কথা কল্পনা কাহিনী

(দ্বিতীয় স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

উৎসর্গ

শ্রীমান তরুণ মজুমদার

গল্পরসিকেষু

সূচীপত্র

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

অলৌকিক

প্রসন্ন মধুর

চিত্ত ও চিত্র

এই গ্রন্থের প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি বিভিন্ন-রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। মূল্য—২২৲

প্রজ্ঞা ও প্রতিশোধ

সেই সময়টা ক্ষণেকের জন্য প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারী একটা ক্রোধ অনুভব করেছিলেন বৈকি রাজ-জামাতা দুর্লভবর্ধন।

ওদিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোষ থেকে তাঁর বিখ্যাত খর্ব তরবারি-খানা বার করেছিলেন—যা নাকি একটা কেশাগ্রকেও দ্বিখণ্ডিত করতে পারে বলে প্রসিদ্ধি আছে—মনে হয়েছিল ঐ কুলটা স্বৈরিণী নারী, আর ঐ বিশ্বাস-ঘাতক কামোন্মত্ত জার—তার সঙ্গে এই রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি প্রাণীকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেন এই মুহূর্তে।

তাঁর যা শক্তি এবং শিক্ষা—এ রাজপ্রসাদের সমস্ত প্রহরী ও রক্ষী যদি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে সকল সমর্থ পুরুষ—তাহলেও তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। মনে হল এই পাপপুরীর সব ক'টাকে বধ করে এই প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিলেও যথেষ্ট প্রশমিত হবে না তাঁর ক্রোধের—সেই সঙ্গে এই রাজ্যটা সুদ্ধ ধ্বংস করে দিতে পারলে, তবে হয়ত কিছুটা প্রকৃতিস্থ হ'তে পারবেন।

কিন্তু সে ঐ কয়েক মুহূর্তই।

তারপরই অসি পুনরায় কোষবদ্ধ করে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলেন। মনে পড়ে গেল, বাল্যকালে বহুবার শোনা পিতার একটি উক্তি, 'তিনিই ধন্য এবং আত্মসংযমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত—যিনি ঈর্ষাকেও দমন করতে পারেন।'

মনে পড়ল—তাঁর পিতার আদর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলেই সামান্য দরিদ্রঘরে জন্মগ্রহণ ক'রেও এই অবস্থায় উন্নীত হ'তে পেরেছেন। এই পদমর্যাদা এই সম্মান অর্জন করেছেন। নইলে তাঁর এ রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার পর্যন্তও পৌঁছবার কথা নয় কোনদিন। ওঁদের মতো মানুষদের সম্মুখের ঐ রাজপথেও হাঁটার কথা নয়।

'জীবনে যদি বড় হতে চাও তো আগে সহ্যগুণ আয়ত্ত করবে।' বাবা বার বার বলতেন, 'অসহিষ্ণুদের কখনও উন্নতি হয় না। তোমরা দরিদ্র এটা বড় অপরাধ তোমাদের, সে জন্যে অকারণেই অনেক অবিচার, অনেক

নির্যাতন সইতে হবে। কখনও সে নির্যাতন বা অন্যায়ের সত্য কোন উত্তর দেবার বা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করবে না, নীরবে মনে মনে যোগ্য প্রত্যুত্তরের শক্তি সঞ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

মন্ত্রের মতো এই কথাগুলো অভ্যাস করেছিলেন দুর্লভবর্ধন প্রজ্ঞাদিত্য ; মন্ত্রের মতোই কাজে লেগেছে তা। নইলে ঐ অতি সাধারণ অবস্থা থেকে দুর্লভবর্ধন ধীরে ধীরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অরাতিদমন সহস্রযুদ্ধজয়ী, বহুদূরদর্শী, অসামান্য রাজনীতিবিদ্, রাজরাজেশ্বর কাশ্মীরাধিপতির সুবৃহৎ অশ্বশালার প্রধান খাদ্যভাণ্ডারীর পদ পেতেন না। উনি চোর নন, অশ্বের খাদ্য গোপনে অন্যত্র বিক্রী করে ঘোড়াগুলিকে অনাহারে রাখবেন না—এই বিশ্বাস ছিল বলেই রাজাধিরাজ বালাদিত্য সামান্য এক দরিদ্রঘরের একটি তরুণকে ডেকে ঐ পদ দিয়েছিলেন। ঘোড়াদের অযত্ন হলে যুদ্ধ জয় তো দূরের কথা, চারিদিকের অসংখ্য লুব্ধ শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। এই পর্বতসঙ্কুল দেশে অশ্বই সৈন্যবাহিনীর প্রাণ, এখানে পদাতিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরর্থক, পথ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ ছাড়া তাদের দ্বারা কিছু হয় না।

ওঁর মতো তরুণের পক্ষে এত বড় সরকারী পদ—দায়িত্বপূর্ণ তো বটেই, তেমন চতুর লোক হলে লাভজনকও—প্রাপ্তিই যথেষ্ট গৌরবের ; তাতেই আত্মীয়-পরিচিতদের ঈর্ষার অবধি ছিল না, এমন কি রাজার আত্মীয়-সমাজ, পারিষদ, তথা অমাত্যবর্গের মধ্যেও এ নিয়ে আন্দোলন ও অসন্তোষ প্রকাশ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তবু তখনও তো—এই অজ্ঞাত অনভিজাত তরুণ যে একদা রাজ-জামাতা হয়ে বসবে—সে কথা সেদিন ছিল তাঁদের সুদূর কল্পনারও অগোচর। রাজরক্ত তো দূরের কথা, অন্য কোন সম্ভ্রান্ত বংশেরও রক্ত নেই দুর্লভবর্ধনের ধমনীতে। এখানে গোনন্দ বংশের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অভাব নেই, কম-পক্ষে দেড়শো ঘরের মতো আত্মীয় আছেন এই রাজধানীতেও। তা ছাড়াও সামন্তরা আছেন, করদ রাজারা আছেন, সভাসদ মন্ত্রীর দল আছেন—তাঁদের পুত্রসন্তানেরও অভাব নেই, তবে কী দেখে রাজা তাঁর একমাত্র ও অনিন্দ্যসুন্দর কন্যাকে অশ্বাগারিকের হাতে দিলেন !

কেন দিলেন তা দুর্লভবর্ধন অবশ্য জানেন।

দুর্লভবর্ধন পিতার কাছে মানব-জীবন-নীতি শিখেছিলেন, কিন্তু রাজনীতিটা শিখেছিলেন নিজে নিজেই। যেদিন থেকে সরকারী কর্ম নিয়েছিলেন সেদিন থেকেই বুঝেছিলেন রাজসভায় বাস মানে হিংস্র শ্বাপদদের মধ্যে বাসা বাঁধা। এখানে চোখ ও কান দুই-ই সর্বদা খোলা রাখা দরকার, সদা-সতর্ক সদা-সচেতন থাকতে হবে। আর তা যদি থাকতে হয়, রাজ-প্রাসাদের খবরাখবরগুলি সদ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। রাজার চতুর্দিকে যাঁরা থাকেন তাঁদের এবং রাজা যেখানে থাকেন সেখানকারও—সাম্প্রতিকতম সংবাদ যে না রাখে সে রাজনীতির অযোগ্য।

দুর্লভবর্ধন—যিনি নিজেই নিজের উপাধি নিয়েছিলেন প্রজ্ঞাদিত্য—তাঁর প্রজ্ঞা শুধু এই জ্ঞানটুকুতেই থেমে থাকবে তা সম্ভব নয়। তিনি বাস্তবেও এ বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন। প্রাসাদের দাস ও রক্ষীদের কাউকে মিষ্টবাক্যে, কাউকে উৎকোচে হাত করেছিলেন ; দাসীদেরও তাই। উপরন্তু কোন কোন বিগতযৌবনা দাসীর সঙ্গে কিছু প্রণয়েরও অভিনয় করতেন। ফলে তারা যে-কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ সর্বাগ্রে পৌঁছে দিত তাঁকে।

এই সব সূত্রেই সংবাদ পেয়েছিলেন প্রজ্ঞাদিত্য যে, কে একজন জ্যোতিষী গণনা করে রাজাকে বলেছিলেন, তাঁর অসামান্যা সুন্দরী কন্যা অনঙ্গলেখার স্বামীই একদা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করবে, গোনন্দ বংশের শাসন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দুশ্চিন্তার অবধি রইল না রাজা বালাদিত্যের। তাঁর ছেলে আছে। সে ছেলেকে কি তাহ'লে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে? ভাবতে ভাবতে তাঁর আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। শেষে অনেক চিন্তার পর তিনি একটা উপায় ভেবে বার করলেন। কোন করদ কি মিত্র রাজবংশের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না তিনি—কোন দেশের রাজা বা রাজপুত্র কারও সঙ্গেই না—সাধারণত যে ধরনের পাত্রে তাঁদের কন্যার বিবাহ হয়। রাজরক্ত নেই, কোন রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন একটি—অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অথচ সৎ বংশের কোন সুদর্শন, সচ্চরিত্র ও সুলক্ষণসম্পন্ন পাত্রের হাতেই কন্যাদান করবেন। রাজবংশের ছেলে না হ'লে, রাজরক্ত দেহে না থাকলে তাকে কেউ—সামন্ত সভাসদ সেনানায়ক অমাত্য কেউই—সিংহাসনে বসতে দেবে না এটা ঠিক। তাঁর ছেলের

অকালমৃত্যু যদি বা হয়—জ্ঞাতিদের কেউ বসবে, তবু তো গোনন্দ বংশের ধারা বজায় থাকবে।

অবশ্য এ সবই উল্‌টে যেতে পারে। ভাগ্য বলবান, কংস-কারাগারেই কংসনিহন্তার জন্ম হয়েছিল—তবু তিনি তাকে বধ করতে পারেন নি। কিন্তু কখনও কখনও পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্যকেও রোধ করা যায়—একথাও সকলে স্বীকার করে—অন্তত পরিবর্তিত হয়। জ্যোতিষীরাই তো বলেন, মহাদান বা প্রাণীদের প্রাণদানের দ্বারা ফাঁড়া কেটে যায় মানুষের, মৃত্যুযোগও লঙ্ঘিত হয়। কিছু না হোক—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুপাত্রের সন্ধান শুরু করে দিলেন।

কার জন্যে পাত্র সন্ধান করছেন, আদৌ কোন পাত্রের সন্ধান করছেন কি না, তাও কেউ জানতে পারে নি। সম্পূর্ণ মন্ত্রগুপ্তি বজায় রেখে গোপনে গোপনে মনের মতো একটি তরুণ সুপাত্রের সন্ধান করছিলেন। দুর্লভবর্ধন হাতের কাছেই ছিলেন, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তার দিকে দৃষ্টি পড়ে নি। শেষে দীর্ঘকাল পরে ঘোড়াগুলির হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ চেহারা দেখে খাদ্যভাণ্ডারীর কথা মনে পড়েছিল। প্রশংসা ক'রে সাধুবাদ দিয়ে এবং কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি করে উৎসাহিত করবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছেন—দুর্লভবর্ধন এসে দাঁড়াতে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। এই তো, ঠিক এমনিটিই তো তিনি চাইছিলেন।

সুকুমার সুশ্রী মুখ, সুগৌর বলিষ্ঠ তনু, দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শিতার আভাস, আচরণ কথাবার্তা মার্জিত, ভদ্র, আভিজাত্যদ্যোতক। উদ্ধত নয়, আবার তোষামোদে নুয়েও পড়ে না। খোঁজ নিয়ে জানলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানও বটে, সুশিক্ষিতও। এর চেয়ে বেশী কি চাই? অন্যান্য যা সুলক্ষণ তাঁর জানা ছিল, তাও কিছু মিলিয়ে পেলেন। গম্ভীর, দৃঢ়চিত্ত, মিতভাষী। সততা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় তো আগেই পেয়েছেন।

বালাদিত্য মন স্থির করে ফেললেন।

ঘরে বাইরে অবশ্যই প্রবল আপত্তি ও প্রতিরোধ উঠেছিল। মহিষীরা, সভাসদ-অমাত্যেরা, আত্মীয়, জ্ঞাতি, সামন্ত—সবাই তারস্বরে প্রতিবাদ ও অননুমোদন জানিয়েছিলেন, নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছিলেন; কোন কোন মহল থেকে সক্রিয় প্রতিরোধের ভীতি প্রদর্শনও করা হয়েছিল কিন্তু সহস্র-যুদ্ধবিজয়ী দুঃসাহসী বালাদিত্য—কি রণে, কি প্রণয়ে যার দ্বিতীয় নেই

কোথাও—অরাতিদমন উপাধি শূন্যগর্ভ-বাক্যসার মাত্র নয়—তিনি এই সব সামান্য মানুষের প্রতিবাদে প্রতিরোধে বিচলিত হয়ে সুচিন্তিত সঙ্কল্প ত্যাগ করবেন, তা সম্ভব নয়।

সুতরাং একদা মহাসমারোহেই দুর্লভবর্ধন প্রজ্ঞাদিত্যের সঙ্গে রাজকন্যা অনঙ্গলেখার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হল। প্রাসাদ সংলগ্ন রাজোদ্যানে কন্যা-জামাতার জন্য নূতন প্রাসাদ নির্মিত হল। কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ রাজ্যশাসন-কার্য তার জন্য নির্দিষ্ট করলেন রাজা বালাদিত্য, সেই সঙ্গে বেতন স্বরূপ মাসিক ভাতা। এমনি মাসোহারা দিলে পরভৃত পরান্নভোজী অলস অকর্মণ্য—দুর্নাম রটবে; সবচেয়ে দুর্নাম 'ঘরজামাই' হয়ে থাকা—সেই জন্যই পরিশ্রম ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হল।

এ বিয়েতে রাজা সুখী হয়েছিলেন ঠিকই, পরবর্তীকালে জামাতার শাসনকার্যে অসামান্য ক্ষমতা দেখে একটু গর্ববোধও করেছিলেন যে, পাত্র-নির্বাচনে তাঁর ভুল হয় নি—কিন্তু অনঙ্গলেখা খুশী হতে পারেন নি।

পারেন নি এই জন্য যে, শৈশব থেকেই তিনি শুনে আসছেন যে তিনি মহান এক রাজচক্রবর্তীর কন্যা, ভারতের যে-কোন নৃপতি তাঁকে বধূরূপে, ভাবী মহিষীরূপে—পেলে ধন্য মনে করবে। তাছাড়াও, এতবড় দিগ্বিজয়ী রাজার কন্যা হয়েও—অথবা সেই জন্যই—দাসী বা দাসী-জাতীয় আশ্রিতা অনুগ্রহ-প্রার্থিনীদের কাছেই মানুষ হয়েছেন তিনি। এদের নীচ মনোভাব, নীচ অভ্যাস এবং সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধে স্থূল ধারণা তাঁর মানসিক গঠনে অনেক প্রভাব বিস্তার করেছে। জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই হয়ে গেছে ভিন্ন। তাঁর উচ্চাশা সাধারণ মেয়েদের মতো—সৎ পাত্র বা আদর্শ মানুষ পাবেন স্বামী হিসাবে—এরকম নয়। প্রচুর অর্থ, প্রভূত প্রতিপত্তি এবং বল্গাহীন সম্ভোগই তাঁর কাছে জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ। দুর্লভবর্ধন তাঁর বাবার এককালীন কর্মচারী, সেনাপতি নয়, কোন প্রবীণ অমাত্যও নয়—নিতান্তই সাধারণ পদাধিকারী একজন। তার স্বভাবচরিত্র যতই ভাল হোক, বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাক, রাজদুহিতা তাঁকে সেই অবজ্ঞার পরকলা দিয়ে দেখছেন, সামান্যতার আবরণের মধ্য দিয়ে। আর তাতেই মনে হচ্ছে যে এতে রীতিমতো তাঁর ওপর একটা অবিচার করা হ'ল। দেববোগ্য বস্তু—

সারমেয়ভোগ্য বলতে যদি বা বাধা থাকে—ভিক্ষুকের ভোগ্য হল।

অতৃপ্তির আরও কারণ ছিল।

দুর্লভবর্ধন সংযত শিক্ষিত মার্জিত রুচির মানুষ। রাজবাড়ির আব-হাওয়ায় যে আভিজাত্য ছিল না—ছিল না তার কারণও একই, রাজবাড়ির ছেলে মেয়েরা দাসদাসীর কাছেই মানুষ হয়, কদাচিৎ ভাল শিক্ষা পেলে কারও কারও চরিত্রে আভিজাত্য বা মর্যাদাজ্ঞানের প্রলেপ পড়ে—সে আভিজাত্য দুর্লভবর্ধনের সহজাত। ঐ ধরনের ভদ্র স্বামীকে দিয়ে অনঙ্গলেখার নিম্নস্তরের লালসা চরিতার্থ হত না। তবু যে ঘর করতেন—উপায় নেই বলেই।

অনঙ্গলেখার এই অতৃপ্তি তার বাবা-মা লক্ষ্য না করলেও একজন করেছিলেন। তিনি হলেন মহামাত্য কঙ্ক। কঙ্করা তিন ভাই, তিনজনই ছিলেন বালাদিত্যের মন্ত্রী, বস্তুত এই তিনজনই রাজ্যশাসন করতেন। এঁদের মধ্যে কঙ্কই ছিলেন বালাদিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং বিশ্বস্ত। এঁরা গোনন্দদের দৌহিত্রবংশীয় হলেও সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন, রাজার প্রসাদে রাজ্যের সর্বোচ্চ পদ পেয়েছেন।

সেই কারণেই প্রাসাদে মহামাত্য কঙ্কর অবারিত দ্বার, এমন কি অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতেও বাধা ছিল না।

কঙ্ক বয়সে দুর্লভবর্ধনের চেয়ে অনেক বড়, দেখতেও যে খুব একটা সুদর্শন তা নয়। স্বভাব-চরিত্রেও—প্রকাশ্য না হোক, গোপন লাম্পট্যর একটা কুখ্যাতি ছিল। হয়ত সেই জন্যই তার দৃষ্টিদর্পণে নিজের লালসার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলেন অনঙ্গলেখা। দুজনেই সম্ভবত দুজনের মনের ভাষা পড়তে পেরেছিলেন, দুজনের আকুতি দুজনের মনে পৌঁছে গিয়েছিল, আর তা পূরণেও কোন অসুবিধা হয় নি।

এসব জানতেন না দুর্লভবর্ধন। সন্দেহ মাত্র করেন নি, এ সম্ভাবনা সুদূর কল্পনাতেও ধরা পড়ে নি। তবে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুদ্ধিমান লোক, পর্যবেক্ষণ শক্তি অসাধারণ—নইলে ইতিমধ্যেই রাজকার্যে এত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন না, এর মধ্যেই দুষ্ট লোকে ভয় করতে শুরু করেছে, শিষ্টরা আশ্বাস লাভ করছে তাঁকে দেখে, সম্ভ্রমের চোখে দেখছে সবাই। দুর্লভবর্ধন দেখলেন অনঙ্গলেখার চোখের কোলে কালিমা। মুখে অপরিসীম ক্লান্তির

চিহ্ন। অর্থাৎ অতিরিক্ত পুরুষ-সংসর্গের লক্ষণ। আরও লক্ষ্য করলেন—ওঁর চোখে চোখ রাখতে পারেন না বা চান না ওঁর স্ত্রী, নৈকট্য এড়িয়ে চলেন প্রাণপণে। আগে স্বামীর কাছে এলে অবজ্ঞা প্রকাশ পেত অনঙ্গলেখার, এখন ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে ওঠে।

সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠলেন দুর্লভবর্ধন।

তারপর আর সংবাদ-সংগ্রহে বিলম্ব হবে কেন? সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হতেও কোন বাধা রইল না। অন্তঃপুরে ওঁর যে সব বেতনভুক্ সংবাদ-সরবরাহকারিণীর দল ছিল—তাদের কুণ্ঠা ও রসনার জড়তাতেই যেটুকু জানার তা জানা হয়ে গেল। পুরুষটি কে তাও বুঝতে দেরি হল না, কারণ কাশ্মীরাধিপতির শুদ্ধান্তঃপুরে মাত্র তিন চারটি পুরুষেরই গতিবিধি ছিল। তাদের ভবনে চর নিয়োগ করতেই মহামাত্যের সন্দেহজনক নৈশ গতিবিধির কথা জানা গেল। বাকীটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হলেন—কঙ্কর মুখে অপরিসীম তৃপ্তি ও চোখে অ-রাজনীতিকসুলভ স্বপ্নাচ্ছন্নতা দেখে।

অনঙ্গলেখা বেশির ভাগ সময়ই রাজপ্রাসাদে থাকতেন—মাসে প্রায় কুড়িদিনই। ইদানীং সেটা ত্রিশদিন দাঁড়াতেও তাই অত সন্দেহের কারণ ঘটে নি। এখনও সে ব্যবস্থায় কোন খোঁচা দিলেন না প্রজ্ঞাদিত্য। বরং সেই নিশ্চিন্ততার সুযোগ নিয়েই আজ অনায়াসে সন্তর্পণে এসে একেবারে স্ত্রীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের দ্বিতীয় পাদে।

দ্বারী রক্ষীরা কেউ বাধা দেবে না, কারণ তারা সকলেই অনুগত। তাছাড়াও রাজকার্য শেষ করে গভীর রাত্রে স্ত্রীর শয়নকক্ষে যাওয়া একেবারে নতুন নয়।

নিঃশব্দে ঢুকেছিলেন প্রজ্ঞাদিত্য। দীপাধারে প্রদীপের সামান্য আলো, তবু অন্ধকারে অভ্যস্ত দৃষ্টিতে প্রায় এক নজরেই সবটা দেখে নিয়েছিলেন। দুজনেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। কঙ্কের বাম বাহুতে অনঙ্গলেখার মাথা, তাঁর চোখের কোলে সুগভীর কালিমা—অত্যুজ্জ্বল রক্তাভ গৌরবর্ণে সে কালিমা গভীরতর দেখাচ্ছে, অনাবৃত স্বর্গকন্যাদুর্লভ বক্ষে নখর-কিণাঙ্ক, ললাটে তখনও বিন্দু বিন্দু শ্রান্তিস্বেদরেখা। অঘোর অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছেন রণশ্রান্ত সৈনিকের মতো।...

উন্মত্ত ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে কয়েক

মুহূর্তের মতো। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রজ্ঞা ও বাস্তববুদ্ধিরই জয় হ'ল, অমানুষিক চেষ্টায় সহজ স্বাভাবিক উত্তেজনা দমন করলেন।

এই সামান্য সময়েই অগ্র-পশ্চাৎ অনেক কিছু ভেবে নিয়েছেন। তাঁর হিসাববুদ্ধি তাঁর কল্পনানেত্র নিমেষে বহুবৎসর অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যতে চলে গেছে। বহু সম্ভাবনা ভেবে নিলেন ইতিমধ্যে ; আশা ও আশঙ্কা—দুটো দিকই ওজন করে দেখে নিলেন।

নিঃশব্দেই অসি কোষবদ্ধ করলেন তাই। বারেক ইতস্তত করে পালঙ্কের পাশে তাম্বুল ও পানীয় রাখার জলচৌকিতে কঙ্কের যে উত্তরীয় অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল…কামনার উন্মত্ত আবেগে যেমন তেমন করে ছুঁড়ে ফেলে ছিলেন কঙ্ক—সেইটাই তুলে নিয়ে রাজকন্যার লেখনী সংগ্রহ করে বড় বড় হরফে লিখলেন, 'তোমাকে বধ করাই উচিত ছিল, কিন্তু ক্ষমা করলাম। অতঃপর যে জীবন ধারণ করবে সে আমারই দান করা—স্মরণ রেখো।'

স্মরণ রেখেছিলেন কঙ্ক।

সতর্ক মহামাত্য রাত্রি থাকতেই উঠে পলায়নে অভ্যস্ত, তাই যতই ক্লান্ত হোন চতুর্থ প্রহরের মধ্যভাগে তাঁর ঘুম ভাঙত। সেদিনও ভাঙল এবং চোখ মেলতেই প্রথম যেটা লক্ষ্য হল—সুশাসকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি—পাশে যেমন-তেমন করে রাখা উত্তরীয়টি কে গুছিয়ে ভাঁজ করে রেখে গেছে, এবং তাতে কী সব লেখা—

লেখাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবিভ্রান্তকারী সুগভীর লজ্জায় একরকম ছুটেই বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। সেই শেষ, আর কোনদিন যান নি, অনঙ্গলেখার শত অনুনয়ে—দূতী বা পত্রপ্রেরণেও না। মুখ তুলে কোনদিন আর দুর্লভবর্ধনের মুখের দিকেও চাইতে পারেন নি, যদিচ রাজ-জামাতার আচরণে কোন বৈলক্ষণ্য বা বিরূপতা প্রকাশ পায় নি কোনদিন।

অতঃপর কঙ্ক দুর্লভবর্ধনের প্রিয়সাধনেরই চেষ্টা করেছেন প্রাণপণে, তাঁর স্বার্থরক্ষার। কঙ্ক ইতিমধ্যে রাজশক্তি নিজের হাতেই সুসংহত ক'রে নিয়েছিলেন, তাই বালাদিত্যের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে যখন সমস্ত জ্ঞাতিকুল, সামন্ত ও করদ রাজার দল নিজেদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন—বালাদিত্যের পুত্র ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন—তখন নির্মম

হস্তে সমস্ত লোভ ও প্রতিরোধের বীজ পর্যন্ত নির্মূল ক'রে—কাউকে উৎকোচে, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে স্বদলে এনে, কাউকে বা ভীতি-প্রদর্শনে—প্রয়োজন মতো, সে ভীতি-প্রদর্শন যে শূন্যগর্ভ আস্ফালন নয় তা প্রমাণের জন্য দু চার জনকে বধ ক'রে—দুর্লভবর্ধনের উত্তরাধিকারের পথকে নিষ্কণ্টক নিরাপদ ক'রে দিলেন। একদা তিনি শুভদিন দেখে—প্রজ্ঞাদিত্য নামেই মহাসমারোহে, অনঙ্গলেখার স্বামী এই দাবীতেই, কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

এই ভাবেই দেবত্ব-আরোপিত গোনন্দ বংশের শাসনাবসান ঘটল। নিতান্তই একটা সাধারণ বংশের লোক দেববংশোদ্ভূত রাজাদের আসনে বসবে—এ চিন্তা বোধহয় অসহ্য হ'ল প্রজাদের, তাই তারা নিজেদের সান্ত্বনার জন্যই একটা কাহিনীর সৃষ্টি করে নিল। প্রজ্ঞাদিত্যের সত্যকারের প্রজ্ঞা, মনীষা, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সে উপাখ্যান রচনায় সহায় হল। তারা বললে, বাসুকীর বংশধর কর্কটনাগ সূক্ষ্মশরীর ধারণ করে এসে দুর্লভবর্ধনের মাতাতে তার অজ্ঞাতসারেই উপগত হয়েছিলেন, তাই এমন অসামান্য পুত্রলাভ হয়েছে তার।

সেই রটনা থেকেই প্রজ্ঞাদিত্যের বংশ নাগবংশ নামে অভিহিত হল।

কঙ্ক ও অনঙ্গলেখার ঘৃণ্য আচরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে ছিলেন প্রজ্ঞাদিত্য নিজের স্বার্থেই। এই স্বার্থ। সিংহাসন প্রাপ্তির সুবিধা-অসুবিধা, সম্ভাব্য সহায়তা ও বিরোধিতার কথা চিন্তা করেই।

কিন্তু তার পর কঙ্কর লজ্জা, যথার্থ অনুতাপ ও অনুকূল আচরণে, যথার্থ সেবায় তাকে ক্ষমাই করেছিলেন প্রজ্ঞাদিত্য। ক্ষমা করতে পারেন নি রাজ্ঞী অনঙ্গলেখাকে। স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা প্রণয়হীনতার থেকেও যেটা তাঁকে গভীর ভাবে আঘাত করেছিল সেটা হচ্ছে অনঙ্গলেখার প্রকাশ্য অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব। হাতে হাতে ঐ লজ্জাজনক আচরণ ধরা পড়ার পরও সে ভাব কমে নি, কোন অনুতাপ বা লজ্জাই প্রকাশ পায় নি ওর আচরণে কি মুখের ভাষায়। প্রেম কোন দিনই ছিল না, ইদানীং পূর্ব অবজ্ঞা উদ্ধত বিরূপতার চেহারা নিয়েছিল বরং।

সবই দেখেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন—সযত্নেই তা সহ্য করেছিলেন তরুণ নৃপতি। স্বাভাবিক ঈর্ষা বা ক্রোধকে স্বার্থের পরিপন্থী হতে দেন নি। এ সিংহাসন পেতে হলে অনঙ্গলেখাকে প্রয়োজন। এই তাঁর একমাত্র দাবী।

কে জানে, সেটা জানতেন বলেই হয়ত অনঙ্গলেখার এত ঔদ্ধত্য।

কিন্তু অনঙ্গলেখা তখনও এই অনভিজাত-বংশীয়, ওঁর মতে নিতান্ত সাধারণ স্বামীটিকে চেনেন নি। তাই সতর্ক হবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। সিংহাসনে বসার পর প্রবল বিরোধিতা এবং ভবিষ্যৎ বিপদের মূল পর্যন্ত বিনাশ করতে তাঁর বছর খানেক সময় লেগেছিল। এই সময়টা অন্য চিন্তা করতে পারেন নি বিশেষ। তবু একেবারে নিষ্ক্রিয়ও ছিলেন না।

কিন্তু তাঁর মন অপরের দুর্জ্ঞেয় পথে চলছিল। কঙ্ক বা অপর কেউ সন্দেহমাত্রও করতে পারেন নি কী মরণফাঁদ কোথা দিয়ে পাতছেন তিনি।

রাজা নিজে এক একদিন নিঃশব্দে অপরের অজ্ঞাতে বেরিয়ে পড়তেন প্রাসাদ থেকে। প্রজাদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অবহিত হতেই ওঁর এই অনির্দেশ যাত্রা—এই কথাই ভাবত সকলে। এই ভাবে বেরিয়ে দূর-দূরান্তের ছোট ছোট গ্রামে চলে যেতেন—যেখানে কেউ চেনে না তাঁকে।

এমনিই ঘুরতে ঘুরতে শহরতলীর এক শ্মশানে এসে একটি তরুণ চণ্ডাল-পুত্রের দেখা পেলেন। যেমন সুদর্শন তেমনই বলশালী ছেলেটি। বয়সও খুব কম, আঠারো-উনিশের বেশি হবে না।

এই রকম একটি নীচজাতীয় অথচ সুশ্রী ছেলেই তিনি খুঁজছিলেন। উচ্চবর্ণের অভিজাত-বংশীয়দের (নীচজাতীয় হীনপ্রবৃত্তি দাস-দাসীদের সংসর্গে শৈশব বাল্য অতিবাহিত করার জন্যই সম্ভবত) চণ্ডালিনী-সহবাস-আসক্তি সর্বজনবিদিত। সেইজন্যই এদের ঘরে মধ্যে মধ্যে ভদ্রবংশেও-দুষ্প্রাপ্য চারুদর্শন পুত্র-কন্যার দেখা পাওয়া যায়।

এই ছেলেটির আবার দেখা গেল আরও কিছু গুণ আছে, সুদক্ষ শিকারীও। ভল্ল ও ধনুঃশর—দুইয়েতেই আশ্চর্য নিপুণতা। একা অরণ্যের মধ্যে অস্ত্র অভ্যাস করছিল, দূর থেকেই তার ক্ষিপ্রতা ও অব্যর্থতা লক্ষ্য করলেন প্রজ্ঞাদিত্য। উনি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই, আমার সঙ্গে যাবি ? ভাল চাকরি দেব।'

ছেলেটা সন্দিগ্ধভাবে ভুরু কুঁচকে চাইল। বললে, 'না। তুমি এখানে কেন এসেছ ? তুমি যাও।'

'কেন রে, রাগ করছিস কেন। ভাল চাকরি দেব। রাজবাড়ির চাকরি।'

'না না, চাকরি আমি করবই বা কেন ? তোমার রকমসকম আমার ভাল

লাগছে না বাপু। তুমি যাও। নইলে আমি মেরে তাড়াব।'

'মেরে তাড়াবি? পারবি আমার সঙ্গে গায়ের জোরে?'

বুক ফুলিয়ে ছেলেটা জবাব দিল, 'হঃ। আমার হাতে হাতিয়ার থাকতে আমার সঙ্গে গায়ের জোরে কেউ পারবে না।'

এর মধ্যেই তার অস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণতা রাজা দেখে নিয়েছেন, তবু বললেন, 'তাই নাকি! আচ্ছা, ঐ যে গাছটায় এক গুচ্ছ 'সেও' ফল হয়ে আছে ওর ঐ পিছনেরটা তীরে কেটে মাটিতে ফেলতে পারিস?'

'খুব। এখনই।' বলে ছেলেটি তীর ছাড়ল। সে তীর বিঁধলও অব্যর্থ লক্ষ্যে। কিন্তু ফলটা বোঁটা কেটে মাটিতে পড়বার আগেই রাজা প্রজ্ঞাদিত্যের তীর সেই শূন্যেই ফলটাকে কেটে দুখানা করে দিল।

এবার ছেলেটার বেশ একটু শ্রদ্ধা হল। বললে, 'তুমি তো ওস্তাদ বটে হে। কে তুমি? আর আমাকে নিয়ে যেতেই বা চাইছ কেন খামকা। আমি তো চাকরি চাই নি। আমার কোন দরকার নেই রাজবাড়ির চাকরিতে।'

'আমার দরকার আছে। আমি তোদের রাজা।'

'রাজা? ও নতুন জামাই-রাজা? তা হ্যাঁ, সেই রকমই লাগছে বটে। রাজা হুকুম করলে তো যেতেই হয়। কিন্তু আমার একটুও যাবার ইচ্ছা নেই। ওখানে সব নানারকম বিপদে পড়তে হয় শুনেছি। আমি জংলী লোক, শেষে কি তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণটা দেব?'

'আচ্ছা। আমি জামিন রইলুম। বিপদে পড়লে প্রাণটা যাতে না যায় আমি দেখব। তোর নাম কি?'

'আমার নাম বক্ক, আমার বাবার নাম—'

'থাক। তোমার বাবার নামে দরকার নেই। বাড়িতে বলে এসো রাজবাড়িতে চাকরি হয়েছে। বেতনের টাকা এখানেই আসবে। তোমাকে কিন্তু আজই, আমার সঙ্গেই যেতে হবে।'···

সে বলিষ্ঠ ও শস্ত্রনিপুণ, এই দুই গুণের অজুহাতে রাজা বক্ককে একেবারে দেহরক্ষী দলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তখনও কেউ অত মাথা ঘামায় নি। কিন্তু মাস দুই পরে যখন শোনা গেল সেই অজ্ঞাতকুলশীল নিরক্ষর নীচ চণ্ডাল-টাকে অতিবিশ্বস্ত ও অতিসতর্ক এই দুই গুণ আরোপ করে শুদ্ধান্তঃপুরের

প্রহরী নিয়োগ করা হচ্ছে, তখন কঙ্ক একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন।

'এ কী করছেন মহারাজ? অন্তঃপুর পাহারা দেবার জন্য বিশ্বস্ত লোকের অভাব তো ঘটে নি।'

'নাই বা ঘটল। অধিকন্তু ন দোষায়। একজন বেশীতে ক্ষতি কি?'

'কিন্তু এ যে নিতান্ত অর্বাচীন, তায় অজ্ঞাতকুলশীল। আর এই তো মাত্র দু মাস দেখেছেন—এর মধ্যেই ওর বিশ্বস্ততার কী প্রমাণ পেলেন? এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ—'

রাজা স্থিরদৃষ্টিতে কঙ্কের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই তো, এক বৎসরেরও উপর অতিক্রান্ত হয়ে গেল—এর মধ্যে কি আমার খুব একটা নির্বুদ্ধিতার বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়েছেন মহামাত্য?'

কঙ্ক জিভ কেটে হাতজোড় করে বললেন, 'আমারই ধৃষ্টতা হয়ে গেল মহারাজ, আপনাকে সতর্ক করতে যাওয়া!'

এই প্রহরী নিয়োগের ফল যা ফলবার তাই ফলল।

অনঙ্গলেখার অনির্বাণ লালসাবহ্নি নবতর ইন্ধন খুঁজছিল। এই সুদর্শন তরুণ বলিষ্ঠ কিশোরটিকে দেখে তার শিখা লেলিহান হয়ে উঠল। তার নাগিনী কামনা গিয়ে যেন পাশবদ্ধ করল ছেলেটাকে। রাজা প্রজ্ঞাদিত্য স্ত্রীকে চিনে নিয়েছিলেন; সেই জন্যই, ইচ্ছে করেই এই ফাঁদ পেতেছিলেন—যাতে সহজেই চোখে পড়ে সে জন্য একেবারে অন্তঃপুরের দ্বারপ্রান্তে স্থাপন করেছিলেন। নির্বুদ্ধি অনঙ্গলেখা অন্ধভাবে ছুটে গিয়ে সে ফাঁদে ধরা পড়ল।

দুর্লভবর্ধনও সজাগ ছিলেন। দুজনেরই দৈনন্দিন গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিনের এই কামবন্ধনের প্রতিটি গ্রন্থি-পড়ার সংবাদ সংগ্রহ করতেন। শেষে দুজনেই নিশ্চিন্ত ও সম্ভোগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে নিশ্চিত সংবাদ পেয়ে একদিন গভীর রাত্রে কঙ্ককে ডেকে পাঠালেন। বিস্মিত উদ্বিগ্ন কঙ্ক হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছতে রাজা হেসে বললেন, 'ভয় নেই। এমন কোন গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। আমার স্ত্রীর শয়ন-মন্দিরে যাওয়া এককালে তো আপনার অভ্যাস ছিল, চলুন সেইটাই ঝালিয়ে নেওয়া যাক।'

নিমেষমধ্যে কঙ্কর মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে উঠল। ললাটে বড় বড় স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

তাঁর অপরাধী মন পলককালেই বহু দূর চলে গেল। এতদিন পরে রাজা

সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ তুলতে চান নাকি ?

অতি-তীক্ষ্ণধী মহামাত্যরও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল—'কেন' এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটাও করতে পারলেন না !

রাজা তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে ছিলেন—প্রশ্নটা উচ্চারিত না হলেও বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। হেসেই বললেন, 'ভয় নেই। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আপনি আমার জন্য যা করেছেন তা আমার মনে আছে—থাকবেও। আপনাকে আমার প্রিয়তমা মহিষীর শয়ন-মন্দিরে নিয়ে যেতে চাইছি অন্য কারণে। যার জন্যে আপনি অত বড় অন্যায় করেছিলেন—বিশ্বাসঘাতকতাই বলতে হয়—তার স্বরূপটা একটু দেখবেন চলুন।...আপনি মহামাত্য, এ রাজ্যে রাজার পরেই সর্বোচ্চ পদাধিকার—আপনার কাছে আমি বিচারও চাইছি।'

অতঃপর রাজা প্রজ্ঞাদিত্য মহামাত্য কঙ্ককে অধরোষ্ঠের উপর তর্জনী-স্থাপন করে নীরবে ও নিঃশব্দে সঙ্গে আসার সংকেত জানিয়ে শুদ্ধান্তঃপুরে, একেবারে রাজ্ঞীর শয়ন-মন্দিরে নিয়ে গিয়ে সেই তর্জনী নির্দেশেই দেখালেন অবস্থাটাও।

কঙ্কও দেখলেন।

দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ। দারুণ গ্রীষ্মে ঐ ভাবে বদ্ধ থাকাতে দুজনেরই স্বেদস্নাত অবস্থা—তবু কেউ বাহুবন্ধন এতটুকু শিথিল করতে চায় নি।

দুর্লভবর্ধনের ক্রোধ হবার কথা নয়, হয়ও নি। তিনি বরং কৌতুক ও একটা বিজয়গর্ব, সেই সঙ্গে অভিলাষ-সিদ্ধির আনন্দ অনুভব করলেন।

কিন্তু দুঃসহ ক্রোধে কঙ্কের মুখ অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল। তিনি এটাকে ব্যক্তিগত অবমাননা বলে বোধ করলেন। নিজের সম্বন্ধে এতকাল যে একটা উচ্চ ধারণা ছিল সেটা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রাজকন্যা, ভাবী রাজমহিষী ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন—এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেন নি, বরং তাঁর সুরুচিরই পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর প্রবৃত্তির এই উগ্র কদর্য চেহারাটা দেখে সেই আত্মতৃপ্তির প্রাসাদটাই চূর্ণ হয়ে গেল, অপমান বোধটা সেই কারণেই। নিজেকে তাঁর কাছে ঐ চণ্ডালটার সমান কল্পনা করেই।

রাজা তাঁর মনোভাব বুঝে উদাসভাবে বললেন, 'যা ভাল বোঝেন, একটা ব্যবস্থা করুন মহামাত্য। আমি বড় অবসন্ন বোধ করছি। ঘটনার বিবরণ শোনা ও চোখে দেখায় অনেক তফাত। এ অপমান ও লজ্জা সইতে পারছি নে।'

মহামাত্য ব্যবস্থা করলেন বৈকি।

প্রণয়ী-যুগলকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করা হল। এবং কোন রাজ্যে কখনও যা হয় নি—প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করে বিচার করা হ'ল। মন্দ লোকে বলে এতটা নাকি মহামাত্য করতে চান নি, করা হয়েছে রাজারই নির্দেশে।

বঙ্কর অপরাধ অপেক্ষাকৃত কম স্বীকার করলেও বিচারকরা তাকে চিরজীবনের মতো নির্বাসন দণ্ড দিলেন। কিন্তু তাতে সে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল না। রাজা ওর এই চরম বিপদের দিনে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন। অতিমানবিক ঔদার্যে ও লোকোত্তর ক্ষমাগুণে তাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে নিরাপদে রাজ্যসীমা পার করিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

কিন্তু মহিষী এত অল্পে পরিত্রাণ পেলেন না। বিচারকরা একমত হয়ে তাঁকে তুষানলে দগ্ধ করার আদেশ দিলেন।

অনঙ্গলেখা মিনতি করে রাজার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন, অন্তত এই ভয়ঙ্কর প্রণালীটা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সকাতর অনুনয় ক'রে। তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করা হোক কিংবা তাঁর শিরশ্ছেদ করা হোক—তুষানলটা রহিত করুন রাজা। গোনন্দ বংশের রাজকন্যার এই একটিই অন্তিম প্রার্থনা।

আত্মীয়-সমাজও এই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করলেন। দয়া করুন রাজা, অন্তত স্বর্গত তাঁর শ্বশুরের স্নেহ-প্রীতির কথা স্মরণ করেও।

কিন্তু রাজার একটিই বক্তব্য, ধর্মাধিকরণের আদেশের ওপর রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এতে প্রজাসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।

শুধু রাজ্ঞীর সকরুণ আবেদন-পত্রের একটা উত্তর দিয়েছিলেন রাজা প্রজ্ঞাদিত্য।

কবে নাকি অনঙ্গলেখা স্বামীকে লক্ষ্য ক'রেই সখীদের কাছে বলেছিলেন, 'পৃথিবীর নিয়মই এই. কখনও কখনও পায়ের জুতোও মাথায় ওঠে।' রাজা সেই বক্তব্যেরই জবাব দিলেন এতকাল পরে, এই পত্রে। শুধু একটিই পংক্তি লেখা ছিল তাতে—'পৃথিবীর নিয়মই এই, কখনও কখনও প্রাণের দায়ে অতি উন্নত মাথাও সামান্য পাদুকাতে অবনত হয়!'

কার্য-কারণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—প্রথমটা ভুল হয়। কার্যের সঙ্গে কারণের যোগসূত্রটা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তারপরই দেখা যায়—কোথাও এতটুকু ভুল হয় নি, দিনের সঙ্গে রাত্রি এবং রাত্রির সঙ্গে দিনের মতোই সব কাজের সঙ্গেই কারণটা জোড়া থাকে। এখানেও আছে।

ভারত-ইতিহাসের একটি অধ্যায় চোখের সামনে খোলা রয়েছে। পড়ছি আর কথাটা ভাবছি।

পর পর ঘটনাগুলো ঘটেছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে—অকারণ। একেবারে অকারণ। কিন্তু তারপরই দেখছি ঠিক কারণটাও খুঁজে পেয়েছেন ঐতিহাসিকরা।

জাহান্দার শা পরাজিত করেছিলেন আজিম-উশ-শানকে। বাকী যে দুই ভাইয়ের সাহায্যে এ কাজ করেছিলেন, তাদের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেরি হয়নি। তার ফলে যে সিংহাসন লাভ করলেন—কয়েক মাস না যেতেই তা থেকে তাকে তাড়ালেন আজিম-উশ-শানের ছেলে ফর্রুক-শিয়র।

পরাজিত সম্রাট পালিয়ে গেলেন রণক্ষেত্র থেকে। মাথা ও গোফদাড়ি মুড়িয়ে স্ত্রীলোক সেজে গোপনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই উজীর ও প্রধান সেনাপতি জুলফিকর খাঁর দোরে। জুলফিকর তাঁর বাবার পরামর্শে আশ্রয়-প্রার্থী প্রাক্তন মনিবকে বন্দী ক'রে নতুন মনিবকে ভেট পাঠালেন এই ভরসায় যে, এই মূল্যবান ভেট পেয়ে পূর্ব শত্রুতা ক্ষমা করবেন বাদশা ফর্রুকশিয়র।

করলেনও তিনি। অভয় ও আশ্বাস দিলেন যথারীতি। তারপর দরবারে ডেকে পাঠালেন। তাঁর দূত তকরাব খাঁ এসে কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করলেন যে, জুলফিকরের কোন ভয় যেই, বাদশা তার উপর খুশীই আছেন। তকবার খাঁ তাঁর নিরাপত্তার জামিন।

বাদশার শিবিরে পৌছানোর পরও সাদর অভ্যর্থনা, খিলাত ও খেতাবেব

ত্রুটি হয় নি। কিন্তু তার একটু পরেই তাতারী সেনারা এসে ঘিরল জুলফিকরকে—মেরে ফেলল নির্মম নৃশংসভাবে। জুলফিকর পেলেন তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। বেচারী তকরাব খাঁয়ের ডান হাতখানা শুধু নাকি সেইদিন থেকে একটু একটু করে শুকিয়ে গেল।

বাদশার এই মিথ্যাচরণের কারণ তখন খুঁজে পান নি তকরাব খাঁ।

যেমন আরও পান নি—হঠাৎ একদিন পিতামহী জিন্নতউন্নিসার (সম্রাট আলমগীরের দুহিতা) বাড়ি থেকে ফিরে এসে নতুন বাদশা যে সাদুল্লা খাঁকে বধ করবার আদেশ দিলেন—তারও কারণ।

কিন্তু ঐতিহাসিকরা দু'টো কারণই খুঁজে বার করেছেন। জুলফিকর খাঁয়ের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা উচিত হবে—এ বিষয়ে বাদশা মতামত জানতে পাঠিয়েছিলেন বাদশা-বেগম জিন্নতউন্নিসার কাছে। তখন মুঘল অন্তঃপুরের এইসব সম্রাট-দুহিতারা—জাহানারা-রোশনারা-জয়েবউন্নিসা-জিন্নতউন্নিসা—এঁরা সকলেই রাজনীতির জটিল ব্যাপার নিয়ে চর্চা করতেন। তাঁদের মতামতের মূল্যও ছিল। উত্থান-পতন যতই হোক্—যিনিই নূতন আসুন—সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সে মতামত শুনতেন।

জিন্নতউন্নিসাও মতামত লিখে পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন ঐ সাদুল্লা খাঁর হাত দিয়েই। লিখেছিলেন, 'না বায়াদ কুশ্‌ত্‌' অর্থাৎ 'বধ করা ঠিক হবে না'। সে চিঠি সাদুল্লা খাঁ বদ্‌লে বাদশার হাতে যখন দিলেন—বাদশা পড়লেন 'বায়াদ কুশত্‌'—'বধ করাই উচিত'! অনেকদিন পরে সম্রাট তাঁর বাপের পিসির কাছে যেতে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'জুলফিকর খাঁকে মারলে কেন? সে থাকলে এই সৈয়দরা তোমার ওপর এতটা বাদশাগিরি করতে সাহস করত না!' বাদশা আকাশ থেকে পড়লেন, 'বা রে! আপনিই যে লিখেছিলেন!'

তখনই কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এইটে আশঙ্কা করেন নি সাদুল্লা। ভেবেছিলেন কথাটা চাপা পড়ে যাবে। জুলফিকরের মতো অমন অনেকেই মারা গেল, কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সৈয়দরা এত প্রবল হয়ে উঠে বাদশার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠবে—তাও হয়ত বুঝতে পারেন নি তিনি।

নিজের এই হ্রস্ব-দৃষ্টির মূল্য দিলেন সাদুল্লা নিজের জীবন দিয়ে।

বাদশা-বেগমের কাছ থেকে ফিরে এসেই নতুন বাদশা হুকুম দিলেন—সাদুল্লার মৃত্যু !

কিন্তু সাদুল্লা এ কাজ করতে গেলেন কেন ?

জুলফিকরের পূর্ব সৌভাগ্যে ঈর্ষা ? ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা ?

ঐতিহাসিকরা অনেক কারণ দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনটাই ঠিক খাটে না। বর্তমানের দুর্গতি দেখেও মানুষ পূর্ব সৌভাগ্যের ঈর্ষা কি মনে রাখে ? আর ভবিষ্যৎ ? যে সৈয়দদের বাহুবলের উপর নির্ভর ক'রে বাদশা সিংহাসন পেয়েছেন তারা থাকতে—জুলফিকর অন্তত সাদুল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী হতেন না এটা ঠিক ! সাদুল্লা কি সে কথাটা জানতেন না ?

আসল কারণ ঐতিহাসিকরা খুঁজে পান নি।

সেইটেই বর্তমান কাহিনী।

আসল কারণ জাহান্দারের প্রিয়তমা বাঁদী লালকুঁয়র। বেগম ইমতিয়াজ মহল।

কুক্ষণে তাকে দেখেছিলেন সাদুল্লা।

দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন নি। পাগল হয়ে গিয়েছিলেন—একদম বেহুঁশ, দিওয়ানা !

লালকুঁয়ারকে দেখেই তিনি সব উচ্চাশা বিসর্জন দিয়ে খান-সামানের[১] পদ নিয়েছিলেন বাদশার।

শুধু সর্বদা ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন বলে। ছায়ার মতোই।

থাকতেনও তিনি তাই।

লালকুঁয়রের ছোট খাটো আদেশ পালন করতে পারলে, সামান্যতম খেয়াল মেটাতে পারলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন তিনি। অনেক সময় মুখে তা প্রকাশ করতেও হ'ত না, চোখের ইঙ্গিতেই ইচ্ছা বুঝে নিয়ে কাজে পরিণত ক'রে দিতেন সে ইচ্ছা।

আর তখন লালকুঁয়রের খামখেয়ালের তো শেষও ছিল না। উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ক্ষমতার সুরা আকণ্ঠ পান ক'রে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপই বুঝি হাতে

---

(১) খানসামা শব্দটি এই থেকেই এসেছে। কিন্তু বাদশার খান-সামান্ বা খান-ই-সামান্ বলতে বোঝাত **Lord high steward.**

এসেছে। পথের ভিখারী বাদশার বাদশা হবার স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্নও যখন মিটেছে তখন সবই মিটবে। সৌভাগ্যের শেষ হবে না কোন দিন, খোদা বিশেষ প্রসন্ন তাঁর ওপর—স্বয়ং খোদারই পরোয়ানা বুঝি তাঁর ললাটে! মাতাল যেমন মদের মাত্রা বাড়িয়ে যায়, তেমনি তিনিও ক্ষমতা-পরীক্ষার মাত্রা বাড়িয়েই যাচ্ছিলেন দিন দিন।

চরম হ'ল সে দিন—

হ্যাঁ—এই সেদিনই, গত শ্রাবণ মাসে।

শাওন-ভাদোর জলকেলি' তখনও শুরু হয় নি—অপরাহ্নের বিশ্রামের পালা চলেছে—সামান-বুরুজে বসে আছেন বাদশা ও তাঁর প্রেয়সী। সামনে যমুনা বয়ে চলেছে। শীত বা গ্রীষ্মের নীল-সলিলা ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী নয়—আষাঢ়-শ্রাবণের গৈরিকবর্ণা পূর্ণ-যুবতী যমুনা, উদ্দামগতিতে বয়ে চলেছে—অসংখ্য ছোটখাটো আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে।

অলস অপরাহ্ণ—শরবৎ, তামাক আর রসিকতায় কাটছে। মদের পালা তখনও আরম্ভ হয় নি। দিবানিদ্রার পর দু'জনেই প্রকৃতিস্থ। সুতরাং অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত দেওয়ারও উপায় নেই।

সেই খরস্রোতা নদীতেও খেয়া পারাপার চলছিল। বিরাট একখানি নৌকা বোঝাই অসংখ্য নরনারী এপার থেকে রওনা হয়েছে তখন। ওপারের গাঁ থেকে এপারে এসেছিল মাল বেচতে, গম-দাল-সব্‌জী, আরও কত কী। অন্য প্রয়োজনেও এসেছিল হয়ত। এখন ফেরত যাত্রী সব। সবারই তাড়া আছে—ওপারে পৌঁছেও হয়ত বহুদূরের গ্রামে হেঁটে যেতে হবে। দু' তিন ক্রোশ বা তারও বেশী। তাড়া না করলে সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে পারবে না। পথ-ঘাট ভালো নয়। জাঠ ডাকাতদের অত্যাচারে অল্প দু' চার টাকা নিয়েও সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ওপারে।

তাই নৌকাটিতে যা লোক ওঠবার কথা, তার চেয়ে ঢের বেশি উঠেছিল। সত্তর-আশি জনের কম নয়। নৌকা আর সামান্যই জেগে আছে জল থেকে। মনে হচ্ছে জলের উপরই বসে আছে লোকগুলো।

তা হোক। এমনিই প্রত্যহ যায় ওরা! আর কতক্ষণেরই বা পথ!

---

(২) লালকিলার দু'টি প্রমোদ উদ্যান। এখানে বাদশারা শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের রাত্রি যাপন করতেন। জলকেলিও চলত।

বাতাস অনুকূল—পূর্ণপালে চলেছে নৌকা, এখনই ওপারে পৌঁছে দেবে। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন সবাই।

বাদশাই কথাটা পাড়লেন, 'ছাখো, লোকগুলোর কাণ্ড! এতগুলো লোক চাপিয়েছে নৌকোয়, একজনও যদি এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করে তো নৌকো যাবে উল্‌টে, আর নদীর যা অবস্থা, বর্ষার ভরা নদী—ঐ স্রোতে পড়লে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! আচ্ছা বেকুব ওরা, ইজারাদার তো পয়সার লোভে লোক তুলবেই—ওদের প্রাণের ভয় নেই?'

লালকুঁয়রও চেয়ে ছিলেন সেদিকে। হঠাৎ বাদশার কোলের কাছে তাকিয়াতে হেলে পড়ে বললেন, 'আমি কখনও নৌকোডুবি দেখি নি। তুমি দেখেছ শাহানশা?'

'দেখেছি বৈকি। পঞ্জাবে ছিলুম। রেবা, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা সাংঘাতিক নদী সব। কত লোক ডুবে মরে ফি-বছর নৌকোডুবিতে।

'লোকগুলো ছট-ফট করে খুব? হাঁকড়পাকড় করে আর জল খায়—না?'

'হ্যাঁ—তা করে।'

'ভারি মজা লাগে দেখতে, না? আমি কখনও দেখি নি! তুমি বেশ সব জিনিস একা একা ভোগ ক'রে নিয়েছ—আগে ভাগেই। যাও!'

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ফরসীর নল সুদ্ধ বাদশার হাতটা একটু নেড়ে সরিয়ে দেন বেগম ইমতিয়াজমহল!

অপ্রতিভের মতো মুচকি মুচকি হাসেন বাদশা। বলেন, 'ভয় কি—এদের যা অবস্থা, এখানে বসে বসেই একদিন দেখবে।'

'হ্যাঁ—তাই না! কবে ডুববে, হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি!'

বাদশা জবাব দিতে পারেন না।

পিছনেই ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন সাদুল্লা খাঁ। শুনেছিলেন সবই। দয়িতার অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর বুঝি কাঁটার মতো বুকে বিঁধেছিল!

নিঃশব্দেই সরে গিয়েছিলেন তিনি···

পরের দিন সব আয়োজন তৈরী ছিল।

নৌকা ভরা লোক যাবে। সে নৌকা মাঝনদীতে উল্‌টে দেওয়া হবে। ইচ্ছা ক'রেই। স্বেচ্ছায় ডোবাতে হবে। সেই রকম হুকুম দেওয়া হয়েছে ইজারাদারকে।

না হ'লে শুধু তারই গর্দান যাবে না, তার স-পুরী এক গাড়ে যাবে।

ডোবাতে হবে মাঝি-মাল্লাদেরই। তাদের ওপর হুকুম হয়েছে—তারা সাঁৎরে পারে চলে আসবে।

কিন্তু তাদের মুখ শুকিয়ে উঠেছে। সাঁতার জানে তারা কিন্তু শ্রাবণের এই উন্মত্ত খরতরঙ্গিনী নদীতে সাঁতার দেওয়া! আর এখানকার এই বিপুল প্রশস্ত নদী। সে কি মানুষের সাধ্য! মৃত্যু যে নিশ্চিত! তারা বেঁকে দাঁড়াল। রাতারাতি পালাবে তারা, যেখানে হোক। জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর চলে যাবে দূর দেহাতে কোথাও। তারা খেটে খেতে এসেছে, বেঘোরে জান দিতে আসে নি। যেখানে হোক খেটে খেতেও পারবে।

ইজারাদার চোখে অন্ধকার দেখল। ওরা অনায়াসেই পালাতে পারে—কিন্তু তিনি কোথায় যাবেন। ঘর-বাড়ী আত্মীয়স্বজন ছেড়ে?

সে লোকটি সারারাত ঘুমোতে পারল না। ভোর বেলাই ছুটল তার আত্মীয় মুনিম খাঁর কাছে। মুনিম খাঁ, উজীরকে গিয়ে জানালেন।

তখন দরবারে আসবার সময়।

আসবার মুখেই সংবাদটা শুনে ক্রোধে ও ঘৃণায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলে এসেছিলেন জুলফিকর খাঁ। জুলফিকর খাঁ তখন প্রায় সর্বশক্তিমান। তাঁর কাউকেই ভয় করবার কোন কারণ ছিল না।

অবশ্য বাদশার সামনে কী করতেন তা বলা যায় না। ভাগ্যক্রমে তখনও বাদশা দরবারে দেখা দেন নি। সারা রাত্রি উন্মত্ত উৎসবের পরে সুরাপান-মত্ত বাদশার বেশ একটু বিলম্বই হ'ত ঘুম ভেঙে উঠতে। ঠিক সময়ে দরবার নেওয়া কোনদিনই হয়ে উঠত না তাঁর।

বাদশা না এলেও সভাসদদের সভায় হাজির থাকতে হ'ত। সেদিনও ছিলেন সবাই। খান-সামান সাদুল্লা খাঁও ছিলেন। আর উজীর সভায় ঢুকতেই তাঁর সামনে পড়ে গেলেন তিনি।

জুলফিকর খাঁ রাগ সামলাতে পারেন নি। সমস্ত আদবকায়দা ভুলে প্রবল একটি চপেটাঘাত করেছিলেন সাদুল্লা খাঁকে।

সবাই অবাক। অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন আসন ছেড়ে। যতই হোক, পদস্থ কর্মচারী সাদুল্লা খাঁ। তাঁকে এমন অপমান! অনেকেরই মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

সাতুল্লা খাঁ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নন, যোদ্ধা তো ননই। তবু তিনিও তরবারিতে হাত দিয়েছিলেন বৈকি।

কিন্তু চরম অবজ্ঞায় সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে নিরস্ত করলেন জুলফিকর খাঁ। বললেন, 'ভাই সব, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি যে কাজ করেছি, হঠাৎ করি নি, জেনেবুঝেই করেছি···বরং বলা চলে একে চড় মেরে একটা অন্যায় করেছি, আমার হাতেরই অপমান করেছি। এ লোকটা অমানুষ—পশু, পশুরও অধম। এ কি করেছে জানেন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে বাদশা এসে পড়েছিলেন।

কথাটা তখনকার মতো স্থগিত রেখে সবাই অভিবাদনে নত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তবু সকলকার চোখমুখের উত্তেজনা বাদশার চোখ এড়ায় নি। তিনি বসেই কারণ জানতে চেয়েছিলেন সে উত্তেজনার।

জুলফিকর খাঁ সাতুল্লাকে কিছু বলবার অবকাশ দেন নি। নিজেই এগিয়ে এসে অভিবাদন করে বলেছিলেন, 'শাহান শা, আমি এই লোকটাকে চড় মেরেছি!'

'সে কি? আমার খান-সামানকে? কেন? কী আশ্চর্য! এ আপনার কি মতিগতি?' বাদশা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

'শুনুন জনাবালি। কাল নাকি আপনার সামনে মাননীয়া ইম্‌তিয়াজ মহল কি লঘু আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি কখনও নৌকোডুবি দেখেন নি। হঠাৎ নৌকোডুবি হলে লোকগুলো কেমন হাক-পাঁক করতে করতে মরে—সেই বিষয়ে—অলস কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। সেই শুনে তাঁর মনোরঞ্জন করে ইহকালে নিজের কিছু সুবিধা করার জন্য এই লোকটা কি করেছে জানেন? খেয়াঘাটের ইজারাদারকে হুকুম দিয়েছে যে, আজ বিকেলে আপনারা যখন সামানবুরুজে বসে থাকবেন, তখন এক নৌকোবোঝাই যাত্রী-সুদ্ধ মাঝ দরিয়ায় নৌকো ডুবোতে হবে।···তু'চারজন হ'লে চলবে না। নৌকো ভরা লোক চাই, অন্তত সত্তর-আশি জন!'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যে অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছিল তার মধ্যেকার ধিক্কারের সুরটুকু কান এড়ায় নি বাদশার। তাই প্রেয়সীর খুশি-ভরা মুখের কথা চিন্তা করেও এতবড় অন্যায়ে সায় দিতে পারেন নি তিনি। ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'না. এটা

তোমার একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছিল সাত্নল্লা খাঁ। মাননীয়া বেগম সাহেবা ওটা—কী বলে—এমনিই বলেছিলেন। তুমি এই কাণ্ড করছ শুনলে খুশী হতেন না নিশ্চয়।...যাক্ গে যাক্—আপনিও কাজটা ভাল করেন নি উজীর সাহেব। সাত্নল্লা খাঁ মানী ব্যক্তি—এমন ভাবে প্রকাশ্যে অপদস্থ করাটা ঠিক হয় নি। ...যাক্ এখন আপনারা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন। সাত্নল্লা, উজীর সাহেব তাঁর কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত। তিনি ক্ষমা প্রার্থনাই করছেন। তুমিও কিছু মনে রেখো না।'

অগত্যা জুলফিকর খাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল। লোক-দেখানো ক্ষমাও করতে হয়েছিল সাত্নল্লা খাঁকে। ত্ন'জনে আলিঙ্গনও করেছিলেন ত্ন'জনকে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সে অপমান কি সত্যিই ক্ষমা করেছিলেন সাত্নল্লা খাঁ?

সেই ঘটনার ফলেই জুলফিকর খাঁকে মিথ্যা ছলনার ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারাতে হ'ল না কি?

ঈশ্বর সাক্ষী

শাহ্জাহান বাদশার নাম কে না শুনেছে! ছোটদের স্কুলপাঠ্য বই থেকে আরম্ভ করে বড়দের মোটা মোটা ইতিহাসের কেতাবে পর্যন্ত—তাঁর নাম বার বারই পড়তে হয় সকলকে। সম্রাট্ বাবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত ভারতের যে ছজন মুঘল বাদশাকে 'গ্রেট বা মহান মুঘলস্' বলা হয় ইংরেজী ইতিহাসে, শাহ্জাহান তাঁদের মধ্যে পঞ্চম সম্রাট্। শুধু আমাদের দেশেই নয়—লালকিলা, তাজমহল ও তখ্‌ৎ-এ-তাউস বা ময়ূর সিংহাসনের দৌলতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও বেশির ভাগ শিক্ষিত লোক আজ শাহ্জাহান বাদশার নাম জানেন।

শাহ্জাহান আরও এক কারণে বিখ্যাত। এত বড় বাদশা জীবিত থাকতেই তাঁর তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন। আর তার পরেও শাহ্জাহান সাত বছর এইভাবে বেঁচে ছিলেন।

শাহ্জাহানের ছোট ছেলে মুরাদ ছিলেন এক বিচিত্র মানুষ। বিরাট জোয়ান, ত্নর্ধর্ষ বীর ও ত্নঃসাহসী যোদ্ধা—কিন্তু সে যুদ্ধক্ষেত্রেই শুধু, এমনিতে

ছিলেন মাথা-মোটা, অত্যন্ত আরামপ্রিয়, হঠ্‌রাগী ও তোষামোদপ্রিয়। আর তেমনি কান-পাতলা, মোসাহেবের দল যে যা বলত তৎক্ষণাৎ তাই বিশ্বাস করতেন।

এ ধরনের লোককে কোন সরকারই কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে চান না, বিশেষতঃ কোন রাজ্যের শাসনভার তো নয়ই। কিন্তু মুরাদ হলেন বাদশার ছেলে, তাঁকে কোন একটা বড় পদ না দিলে লোকে কি বলে? প্রকাশ্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে যে! অগত্যা শাহ্‌জাহান বাদশাকেও বড় বড় পদে বসাতে হ'ত ছেলেকে—কিন্তু দায়িত্বের কাজ দিয়েও সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতেন তিনি, এই ছেলেটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না তাঁর।

এখন কথা হচ্ছে, বাদশার ছেলে, তাঁকে কোন পদ দিতে হলে বেশ বড়গোছেরই দিতে হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছাড়া অন্য আর কীই বা পদ আছে শাহ্‌জাদাদের দেবার মতো! পর পর এমনি ভারই দিতে লাগলেন তাই শাহ্‌জাহান। বাল্‌খ, দাক্ষিণাত্য—শেষ পর্যন্ত গুজরাট। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক ইতিহাস, কু-শাসন আর কুকীর্তির নালিশে বাদশা জর্জরিত হয়ে যেতে লাগলেন। শেষে গুজরাটে অরাজকতা চরমে পৌঁছতে তিনি আলি নকী নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত প্রবীণ কর্মচারীকে মুরাদের উজির হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। লিখে পাঠালেন তাঁর 'প্রিয় পুত্র' যেন বিশ্বাস ক'রে রাজস্ব ও রাজ্য-শাসন সম্পর্কিত ভার সম্পূর্ণ এঁর হাতে ছেড়ে দেন।

মুরাদের বিশেষ আপত্তি ছিল না এ ব্যবস্থায়। কারণ এসব ঝুট-ঝামেলা তাঁর কোনদিনই পছন্দ নয়, ফুর্তির ব্যাঘাত ঘটে এতে। কিন্তু দেখা গেল আর সকলেরই ঘোরতর আপত্তি। যে সব অকর্মণ্য বদমাইশ চাটুকারের দল মুরাদকে বোকা বানিয়ে যা-খুশি-তাই করছিল এবং লক্ষ লক্ষ টাকা 'জেব'-এ পুরছিল—তাদের খুব অসুবিধা হতে লাগল। বাদশা অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করেন নি, আলি নকী যেমন কর্মঠ, বুদ্ধিমান—তেমনিই সৎ। তিনি কঠোর হাতে রাজস্বের হিসাব নিতে লাগলেন, চুরি-জুচ্চুরির দুই পথেই কাঁটা পড়ল। তাছাড়া তিনি একটু জবরদস্ত গোছের লোক ছিলেন, অন্যায় ক'রে কেউ সহজে নিস্তার পেত না, তা সে যেমন লোকই হোক। এমন কি অন্যায় করেছে জানলে মুরাদের অতিশয় প্রিয়পাত্রকেও রেহাই দিতেন না। তিনি জানতেন যে বাদশা তাঁর মূল্য জানেন, বাদশার অগাধ আস্থা আছে

তাঁর ওপর। তার চেয়েও বড় কথা—তিনি নিজে খাঁটি আছেন যখন, ঈশ্বরের কাছে কোন গুনাহ্ বা অপরাধ করেন নি যখন, তখন আর কাকে ভয় করবেন।

কিন্তু এতকাল যারা নির্বিবাদে মালিককে বোকা বুঝিয়ে লুটেপুটে খেয়েছে যথাসর্বস্ব, অতটা কড়াকড়ি তাদের অসহ্য লাগারই কথা। তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল আলি নকীর বিরুদ্ধে, কৌশলে কী ক'রে সর্বনাশ ঘটানো যায় লোকটার—সেই মতলব আঁটতে লাগল।

বুদ্ধি একটা বারও করল শেষ পর্যন্ত। ঠিক সেই সময় শাহ্জাহান বাদশার গুরুতর অসুখের খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, সেই সঙ্গে এ খবরও ছড়িয়েছে যে বড় শাহ্জাদা দারা সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার ফিকিরে আছেন। সে খবর শুনে এদিকে মুরাদ, ওদিকে মানে দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব ও বাংলাদেশে শুজা দারার বিরুদ্ধে লড়াই করার তোড়জোড় লাগিয়ে দিয়েছেন, চারদিকে সাজসাজ রব উঠে গেছে—তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে।

অর্থাৎ দারা এখন এঁদের সবাইকার শত্রু। এই লোকগুলো করল কি, আলি নকীর এক চাকরকে ঘুষ খাইয়ে তাঁর মোহর দিয়ে এক জাল চিঠি খাড়া করল—যাতে মনে হয় যে আলি নকী গোপনে এঁদের খবর দারার কাছে পাঠাচ্ছেন—যাতে দারার কিছু সুবিধা হয়।

এই চিঠি একজনকে দিয়ে রওনা করিয়ে দিয়ে পথ থেকে আর কয়েকজনকে দিয়ে আবার তাকে ধরে আনা হল। এবং সেই চিঠিসুদ্ধ লোককে হাজির করা হল খোদ শাহ্জাদা মুরাদের কাছে। ভাবটা যে, দ্যাখো, কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল, আমরা তোমার এত হিতাকাঙ্ক্ষী—তাই বাঁচিয়ে দিলুম।

সবটাই মিথ্যা, সবটাই অভিনয়।

অন্য যে কোন সাধারণ মানুষ হলেও এটা ধরতে পারত, অন্ততঃ একটু সন্দেহ করত। কিন্তু মুরাদের অত বুদ্ধি ছিল না। তার ওপর গত কয়েক রাত জেগে তিনি গান-বাজনা ফূর্তি করেছেন, মাথাতে কিছুই ঢুকছে না—তখন হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা দূরে যাক, ভাল করে পড়বারও অবস্থা নেই তাঁর। তিনি একবার চোখ বুলিয়েই তৎক্ষণাৎ আসামীকে তাঁর সামনে হাজির করবার আদেশ দিলেন।

বেচারী আলি নকী এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি তখন নিজের

বাসায় বসে কোরান পাঠ করছেন, মনিবের আদেশ শুনে শশব্যস্তে ছুটে এলেন।

অনিদ্রা আর প্রচণ্ড ক্রোধ—দুইতেই চোখ লাল করে বসে আছেন মুরাদ, হাতে বিরাট এক বর্শা, বজ্রমুষ্টিতে ধরা! মনের সমস্ত রাগটা যেন ওই মুঠোর মধ্যে জড়ো হয়েছে, ভাল ইস্পাত না হলে বোধ হয় গুঁড়িয়ে যেত।

আলি নকী গিয়ে দাঁড়াতেই মুরাদ প্রশ্ন করলেন, 'কেউ যদি অন্নদাতা মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে কী শাস্তি দেওয়া উচিত?'

'প্রাণদণ্ড!' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন নকী।

তখনও তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি।

তবে বেশীক্ষণ আর লাগলও না বুঝতে।

মুরাদ সেই জাল চিঠিখানা আলি নকীর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, পড়ে দ্যাখো!'

আলি নকীরও ভাল করে পড়বার দরকার হল না, তিনিও একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে দিলেন চিঠিটা, বললেন, 'এ কোন নিতান্ত নির্বোধ বুদ্ধু লোকের কাজ, খুবই বোকার মতো জাল করা হয়েছে, যে কেউ ভাল করে দেখলেই ধরতে পারত যে এ আমার হাতের লেখা নয়! তাছাড়া এ কাজ নতুনও নয়, প্রথমও নয়—এইভাবে লোককে মিথ্যা কলঙ্কে জড়িয়ে ফেলা তো খুব সাধারণ কৌশল। তুমিও যদি ওদের চেয়েও বুদ্ধু না হতে, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাতে না, নিজেই বুঝতে পারতে যে এর আগাগোড়াই মিথ্যা, জালিয়াতি!'

মেজাজ খারাপই ছিল, তার ওপর এই 'বুদ্ধু' বিশেষণটা সহ্য হল না মুরাদের। তিনি যেন রাগে অন্ধ হয়ে উন্মত্তের মতো সেই হাতের বর্শাটা বিঁধিয়ে দিলেন বৃদ্ধ আলি নকীর বুকে। এত জোরে বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন যে ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটে এসে মুরাদেরও সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে দিল, বিশেষ একটা রেখা এসে এমন ভাবে মালার মতো গলায় লাগল যে মনে হল, গলাটা সেইখানে কে যেন ক্ষুর দিয়ে কেটে দিয়েছে গোল করে।

বৃদ্ধ আলি নকী কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলেন। শুধু একটি মাত্র কথা তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, 'ঈশ্বর সাক্ষী!'

হয়তো আরও কিছু বলতেন, বর্শা দেহ ভেদ করে পিঠের দিক ফুঁড়ে

বেরিয়ে এলেও বীর এবং শক্তিমান আলি নকীর সব শক্তি তখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি, হয়তো বা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার আগে ঈশ্বর সাক্ষী করে নিজের নিরপরাধই জানিয়ে যেতে চাইছিলেন, বলতে যাচ্ছিলেন, 'ঈশ্বর সাক্ষী' আমি নির্দোষ। এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না।' কিন্তু সেটুকু অবসরও মিলল না। দেহটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরাদের জল্লাদ অনুচররা চারদিক থেকে যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল তাঁর ওপরে, অসংখ্য অস্ত্রে খণ্ডখণ্ড হয়ে চিরদিনের মতো নীরব মূক হয়ে গেল আলি নকীর কণ্ঠ।

শুধু মুরাদের কানে যেন বার বার ওই শব্দ দুটো বাজতে লাগল ঘুরে-ফিরেই—'ঈশ্বর সাক্ষী !'

কিন্তু সত্যিই কি আলি নকী সে সময় নিজের নির্দোষিতাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ?

নাকি, একেবারে শেষ মুহূর্তে আর একটি কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল?

ভয়ঙ্কর একটি অভিশাপের ইতিহাস ? অনেকদিনের শোনা এবং প্রায়-ভুলে যাওয়া কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে !

নিজের প্রাণ দিয়ে স্বীকার করে যেতে চেয়েছিলেন সেদিনের সে লোকটির নির্দোষিতা, তার কথাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে পেয়েছেন সেই কথাটাই বলে যেতে চেয়েছিলেন সবাইকে।

অথবা তীব্র অনুতাপের জ্বালা থেকে অব্যাহতি পেতে নিজের বিবেককেই বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে বলতে চেয়েছিলেন যে, সেদিনের সে অপরাধ তিনি না জেনেই করেছিলেন।

বিবেকের পীড়নই হয়তো শেষ মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তার কথা।

সেদিনের সেই চোর ফকিরের কথা।

যাকে ফকির-বেশী চোর ভেবেছিলেন তিনি।

সে যে চোর নয়—তা আজ, বিনা-অপরাধে সম্পূর্ণ নির্দোষ থেকেও মনিবের হাতে মৃত্যু লাভ করার মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু আর সে ভ্রমসংশোধনের বা প্রায়শ্চিত্তের অবসর মিলল না, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইবারও না।

সেদিন যদি অন্ততঃ একটু খোঁজও করতেন !

এই তো, মাত্র কিছুদিন আগের কথা।

বোধ হয় এক বছরও হয় নি।

বহু কাজের মধ্যে, এমনতরো বহু ঘটনার ভিড়েই সেদিনের সেই ফকির তাঁর মনের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। নইলে ভুলে যাওয়ার মতো এমন কিছু দীর্ঘকাল কাটে নি তার পর।

আলি নকী নিজে, কোন লোভে বা কোন লাভের আশাতেই কখনও কিছু অন্যায় বা অপরাধ করেন নি জীবনে—তাই অন্যায় বা অপরাধ সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন ক্ষমাও ছিল না। আর সেই জন্যেই এতবড় অন্যায়টা ঘটে গেল! এই এক বিশ্রী কলঙ্ক রয়ে গেল তাঁর জীবনে।

অত্যন্ত কঠোর বিচারক ছিলেন আলি নকী!

চুরি করার একমাত্র শাস্তি তাঁর কাছে ছিল—জীবন্ত অবস্থাতেই পেট কেটে নাড়ীভুঁড়ি বার করার আদেশ দেওয়া।

সেদিন যখন চুরির দায়ে ফকিরকে ধরে এনেছিল কোতোয়ালীর লোক—তখনও সেই আদেশই দিয়েছিলেন তিনি।

খাস শাহী-খাজানায় বা কোষাগারে ঢুকে পড়েছিল চুরির উদ্দেশ্যে। হাতেনাতে ধরেছে ওরা। যেহেতু জায়গাটা উজিরসাহেবের এলাকা, সেই হেতু কাজীর কাছে নিয়ে না গিয়ে তাঁর কাছেই এনেছে।

এই রকম ফকির পর পরই কটা ধরা পড়েছে। চুরি করে নিরাপদে সরে পড়ার পক্ষে এই পোশাকটা ভারী সুবিধাজনক, যেখানে সেখানে গেলেও লোকে সন্দেহ করে না। চোর বলে জানলেও সাধারণ লোকে ধরতে বা মারধোর দিতে ইতস্ততঃ করে। তাই আজকাল, যারা পেশাদার চোর সবাই এই পোশাক ধরেছে।

তবুও আলি নকী প্রথম একটু খাতির করেছেন পোশাকটাকে। খোঁজ-খবর প্রমাণ-প্রয়োগ তলব করে দেখেছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ঠিক ঠিক চোরই ধরা পড়েছে—ফকির কেউই নয় তারা—সুতরাং ইদানীং আর অত কাণ্ড করেন না, অপরাধী বলে ধরে আনলে শাস্তির হুকুম দেন।

এবারেও তাই দিয়েছিলেন। সোজাসুজি তাঁর যা প্রচলিত শাস্তি, সেইটিই প্রয়োগ করেছিলেন।

ফকির বলেছিল, 'হুজুর, আমি নিরপরাধ। যদি চান তো কোরান স্পর্শ করে বলছি। আমি বুঝতেই পারি নি যে ওটা খাজনাখানা। আমি সাধারণ দপ্তর ভেবে ঢুকে পড়েছিলুম। দোরে পাহারা ছিল না, কেউ বাধাও দেয় নি। কোষাগারে পাহারা থাকবে না—এ আমি ভাবতে পারি নি।'

উজিরসাহেব জবাব দেন নি। পাহারাদাররা জোরে হেসে উঠে নিজেদের অপরাধের কথাটা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল।

তারপর, যখন জল্লাদের ছুরি পেটে বসেছে, ফকিরের চোখের সামনেই বেরিয়ে এসেছে তার পাকস্থলী আর অন্ত্র, তখন যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে উঠেছে সে, 'ঈশ্বর সাক্ষী রইলেন আলি নকী, কোরানের নামে আমি মিথ্যা বলি নি। আবারও বলছি আমি চোর নই! তুমি আমাকে বিনা বিচারে বিনা অপরাধে এই শাস্তি দিলে, আমি যদি একদিনও মনেপ্রাণে ঈশ্বরকে ডেকে থাকি, তোমাকেও একদিন এমনি বিনা অপরাধে বিনা বিচারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অপঘাত মৃত্যু দিয়েই এই অপঘাত মৃত্যুর মূল্য শোধ করতে হবে তোমাকে!'

কঠিন ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলেন আলি নকী। এমন ধরনের শাপশাপান্ত গালিগালাজ যথার্থ দোষী লোকের মুখেও ঢের শুনেছেন তিনি। এসবে দীর্ঘকাল অভ্যস্ত। চোরেরই বড় গলা হয়—এ কে না জানে!

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আলি নকীর মৃত্যুর পর। প্রায় চার বছর।

বহু উত্থান-পতন ঘটে গেছে এর মধ্যে।

মুরাদ আওরঙ্গজেবের পক্ষে দারার বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। দারার বিরুদ্ধে একা এগিয়ে যেতে সাহস হয় নি আওরঙ্গজেব বা ভাবী আলমগীর বাদশার, তিনি মুরাদকেই সিংহাসন দিয়ে চিরকালের মতো মক্কা চলে যাবেন, শুধু দারা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী নন বলেই তাঁর প্রতি ওঁর এই যুদ্ধযাত্রা—কারণ দারা সিংহাসনে বসলে মুসলমান ধর্মই লোপ পেয়ে যাবে দেশ থেকে—এইসব বুঝিয়ে মুরাদকে দলে টেনেছিলেন। উনি জানতেন যে মুরাদ দিল-দরিয়া গোছের মুক্তহস্ত মানুষ বলে অনেকেই তাঁকে ভালবাসে, তাঁর সৈন্যরা তাঁর কথায় মরতেও প্রস্তুত—লোকবল বা অর্থবল কোনটারই অভাব নেই

তাঁর। তাছাড়া একসঙ্গে দুই শত্রুর সঙ্গে লড়তে গেলে পেরে উঠবেন না কিছুতেই—একে একে শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই করেওছেন তিনি। নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে মুরাদকে খাওয়াবার নাম করে নিজের ঘরে ডেকে এনে বন্দী করে গোপনে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন—যাতে মুরাদের দলের লোকেরা টের পেয়ে না গোলমাল করতে পারে। দারা বার বার হেরে নিঃসম্বল অবস্থায় ভিখারীর মতো পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন তাও পারেন নি, তাঁকে ধরে এনে বধ করিয়েছেন। আলমগীর আজ নামে ও কাজে হিন্দুস্তানের বাদশা।

কিন্তু তাতেও শান্তি নেই আওরঙ্গজেবের।

খবর এসেছে যে মুরাদের বন্ধুরা সুরাটের সওদাগরদের সাহায্যে অনেক টাকা যোগাড় করেছে। নতুন করে সৈন্যবাহিনী গড়বার চেষ্টা করছে তারা। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি তারা একদিন দুর্গের পাহারাদারদের ঘুষ খাইয়ে মুরাদের পালাবারও ব্যবস্থা করেছিল—নিতান্ত ভাগ্য খারাপ বলেই বুদ্ধি খারাপ হয়েছে মুরাদের, নিজের দোষে শেষ মুহূর্তে ধরা পড়েছেন।

এই খবরটাতেই বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছেন নতুন বাদশা। মুরাদ যে রকম জনপ্রিয় তাতে তিনি যদি কোন রকমে একবার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন, তাহলে তাঁর অর্থ, বা লোকবল কোনটারই অভাব হবে না। দেখতে দেখতে বিপুল বাহিনী গড়ে ফেলতে পারবেন মুরাদ। আর তাহলে আওরঙ্গজেবের সিংহাসন কতদিন টিকবে কে জানে! বুড়ো বাবাকে বন্দী করে নিজে তখ্‌তে বসা, বড় ভাইকে ওইভাবে হত্যা করানো, ছোট ভাইকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভুলিয়ে কয়েদ করানো—এর কোনটাই এখনও ভোলে নি দেশের লোক। যে-কেউ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই এদের সমর্থন পাবে। টাকা দিয়ে, লোক দিয়ে নানা রকমে সাহায্য করবে, এমন কি তাঁর নিজস্ব কর্মচারীদেরই কজন টিকে থাকে তাই বা কে জানে!

সুতরাং মুরাদকেও ইহধাম থেকে সরাতে হবে।

আর খুব শিগগির।

শুধু সেইটে কীভাবে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না নতুন বাদশা।

পরপর এতগুলো অন্যায় কাজের পর এখনই যদি চট করে ভাইকে মারবার হুকুম দেন তাহলে হয়তো দেশসুদ্ধ লোক ক্ষেপে উঠবে। দারার

মৃত্যুর পর খাস দিল্লীতেই যে কাণ্ড হয়েছিল—সেকথা এখনও ভোলেন নি আওরঙ্গজেব! নিশ্চয় আরও অনেকের মনে আছে, সে তো এই মাত্র বছর-দুই আগের ঘটনা। কী ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গিছল!

ভাবছেন বাদশা। গভীর ভাবেই ভাবছেন। একা বসে বসে চিন্তা করছেন। নির্জন, নিস্তব্ধ ঘর, ঘরের বাইরে বোবা হাবশী প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

অস্থির চিন্তাকুল নতুন বাদশা শেষ পর্যন্ত একবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। দালান পেরিয়ে একেবারে বাগানের ধারে এসে পড়লেন। সবাই বলে ওঁর পেছনেও দুটো চোখ আছে, আছে অন্ততঃ আটজোড়া কান। কাজেই হঠাৎ কোন দুশমন এসে তাঁকে আক্রমণ করবে সে ভয় নেই। বাদশা একাই বাগানে এসে দাঁড়ালেন নির্ভয়ে।

অন্ধকার রাত, গাছপালার শাখায় সে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় আরও জমাট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কাউকে দেখা যায় না, বেশ খানিকটা কাছে এসে না দাঁড়ালে। বাদশা এসেওছেন নিঃশব্দে পায়ের আওয়াজ না করে। তাই তিনি যে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন তা কেউ টের পায় নি।

সেদিকের দরজায় যে দুজন সান্ত্রীর থাকার কথা, তারা ঠিক ফটকের পাশে ছিল না। এদেশে হেমন্তে এমনিই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায় রাত্রের দিকে, তায় আজ সন্ধ্যার পর থেকেই কনকনে উত্তুরে বাতাস চালিয়েছে, বহুক্ষণ সে বাতাস সহ্য করার পর সামান্য একটু রেহাই পাওয়ার জন্যে তারা একটু তফাতে একটা বড় গুল্‌মোর গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কর্তব্যে অবহেলা এই নতুন বাদশা কোনদিনই সহ্য করতে পারেন না, বিশেষ করে তিনি জানেন—ফৌজ কিংবা পাহারাদারদের মধ্যে এই অবহেলাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিলে কালে বিষম অনিষ্ট হবে, এতবড় সাম্রাজ্য তিনি শাসন করতে পারবেন না। তিনি একবার মাত্র দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং জ্বলে উঠলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতোই ভয়ংকর মুখ করে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ওদের। একবার একটু গলা-খাঁকারি দিলেও আশপাশ থেকে অন্য প্রহরী-প্রহরিণীরা ছুটে আসত—কিন্তু সেটুকু দেরিও তর সইল না বাদশার।

অন্ধকার ঠিকই—কিন্তু সে অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি সয়ে গেছে সান্ত্রীদের—

বাদশাকে চিনতে দেরি হল না বিন্দুমাত্রও। আর সঙ্গে সঙ্গেই, চোখের সামনে ভেসে উঠল—সর্বপ্রথম—দুটি মাটির কবর।

এমনিতেই—বাদশাকে দেখলেই ওদের আত্মা-পুরুষ খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হয়। তার ওপর এতখানি গাফিলি হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে। এর ফলাফল দুজনেই বিলক্ষণ জানে। কিন্তু অন্যের হাতে ধরা পড়লে হয়তো কদিন সময় মিলত। এ আর বোধ হয় চোখের পলকও ফেলতে দেবেন না বাদশা। নিজে হাতে এখনই শাস্তি দেবেন বলেই একেবারে খোলা তলোয়ার হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বাদশার সামনে কোন অবস্থাতে বসা রীতি নয়—কিন্তু এত বড় বেয়াদবি জেনেশুনেই করতে হল ওদের। ওরা কাঁপতে কাঁপতে ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল, কিছুতেই দাঁড়াতে পারল না। যে শীতের জন্যে এত কাণ্ড, সে শীত কোথায় চলে গেছে, নিমেষে ঘেমে নেয়ে উঠেছে ওরা, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, পায়ে হাতেও আর বিন্দুমাত্র জোর নেই।

বাদশা যেন কী একটা বললেন। সে ওরা ভাল বুঝতেও পারল না। একজন তো অনেক চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারল না। আর একজন অতিকষ্টে শুধু বলল, 'এই এখনই—সিকিদণ্ডও হয় নি। কী একটা আওয়াজ শুনে তাই দুজনে খোঁজ করতে—'

জড়িয়ে জড়িয়ে এলোমেলোভাবে বলছিল কথাটা—তাও শেষ করতে পারল না।

'আবার ঝুট্ বলছিস। একটা অন্যায়ের ওপর আর একটা!··· ভেবেছিলুম এখনই কেটে ফেলব। তা হবে না। তাতে তোদের সাজা পুরো হবে না। আগে যে জিভে মিথ্যে বলছিস সেই জিভ কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াব তোদের সামনে, তারপর তোদের কোতল করব! বেইমান মিথ্যেবাদীর সেই সেই ঠিক শাস্তি!'

'না—না—জাহাঁপনা—সত্যি বলছি—ঈশ্বর সাক্ষী। যদি ঝুট্ বলে থাকি তাহলে খোদা যেন এখনই বাজ ফেলেন আমাদের মাথায়—'

হঠাৎ শব্দ দুটো কানে যেন খট করে বাজল—'ঈশ্বর সাক্ষী!'

কোথায় যেন এই কথাটা শুনেছিলেন এর আগে?

কার ব্যাপারে এই কথাটা যেন কে বলেছিল? অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন

বাদশা।

ততক্ষণে অন্য প্রহরীরা এসে পড়েছিল, ওঁদের কথা বলার আওয়াজ পেয়ে। বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে খোদ বাদশার গলা—বিষম কাণ্ড একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়!

ওরই মধ্যে যে সর্দার প্রহরী, বাদশা তাকেই আসামীদের আপাততঃ কয়েদ করে রাখার হুকুম দিয়ে ভেতরে চলে এলেন।

একটা অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা স্মৃতি তাঁকে এমন উন্মনা করে তুলল কেন আজ?

তবে কি এ শব্দ দুটোর সঙ্গে তাঁর বর্তমান চিন্তার কোন যোগ আছে?

হ্যাঁ, ঠিক তো!

মনে পড়েছে তাঁর:

আলি নকী। মুরাদেরই উজির। বিনা অপরাধে মুরাদ যখন তাঁকে হত্যা করেন তখন মৃত্যুর আগে এই দুটি শব্দই উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। এই দুটি শব্দই শুধু উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন।

এ কাহিনী তিনি শুনেছেন একাধিক লোকের মুখে। এই শব্দ দুটো, আর সেই সঙ্গে আরও একটা অদ্ভুত ঘটনা। আলি নকীর রক্ত কেমন করে ফিনকি দিয়ে এসে মুরাদের গলায় লেগেছিল—গলা বেড়ে, কাটবার দাগের মতো করে—

বাঃ, এই তো উপায় পেয়ে গেছেন তিনি। এইজন্যেই বুঝি বিধাতা হাত ধরে তাঁকে বাগানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এইজন্যেই শব্দ দুটো তাঁকে এমন কৌতূহলী, এত অন্যমনস্ক করে তুলেছিল!

বাদশা তখনই লোক পাঠালেন আলি নকীর ছেলেদের কাছে। তারা যদি বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায় তো এখনও সময় আছে। তারা অনায়াসে নালিশ করতে পারে বড় কাজীসাহেবের আদালতে। তারা যাতে সুবিচার পায়—অপর কেউ এজন্য তাদের ওপর কোন অত্যাচার কি অনিষ্ট করতে না পারে স্বয়ং বাদশা তা দেখবেন। তাদের নিরাপত্তার জন্যে তিনি জিম্মাদার রইলেন।

আরও একটা কথা বলে দিলেন বাদশা। ইসলামের আইনে আছে, অন্যায়ভাবে যে নিহত হয়েছে তার উত্তরাধিকারীকে বা উত্তরাধিকারীদের যদি রক্তের দাম হিসাবে খুনী নগদ টাকা দেয়, আর তারা যদি সে টাকা

নিয়ে সে খুনের মাফ দিয়ে দেয়, তাহলে আর সরকার থেকে তার বিচার করা চলে না, খুনী ছাড়া পায়। বাদশা জানিয়ে দিলেন যে, এমন গর্হিত কাজ তারা যেন না করে, বাপের রক্তের দাম কি সামান্য দু চারশ মোহরে শোধ হয়? তাদের টাকার দরকার থাকে, বরং বাদশাকে যেন জানায় তারা, তিনি কথাটা ভেবে দেখবেন।

আলি নকীর বড় ছেলে এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল না। যা হবার তা হয়েই গেছে, তার জন্যে পরাজিত বন্দী শাহ্‌জাদার নামে নালিশ করে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে রাজী নয় সে। কিন্তু তার পরের ভাইটি বাদশাকে খুশী করার এমন সুযোগ ছাড়তে চাইবে কেন? বাদশা তাকে মনসবদারী বা সেনানায়কত্ব দেবেন, জায়গীর দেবেন—এ ছাড়াও নগদ টাকা দেবেন, এমন আভাস সে পেয়েছে। তার ওপর বাবার অন্যায় মৃত্যুরও শোধ উঠবে। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। এত সুবিধা ছাড়া যায়?

প্রাথমিক বিচার আগ্রাতেই আরম্ভ হল।

কাজী জানতে চাইলেন, সে কিছু অর্থ ক্ষতিপূরণ নিয়ে শাহ্‌জাদাকে ক্ষমা করতে রাজী আছে কিনা! ফরিয়াদী প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ল, 'কখনও না। সামান্য কটা টাকার জন্যে বাপের হত্যাকারীকে ক্ষমা করব! আমার দ্বারা তা হবে না।'

শাহ্‌জাদার নামে মামলা, কাজী বাদশাকে জানালেন কথাটা। বাদশা খরচাপত্র লোকলস্‌কর দিয়ে ওদের গোয়ালিয়রে পাঠালেন। মুরাদকে পায়ে বেড়ি দিয়ে নির্জন ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে। পালাবার চেষ্টা করার পরই এই ব্যবস্থা করেছেন নতুন বাদশা—সুতরাং তাঁকে আনানো সম্ভব নয়। কাজী সেখানে গিয়েই বিচার করবেন। বিচারটা আইন-মাফিক হওয়া চাই! কেউ না বলে—তিনি অন্যায় করেছেন। যথারীতি বিচার করবেন কাজী। আসামী ফরিয়াদীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে।···

তারপর?

তারপর আর কি, বাদশা যা চেয়েছিলেন তাই হল। মুরাদ কাজীর সামনে দাঁড়িয়ে মামলা চালাতে রাজী হলেন না। বললেন, 'ভাই আমাকে মারতে চান, মেরেই ফেলুন। ভণ্ডামিতে দরকার কি? এ মামলা কেন আনা হয়েছে, কে এনেছে তা তো জানিই, মিছিমিছি কে এক বান্দার

বান্দা—তার সামনে দাঁড়াব কেন ?'

কাজেই কাজীসাহেবকে একতরফা রায় দিতে হল। প্রাণের বদলে প্রাণ দিতে হবে মুরাদকে। আইনে তাই বলে।

ঘাতক সেই ঘরে এসেই মুরাদের প্রাণ বধ করল। গলায় সেই যে আলি নকীর রক্তের দাগ পড়েছিল, প্রায় সেই দাগে দাগেই গলাটা কেটে ফেলল জল্লাদ। রক্তের দাম রক্তে শেষ হল।

মৃত্যুর আগে আলি নকীর অভিশাপের কথাটা মুরাদের মনে পড়েছিল কিনা—কে জানে।

জরা ও বাসুদেব

বাসুদেব অবসন্নভাবে একটা গাছের নিচে বসে পড়লেন। তৃণবিরল, কঙ্কর- ও বালুময় মৃত্তিকা; কঠিন ও কষ্টদায়ক—তা হোক, তাতে আর কিছু এসে-যায় না। কিছুতেই আর কিছু এসে-যায় না তাঁর। গাছের এই ছায়াটা না পেলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। শুধু গাছটার কাণ্ডে ঠেস দিতে হবে বলেই একবার মাত্র চেয়ে দেখে নিয়ে এই গাছটার তলায় এসে বসেছেন। কোন একটা কিছুকে আশ্রয় অবলম্বন না করলে আর চলছে না। কোথাও এতটুকু আর শক্তি বোধ করি অবশিষ্ট নেই তাঁর।

ক্লান্তি এই প্রথম বোধ করছেন না। অনেক দিন আগে থেকেই এই ভাবটা এসেছে—নিজেকে বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মনে হয়েছে। তবু, এর আগে কোন দিন এমন অবসাদ বোধ করেন নি। বিষাদ আর অবসাদ। সেই সঙ্গে একটা হতাশাও।

নিত্য আনন্দময় পুরুষ তিনি; দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে বীতস্পৃহ, অনাসক্ত, দ্রষ্টা। কোন কারণে কিছুতেই কোন চাঞ্চল্য জাগে না তাঁর—কোন অবস্থাতেই বিচলিত বোধ করেন না। কখনও ক্রোধ হয় না তাঁর, স্থিরবুদ্ধি মানুষ। সে-ই তিনি এমন অবসন্ন হয়ে পড়লেন কেন? যেন এক বিহ্বল হতাশা আর অপরিমেয় বিষাদ তাঁকে এমন করে আচ্ছন্ন করছে, গ্রাস করছে—মৃত্যুর আগের মৃত্যুর মতো?

আসলে একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

এ-ই বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য ; ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম, প্রকৃতির অমোঘ বিধান। দেহ ধারণ করলেই দেহের নিয়ম মানতে হবে। ক্লান্তি অবসাদ জরা মৃত্যু—দেহীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এসব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এসব আসবে—কোন মতেই তাদের ক্রমাগ্রসরে বাধা দেওয়া চলবে না, এড়ানো যাবে না।

তাও তো—বহুদিনই এদিকে চোখ বুজে ছিলেন তিনি। জোর ক'রেই। সত্য জেনেও সেটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন। দেহ ও মনের এই অবসাদ ও ক্লান্তি—আর, আর সবার কারণ এই বার্ধক্য।

লোকে বলে তিনি নারায়ণ। পুরাকালের প্রখ্যাত ঋষি—তপস্যা-বলে ঐশীশক্তিসম্পন্ন হয়ে দেহান্তর ধারণ করেছেন। কেউ বলে তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান, কেউ বা বলে ভগবানের অংশ।

তিনি কে তা তিনি জানেন না। সে আত্মোপলব্ধি আত্মপরিচয় লাভের চেষ্টাও করেন নি কখনও।

কারণ, এ তিনি জানেন, যদি কোন দিন বুঝতে পারেন তিনি ঈশ্বরের অংশে জন্মগ্রহণ করেছেন—তাহ'লে সেই দিন সেই মুহূর্তেই তাঁকে এ দেহ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরজানিত পুরুষ, দৈব কার্যে দৈব অংশে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন—স্বরূপ উপলব্ধির পর আর এই মর্ত্যের মাটিতে এই মরদেহে থাকা তাঁদের সম্ভব নয়।

না, বাঁচতেই চেয়েছিলেন তিনি। কাজ করতে চেয়েছিলেন।

অনেক কাজ তাঁর।

এই কাজকেই তাঁর জীবনের ব্রত, লক্ষ্য বলে মনে করেছিলেন। দায়িত্ব—জীবনধারণের কারণ।

সে ব্রত অসমাপ্ত রেখে তাঁর মরা চলবে না, এইটেই মনে করেছিলেন। তাই প্রাণপণে দেহীর পরিণতি—আসন্ন জরা ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিক থেকে পিছন ফিরে চোখ বুজে ছিলেন।

হায় রে মানুষের দম্ভ !

তবে এও তো সেই দেহেরই ধর্ম, এই আত্ম-অহঙ্কার।

নিজের সম্বন্ধে অকারণ উচ্চ ধারণা পোষণ করা, কল্পিত দায়িত্বের গৌরবে স্ফীত হওয়া।

বার বারই দেহের ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে তাঁকে, বাসুদেবকে—যিনি মাত্র এই কয়েক বছর আগেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর ভাই ও বন্ধু অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—একেবারে অনাসক্ত ভাবে কাজ ক'রে যেতে ; বুঝিয়েছেন যে, কর্মেই মানুষের অধিকার, ফলে নয় ; বুঝিয়েছেন যে, যোগস্থ হয়ে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান অবিচল থেকে কর্ম করাই উচিত ; দেহধারী আত্মার কৈশোর যৌবন জরা অনিবার্য ; বুঝিয়েছেন যা করবার তা ঈশ্বরই ক'রে রেখেছেন, ক'রে রাখেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র, তার বেশি তার কোন শক্তি বা অধিকার নেই, তাকে দিয়ে প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিয়ে নেয়। ইত্যাদি—

বুঝিয়েছেন, অর্জুনও বুঝেছেন !

কিন্তু তিনি নিজে ?

নিজে কি বিশ্বাস করেছিলেন এসব কথা ?

তা যদি করতেন, তাহলে ভারতের এই ভার হরণের—পাপ হরণের দায়িত্ব, এখানে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপনের দায়িত্ব তাঁরই—একথা মনে হবে কেন ?

কেন এত কাণ্ড ক'রে এত কৌশল ক'রে এতগুলি লোকের মৃত্যু ঘটাবেন ? এত বিধবার হাহাকার, এত অনাথের ক্রন্দন, এত কোটি কোটি লোকের বিপুল বিনষ্টি বা সর্বনাশের দিক থেকে চোখ বুজে কঠিন নির্মম হয়ে থেকে—এই স্বয়ং-আরোপিত দায়িত্ব বহন করতে যাবেন ?

শুরু হয়েছে নিজের মাতুল-নিধন থেকে।

কংস তার নিজের মৃত্যু প্রতিরোধের জন্যে যদি ভগ্নি-ভগ্নিপতিকে কারারুদ্ধ ক'রে থাকে, যদি ভাগিনেয়দের মৃত্যুর কারণ হয়—তাহলে তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় কি ? আত্মরক্ষার ইচ্ছা শুধু মানুষের নয়—প্রাণী মাত্রেরই সহজ প্রবৃত্তি। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ন্যায়ান্যায়বিচার কিছু নেই—ইতর কীট-পতঙ্গ—তাদেরও এটা সহজাত।

অবশ্য তাঁর কথাও চিন্তা করতে হবে বৈকি এক্ষেত্রে।

বাসুদেবের নিজের কথা।

তাঁরও সহজ প্রবৃত্তি হ'ল মা-বাবার সেই শত্রু, নিজের বংশের শত্রুকে বিনষ্ট করা। তিনি তাই-ই করেছেন। দেহের ধর্ম, দেহীর ধর্মই পালন করেছেন। তার বেশী কিছু নয়।

কংস-বধ তাঁর পক্ষে কোন অন্যায় কর্ম, অধর্ম হয় নি!

তবে অন্যায়—মানুষের চোখে সমাজের চোখে যা অন্যায়—তাও কিছু কিছু করেছেন বৈকি! লোককে বুঝিয়েছেন—মানে তাদের ধারণা ভাঙাবার চেষ্টা করেন নি যে, তিনি মানুষের ঊর্ধ্বেকার কোন মানুষ, মহামানব বা অবতার, লোকের পক্ষে যা অধর্ম তাঁর পক্ষে তা নয়,—আর নিজেকে বুঝিয়েছেন যে,—লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যেখানে মহান, সেখানে এমন একটু-আধটু হীন কৌশল অবলম্বন করায় দোষ নেই।

জরাসন্ধকে বধ করায় কোন দোষ হয় নি—কিন্তু যে উপায়ে বধ করেছেন তা দোষার্হ বৈকি! ক্ষত্রিয় বা বীরের কাজ হয় নি সেটা। আতিথ্যের সুযোগ নিয়ে গোপনে ছদ্ম পরিচয়ে গেছেন তাঁরা, অতর্কিতে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন—নইলে জরাসন্ধকে হয়ত কোনদিনই বধ করা যেত না। ভীম অর্জুন দু'জনে মিলেও পারতেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু এই জরাসন্ধ-বধ কি শুধুই তাঁর মহান দায়িত্ব পালন, ভারতকে পাপমুক্ত ভারমুক্ত করার জন্যেই করেছেন—সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান থেকে, ফলে উদাসীন হয়ে,—যে উপদেশ বা নির্দেশ তিনি পরে ধনঞ্জয়কে দিয়েছেন? শুধুই কি ধর্মের রক্ষার কথা মনে ছিল তাঁর? তাঁর ব্যক্তিগত বৈরই কি এ-কাজে প্রণোদিত করে নি তাঁকে? প্রাণভয়ে মথুরা ত্যাগ ক'রে তাঁদের রৈবতক পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, সে অপমানবোধ কি তাঁর মনের অবচেতনে তাঁকে প্ররোচিত করে নি যুধিষ্ঠিরকে জরাসন্ধ-বধে প্রবৃত্ত করতে?

জরাসন্ধ-বধের জন্য যে সব হীন কৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন—বিদ্বেষশূন্য হয়ে করলে—তাতেও দোষ হ'ত না।

তা কি সম্ভব হয়েছিল আদৌ?

দীর্ঘকাল ধরে অপমান সহ্য ক'রে থাকতে হয়েছিল, অপমান আর ভয়। বহু জ্ঞাতি নাশ হয়েছে তাঁর—তাতেও সে ভয় থেকে, সে অপমান থেকে অব্যাহতি পান নি।

সে জ্বালা অহরহ তাঁর ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তাই পাঞ্চাল স্বয়ম্বর সভায় ভীম-অর্জুনকে দেখে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন—আত্মীয়তার দাবী প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাদের স্বপক্ষে আনবার জন্যে। এই দুই তরুণ বীরের মধ্যে সেদিন ভাবী জরাসন্ধ-নিধনকারীদের দেখেছিলেন বলেই আসলে এত

উল্লাস !

না, জীবনের প্রদোষবেলায় পৌঁছে আর আত্মপ্রবঞ্চনা করতে চান না তিনি। স্বকর্ম সাধন করতে এমন অনেক কৌশল অবলম্বন করেছেন তিনি—ন্যায় ও সত্যের বিচারে, মনুষ্যত্বের মাপে যা সঙ্গত হয় নি। বিবেককে যতই বোঝান যে, এটা তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য, স্বকর্ম সাধনের জন্যই করতে হচ্ছে—মনে মনে বেশ জানেন যে, সুবিধার জন্যই তিনি সত্য-পথ থেকে বীরের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন বার বার।

এই এত বড় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও তো তাঁরই রচনা।

কৌরবরা যখন কপট দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানাতে এল ইন্দ্রপ্রস্থে, তখনই তিনি জানতেন সে আমন্ত্রণের পরিণাম কি। তাঁর উচিত ছিল পাণ্ডবদের নিষেধ করা, নিবৃত্ত করা। তিনি নিষেধ করলে যুধিষ্ঠির কখনই এ কাজে যেতেন না। কিন্তু তা তিনি করেন নি। পাছে কাছাকাছি থাকলে যুধিষ্ঠির তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেন—সেই কারণেই, তিনি সব জেনেও দ্বারকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, যাতে চেষ্টা করলেও ওঁরা যোগাযোগ না করতে পারেন। তিনি চেয়েইছিলেন যে, দ্যূতসভায় পাণ্ডব তথা পাঞ্চালী অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ভোগ করেন। পাপ চরমসীমায় না পৌঁছলে দৈব-কোপ জাগ্রত হয় না, আর—তা না হ'লে পাপের বিনাশও হয় না।

হ্যাঁ, এই যুদ্ধই তিনি চেয়েছিলেন। এই লোকক্ষয়কারী নিষ্ঠুর যুদ্ধ। প্রজানাশেই আনন্দ তার—যাঁকে লোকে প্রজাপতিরই অন্য রূপ বলে জানে। চেয়েছিলেন অধর্মশক্তির সম্পূর্ণ বিনষ্টি, চেয়েছিলেন শ্মশানের উপর ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

প্রকাণ্ড ভুল করেছিলেন তিনি। পরশুরাম ভারতকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় বীরশূন্য ক'রেও পারেন নি তাকে পাপশূন্য করতে। ভারতবাসী তার স্বভাব ও স্বধর্ম ভুলতে পারে নি। কাম ক্রোধ অসূয়া এবং লোভ—এতেই তারা অন্ধ হয়ে যায়। আর কোন কিছু বিবেচনা থাকে না, ক্ষুদ্র স্বার্থে বৃহৎ স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়, নিজের ইষ্ট নিজের ভবিষ্যৎ কিছুই দেখতে পায় না। সামান্য দূরেও দৃষ্টি চলে না তার।

তবু যে বাসুদেব এই ভারতভার-হরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেও কি তাঁর আত্ম-অহমিকারই একটা প্রমাণ নয়? ভেবেছিলেন তিনি পরশুরামের অপেক্ষা

বেশী বুদ্ধিমান, সেই ক্রোধী তপস্বী নিজ ভুজবলের ওপর নির্ভর ক'রেই ব্যর্থ হয়েছেন ; মস্তিষ্ক বাহুর থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী—এই সত্য নূতন ক'য়ে প্রতিষ্ঠা ক'রে সার্থক হবেন তিনি। নিজে নয়—অপরকে দিয়ে এই মহামৃত্যু-যজ্ঞ সমাপন করবেন।

এই নেশাতেই মত্ত হয়ে ছিলেন, তাই পাণ্ডবদের শোকের সময়—ঘটোৎকচের মৃত্যুতে—তাদের হতচকিত ক'রে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছিলেন। কারণ কর্ণের একাঘ্নীতেই ভয় ছিল তাঁর। ইন্দ্রের দেওয়া অমোঘাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হ'লে ইন্দ্রতনয় অর্জুনও রক্ষা পেতেন না। সেই অস্ত্র ঘটোৎকচের ওপর দিয়ে নষ্ট হ'তেই এত আনন্দ তাঁর, এত নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। এ আনন্দ উদ্দেশ্যসিদ্ধিরও বটে ! জেনে-শুনেই ঘটোৎকচকে তিনি ঐ নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। ঘটোৎকচ যখন ভয়ঙ্কর সংহারমূর্তি ধারণ ক'রে কুরুসৈন্যনাশে প্রবৃত্ত হয়েছে তখনই তো বাসুদেব জানতেন এর ফলাফল কি। মানুষ মাত্রেরই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের থেকে প্রত্যক্ষ বর্তমানের ভয় বেশী। এখন বাঁচলে তবে কোন এক দিন মরার আশঙ্কা। কৌরবরা যত নির্বোধই হোক বর্তমানকালের বিপুল সর্বনাশ এড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না, ভবিষ্যতের সুদূর সম্ভাবনা ধরে বসে থাকবে, এত নির্বোধ নয়।

তিনিই পাণ্ডবদের ভীষ্মবধের কৌশল বলে দিয়েছেন ; যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলিয়েছেন, তিনিই অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কর্ণরথচক্র মেদিনীগ্রস্ত হবার সুযোগে তাঁকে বধ করতে ; তিনিই সূর্য অস্ত যাবার মিথ্যা রোল তুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য জয়দ্রথকে অন্যমনস্ক ক'রে দিয়ে—অর্জুনকে সেই মিথ্যার সুযোগ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ; তিনিই দ্বৈরথ গদাযুদ্ধের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ভীমকে ইঙ্গিত করেছিলেন দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করতে, —এরা ভুলে গেলেও তিনি ভোলেন নি যে, দুর্যোধনের দেহের মধ্যে ঐ অংশটুকুই ভঙ্গুর।

এ সবই তাঁর কীর্তি, তাঁর সংগঠন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রষ্টা হয়ে থাকার কথা তাঁর, নিরস্ত্র হয়ে। ছিলেনও প্রায় তাই—মাত্র দু' একবার ছাড়া সে যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন নি, অথচ একথা আজ আর কে না জানে যে, আসল যুদ্ধ তিনিই করেছেন। বাহু দিয়ে হয়ত নয়—তিনি যুদ্ধ-চালনা করেছেন মস্তিষ্ক দিয়ে। বাহুকে যে মস্তিষ্কই চালনা করে—এ সর্বজনবিদিত

সত্য। সেদিনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সে তথ্য অবিদিত ছিল না। কৌরবদের শবদেহ সংকারের আগেই আর্যা গান্ধারী সে অনুযোগ করেছিলেন, অভিসম্পাত দিয়েছিলেন।

সেই অভিসম্পাতই তো এই মাত্র সফল হ'ল। তিনি নিজেই তা সফল ক'রে এলেন।

মহাদেবী গান্ধারী বলেছিলেন, 'বাসুদেব, তুমি কেন এই যুদ্ধ হ'তে দিলে? তুমি শক্তিমান, সকলেই তোমার কথা শুনত। ক্ষমতা সত্ত্বেও কুরুকুলের বিনাশ তুমি উপেক্ষা করেছ, বাধা দাও নি—তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, কুরুপাণ্ডব তোমার আত্মীয়—তাদের এই বিনাশে তুমি উদাসীন ছিলে—তোমারও জ্ঞাতিনাশ তোমাকে দেখতে হবে, তাদের তুমিই বিনষ্ট করবে। জ্ঞাতিহীন, পুত্রপৌত্রহীন, অমাত্যহীন নির্বান্ধব অবস্থায় বনচারী হয়ে অপঘাত-মৃত্যুকে বরণ করবে। আজ যেমন আমার বংশের বিধবা নারীরা ভূমিতে লুটিয়ে হাহাকার করছে, তোমার কুলনারীরাও তেমনি করবে।'

তখন হেসেছিলেন বাসুদেব। প্রশান্ত, প্রসন্ন হাসি।

এ যে হবেই, অনিবার্য—তা তো তিনি জানতেনই। তাই বিচলিত হন নি।

কিন্তু আজ আর সে হাসি নেই তাঁর। সেদিনের সে চিত্তস্থৈর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 'বীতরাগভয়ক্রোধ' স্থিতধী বলে যে অহঙ্কার ছিল তাঁর—তা চূর্ণ হয়েছে।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। হ্যাঁ—মানবিক অর্থে যাকে ক্রুদ্ধ হওয়া বলে তাই হয়েছিলেন। ক্ষণকালের জন্য বিচার-বিবেচনা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে-ছিলেন তিনি।

ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর জ্ঞাতিদের ওপরই। সেই ক্রোধের ফলেই তাদের বিনাশ ঘটেছে। অথর্ব বৃদ্ধ ও অবলা নারী ছাড়া বৃষ্ণি অন্ধক যাদব বংশে কেউ জীবিত নেই। একটি সমর্থ বালকও না।

তাঁর নিজের বংশের এ পরিণাম তিনি জানতেন, এতটা জানতেন না। নারী ও সুরায় উন্মত্ত হয়ে উঠল তারা। সর্বজনসমক্ষে সুরাপান করতে

লাগল। অহোরাত্র সুরাপান. মাংসাহার ও স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক যৌনসম্ভোগে রত রইল। শ্রদ্ধেয়দের অবজ্ঞা করতে লাগল, যা শুভ ও হিতকর তা উপেক্ষা করল। শুধু তাদের দেহটাই নয়—মনে হ'ল তাদের আত্মা মন নানাবিধ পাপ ও ব্যসনে ডুবে গেছে তা থেকে উঠে আসার আর কোন আশা নেই।

তার ফল যা হবার তাই হ'ল।

তুচ্ছ কারণে কলহ বাধল, সে কলহ ঘোরতর আত্মযুদ্ধে পরিণত হ'তেও বিলম্ব ঘটল না।

কেশি-নিসূদন বাসুদেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁর পুত্র-পৌত্ররা, তাঁর জ্ঞাতিরা অকারণেই মূঢ়ের মতো পরস্পরকে হত্যা করছে।

সেই সময়েই অকস্মাৎ ঐ দিক্‌দাহকারী ক্রোধ অনুভব করেছিলেন বাসুদেব।

ক্রোধ নিজের ভাগ্যের ওপর, নিজের নির্বুদ্ধিতার ওপর।

বহু আশা ক'রে বহুদিনের বহু আয়াসে তিনি ভারতভার হরণ করতে গিয়েছিলেন ; কৌরবদের সর্বনাশা জ্ঞাতিযুদ্ধ ঘটিয়ে ভারত থেকে পাপ ও অন্যায়, অধর্ম ও অসত্য লোপ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। হায় রে বুদ্ধির অহঙ্কার! এত কাণ্ড না করলে বুঝি ভাগ্যের টনক নড়ত না—এত লক্ষ বিধবার হাহাকার আর অশ্রুজল মিলিত না হ'লে বোধ করি বিধাতার স্থৈর্য নষ্ট হ'ত না। এমন বিচলিত হয়ে উঠতেন না তিনি।

ওঁর উত্তুঙ্গ অহঙ্কার দেখে এমন ক্রূর পরিহাসের হাসি হাসতেন না অদৃষ্ট-দেবতা!

হ্যাঁ, অদৃষ্টের পরিহাস তো একেই বলে।

সেই সমস্ত পাপ, সেই সমস্ত অন্যায় ও অধর্ম তাঁর রাজ্যে তাঁর বংশে এসেই জুটল।

ভারতের সমস্ত প্রান্তেই তাঁর দৃষ্টি ছিল, মৎস্য পাঞ্চাল মদ্র বিদর্ভ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর মণিপুর —ছিল না শুধু নিজের ঘরের দিকে। দীপাধারের ছায়ার মতো তাঁরই আড়াল পড়েছিল বুঝি বা, তাই একবারও লক্ষ্য করেন নি—কী পুঞ্জীভূত অনাচার জমছিল তাঁর কুলে, তাঁর গৃহে।

সেই পরাজয়েরই ক্রোধ তাঁর, দর্পচূর্ণ হওয়ার গ্লানি। আশাভঙ্গের ক্ষোভ।

সেই ক্রোধেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন বাসুদেব। উন্মত্ত না হ'লে এমন-ভাবে কেউ নিজের বংশ ধ্বংস করে না, এমনভাবে সর্বনাশের সুরা পান ক'রে মরণোৎসবে মাতে না।

তিনি এক সন্তানের হাতে অস্ত্র যুগিয়েছেন আর এক সন্তানের হত্যার জন্য। তার চোখের সামনে তাঁর পুত্রকলত্র কলহে ও বিগ্রহে মেতে উঠেছে—স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে দেখেছেন তিনি, বাধা দেবার কি তাদের সংযত করার কোন চেষ্টা করেন নি। ক্রমশ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে নিধন করেছে, কে কাকে হত্যা করছে তা দেখার কি জানারও সাধ্য থাকে নি। সেই চরম সময়ে—যখন মৃত্যুর নেশায় বুঁদ হয়ে উঠেছে অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজ বংশীয় যাদবদের দৃষ্টি—তখন নিজেও সংহারমূর্তি ধারণ করেছেন।

কঠিন লৌহমুষলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন তাঁরই প্রিয় স্বজনদের মস্তক। আত্মনিধনাবশিষ্ট একটি পুরুষকেও বাঁচতে দেন নি যাদব বংশের—তিনি এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজ ছাড়া! আর বাদ দিয়েছেন বৃদ্ধ বসুদেবকে—নিজের পিতাকে—যেন এই দুঃসহ শোক বহন করার জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁকে।

ক্লান্ত অবসন্ন বাসুদেব যেন শিউরে ছটফট ক'রে উঠে বসলেন।

সে বীভৎস দৃশ্য এখনও তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। নিজের বংশের সেই সর্বাত্মক বিনষ্টির দৃশ্য।

কিন্তু শুধু কি আত্মীয়নাশেই এত অবসাদ তাঁর—এত হতাশা?

যাদবকুলের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে শুধু কি মানুষগুলোর মৃত্যুই তিনি প্রত্যক্ষ ক'রে এলেন এই মাত্র?

না, আরও কিছু দেখেছেন তিনি। আরও অনেক কিছু।

দেখেছেন তাঁর কল্পনা, তাঁর কর্ম, তাঁর জীবন-সাধনারও মহা বিনাশ।

দেখেছেন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, তার পরিণাম। দেখেছেন একটা দেশ, একটা জাতির শোচনীয় মৃত্যু।

মহাসতী জননী গান্ধারীর অভিশাপ তাঁর বংশে সফল হয়েছে, কিন্তু সেই-খানেই তার অবসান ঘটে নি। যুগ থেকে যুগান্তরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে এই অভিশাপ এদেশের আকাশ-বাতাস মৃত্তিকায় লেগে থাকবে, অনাগত বহুশত বৎসর ধরেই অভিসম্পাত বহন করতে হবে—এই দেশকে, এই

জাতিকে। কুরুবংশ নাশের জন্যে যারা দায়ী তারা কেউ বেঁচে থাকবে না সত্য কথা—কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত থাকবে। পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে উত্তরপুরুষদের—বংশানুক্রমে। তাঁর—তাঁদের পাপের ঋণ শতশতাব্দীতেও শেষ হবে না।

আত্মকলহ ও জ্ঞাতিবিরোধ—এ-ই ভারতভূমির অদৃষ্টলিপি। আত্মকলহ ও আত্মসর্বনাশ। আত্মনাশা বুদ্ধি। ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র কলহ থেকে গৃহযুদ্ধ, দেশের সর্বনাশ। এই অভিসম্পাত সেই ভাবীকালের মানুষদের দৃষ্টি রাখবে আচ্ছন্ন ক'রে, শুভবুদ্ধিতে এনে দেবে জাড্য—তারা কেউ খণ্ডকালের, অতি নিকট বর্তমানের বাইরে কিছু দেখতে পাবে না। বিনাশ করবে ও বিনষ্ট হবে। এ-ই তাদের ভাগ্যলিপি।

আবারও সেই বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসলেন যাদবকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বাসুদেব।

অবসাদ। অবসাদ আর হতাশা। অবসাদে হিম হয়ে আসছে তাঁর সমস্ত দেহ। বদজনপূজিত বহুজনবাঞ্ছিত তাঁর চরণযুগল থেকে সেই হিম অবসন্নতা এগিয়ে আসছে—শিরা উপশিরা ধমনী বেয়ে, তাঁর কৌস্তুভলাঞ্ছিত ভৃগুপদচিহ্নশোভিত বক্ষের দিকে। এ লক্ষণ তিনি চেনেন। মৃত্যু, মৃত্যুই আসছে তাঁর দেহের রক্তধারাকে গাঢ় শীতল ক'রে দিয়ে। অসাড় অবশ হয়ে আসছে স্নায়ু, পেশী। আর একটু পরে এই চৈতন্য ও চিন্তাশক্তিও লোপ পাবে। ঐ সমস্ত-একাকার-করা অবশতায়।

কে জানে তার আর কতটুকু বিলম্ব। তাঁর নিধনকারীর আগমন পর্যন্ত সবুর সইবে কি না।

হ্যাঁ, নিধনকারীই।

আসবে তা তিনি জানেন।

জরা। সকল শক্তি সকল বুদ্ধির অবসান হবে তার আগমনে। দেহের মধ্যে, ধমনীর রক্তকণিকায় তার আসার পূর্বাভাস পেয়েছেন, শুধু এখন শেষটুকু বাকী। শেষ উপলক্ষটুকু।

তাঁকেও নিহত হতে হবে বৈ কি।

সুস্থ স্বাভাবিক সহজ মৃত্যু, কিংবা দেহত্যাগ বা ইচ্ছামৃত্যু তাঁর জন্য নয়। সে ভাগ্য তিনি ক'রে আসেন নি।

অথবা বলা যায়, এইটেই তাঁর ইচ্ছামৃত্যু। এই মৃত্যুই তিনি চেয়েছেন। এইটেই নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন।

না চাইলেও পেতে হ'ত তাঁকে অবশ্য। বহু লোকের অপঘাত মৃত্যুর কারণ হয়েছেন, বহু লোককে বধ করেছেন—করিয়েছেন। এই মাত্র তো কত স্বজন হত্যা ক'রে এলেন। তাঁর যদি সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়—সেটা ঈশ্বরের অবিচার বলে গণ্য হবে যে, তাঁর রাজ্যে অনিয়ম। ত্রিভুবনের লোক ধিক্কার দেবে সৃষ্টিকর্তা বিধাতাকে। যেমন পাপ তেমনি প্রায়শ্চিত্ত হওয়া চাই বৈকি! তিনি জেনেশুনেই তো এইখানে বসে অস্বাভাবিক অপঘাত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন—প্রার্থনা করছেন তার আগেই না এই দেহযন্ত্রটা থেমে যায়, এই সামান্য প্রায়শ্চিত্তটুকু অন্তত করবার সুযোগ পান।

পাপ? পাপ বৈকি!

দেহে শুধু নয়—শুধুই এই উচ্চাশা বহনের পাপ নয়, যে উচ্চাশার অনলে এতগুলি মানুষ, এতগুলি বীর প্রাণ দিল, এতগুলি নারী ও শিশু অনাথা হ'ল, এত গৃহের সর্বনাশ হ'ল—পাপ তাঁর মনেও কি ছিল না? এই অকারণ উচ্চাশা ও অহঙ্কার ছাড়া?

যাকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক পূজনীয় মনে করে—তারও মনে কিছু পাপ, কিছু বীভৎস চিন্তা, অসূয়া দ্বেষ বাসা বেঁধে থাকতে পারে। তবে সেও দেহেরই ধর্ম।

দেহ আর মন অঙ্গাঙ্গী জড়িত. অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

চোখ দেখে বলেই মনে লালসা জাগে, রসনা সুখাদ্যের স্মৃতি বহন করে বলেই স্বাদু আহার্যের সন্নিধানে মানুষ লুব্ধ হয়ে ওঠে।

দেহ ধারণ করলেই ইন্দ্রিয়ের অধীন হতে হবে। মনও সে নিয়মের বাইরে নয়। সাধুরা নির্জন পাহাড়ে বা অন্ধকার গুহায় বসে তপস্যা করেন—নিজেরই ইন্দ্রিয় তথা মনের কাছ থেকে আত্মগোপন করতে।

এ তথ্য নিজের জীবনেই উপলব্ধি করেছেন।

মনের অগোচরে পাপ নেই, এতকাল প্রশ্নটা বা সত্যটা প্রাণপণে এড়িয়েই এসেছেন—আজ সেটা মনে মনে অন্তত স্বীকার ক'রে যাবেন। এর এই প্রায়শ্চিত্ত।

কর্ণবধ তাঁর এই রকমেরই একটি পাপ।

কর্ণকে নিজে হাতে বধ করেন নি—কিন্তু তিনিই ওঁর মৃত্যুর প্রধান কারণ, তিনিই সংঘটন করিয়েছেন।

ইচ্ছে করলে বাঁচাতে পারতেন। পাণ্ডবদের কাছে কর্ণের সত্য পরিচয় দিলে পাণ্ডবরা কখনই তাঁকে বধ করতেন না। ওঁরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে সম্মান দিয়ে পদপ্রান্তে নত হ'লে কর্ণও সব বিদ্বেষ ভুলে যেতেন। মিলিত হতেন ভাইদের সঙ্গে। সে উদারতা তাঁর ছিল। আসলে অতি কোমল মন কর্ণের—সেটা বাসুদেবের অজানা ছিল না।

কিন্তু বাসুদেব সে চেষ্টাই করেন নি। আর কেউ না জানুক, তিনি বরাবরই জানতেন কর্ণই তাঁর পিতৃষ্বসা পৃথার প্রথম সন্তান। জ্যেষ্ঠ পার্থ।

তিনি বরং বহুদিন ধরে চক্রান্তই করেছেন কর্ণবধের জন্য। ঘটোৎকচকে জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন অর্জুনের-জন্য-নির্দিষ্ট-ক'রে-রাখা একাঘ্নী অস্ত্র নষ্ট করতে। নিরস্ত্র শত্রুকে অর্জুন কখনই বধ করতেন না, বিদ্রূপছলে কর্ণের বিবিধ কুকীর্তি স্মরণ করিয়ে উত্তেজিত ক'রে না তুললে।... শল্যকে কর্ণের সারথ্য গ্রহণে অনুরোধ করার মূলেও তিনি; শল্য নানাভাবে মনোবল হরণ না করলে কর্ণ অত বিভ্রান্ত হতেন না, অভ্যস্ত অস্ত্রের কথাও বিস্মৃত হতেন না। অভিশাপ ছিল সত্য কথা—গুরু ও ব্রাহ্মণের—কিন্তু সে কথা মনে করিয়ে না দিলে অত শীঘ্র হয়ত তা ফলত না।

কেন এ কাজ করেছেন বাসুদেব? কর্ণ নিহত না হ'লে কৌরবরা অজেয় থাকবে চিরকাল—এই আশঙ্কায়? শুধুই কি ওঁর কল্পিত ধর্মরাজ্য স্থাপনের ব্যস্ততায়?

অথবা কর্ণের দুষ্কৃতির জন্যেই তাকে শাস্তিদান করতে চেয়েছিলেন? নানা দুষ্কৃতি কর্ণের, বিশেষ কপট দ্যূতসভায় তাঁর আচরণ অমার্জনীয়। তবু, সে-ই কি একমাত্র বা প্রধান কারণ? কর্ণের স্বভাবে দোষ ছিল অনেক —তবে তার চেয়ে ঢের বেশী কি গুণও ছিল না? বরং কর্ণ বেঁচে থেকে পাণ্ডবদের মিত্র ও সহায় হ'লে বহু উপকার হ'ত মানুষের। আর, আর হয়ত ঠিক এতটা জনক্ষয়েরও প্রয়োজন হ'ত না।

না, ওসব কোন কারণই নয়। আসল কারণ ছিল ওঁর মনে।

অসূয়া? বিদ্বেষ? হীনমন্যতা?

কে জানে কি! অত কিছু ভেবেও দেখেন নি তিনি।

মূল কারণ স্ত্রীলোক। দেহী পুরুষমাত্রেরই অশান্তির মূল কারণ।

পাণ্ডবমহিষীই সেই স্ত্রীলোক। হোমাগ্নি-সম্ভবা দ্রৌপদী।

কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা। শুধু নামেই নয়, শুধু গাত্রবর্ণেই নয়—আরও অনেক মিল দু'জনের। সিংহের উপযুক্ত সিংহিনী। অবশ্য যদি নিজেকে সিংহ মনে করেন বাসুদেব—আজ আর সে অহঙ্কার ওঁর নেই—তবুও মনে হয়, তাঁরই সহধর্মিণী হওয়া উচিত ছিল কৃষ্ণার। সখী বান্ধবী ঠিকই—যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল ওঁর সঙ্গে, কিন্তু তাতে মন ভরে নি।

মন ভরে নি বাসুদেবের অগণিত স্ত্রীতেও। তারা কেউ বা শুধুই ধর্ম-পত্নী, কেউ বা প্রেয়সী। তারা সকলেই নর্মসহচরী, কর্মসহচরী কেউ নয়। এমন কি সহমর্মিণীও নয়। মহিষী হবার উপযুক্ত তো নয়ই। কে জানে কৃষ্ণা যদি পাণ্ডবমহিষী না হয়ে যদুকুল-রাজ্ঞী হ'ত, তাহলে হয়ত ওঁর আশা এমন দুরাশার মতো স্বপ্নেই বিলীন হ'ত না, এমন শোচনীয় পরিণাম হ'ত না সে মহৎ পরিকল্পনার।

আর একটিও মানুষ পান নি বাসুদেব ওঁর এই দীর্ঘ জীবনে—যার কাছে মনের সব গোপন কথা, একান্ত অভিলাষ ব্যক্ত করা যায়, যার সঙ্গে বসে একটা জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা যায়।

দ্রুপদনন্দিনীই সেই মানুষ—যার সঙ্গে সে-সব প্রসঙ্গ আলোচনা করা চলত, যে সে-সব কথা বুঝত, যে বিপুল এই দেশটাকে অক্ষক্রীড়ার ছক্ বলে ভাবতে পারত। যাজ্ঞসেনীর মর্যাদা পাণ্ডবরা বোঝেন নি। তার শক্তি কাজে লাগাতে পারেন নি। এমন কি স্বয়ং অর্জুনও নয়।

সে মহতী সম্ভাবনা সামান্য জীবন-যাত্রায় ব্যয় হয়ে গিয়েছে। মহাব্রহ্মাস্ত্র ক্ষুদ্র কীটনাশে প্রযুক্ত হয়েছে।

কিন্তু সেই অসামান্যা নারীরও একটা দুর্বলতা ছিল। ইতর নারীসুলভ দুর্বলতা। আর কেউই জানত না, আজও কেউ জানে না। কেবল তিনি জানেন—বাসুদেব। দ্রৌপদীর মনের সব গলি-পথেই আনাগোনা আছে ওঁর, তাঁর সকল নিরুক্ত বাসনা-কামনার ইতিহাসই উনি জানেন।

কর্ণই সেই দুর্বলতা। অঙ্গাধিপতি পাণ্ডবসহোদর কর্ণ।

ধার্মিক, বলবান, বীর্যবান, কান্তিমান, বুদ্ধিমান—পঞ্চস্বামীতেও তৃপ্তি হয়

নি তার, মন ভরে নি। এমন আদর্শ স্বামীতে বুঝি কোন মেয়েরই মন ভরে না। দ্রৌপদীও চায় নি এমন মহাপুরুষ, এমন আদর্শ পুরুষ। সে চেয়েছিল রক্তমাংসের মানুষ,— আবেগে উদ্বেল, উদারতায় বিশাল, বীর্যে অনন্যসাধারণ, শৌর্যে দেবকল্প, একটা পরিপূর্ণ পুরুষ। যার কীর্তিকথা জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তী হয়ে ওঠে, যাকে ঘিরে মানুষের জল্পনা-কল্পনা-কৌতূহলের শেষ থাকে না—যে সামান্য অবস্থা থেকে অসংখ্য জনশ্রুতির নায়ক, রূপকথার রাজা হয়ে ওঠে। যার দানশক্তি ত্রিভুবনে অতুলন, সত্যে যে অদ্বিতীয়, যে স্বয়ং পরশুরাম এবং ইন্দ্রের কাছ থেকে আয়ুধ সংগ্রহ করেছে, যে জেনেশুনে শত্রুর হাতে আত্মরক্ষার বর্ম তুলে দিয়েছে ; অথচ যে কামনায় অস্থির, অসূয়ায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য, যে তার গোপন স্বপ্নের মানসীকে প্রকাশ্য অপমানে লাঞ্ছনায় ক্ষতবিক্ষত করতে পারে,—এমন সাধারণে-অসাধারণে মেশা বাস্তবে-আদর্শে জড়ানো একটি মানুষ, যাকে শুধু শ্রদ্ধা বা ভয় নয়—ভালবাসাও যায়। যাকে প্রভাতের প্রণামের সঙ্গে রাত্রিশেষের একটি চুম্বন উপহার দেওয়া যায়, যাকে অনুরোধ নয়—নিঃসঙ্কোচে আদেশ করা যায়!

অর্জুন? হ্যাঁ, অর্জুনই দ্রৌপদীর সমধিক প্রিয়, তবু সে-ও আদর্শ পুরুষই একজন! তার অঙ্কে নিজের পা দুটি তুলে দেওয়া যায় না, অসময়ে প্রেম-নিবেদন করা যায় না। তার চরিত্রে দোষ কই? ঈর্ষা কই—যার মধ্যে স্ত্রীলোক নিজের আরতি উপভোগ করে, নিজের মূল্যের পরিমাপ করতে পারে? ঈর্ষাহীন পুরুষ কোন স্ত্রীরই কাম্য নয়। তাই পঞ্চস্বামী সত্বেও একটা অভাববোধ ছিল কৃষ্ণার মনে মনে। ছিল একটা শূন্যতা—হয়ত ষষ্ঠের জন্যই—বাসুদেব জানতেন জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের জন্য।···

লালসা? কামনা? রিরংসা?

না না, সেসব কিছু নয়। শুধুই একটা দুর্বলতা। একটা, হয়ত বা, বেদনাবোধও। সেই স্বয়ম্বর সভায় যে আঘাত দিয়েছিল, সেই আঘাতের ব্যথাটুকু মুছে নেবার একটা অভীপ্সা। কোন এক অবসরে একটু ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে নেবার ইচ্ছা ; একটু বুঝি সান্ত্বনা দেবারও। জানিয়ে দেবার যে আজ আর তাঁকে অনুপযুক্ত মনে করে না কৃষ্ণা, বরং মনে করে যে, একমাত্র তাঁকে পেলেও সে সুখী হত।

আরও একটু জানাতে চায় সে। জানাতে চায় যে, তাঁর মনের গোপন

ক্ষতটির কথাও সে জানে। কেন যে কৌরব-দ্যূতসভায় অমন ক্ষিপ্ত, অমন হিংস্র, অমন বর্বর হয়ে উঠেছিলেন অঙ্গাধিপতি—তা আর কেউ না জানুক, যাকে সবচেয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে—সে জানে। জানে যে, সে কেবল কঠিন আঘাতে পাণ্ডবদের পৌরুষে উদ্বুদ্ধ করারই চেষ্টা। কৃষ্ণার অপমান বুকে বেজেছিল বলেই অমন অমানুষের মতো আচরণ করেছিলেন সেদিন কর্ণ।

কেবল এইটুকু। আর কিছু না। ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

তথাপি, সেই সামান্য দুর্বলতাটুকুও সহ্য করতে পারেন নি বাসুদেব। কেমন যেন মনে হয়েছে যে, ওঁর নিজস্ব প্রাপ্যটুকু থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উনি। আদর্শ পুরুষহিসেবে ওঁর যেটা পাওয়া উচিত—সেটা অন্যত্র, অপাত্রে চলে যাচ্ছে।

সেই ক্ষোভটাই ক্রমশ বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। ক্ষোভ বলে আর লাভ নেই, ঈর্ষাই বোধ করেছেন স্বয়ং বাসুদেব। সেই ঈর্ষাই কালের হস্ত ত্বরান্বিত করেছে, কর্ণকে তাঁর অমোঘ নিয়তির দিকে দ্রুত ঠেলে দিয়েছে।

এই একান্ত কাপুরুষোচিত মনোভাবই আজ বাসুদেবকে পীড়া দিচ্ছে সব চেয়ে বেশী। কর্ণ বেঁচে থাকলে উনি তাঁর হাত দুটি ধরে অশ্রুজলে এই কলুষ ধুয়ে দিতেন, ক্ষমাপ্রার্থনায় প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

ক্ষমা প্রার্থনা করতেন কৃষ্ণার কাছেও।

কৃষ্ণা অবশ্য আজও, এখনও বেঁচে আছে। বাসুদেবেরই আর সে শক্তি, সে অতিরিক্ত পরমায়ু নেই। আজ এই জীবনের অন্তিম বেলায় সেই অপরাধ স্বীকারের জন্যেই প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছে তাঁর, প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই ছটফট করছেন তিনি।

অবশ্য বেশী দেরিও নেই আর। দেনা-পাওনা যার যা বাকী আছে তা নিয়েই হয়ত যাত্রা করতে হবে, এখানের পাট চুকিয়ে। জরা গ্রাস করেছে সকলকেই, কেউই আর সুস্থ স্বাভাবিক নেই।

যাদবকুলের কুলনারীদের রক্ষা করার জন্য ধনঞ্জয়কে আসতে বলেছেন বটে, তবে তিনি এও জানেন যে, তারা রক্ষা পাবে না। গাণ্ডীবীর শক্তিতে কুলোবে না আর। তাঁর বিধবা অনাথা পুরনারীরা বর্বর লম্পটের অঙ্কশায়িনী হবে, এই তাদের ললাটলিপি। এও বাসুদেবেরই কৃতকর্মের ফল হয়ত—তবু এ

অবশ্যম্ভাবী, এ দুঃখ তাদের ভোগ করতেই হবে। ইন্দ্রপ্রস্থ যাওয়ার পথে পঞ্চনদের দস্যুরা যখন আক্রমণ করবে তখন আর গাণ্ডীবে জ্যা রোপণের সামর্থ্য থাকবে না অর্জুনের, কোন শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগকৌশলও মনে পড়বে না আর। এ তো দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন তিনি—অচির ভবিষ্যতের এই দৃশ্য।

কাল ফুরিয়ে এসেছে ওঁদেরও। লোকক্ষয়কারী কাল জরাকে পাঠিয়েছেন দূতরূপে, সে আহ্বান এখনও শুনতে পান নি ওঁরা—তাই এ দুর্গতি। পাণ্ডবদেরও এবার যাত্রা করতে হবে প্রাণীমাত্রেরই অবশ্য পরিণতির পথে—মহাপ্রয়াণের পথে।

তাহলে এ প্রহসনের প্রয়োজন কি ছিল? অর্জুনকে ডেকে পাঠাবার?

ছিল বৈকি! ম্লান ক্লিন্ন হাসি হাসলেন বাসুদেব, আপন মনেই। অর্জুনেরও কিছু ছিল বৈ কি, অহমিকা সেই পাপ—তাঁরও প্রাপ্য ছিল এই অপমানটুকু।

কিন্তু সে কথা আজ থাক। আজ আর অপর কারুরই দোষ ধরবেন না তিনি। তাঁর মতো লোকোত্তর চরিত্র মানুষের অন্তরেই যদি এত গ্লানি, এত কলুষ, এত দৈন্য থাকে—অপর কার ছিদ্র অন্বেষণ করতে যাবেন তিনি?

'আঃ—!'

এই বুঝি মৃত্যু এল এবার, এল পরিসমাপ্তি, সকল সুখ-দুঃখের মহা-অবসান এতকাল পরে।

চোখ মেলে চাইলেন বাসুদেব একবার, 'ও কে? কে তুমি? অমন হাহাকার করছ কেন? আমাকে আঘাত করেছ এই অনুশোচনায়? কিছুই করো নি তুমি বন্ধু, কোন অন্যায় করো নি, আজ এই দুর্দিনে, শেষ দিনে বন্ধুর কাজই করেছ। এর জন্য আমি প্রতীক্ষাই করছিলুম যে,—মুক্তি দিয়েছ আমাকে। সকল মহাপুরুষেরই—যাদের দেহ ধারণ করলেও লোকোত্তর হবার সাধ যায় না, অহঙ্কার যায় না ঐশীশক্তির—তাদের নিবুদ্ধিতা স্মরণ করাবার জন্য যুগে যুগে তোমার মতো বন্ধুর প্রয়োজন হবে। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঐ শর উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও, না না, কোন সঙ্কোচ করো না—ভবিষ্যতে তোমার কাজে লাগবে, নষ্ট ক'রে লাভ কি? পুরস্কার দেবার মতো আর কিছুই নেই আমার—তাই আশীর্বাদ করছি। কল্যাণ হোক।'—

আর একবার চারিদিকে চাইলেন বাসুদেব। জন্মেছিলেন অন্ধকারাগারে —কিন্তু তার পর, জ্ঞান হতে যে শ্যামা সুন্দরী ধরিত্রীকে দেখেছিলেন, পুষ্পিতা নদী-পর্বত-অরণ্যানীশোভিতা, মৃত্যুকালে দেখে গেলেন তাকে কামনা-কলুষ উচ্চাভিলাষ-পাপবিধ্বস্ত এক মহাশ্মশান। সেখানে সত্য নেই, সেখানে ক্ষমা নেই, সেখানে উদারতা, প্রসন্নতা, তৃপ্তি—কিছুই নেই আর। আছে শুধু দুর্বার লোভ আর লালসা আর রিরংসা ; রিপুর প্রাধান্য আর হিংসা। আছে সর্বনাশা আত্মঘাতী বুদ্ধি। যুগ-যুগান্তরের জন্যই বুঝি এই উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছেন বাসুদেব।

ক্ষমা করো, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বরের ঈশ্বর, ক্ষমা করো তুমি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে, ক্ষমা করো !

ছটি প্রাণের মূল্য

মহাভারতে আছে, পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার মতলবে কৌরবরা কৌশল ক'রে তাদের বারনাবত বলে এক ছোট শহরে পাঠান। জায়গাটি নাকি খুব মনোরম। কী একটা মেলাও যাচ্ছিল—পাঠাবার ছুতোরও অভাব হ'ল না। পাণ্ডবরা অত বুঝতে পারেন নি, তাঁরা সহজেই রাজী হলেন। তখন দুর্যোধন পুরোচন বলে এক কর্মচারীকে আগে পাঠিয়ে ধুনো-গালা-তেল-শন প্রভৃতি দিয়ে একটা বিরাট চকমিলানো বাড়ি তৈরি করালেন। তার বাইরের দিকে কোন জানলা কি দরজা রইল না, বাড়ির মধ্যে ঢোকবার একটিমাত্র প্রবেশপথ বাদে। ঘরের জানলা-দরজা সব ভেতর দিকে, উঠোনদালান সবই ভেতরে। তখন বেশির ভাগ বাড়ি ঐ ভাবেই তৈরী হত। পশ্চিম অঞ্চলে এখনও এইভাবে তৈরী পুরনো বাড়ি অনেক দেখা যায়। শত্রুর ভয় তো ছিলই, তা ছাড়াও শীতে দারুণ হিম আর গ্রীষ্মকালে গরম বাতাস ঢোকার ভয়ে কেউ বাইরের দিকে জানলা রাখত না।

পাণ্ডবদের কয়েকদিন অন্য বাড়িতে রেখে পুরোচন পাকাপাকিভাবে এই বাড়িতে এনে তুলল এবং দিনরাত চোখে চোখে রেখে দিল। রাত্রে পাহারা দেবার নামে সদরদরজা আগলে শুত—যাতে তাকে না-জাগিয়ে কেউ

না বাইরে যেতে পারে। পাণ্ডবরা অবশ্য বাড়িতে এসে দেওয়ালের গন্ধেই টের পেয়েছিলেন যে এটা জতুগৃহ, সহজে আগুন লাগে এমন উপকরণে তৈরী। তাছাড়া বিদুরও তাঁদের আগে থাকতে ইঙ্গিতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি পরে একটা লোকও পাঠিয়ে দিলেন, সে দিনে ঘাপটি মেরে থাকত আর রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মেঝের মাটি কেটে সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ত। দেখতে দেখতে বহুদূরে পথ তৈরী হয়ে গেল—যাতে অনেকটা দূরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উঠতে পারেন এঁরা।

পালাবার ব্যবস্থা তো হ'ল, কিন্তু যুধিষ্ঠির ভেবে দেখলেন যে তাঁরা যদি এমনি পালান তো পুরোচন তখন হয়ত পিছুপিছু লোকজন নিয়ে ধাওয়া ক'রে সোজাসুজি মেরে ফেলবে। তাই তিনি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সুযোগ একটা এসেও গেল। একদিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে শহরের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁরা। ইতর-ভদ্র সব ধরনের লোকই এল ভোজ খেতে। এক নিষাদী মানে নিষাদ বা ব্যাধ জাতীয় মেয়েছেলেও তার পাঁচটি ছেলে নিয়ে খেতে এসেছিল। ভোজে ভাল ভাল খাবারই শুধু নয়—যারা নীচু জাতের লোক, নিষাদ বা চণ্ডাল, তাদের জন্যে মদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল। এত ভাল খাবার আর সেই সঙ্গে এমন অঢেল মদ অনেকদিন কপালে জোটে নি। নিষাদী আর তার ছেলেগুলো আকণ্ঠ খেল বসে বসে, ফলে নেশার চোটে আর বাড়ি ফিরতে পারল না, সেইখানেই দাওয়ায় পড়ে ঘুমোতে লাগল। পাণ্ডবরা দেখলেন এ-ই উত্তম সুযোগ। তাঁরা নিজেরাই বাড়িটার চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়লেন এবং রাতারাতি বহুদূর চলে গেলেন।

বাড়ির মধ্যে যারা শুয়ে ছিল—নিষাদী, তার পাঁচ ছেলে আর পুরোচন—সবাই সে বেড়া-আগুনে পুড়ে মল। নেশা করার ফল হাতে হাতে মিলল। পরের দিন সকালে আগুন নিভলে গ্রামবাসীরা এসে সেই পোড়া দেহগুলো দেখে ভাবল পাণ্ডবরাই পুড়ে মরেছে, সেইসঙ্গে পাজী পুরোচনটাও। 'বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল' এই বলে পাণ্ডবদের জন্যে শোক করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল তারা। কৌরবরাও এই খবর পেয়ে তাঁদের কাঁটা পাণ্ডবরা সরে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন।

এই পর্যন্ত মহাভারতে আছে। ঐ নিষাদী কে, কী তার নাম, তার আর কেউ ছিল কি না—এসব কোন কথাই নেই। যুধিষ্ঠির—যাঁকে ধর্মরাজ বলা হয়, যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি বলে যাঁর রথের চাকা মাটি থেকে উঠে থাকত—তিনিই বা কি করে অম্লানবদনে নিজের সুবিধার জন্য নিরপরাধ ছটা মানুষকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করলেন—তাও মহাভারতে লেখা নেই।

তা মহাভারতে লেখা না থাক, আমি আজ ঐ নিষাদীদের গল্পই বলব।

যে নিষাদীটি তার পাঁচ ছেলে নিয়ে পুড়ে মারা গেল তার নিষাদ স্বামী—ধরো তার নাম নমুচি—তখন বারণাবতে ছিল না। পাহাড়ের দিকে শিকার করতে গিয়েছিল। এমন প্রায়ই যেত, সাত আট দশ দিন কাটিয়ে ফিরত। এবারেও জতুগৃহদাহের আট দিন পরে যথারীতি মরা ছাগল-হরিণের চামড়ার বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখে তার কুটির শূন্য, হা-হা করছে খালি পড়ে—না আছে তার বউ আর না তার পাঁচ ছেলে।

তবু তখনও কোন বিপদের কথা মনে হয় নি, এমনভাবে ছেলেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ওর বউয়ের স্বভাব। হয়ত গ্রামান্তরে কোন ভোজের খবর পেয়ে ছেলেপিলে নিয়ে খেতে গেছে—কাল-পরশু ফিরবে। কিন্তু এমনি কাল-পরশু করতে করতে যখন বেশ কয়েকদিন কেটে গেল তবুও নিষাদী ফিরল না—তখন একটু ভাবনায় পড়ল। এদিক ওদিক, পাড়ায়, পাড়ার বাইরে—যতটা পারল খোঁজখবর করল—কেউই কিছু বলতে পারল না বিশেষ। সে রাজাদের ওখানে ভোজে গিয়েছিল এটা অনেকেই দেখেছে, তারপর কী হ'ল তা কেউই জানে না।

তবে কি ঐখানেই পুড়ে মরেছে?—নমুচির একথাও মনে হল একবার।

কিন্তু তাই বা কি করে হবে? এখানে তো পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, দেবী কুন্তী আর সেই দুরাত্মা পুরোচন ছাড়া কারও অস্থি পাওয়া যায় নি!

অনেক ভাবল নমুচি, অনেক খুঁজল, অনেক কান্নাকাটি করল। বউয়ের জন্যে তত না—ছেলেগুলোর জন্যেই তার শোক বেশী। বিয়ে আর একটা ইচ্ছে করলেই করতে পারে,—কিন্তু যে ছেলেগুলো মারা গেল তাদের পাওয়া যাবে না আর। স্বাস্থ্যবান, ডাগর ছেলে। তারা থাকলে ওর ব্যবসার সহায় হত। অত্যধিক মায়ায় পড়েই পাহাড়ে নিয়ে যেত না—সেইটেই বুঝি কাল হল! যদি বড় দুটোকেও সঙ্গে নিয়ে যেত বুদ্ধি করে! অনেক বেশী মাল

ঘরে আসত—সে ছেলে দুটোও চোখের ওপর থাকত, এমন করে সকলকে হারাতে হত না।

ছেলেদের শোকে ক্রমশঃ পাগলের মতো হয়ে উঠল নমুচি, কাজকারবার জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ঘরে গুম্ হয়ে বসে থাকত শুধু—পাড়ার লোক কেউ দয়া করে খেতে দিলে খেত—নইলে উপোস করেই পড়ে থাকত। শেষে তাও ভাল লাগল না আর—একদিন 'দুত্তোর' বলে ঘর দোর সব ফেলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ল। তবে—বেরোবার আগে কী জানি কি মনে হ'ল—সেই পোড়া জতুগৃহের ছাইয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে কয়েকটা হাড়ের টুকরো—যা তখনও একেবারে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় নি—সংগ্রহ ক'রে পিঠের চামড়ায় তৈরী তূণের মধ্যে পুরে নিল। কদিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে ছাইয়ের মধ্যে থেকে সাদা হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছিল—ছাইয়ের মধ্যেও দেখতে কোন অসুবিধা হল না।

এর পর এদেশ ওদেশ বহুদেশ ঘুরে অনেকদিন পরে একসময় পাঞ্চাল দেশে পৌঁছল। সেখানে গিয়ে দেখল মহাসমারোহ ধুমধাম চলেছে—রাজধানীতে উৎসবের হুল্লোড় চলেছে। কী ব্যাপার? শুনল রাজা দ্রুপদের মেয়ের বিয়ে—কদিন আগে স্বয়ংবর হয়ে গেছে, এইবার অনুষ্ঠান ক'রে বিয়ে দেওয়া হবে।

ক্রমশঃ সব খবরই শুনল নমুচি। পাণ্ডবরা মরেন নি, সুড়ঙ্গপথে জতুগৃহ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরই একজন—অর্জুন স্বয়ংবরের পণে জিতে দ্রৌপদীকে পেয়েছেন—কিন্তু পাহাড়ীদের মতো পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। এত করেও পাণ্ডবদের মারা যায় নি, বরং তাঁদের বদ মতলবের কথাটা প্রচার হয়ে গেল দেখে কৌরবরা লজ্জা পেয়েছেন, তাঁরাও নাকি লোক পাঠিয়ে একটা মিটমাট ক'রে নিয়েছেন, পাণ্ডবদের আদ্ধেকটা রাজ্য ছেড়ে দেবেন, আর একটা রাজধানী তৈরি ক'রে পাণ্ডবরা সেখানে রাজত্ব করবেন।

পাণ্ডবরা মরেন নি। নিজেরাই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেছেন। তারপর আবার লোক দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখটা মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছেন ওঁরা—যাতে পালাবার কথা না কেউ টের পায়।

তাহলে সে অস্থিগুলো কার?

ছটি মানুষের অস্থি ?

একটি মেয়েছেলে আর পাঁচটি ছেলের পোড়া হাড় !

কারা অমন বেঘোরে পুড়ে মারা গেল ? কে তারা ? কি পরিচয় ?

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনে উত্তর পেয়ে গেল নমুচি। নিশ্চয় তার বউ আর পাঁচ ছেলে।

কিছুই আর বুঝতে বাকী থাকে না নমুচির। পেট ভরে খেতে পাবে ভেবে অনাহূতই গিয়েছিল ভোজ খেতে। সেখানে বিনাপয়সার মদ পেয়ে তাও খুব গিলেছে, ছেলেগুলোকেও গিলিয়েছে ! তারপর বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়ত ইচ্ছে করেই বেশী বেশী মদ খাইয়েছে পাণ্ডবরা, যাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। কত দিন সাবধান করেছে সে বউকে—মদ খাওয়ার বিপদ বুঝিয়েছে—শোনে নি। এবার তার ফল পেল। পাণ্ডবরা ওদের নেশার সুযোগ নিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে—নিষাদী আর তার পাঁচ ছেলেকে ইচ্ছে ক'রে পুড়িয়ে মেরেছে—যাতে সবাই মনে করে যে, কুন্তী আর পাণ্ডবরাই মারা গেছে পুরোচনের দেওয়া আগুনে।

নিশ্চয়ই এই।

যতই ভাবে নমুচি, সব দিক তলিয়ে চিন্তা করে—ততই মনে হয় যে ঠিক এমনিটাই ঘটেছিল। কৌরবরা না পিছু পিছু তাড়া করে—এই ভয়ে তার বউ আর ছেলেকে মেরেছে পাণ্ডবরা।

ভাবতে ভাবতে এতদিনের দুঃখ আবার যেন নতুন ক'রে জেগে ওঠে মনের মধ্যে। আহা, বাছারা না জানি কত কষ্টই পেয়েছে, নেশা আর ঘুমের মধ্যে থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠে বিহ্বলভাবে ছুটোছুটি করেছে নিশ্চয়, বাঁচবার জন্যে, সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরোবার জন্যে কত চেষ্টা করেছে—চেঁচিয়েছে কেঁদেছে—তাদের সে কান্না কেউ শোনে নি, কেউ তাদের বাঁচাতে ছুটে আসে নি !···

শেষ পর্যন্ত নমুচি মরীয়া হয়ে উঠে রাজপ্রাসাদের দিকে গেল। এর একটা হেস্তনেস্ত করবে সে, জবাব চাইবে যুধিষ্ঠিরের কাছে, কেন এই নিষ্ঠুর কাজ করলেন তিনি।

অবশ্য মুখে বলা যত সহজ—রাজরাজড়ার কাছে পৌঁছনো তত সহজ নয়। বিশেষতঃ উৎসবের বাড়ি—নমুচির সেই ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, রুক্ষ

জটা-পাকানো চুল আর পাগলের মতো চোখের দৃষ্টি দেখে দারোয়ান সান্ত্রীরা গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। যতবারই চেষ্টা করে—ততবারই এক ফল হয়। বারবার ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়।

কিন্তু নমুচিও ছাড়বার পাত্র নয়।

সে শেষে একটা মতলব বার করল মাথা থেকে।

বিবাহের পর পর বর-কনেরা যখন দ্রুপদরাজার প্রাসাদ থেকে বেরোচ্ছেন—চারিদিকে প্রজারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে রাজার জামাইদের জয়ধ্বনি দিচ্ছে আর ফুল ছুঁড়ছে—সেই ভিড়ে গা ঢেলে নমুচি এসে দাঁড়াল একেবারে পথের ধারে। পাণ্ডবরা একে একে এসে বেরিয়ে এলেন ঘোড়ায় চেপে, পিছনে চতুর্দোলায় দ্রৌপদী। নমুচি সকলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে একেবারে যুধিষ্ঠিরের সামনে এসে দাঁড়াল—'দাঁড়াও রাজা, আমার কথার জবাব দিয়ে তবে বউ নিয়ে যেতে পাবে, নইলে পথ ছাড়ব না। আমার নালিশ শুনে যাও যাবার আগে!'

যথারীতি রাজবাড়ির রক্ষীরা ওকে মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল পথ থেকে, যুধিষ্ঠিরই নিষেধ করলেন। বললেন, 'কে তুমি, কী তোমার নালিশ বলো? আর কার নামেই বা নালিশ?'

নমুচি বলল, 'নালিশ আমার পাণ্ডবদের নামে। তোমার নামে। তুমি না রাজা, তুমি না ধার্মিক—তোমাকে না লোকে ধর্মরাজ বলে? তবে তুমি কেন আমার নিরপরাধ স্ত্রী আর পাঁচটা বাচ্চাকে পুড়িয়ে মারলে, তারা কী দোষ করেছিল? ভাল খেতে পাবে এই লোভে তোমার দোরে গিয়েছিল বলে? তোমরা এমনিই একদিন পালাতে পারতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, পুরোচনটাকে মারলে কোন দোষ হ'ত না—আমার বউ আর পাঁচটা ছেলেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারলে কেন রাজা? এর কি বিচার—কী শাস্তি তুমিই ঠিক করো এবার!'

বেশ চেঁচিয়েই বলেছিল নমুচি, সকলকার কানেই গিয়েছিল কথাটা। শুনে পাণ্ডবরা সকলেই কিছুক্ষণের জন্য মাথা হেঁট করলেন—যুধিষ্ঠির সুদ্ধ। তবে তিনিই প্রথম মাথা তুললেন, আবার শান্তকণ্ঠে বললেন, 'নিষাদ, আত্ম-রক্ষার জন্যে সব কিছুই করা যায়—সেক্ষেত্রে কোন কাজই অন্যায় বা গর্হিত বলে ধরা হয় না। শাস্ত্রে একথা লেখা আছে। আমরাও আত্মরক্ষার জন্যে

তোমার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়েছি। তাছাড়া, ভেবে ছাখো—রাজার জন্যে প্রাণ দেওয়া প্রজা মাত্রেরই কর্তব্য, সেদিক দিয়ে ধরলে তোমার বউ-ছেলেরা তাদের কর্তব্যই পালন করেছে।'

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'যাই হোক, তোমার এখনও তেমন বয়স হয় নি। তুমি আর একটি বিবাহ করে সংসার পাতো, তোমার কল্যাণ হোক, বরং আমি আমার অমাত্যদের নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকে কিছু অর্থ দেবে, যাতে তুমি আবার সুবিধামতো ঘরবাড়ি ক'রে সংসার পেতে বসতে পারো।'

নমুচি ঘৃণার সঙ্গে উত্তর দিল, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিলে আমার ছেলেদের রক্তের দাম নেওয়া হবে। ছেলের রক্ত বেচে না-ই বা খেলাম। ও টাকা আমার কাছে শূকর-বিষ্ঠার সমান। থাক্—তুমি বউ নিয়ে ঘরে যাও, আমার বিয়ের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি রাজা, ধর্মরাজ—তোমার কাছে বিচার চেয়েছিলাম, তুমি নিজের সুবিধামতো বিচার করলে। এ নালিশ আমার তোলা রইল। রাজার ওপরেও একজন রাজা আছেন—ভগবান, দেখব তিনি আমার নালিশ শোনেন কিনা, সুবিচার করেন কিনা!'

এই বলে সে পথ ছেড়ে দিয়ে আবার ভিড়ে মিশে গেল।

এরপর নমুচি এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। সেই যে হাড়গুলো নিজের তূণে রেখেছিল—এখন তো বোঝাই গেল যে তার স্ত্রী আর ছেলেদেরই হাড়—সেগুলো কিন্তু গঙ্গায় দেওয়া বা শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা করা. কিছুই করল না। বরং হাড়গুলো ঘষে ঘষে আরও সাফ ক'রে, কয়েকটা পাশা তৈরি করল। তারপর সেইগুলো নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে একমনে তপস্যা করতে লাগল। ভগবানকে ডাকল না—পিশাচের সাধনা করতে লাগল, যাতে কোন পিশাচ তার বশ হয়।

তারপর—সম্ভবতঃ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেই আবার লোকালয়ে ফিরে এল। সাধারণ কোন লোকালয় নয়—রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এসে রাজ-প্রাসাদের কাছাকাছি জাত-ব্যবসা ফেঁদে বসল, হরিণ শিকার ক'রে এনে মাংস বিক্রী করতে লাগল, একটা দোকানও দিল মাংসের।

প্রাসাদের কাছাকাছি থাকে, রাজপ্রাসাদে অনেক লোকই তার দোকানে

আসে মাংস কিনতে। কোন কোন দিন রাজার রন্ধনশালা থেকেও লোক এসে মাংস কিনে নিয়ে যায়। তাদের মুখে নানা গল্প শোনে নমুচি, প্রাসাদের অনেক কাহিনী। পাণ্ডবদের কে কেমন, দ্রৌপদী কেমন মানুষ, পাণ্ডবদের অন্য স্ত্রীরা কেমন—শালাসম্বন্ধী কুটুম্ব—অনেকের কথাই কানে আসে। জ্ঞাতিদের ঈর্ষা, সে ঈর্ষার আগুনে কারা ঘি ঢালে—কর্ণ শকুনি—তাদের কথাও বলে যায় কোন কোন লোক। দাসীচাকরদের কোন কথাই জানতে বাকী থাকে না—কৌশলে নমুচি তাদের কাছ থেকে সব কথা আদায় ক'রে নেয়।

ক্রমে ময়দানব এসে নতুন সভাগৃহ তৈরি করল, রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হ'ল, দেশবিদেশ থেকে কত রাজামহারাজা এলেন, তাঁদের শিবিরের কানাত পড়ল চারিদিকে—লোকলস্করে গিজগিজ করতে লাগল রাজধানী, নমুচির মাংসের কারবার চালানোই দায় হয়ে পড়ল। চাহিদা অনেক কিন্তু মাল নেই—আশপাশের বনজঙ্গল অনেকদিন আগেই মৃগশূন্য হয়ে গেছে। এত লোক ক্রমাগত খেতে থাকলে আর জঙ্গলে হরিণ ছাগল থাকে কতদিন?

যাই হোক—কারবার চলুক আর না চলুক, মাংসের যতই অভাব হোক, নমুচির খবরের কোন অভাব রইল না। অতি গোপন কথাও কানে আসতে লাগল তার। কৌরবদের কি দুর্দশা হয়েছে নতুন স্ফটিকে তৈরী সভাগৃহে এসে, পদে পদে কী লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে, তার ফলে দুর্যোধন যে দিনরাত লাঠির-খোঁচা-খাওয়া সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছেন—আর তাঁকে অনবরত তাতিয়ে যাচ্ছেন শকুনি—সব খবরই নমুচিকে শুনিয়ে যেতে লাগল প্রাসাদের দাসী-চাকররা।

এর মধ্যে কৌরবদের কয়েকটি চাকরকেও বাগিয়ে নিয়েছিল সে, তাদের কাছ থেকে ওপক্ষের পরামর্শও শোনার কোন অসুবিধা হল না। বরং দেখা গেল এখন ওদের খবরেই নমুচির উৎসাহ বেশী। যজ্ঞ শেষ হতে কৌরবরা যখন হস্তিনায় ফিরে গেলেন সেও কয়েকদিনের জন্যে শিকারে যাবার নাম করে হস্তিনায় এসে আড্ডা জমাল। এবং সেইখান থেকেই খবর পেল—শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন বিদুরকে পাঠিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নিমন্ত্রণ জানাতে। আরও খবর পাওয়া গেল, যুধিষ্ঠিরের নাকি পাশাখেলার শখ খুব—কিন্তু তেমন শিক্ষা নেই, শকুনি অত্যন্ত ধূর্ত, দুর্যোধনের হয়ে তিনি-ই পাশা খেলবেন—এবং পাণ্ডবদের সব সম্পত্তি জিতে নেবেন—এই আশা

কৌরবদের।

এই সংবাদের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল নমুচি। সে প্রাসাদের একটি ভৃত্যকে পাঁচটি নিষ্ক বা মোহর ঘুষ দিয়ে নিভৃতে শকুনির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করল। সেই ভৃত্যটি গিয়ে বলল, পাণ্ডবদের জব্দ করা যেতে পারে যে উপায়ে—এমন গোপন কথা বলতে চায় লোকটি ; এই জন্যেই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এতদূর এসেছে।

শকুনি ওর বেশভূষা দেখে একটু বিরক্তই হলেন।

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী চাই বাপু তোমার ? তোমার কাছে এমন কোন জরুরী খবর থাকবে বলে তো মনে হয় না। কী মতলবে এসেছ খুলে বলো দিকি ?'

নমুচি দূর থেকে তাঁকে নমস্কার ক'রে নিজের কাহিনী খুলে বলল। বলল, 'প্রতিহিংসা ছাড়া আমার জীবনে এখন আর কোন লক্ষ্য নেই। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এক চণ্ডালবালক বধ ক'রে তার মৃতদেহের উপর বসে সাধনা ক'রে পিশাচ-সিদ্ধি লাভ করেছি। কথা আছে আমি স্মরণ করলেই যে কোন সময়ে পিশাচ একবার এসে আমার প্রিয় কার্য সমাধা ক'রে যাবে। পাণ্ডবদের বধ করার কথা বলেছিলাম তাতে সে বলেছে—পাণ্ডবরা দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত—তাদের ওপর ওর কোন জারিজুরি খাটবে না। সেই জন্যেই আমি অন্য কোন সুযোগের অপেক্ষা করেছি এতকাল। শুনলাম আপনি যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় ডেকেছেন তাদের সর্বস্ব অপহরণের জন্যে—আমি আপনাকে এই কয়টি পাশা দিয়ে যেতে চাই। আমার ছেলেদের হাড়ে তৈরী এ পাশা, আমার কথায় পিশাচ এর মধ্যে ভর করবে—আপনি যেমন করেই খেলুন—নিশ্চয় জিতবেন।'

শকুনি ধূর্ত লোক। তিনি সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তুমি যে সত্যি কথাই বলছ তা আমি বুঝব কি ক'রে ? তাছাড়া- আমি সর্বস্ব অপহরণের জন্যে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় ডেকেছি তাই বা কে বলল ? খেলার শখ হয়েছে তাই ডেকেছি। আর পাশাখেলা আমি ভালই জানি—তোমার ও পিশাচে-পাওয়া পাশায় কোন দরকার নেই।'

নমুচি এবার নিজমূর্তি ধরল। বলল, 'দ্যাখো ঠাকুর, বেশী চালাকি ক'রো না। তোমার মতলব জানতে আমার বাকী নেই। আমি যে সত্যি কথা

বলছি—তা যে-কোন দিব্যি গেলে বলতে পারি, তাও বিশ্বাস না হয় আমাকে ধরে কারাগারে বেঁধে রাখো, মিথ্যে প্রমাণ হলে আমাকে কেটে ফেলো। আর নিজের ওপর অত বিশ্বাস রেখো না, যুধিষ্ঠির ভাল খেলতে জানে না এটা ঠিক—কিন্তু সে নিত্য অভ্যাস করে। রোজ এক জায়গায় জল পড়লে পাথর ক্ষয়ে যায়—নিত্য অভ্যাসে তার হাত একটুও পাকবে না—তা সম্ভব নয়। কেন মিছিমিছি ঝুঁকি নেবে ? আমার এই পাশা তুমি ফেলে দ্যাখো—যেমন হুকুম করবে তেমনি পড়বে।'

কথাগুলোয় যে যুক্তি আছে তা মানতে হ'ল শকুনিকে। এবার তিনি ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন লোকটাকে ; পাগলের মতো চেহারা—কিন্তু পাগল নয়। মিথ্যা কথা বলছে বলেও বোধ হ'ল না। তখন তিনি পাশাগুলো ওকে মাটিতে রাখতে বলে, নিজে তুলে নিয়ে এমনি চেলে দেখলেন, ঠিকঠিক হুকুমমতোই পড়ল। তারপর খুশী হয়ে পাশাগুলো নিজের বটুয়াতে পুরে কয়েকটি নিষ্ক পুরস্কার দিতে গেলেন।

নমুচি কিন্তু এতখানি জিভ কেটে পিছিয়ে সরে গেল, হাতজোড় ক'রে বলল, 'মাপ করবেন, ছেলেদের অস্থির দাম নিতে পারব না। পাণ্ডবদের সর্বনাশ হলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে। আপনার কাজ শেষ হলে বরং—যদি সম্ভব হয়. পাশাগুলো কোন জলাশয়ে ফেলে দেবেন, গঙ্গায় দিলে আরও ভাল হয়।'

এর পরে যা ঘটল তা সবাই জানে। নমুচিও ভিড়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখল নিজের চোখে। পাণ্ডবরা সর্বস্ব হেরে কৌরবদের দাস হলেন, দ্রৌপদীকে সুদ্ধ প্রকাশ্য সভায় এনে লাঞ্ছনা করল কৌরবরা, আবার সেই দ্রৌপদীর কথাতেই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব ফিরিয়ে দিলেন ; আর একবার পাশা খেলে কৌরবরা ওঁদের তেরো বছরের জন্যে বনে পাঠালেন, বারো বছর এমনি বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস। সবই দেখল সে, ওর সামনে দিয়ে বনবাসে যাত্রা করলেন পাণ্ডবরা, যুধিষ্ঠির মুখে কাপড় চাপা দিয়ে গেলেন, দ্রৌপদী গেলেন নিজের চুলে মুখ ঢেকে—খালি পায়ে একবস্ত্রে হেঁটে গেলেন সকলে। তবু কিন্তু নমুচির তৃপ্তি হল না। এত কাণ্ড ক'রে এ কী হ'ল ? বনে গেল বটে—তবে বেশ সগৌরবেই তো গেল। প্রজারা সব হায় হায় করছে, কত লোক

ওদের সঙ্গে সঙ্গে বন পর্যন্ত গেল, তাছাড়া সবাই একসঙ্গে থাকবে যখন—এমন আর কী তুঃখ বোধ করবে! বাকী স্ত্রী যারা তারা তো ছেলেমেয়ে নিয়ে যে যার বাপের বাড়ি চলে গেল—সুখে-ভোগেই থাকবে। মা কুন্তী বিছুরের বাড়িতে থেকে গেলেন, তাঁরও যত্নের কোন ক্রটি হবে না! একটা যে কারও জন্যে তুশ্চিন্তা থাকবে—তাও তো মনে হচ্ছে না। 'এই জন্যেই কি এত কষ্ট করল নমুচি?

খুব মুষড়ে গেল সে। এতকাল ভেবে রেখেছিল পাণ্ডবদের সর্বনাশ দেখে তৃপ্ত হয়ে দূরে পাহাড়ে বা বনে কোথাও চলে যাবে—ভগবানের নাম ক'রে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা—কিন্তু এ সর্বনাশে সে-তৃপ্তি হ'ল না। ছেলেদের মৃত্যুর শোধ উঠল বলেও মনে করতে পারল না।

না, পাণ্ডবদের এতে এমন কোনো অনিষ্টই হ'ল না। বরং মূর্খ কৌরবগুলো বুঝতে পারল না—সর্বনাশ তাদেরই হ'ল। এই তের বছর পরে পাণ্ডবরা যখন ফিরবে তখন কি আর এ অপমান এ অনিষ্টের শোধ তুলবে না!

নমুচির আর পাহাড়ে জঙ্গলে যাওয়া হ'ল না। সে ইন্দ্রপ্রস্থেও ফিরল না, হস্তিনাতেই থেকে গেল। ঐখানেই জাত-ব্যবসা শুরু ক'রে দিল আবার। পাণ্ডবদের খবর রাখতে হলে এখন এদের কাছাকাছিই থাকা দরকার। তুর্যোধনের গুপ্তচর নিত্য খবর আনছে বন থেকে, সে খবর নমুচির পেতে কোন অসুবিধা নেই। পাণ্ডবদের শেষ না দেখে, স্ত্রী আর ছেলেদের অপঘাত মৃত্যুর দেনা উশুল না করে সে কোথাও নড়তে পারবে না, তা তার জন্যে যতদিনই অপেক্ষা করতে হোক করবে।...

দীর্ঘকালই রইল সে হস্তিনায়। তেরো বছর কাটল, পাণ্ডবরা এসে রাজ্য দাবী করলেন, কৌরবরা দিলেন না। যুদ্ধের তোড়জোড় হ'ল, যুদ্ধ বাধলও—কাছে থেকে সব দেখল নমুচি। ওর সুবিধেও হয়ে গেল খানিকটা, সৈন্যদের খাওয়ার জন্যে মাংস দরকার, অনেক নিষাদকেই সেকাজে নিযুক্ত করা হ'ল। নমুচিও চেষ্টা ক'রে একটা 'ঠিকা' সংগ্রহ করল। মাংস যোগান দেবার নাম করে যখন-তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে লাগল সে!

ফলে ভীষণ সেই লড়াইয়ের অনেকখানিই সে দেখল, হাজার হাজার লোক মারা গেল ওর চোখের সামনেই, কত রাজা মহারাজা যোদ্ধা, কত বীরপুরুষ, কত যুবা কত বালক! কিন্তু তাতেও কোন তৃপ্তি পেল না। এদের মৃত্যু তো

সে চায় নি। পাণ্ডবরা একজনও যদি ওর চোখের সামনে পড়ত—তবেই একটু শান্তি পেত সে। পাঁচজনই মারা যাবে কি পাণ্ডবপক্ষ হারবে—এমন দুরাশা তার ছিল না—তবু, যদি একজনও মরে, দৈবাৎ—এমন কি হতে পারে না? এই আশাতেই সে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ছিল। কিন্তু কিছুই হ'ল না, ওর চোখের সামনেই ভীমের গদার ঘায়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে দুর্যোধন রক্তবমি করতে লাগলেন—ওর শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে গেল।

তাহলেও কিন্তু সে সেখান থেকে যেতে পারল না। দুর্যোধন বেচারী আহত হয়ে পড়ে আছেন—নড়তে পারছেন না, তাঁকে জীবন্ত অবস্থাতেই শিয়াল কুকুর ছিঁড়ে খেতে আসছে—কোনমতে হাত তুলে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন এক একবার—আবার মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছেন। লোকটা বেঁচে আছে জেনেও পাণ্ডবরা কেউ একটা পাহারা দেবার লোক ব্যবস্থা করতে পারল না! আশ্চর্য নৃশংস মানুষ বটে! নমুচির মনে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে আক্রোশ আরও খানিকটা বেড়েই গেল।

সে অবশ্য কাছাকাছি ছিল, দুর্যোধন অপারগ হয়ে পড়লে সে নিজেই তাড়াত—তবে তার আগে কাছে যেতে সাহস হ'ল না। মহামানী রাজা দুর্যোধন, সামান্য নিষাদ একজন সাহায্য করতে চাইছে বা সহানুভূতি জানাচ্ছে শুনলে হয়ত অপমানেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। সুতরাং সে চুপ করেই বসে রইল।

কিন্তু খানিক পরে যখন অশ্বত্থামা, তার মামা কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা বলে একটা লোক দেখা করতে এল, আর সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন, অশ্বত্থামাও 'পাণ্ডব আর পাঞ্চালদের নিশ্চয় বধ করব' এই ভরসা দিয়ে চলে গেল—তখন আর 'মড়া-পাহারা' দিয়ে বসে থাকতে পারল না নমুচি, নতুন আশায় বুক বেঁধে অন্ধকারেই অশ্বত্থামাদের পিছু পিছু গেল।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পর রাত্রি গভীর হলে ওরা রথ থেকে নেমে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করতে লাগল। কৃপ ও কৃতবর্মা ঘুমিয়েই পড়ল—অশ্বত্থামা জেগে রইল শুধু। সকালের আগে কিছু করা যাবে না—এইটেই ওরা ধরে নিয়েছিল। নমুচি ওদের এই কাণ্ড দেখে বিষম বিরক্ত হ'ল, এত বড় বড় কথার এই পরিণাম! সকাল হলে দিনের আলোয় যুদ্ধ করে ওরা

পাণ্ডবদের হারাবে ! তবেই হয়েছে। 'হাতি ঘোড়া গেল তল—ব্যাঙ বলে ক'হাত জল !'

চলেই যাচ্ছিল সে—আবার কী ভেবে একটুখানি বসে রইল। সে ব্যাধ, শিকারের জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অন্ধকার রাতে ফাঁদ পেতে বসে শিকার ধরে—তার চোখ অন্ধকারে অনেক জিনিস দেখতে পায়। সেইখানে বসে বসেই সে দেখল গাছের মাথাতে একটা কালপেঁচা এসে কাকের বাসায় পড়ে ঘুমন্ত কাকগুলোকে মারছে একে একে ! দেখতে দেখতেই তার একটা মতলব মাথায় এল, সে অশ্বত্থামার কাছে এসে বসে চুপি চুপি বলল, 'ঠাকুর কই পাণ্ডবদের মারতে গেলে না ?'

চমকে উঠল অশ্বত্থামা, 'কে রে ? কে তুই ?'

'আমি কে তা জেনে তোমার লাভ কি হবে ? আমি কোন বদ মতলবে আসি নি, তাহলে আগেই সাবাড় করে দিতুম। সে কথা যাক, এখন যা বলছি শোন, তোমার এই যে চার পাশে এত কাকের পালক পড়ে আছে, তোমার মাথাতেও পড়েছে—এগুলো কেন পড়ছে বুঝেছ ?'

অশ্বত্থামাকে স্বীকার করতে হ'ল যে সে বোঝে নি।

'এই গাছের মাথাতে কাকের বাসা আছে। কাকগুলো ঘুমিয়ে ছিল, সেই ফাঁকে নিশ্চয় কালপেঁচা এসে তাদের মেরে খেয়েছে। পেঁচাকে শুধু শুধু জ্ঞানী বলা হয় না। ওর যুক্তি নাও। দিনের আলোয় লড়াই ক'রে তোমার বাবাই পাণ্ডবদের হারাতে পারেন নি, তুমি তো ছেলেমানুষ। এই রাত্রেই যাও ওদের শিবিরে, ঘুমন্ত পাণ্ডবদের বধ ক'রে এসো। এমন সুযোগ আর পাবে না, সবাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, সোজা শিবিরে ঢুকে যেতে পারবে।'

এই বলে, যেমন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে কাছে এসেছিল—তেমনি অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে গেল নমুচি।

এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। পাণ্ডবদের পায় নি অশ্বত্থামা, পাণ্ডবদের পাঁচ ছেলেকে, আর পাঞ্চাল দেশের বড় বড় বীর অনেককে মেরে দুর্যোধনকে গিয়ে খবর দিয়েছিল, ফলে মরবার আগে তবু একটু শান্তি পেয়ে গিয়েছিলেন রাজা দুর্যোধন।

নমুচিরও এবার শান্তি পাবার কথা। তার পাঁচ ছেলের বদলে পাণ্ডবদের

পাঁচ ছেলে গেছে। ওদের আর বংশই রইল না বলতে গেলে। এতদিনের পোষা আক্রোশ জুড়িয়েছে, প্রতিশোধ উঠেছে।

কিন্তু কে জানে কেন, নমুচি শান্তি পায় না। পাণ্ডবদের স্ত্রীরা হাহাকার ক'রে ক'রে কাঁদছে, পাণ্ডবরা, দ্রৌপদী সবাই আছড়ে পড়ে শোক করছে—এমন কি সমস্ত কুরু বংশ শেষ হয়ে গেল বলে কৌরবদের রানীরাও দুঃখ করছেন। সে কান্না যেন নমুচির দুটো কানে আগুন ঢেলে দেয়। এই প্রথম ওর মনে হয়—এত কাণ্ড ক'রে কী লাভটা হ'ল তার? এর ফলে কি ওর পাঁচ ছেলে ফিরে এল? না কি—এই যে বলতে গেলে সারা জীবন ধরে এই প্রতিহিংসা বয়ে নিয়ে বেড়াল, নিজের খাওয়া শোওয়া আরাম কোনদিকে তাকাল না, জঙ্গলী পশুর মতো জীবনযাপন করল—তারই কোন দাম উঠল? তাদের প্রাণ তো গিয়েই ছিল, ওর প্রাণটাও গেল—সুখ শান্তি আরাম কোনদিনই কিছু পেল না, আর কিছু পাবার আশাও রইল না। আর কি কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধতে পারবে? কেউ তো কোথাও নেই! আত্মীয় যা দুচার ঘর ছিল—তারা এখন কে কোথায় থাকে তার খবরও রাখে না সে। পাণ্ডবদের ছেলেরা ম'ল, তারা দুঃখ পেল ঠিকই—তাতে নমুচির কি লাভ হ'ল, সে কি পেল? সেদিনের সে জীবন কি আর ফিরে আসবে? এখন কি করবেই বা সে?

যতই ভাবে ততই যেন কেমন হতাশ হয়ে পড়ে। কিছুই ভাল লাগে না। যেদিকে দুচোখ যায়—শ্মশানের ছবিই চোখে পড়ে। শুধুই মৃতদেহ, তার কতক শেয়ালে শকুনিতে খেয়েছে, কতক বা এখনও টানা-ছেঁড়া করছে। চারিদিকেই কান্নার শব্দ, শোকের হাহাকার।

পুরো দুটো দিন না খেয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল নমুচি। ক্রমে বুঝল যে হিংসায় হিংসার শোধ ওঠে না; যা ক্ষতি হবার তা হয়েই যায়, প্রতিহিংসা নিতে গেলে অপরের হয়ত খানিকটা ক্ষতি করা যায়—তাতে নিজের কোন লাভ হয় না, আগের ক্ষতির পূরণ হয় না।···

শেষে আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল, 'রাজা আমার অপরাধের সীমা নেই, আমার বিচার করো, আমাকে বধ করো।'

সব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমাদের অপরাধের সীমা নেই, তোমার কি

বিচার করব ভাই! তুমি যা করেছ আত্মীয়শোকে বিহ্বল হয়েই করেছ। আত্মীয়শোক যে কী তা আমরা এখন বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। তুমি যাও, ভগবানকে ডাকো—তাহলেই শান্তি পাবে।'

নমুচি একে একে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—সকলের কাছেই গেল। কেউই তাকে বধ করতে রাজী হলেন না। অনেক প্রাণ নিয়েছেন তাঁরা—আর নয়। তখন সে গভীর জঙ্গলে চলে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইল এক জায়গায়—যদি কোন হিংস্র জন্তু দয়া ক'রে খেতে আসে। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, খাওয়া তো দূরের কথা—একটা বাঘ ভালুক কাছেও এল না। কদিন অপেক্ষা ক'রে থেকে হতাশ হয়ে আবার কুরুক্ষেত্রে ফিরে এল। তখন ওখানকার মৃতদেহ, দেহের টুকরো—শিয়াল শকুনে খেয়েও যেটুকু বেঁচেছে—জড়ো ক'রে করে কয়েকটা বড় চিতায় দাহ কবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এদিক ওদিক দেখে—কেউ না দেখতে পায় এইভাবে—তারই একটাতে সটান উঠে গেল। তার অনুতাপের জ্বালা এতই বেশী যে—আগুনের জ্বালাও তুচ্ছ মনে হল তার কাছে। নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে প্রাণ দিল সে, একটু একটু ক'রে সারা দেহটা পুড়ল তবু একটা শব্দ করল না বা পালাবার চেষ্টা করল না। এইভাবে প্রতিহিংসার প্রায়শ্চিত্ত করল নমুচি।

অনশন অস্ত্র

অনশন ধর্মঘট আমরা আজকাল প্রায়ই শুনি। অনশন মানে উপবাস। না খেয়েও একরকমের ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট মানে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম ছেড়ে বসে থাকা—এও সেইরকম, নিত্যকার খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করা।

এখন এটা বেশ অস্ত্রের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। প্রায়ই শুনতে পাবে—যেখানে-সেখানে যখন-তখন অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছে। তাতে কাজও হচ্ছে। কেউ কেউ বা শুধু ভয় দেখিয়ে, কেউ কেউ বা সত্যি শেষ পর্যন্ত না খেয়ে ম'রে—নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে নিচ্ছেন।

সে কথা থাক।

আমরা অনেকেই মনে করি এই অনশন ধর্মঘট শুরু হয়েছে—ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের আমল থেকে। বাস্তবিক আমাদের যতটুকু জানাশুনো তাতে সেই রকমই মনে হয়, কংগ্রেসই এটা শুরু করেন বা চালু করেন। প্রবলের অত্যাচার বন্ধ করার আর কোন উপায় যেখানে নেই, সেখানে দুর্বলের এই একটা ভাল হাতিয়ার।

কিন্তু তা নয়, এ ব্যাপারটা এদেশে বহু দিন থেকেই ছিল। হাজার বছর কেন—আরও প্রাচীন কাল থেকে। বিশেষ একসময় কাশ্মীরে এটা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে সেখানকার সরকারকে তখনকার দিনেই পুলিসের একটা বিশেষ বিভাগ রাখতে হয়েছিল এ জন্যে। এ কথা ওখানকার প্রাচীনকালের যে ইতিহাস, তাতে বহু জায়গাতেই আছে। যে কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যেই সাধারণ লোক বা দুর্বল যারা—তারা অনশন শুরু ক'রে দিত, বলে-কয়ে, সরকারকে জানিয়ে।

রাজার লোক এই সব উপবাসীদের ওপর নজর রাখত—সত্যিই কেউ উপোস করে মারা যাচ্ছে কিনা ; অথবা এরা যে সব অভিযোগের জন্যে উপোস করছে তার মূলে সত্যিই কোন অন্যায় বা অবিচার আছে, না—এরা মিছিমিছি একটা বাহানা জুড়েছে—তাই দেখবার জন্যে।

মহাত্মা গান্ধী নিজে উপবাস করতেন—উপবাসকে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করার জন্যে তত নয়, যতটা নিজেকে মানে নিজের মনকে শুদ্ধ করার জন্যে। মন থেকে হিংসা রাগ এসব দূর হ'লে মন নির্মল হবে, তখন সত্যকার পথ দেখতে পাওয়া সহজ হবে, যে পথে কাজ করা উচিত—ভেতরে ভেতরে হয়ত ঈশ্বরেরও নির্দেশ পাবেন। অনেক সময় এই কারণেই উপবাস করতেন।

কাশ্মীরের এক রাজাও একবার এই ধরনের উপবাস করেছিলেন।

বহুদিনের কথা অবশ্য—এখন থেকে প্রায় তেরশ বছর আগের ঘটনা।

চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা তখন কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন। খুব ধার্মিক এবং ন্যায়-পরায়ণ রাজা, খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী বলেও বিখ্যাত ছিলেন।

হঠাৎ একদিন চন্দ্রাপীড় খবর পেলেন এক ব্রাহ্মণ মহিলা কয়েকদিন ধরে উপবাস ক'রে আছেন। অন্ন তো দূরের কথা, একটু জল পর্যন্ত খাচ্ছেন না।

কী ব্যাপার—দ্যাখো দ্যাখো। রাজা বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমনি সাধারণ লোক উপবাস করে সে একরকম—এখানে এ ব্যক্তি একে ব্রাহ্মণ

তায় মেয়েছেলে—ইনি যদি উপবাস ক'রে মারা যান—একই সঙ্গে ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যার পাতক এসে পড়বে যে রাজার ওপর!

রাজা লোক এবং ডুলি পাঠিয়ে মহিলাটিকে সভায় আনালেন। রাজা ডাকছেন শুনে এলেনও ভদ্রমহিলা।

'কী অভিযোগ আপনার মা? আপনি উপবাস ক'রে আছেন কেন?'

রাজা হাত-জোড় ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন।

'মহারাজ, আমার স্বামী সেদিন বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে হত্যা ক'রে গেছে। মহারাজ, অকারণ ব্রহ্ম-হত্যায় রাজ্যের সর্বনাশ হয়। এটা কলিযুগ ঠিকই, তবু এখনও এক পোয়া ধর্মও তো আছেন! এ অন্যায়ের প্রতিকার না দেখে মরব না বলেই আমি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাই নি—এর প্রতিকার না হ'লে অন্নজলও মুখে দেব না। আমি আজ চার দিন উপবাসী আছি।'

রাজা আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'মা, আপনার স্বামীর সঙ্গে কারও কোন ঝগড়া বিবাদ—কি শত্রুতা ছিল?'

'মহারাজ, আমার স্বামী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কারও সম্বন্ধে কোন ঈর্ষা কি দ্বেষ পোষণ করতেন না, কদাচ মিথ্যা কথা বলতেন না। কিম্বা মিথ্যা-আচরণ করতেন না। তিনি নির্লোভ নিরহঙ্কার ও অনুদ্ধত ছিলেন। তাঁর চরিত্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো নির্মল—মেজাজ শ্বেত চন্দনের মতো স্নিগ্ধ শীতল ছিল।'

'মা, আমি এখনই আমার মন্ত্রীদের তাড়না করছি, অতি সত্বর এ বিষয়ে তদন্ত করে অপরাধীকে ধরে আনবার জন্য। আপনি শান্ত হোন।'

'পারবেন না মহারাজ।' ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন, 'কে হত্যা করেছে আমি জানি। পারবেন না তার কারণ—সে মহা ঐন্দ্রজালিক, ডাকিনী-তন্ত্র জানা লোক। তাকে ধরতে বা অপরাধ প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'ও, আপনি তাহ'লে জানেন কে হত্যা করেছে?'

'আমি চোখে দেখি নি, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই করেছে। সে লোকটা বাল্যে আমার স্বামীর সহপাঠী ছিল, লেখাপড়ায় বরাবর আমার স্বামীর কাছে হেরে গিয়েছে। বড় হয়ে—আমার স্বামী পণ্ডিত বলে ধার্মিক লোক বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাকে কেউ আমল দেয় নি। সে জন্যে তার

দারিদ্র্যও ঘোচে নি। সেই ঈর্ষাতেই সে জ্বলত, সেই জন্যেই সে ভোজবাজী ও ডাকিনীতন্ত্র শিক্ষা করেছে—যাতে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিজে উপস্থিত না থেকেও আমার স্বামীর প্রাণ নিয়ে নিতে পারে।'

'তার নাম?'

ব্রাহ্মণী নাম, ঠিকানা বলে দিতে রাজা সেইদিনই সে লোকটিকে ধরে আনালেন। কিন্তু সত্যিই সে মহাচতুর ও ধড়িবাজ লোক। সে বিস্তর সাক্ষী ডেকে প্রমাণ ক'রে দিল যে তার সহপাঠী ঐ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর দিন সে রাজধানী থেকে বহু দূরে এক মন্দিরে ছিল। স্বয়ং সেই মন্দিরের পুরোহিত সাক্ষী দিলেন।

রাজার দুশ্চিন্তার শেষ রইল না। এদিকে তাঁর রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা হয়েছে, স্ত্রী-হত্যাও প্রায় হয় হয়। এর কোন প্রতিকার না হ'লে তাঁর রাজা নামেই কলঙ্ক, এই সমস্ত পাপ বা অন্যায়ের দায় তাঁর ওপরই এসে পড়বে। আবার ওদিকে বিনা প্রমাণে ঐ বামুনটাকেই বা শাস্তি দেন কি ক'রে? লোকটাই যে এ কাজ করেছে তা তার মুখের চেহারা, চাউনির হিংস্রতা দেখেই বোঝা যায়—কিন্তু প্রমাণ তো চাই। বিশেষতঃ এ লোকটাও ব্রাহ্মণ।

কিছুতেই কিছু ভেবে না পেয়ে তিনি ত্রিভুবনস্বামীর মন্দিরে গিয়ে উপাসনা শুরু করলেন। যদি এই ঘটনার সুবিচারের কোন পথ না পান তো তিনি এ আসন থেকে আর উঠবেন না, প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করবেন।

এই ভাবে তিন রাত্রি কাটবার পর চতুর্থ রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু গরুড়বাহনে এসে যেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলছেন, 'কাল রাত্রে আমার এই মন্দিরের চারিদিকে বেশ পুরু ক'রে চালের গুঁড়ো বা সবেদা ছড়িয়ে দেবে, তারপর ঐ লোকটাকে বলবে এসে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে। যদি লোকটা সত্যিই খুনী হয়, প্রতিটি পায়ের ছাপে সাদা চালের গুঁড়ো কালো হয়ে যাবে—আর যদি না হয়, দেখবে সাদাই আছে।'

রাজা আসন থেকে উঠে এসে সেই ব্যবস্থাই করলেন।

পরিক্রমার প্রতি পদে কালির মতো কালো হয়ে উঠল সাদা চালের গুঁড়ো। অর্থাৎ ঐ লোকটাই যে হত্যাকারী তাতে কোন সন্দেহ রইল না।

শাস্তি অনেক রকমেই দিলেন রাজা চন্দ্রাপীড়। তবে ব্রাহ্মণদের তখন

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তাই প্রাণদণ্ড হ'ল না। যাই হোক, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে সে ব্রাহ্মণীও উপবাস ভঙ্গ করলেন।

লোকটি তার ডাকিনী সিদ্ধি প্রয়োগ করেও কোন প্রতিকার করতে পারল না। রাজা চন্দ্রাপীড় ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়েছিলেন—সেখানে সামান্য ডাকিনী কি করবে।

বুদ্ধির খেলা

এখন থেকে প্রায় তেরশো বছর আগে কাশ্মীরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। অল্প বয়সে রাজা হ'লেও তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা ও দূরদৃষ্টি ছিল খুব বেশী। যে জন্যে এতদিন পরেও লোকে তাঁকে মনে রেখেছে।

সেকালে রাজা বা জমিদাররা ছিলেন কতকটা স্বেচ্ছাচারী, তাঁদের কথার ওপর কারও কথা চলত না, যা খুশি তাঁরা করতে পারতেন। তার ফলে, কোনো ভাল লোক সৎ লোক রাজা হ'লে তাঁরা প্রজাদের অনেক কল্যাণ ক'রে যেতেন। ইতিহাসে সে রকম বহু রাজা বা জমিদারের নাম পাওয়া যায়; সব দেশে সব সময়ই এমন লোক ছিল। তেমনি বোকা বা অসৎ লোক এই ধরনের ক্ষমতা হাতে পেলে প্রজাদের দুঃখের শেষ থাকত না। বিশেষ এই ধরনের লোক গদীতে বসলেই বিস্তর মোসাহেব জুটে যেত, তারা মনিবের মিথ্যা গুণগান বা তোষামোদ করে নিজেদের নানা সুবিধা করে নিত—তবে ঐ কটি লোক ছাড়া বেশির ভাগ সাধারণ মানুষেরই খুব অসুবিধা হ'ত। প্রজারা সুবিধা তো পেতই না, উল্‌টে বহু দুঃখ, বহু নির্যাতন লাঞ্ছনা সইতে হ'ত তাদের।

অথচ, সে দুঃখের কথা কাউকে জানাবারও উপায় ছিল না। এখনকার মতো সভা-সমিতি ক'রে, মিছিল বার ক'রে খবরের কাগজে লিখে প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ ছিল না, পড়ে মার খেতে হ'ত বেচারাদের।

চন্দ্রাপীড় ছিলেন সৎ রাজাদের দলে। কারও কথা, বিশেষ তোষামোদকারী কর্মচারীদের কথা শুনে কোন কাজ করতেন না, সবদিক ভেবে চিন্তে বিচার

ক'রে—যা করা উচিত, ন্যায্য মনে হ'ত তাই করতেন। আর সব কাজেই—প্রজাদের কিসে ভাল হয়—সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতেন।

এহেন চন্দ্রাপীড়কে একবার এক সামান্য মুচি ভীষণ রকম জব্দ করতে এসেছিল—আর চন্দ্রাপীড় কিন্তু তাকেই জব্দ ক'রে ছেড়ে ছিলেন।

সেকালে রাজারা সিংহাসনে বসার পরই চেষ্টা করতেন—যাতে কিছু না কিছু কীর্তি রেখে যেতে পারেন। কেউ বেরিয়ে পড়তেন দিগ্বিজয়ে—লড়াই ক'রে অপর রাজাকে পদানত ক'রে নিজের গৌরব বাড়াতে চাইতেন। এই চন্দ্রাপীড়েরই পরের এক রাজা—ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় এই রকম ভাবেই বিখ্যাত হ'তে চেয়ে ছিলেন, যুদ্ধ করতে করতে বহুদূর এগিয়ে এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে, বহু দেশ ও বহু রাজাকে পদানত করেছিলেন।

আবার অনেকে, বেশির ভাগই, অন্য ভাবে—কেউ বা বড় বড় বাড়ি ক'রে, বড় বড় মন্দির মসজিদ গির্জা বানিয়ে, কেউ রাস্তাঘাট তৈরী ক'রে জলাশয় কাটিয়ে—নিজেদের নাম স্মরণীয় ক'রে রাখতে চাইতেন। যেমন ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই, এত বড় বড় প্রাসাদ করিয়েছিলেন যার খরচ শুনলে আজও আমাদের মাথা ঘুরে যায়। আমাদের শাজাহান বাদশাও ছিলেন এমনি, দিল্লীর লাল কিলা, জামি মসজিদ, তাজমহল, তখ্‌ৎ-এ-তাউস—তৈরী করিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছিলেন।

এ ঝোঁক অনেকেরই ছিল। প্রাচীনকালে—চার-পাঁচ হাজার বছর আগেও—মিশরের রাজারা কৃত্রিম পাহাড় গাঁথিয়ে ছিলেন পাথর দিয়ে—যাদের পিরামিড বলে—সেগুলোর মধ্যে তাঁদের সমাধি দেওয়া হত। স্ফিংক্‌স্ নামে পাহাড়ের মতোই উঁচু এক মূর্তি করিয়েছিলেন একজন—সেও পাথর দিয়ে গেঁথে গেঁথে ; এই সব পাথর বহুদূর থেকে আনাতে হত, সেইটেই তো সেকালের দিনে এক দুঃসাধ্য কাজ ছিল। এদেশে উড়িষ্যায় এক রাজা কুড়ি বছর ধরে কোণার্কের বিরাট সূর্য-মন্দির তৈরী করতে গিয়ে সম্পূর্ণ দেউলে হয়ে গিয়েছিলেন—মন্দিরের জঙ্ঘা বা ভিত করতেই ঐ সময় তাঁর অত টাকা চলে গেল বলে বাকিটা তৈরীই হয়ে উঠল না আর।

তেমনি আবার সম্রাট অশোক দিকে দিকে বৌদ্ধবিহার, স্তূপ, চৈত্য, রাস্তাঘাট করিয়েছিলেন। শেরশাহ বাংলা দেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত পাকা

সড়ক করিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সেই রাস্তার ওপরই তৈরী হয়েছে।

কাশ্মীরের রাজাদেরও নিয়ম ছিল—রাজা কেন রাণীরাও—গদিতে বসার পরই কিছু কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেন। যাঁর যা ইষ্টদেবতা, কেউ নারায়ণের, কেউ শিবের মন্দির করাতেন—আবার বৌদ্ধ রাজারা বিহার প্রতিষ্ঠা করতেন, যাতে ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা সেখানে থেকে পড়াশুনো ও তপস্যার সুযোগ পান।

এটা তাঁরা অবশ্য-কর্তব্য বলেই মনে করতেন। কিছু কিছু দীঘি পুকুর কাটানো বা অন্য কোন পুণ্যকর্ম যে না করতেন তা নয়—কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশী।

চন্দ্রাপীড়েরও রাজা হবার পর ইচ্ছা হল তিনি একটি মন্দির তৈরী করাবেন। ত্রিভুবন-স্বামী বা ভগবান (বিষ্ণুর) কেশবের মন্দির হবে। রাজার কাজ—দেরি হবার কারণ নেই। দেখতে দেখতে মন্দির কেমন হবে, কত বড়—সে নক্‌শা, পরিকল্পনা, খরচার বরাদ্দ সব ঠিক হ্‌ল, জায়গাটাও মোটামুটি একটা পছন্দ করলেন রাজা, কাজ শুরু করার হুকুম দেওয়া হ্‌ল।

এখন হয়েছে কি, জমি যেখানটায় ঠিক হয়েছিল—বড় মন্দির তো, অনেকখানিই জমি লাগবে—তার মধ্যে বেশিটাই খালি পড়ে থাকলেও, দু'একটা বসতবাড়িও ছিল। সামান্য লোকের সাধারণ বাড়ি—তারা রাজার কাছ থেকে মোটা ক্ষতিপূরণ আর অন্য জায়গায় ভাল জমি পেয়ে খুশী হয়েই বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেল, কেবল যেতে রাজী হ'ল না এক মুচি। সে বললে, 'কটা টাকার জন্যে বাস্তু ভিটে বেচব! এমন অভাবে এখনও পড়িনি। বাস্তুভিটে মায়ের মতো, তাঁকে বেচব কি, ছি!'

কতকটা সেই রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের মতোই—

"সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে, এমনি লক্ষ্মীছাড়া?"

মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন এঁরা। মুচির বাড়িটা এমনই জায়গায় যে, সেটুকু জমি না পেলে মন্দিরটা ঠিক পরিকল্পনামতো করা যায় না। এসব কাজে সৌষ্ঠবটাই বড়, চারকোণা জমির মাঝখানে মন্দির বসবে—চারটি কোণ থেকেই সমান দূরত্ব থাকবে—এই ভাবেই নকশা করা। এখন ঐ জমিটা

বাদ দিয়ে করলে, খাপছাড়া মতো হয়ে যাবে না ?

অনেকটা চেষ্টা করলেন পূর্তমন্ত্রী, রাজ-কর্মচারীরা দলে দলে গিয়ে মোটা মোটা টাকার লোভ দেখালেন। মুচির সেই এক কথা, 'ভিটে বাড়ি ছাড়ব না।'

অগত্যা তাঁরা রাজাকে জানাতে বাধ্য হলেন কথাটা।

অন্য কোন রাজার আমল হলে এসব হাঙ্গামা করতে হ'ত না। তাঁরাই মুচির ভিটেমাটি উচ্ছেদ ক'রে রাতারাতি তাড়িয়ে দিতেন। কিন্তু চন্দ্রাপীড় সে রাজা নন। এমন কোন কাজ তিনি করতেন না বা মন্ত্রী কি কর্মচারীদের করতে দিতেন না—যাতে কখনও কোন অনুতাপ করতে হয় বা নিজের কাছেই লজ্জা পেতে হয়। এ বিষয়ে কারও পরামর্শ বা উপদেশও শুনতে রাজী নন তিনি ; যা সত্য বা উচিত বলে মনে হবে তা করবেনই, আর তা-ই করবেন। বরং কর্মচারী বা পরামর্শ-দাতাদেরই বুঝিয়ে যুক্তি দিয়ে নিজের মতে বা সৎপথে আনতেন। ঐতিহাসিক কলহন ওঁর সম্বন্ধে এই কথায় ভারী সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন, 'হীরেকে অন্য কোন পাথরই কাটতে পারে না কিন্তু হীরে অনায়াসে অন্য পাথর কাটে।'

এই মুচির ব্যাপারেও রাজা কর্মচারীদেরই তিরস্কার করলেন। বললেন, 'তোমাদেরই অন্যায় হয়েছে। আগে থাকতে ওর সঙ্গে কথা না বলে, জমি পাবে কি না ঠিক না জেনে মন্দির তৈরি শুরু করলে কেন ?···যাও, যা হয়েছে হয়েছে··এখন ও জায়গা ছেড়ে অন্য ভাল জায়গা ঠিক করো গে যাও। আর যেখানটাই বাছো না কেন, পুরো জমিটা পাওয়া যাবে কিনা আগে জেনে নিয়ে তবে কাজে হাত দিও।'

অমাত্যরা তো অবাক। রাজার কি দেহে রাগ বলে কোন জিনিস নেই, ঐ সামান্য লোকটার এতখানি আস্পর্দ্ধাও অনায়াসে হজম করলেন ? লোকটাকে ডেকে একটা ধমক দিলেই কাজ হয়ে যেত—তা নয়, হুকুম দিলেন এতদিনের এত পরিশ্রম এত অর্থব্যয় সব নষ্ট ক'রে অন্য জায়গা দেখতে ! এ আবার কী রকম রাজা। এর জন্যে তাঁদের সুদ্ধ অপমান।

রাজা তাঁদের মুখ দেখে মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'দ্যাখো, আমরাই এ রাজ্যের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-কর্তা, নয় কি ? আমরাই যদি অন্যায়ের পথ ধরি, জোর ক'রে একজনকে তার ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ

কবি—আর কেউ কি আইনের দোহাই বা ন্যায়-অন্যায়ের দোহাই শুনবে? আমরা আইন তৈরী করেছি বলেই আমাদের বেশী ক'রে আইন মেনে চলা উচিত।

[যে সমস্ত রাজা বা সম্রাট ন্যায়পরায়ণতার জন্যে বিখ্যাত, তাঁদের সকল-কারই প্রায় এই ধরনের কথা ছিল। রাজর্ষি নওসেরোয়াঁ একবার বনের মধ্যে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। দেরি হয়ে গিছল বলে সেখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'ল। তা সেখানে ঐ শিকার-করা মাংস ঝল্‌সে খাওয়া ছাড়া উপায় কি? কিছু তো কিনে খাওয়া যাবে না। সেই ব্যবস্থাই হ'ল। কিন্তু খেতে বসে দেখা গেল অন্ততঃ একটু নুন দরকার, নইলে পোড়া মাংস খাওয়া যায় কি করে? কে একজন ছুটে গিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে এক-ঘর গরিব লোক থাকত, হয়ত বনরক্ষকের কাছেই চাকরি করে বেচারারা—তাদের কাছ থেকে একটু নুন চেয়ে আনল।

নওসেরোয়াঁ জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ নুনের দাম দেওয়া হয়েছে তো?'

কেউই ভালমতো উত্তর দিতে পারল না সে কথার। কারণ নুনটা অনেক হাত ঘুরে তবে সুলতানের সামনে পৌঁচেছে, আসল যে এনেছে সেই বলতে পারে দাম দেওয়া হয়েছে কিনা।

ঠিক-মতো উত্তর না পেয়ে নওসেরোয়াঁ হাত গুটিয়ে বসলেন। বললেন, 'দাম দেওয়া হয়েছে কিনা না জানলে এ নুন খেতে পারব না।'

একথা শুনে কে একজন অমাত্য অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'ভারি তো এক নুন—তার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? রাজা না হয় একটু নুন এমনিই চিমটি নিলেন, সবই তো রাজার।'

নওসেরোয়াঁ জবাব দিলেন, 'সব রাজার নয়—রাজা রক্ষক মাত্র। আর আমি যদি প্রজাদের কাছ থেকে এক চিমটি নুন এমনি নিই—আমার কর্মচারীরা তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নেবে। আমি রাজা, আমিই যদি ন্যায়ের পথে না চলি, অপরে চলবে কেন?'

শেষে, লোকটিকে ডাকিয়ে এনে, নওসেরোয়াঁর সামনে নুনের দাম মিটিয়ে দেওয়া হ'তে—তিনি তবে খেতে শুরু করলেন।]

যাই হোক—যতই আদিখ্যেতা মনে করুন আমলারা—রাজার কথার ওপর কিছু কথা চলে না। চুপ ক'রেই থাকতে হ'ল!

তবু তাঁরা তখনই হাল ছাড়লেন না, শেষবারের মতো বেয়ে-চেয়ে দেখবেন ঠিক করলেন। আবারও একদল লোক পাঠানো হল মুচির কাছে। তারা গিয়ে এবার অন্য পথ ধরল, টাকা-পয়সার নামগন্ধও করল না—শুধু বলল, তার ব্যবহারে রাজা খুব দুঃখিত হয়েছেন। তিনি অবশ্য তেমন লোক নন, জোর করবেন না এটা ঠিক, তবে খুবই অসুবিধা হ'ল তো—সেই জন্যেই আরও মন খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। আবার নতুন ক'রে সব শুরু করতে সময়ও নষ্ট হবে বড় কম নয়।

এইসব শুনে, ওঁরা জোর করবেন না শুনেই হয়ত, মুচির কি মনে হ'ল কে জানে, সে বলল সে রাজার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। তার যা বলবার তাঁকেই বলবে তাঁর কথাও শুনে আসবে।

এঁদের মধ্যে একজন ভুরু কুঁচকে একটু রাগের সুরেই বললেন, 'রাজা তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আর্জি জানাবেন? তোমার আশা আর আস্পদ্দা তো কম নয়।'

মুচিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'ভগবান রামচন্দ্র চণ্ডালকে আলিঙ্গন করে-ছিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির একটা সামান্য পথের কুকুরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাকে ছেড়ে স্বর্গে যেতেও রাজী হন নি। আমি কিছু চণ্ডাল বা কুকুরের চেয়ে হীন নই, আর আজা চন্দ্রাপীড়ও রামচন্দ্র কি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বড় নন।... আমি তাঁর রাজপ্রাসাদেও ঢুকতে চাই না, আমি ওঁর প্রাসাদের বাইরে দাড়াব, তিনি যদি দর্শনার্থী প্রজাকে দেখা দেওয়া কর্তব্য মনে করেন তো—বেরিয়ে এসে দেখা দেবেন।'

এই বলে মুচি তখনকার মতো রাজার আমলাদের বিদায় দিল। তারপর—পরের দিন সকালে স্নান ক'রে চন্দনের ফোঁটাতিলক লাগিয়ে ওরই মধ্যে একটু বাসি-করা কাপড় পরে প্রাসাদের সিংহদ্বারের বাইরে হাত জোড় ক'রে গিয়ে দাঁড়াল।

রাজা তাঁর অমাত্য আর সচিবদের কাছে এ সব কথাই শুনেছেন। এ কথা তাঁকে না জানিয়ে উপায় ছিল না বলেই ভয়ে ভয়ে বলতে হয়েছে। মাথাটাথা চুলকে, অনেকবার ঢোঁক গিলে কোনমতে বলে ফেলেছেন। যে মানুষ, আবার সে মুচির কাছে যাওয়া হয়েছে, কেউ কেউ ধমকধামকও করেছে—একথা শুনলে হয়তো কঠোর তিরস্কার করবেন, একেবারে চাকরি

খেয়ে দেওয়াও আশ্চর্য নয়।

যাই হোক, রাজা তো বেরিয়ে এলেন।

'কী চাই বাপু তোমার?' শুধোলেন তিনি।

'আজ্ঞে, আমার তো কিছু চাই না। শুনলুম আপনিই আমার ভিটেটুকু চান। সেইজন্যেই আপনার কাছে এসেছি, এসব কথাবার্তা আমলাদের দিয়ে চালানো ঠিক নয় বলে নিজেই এলুম।'

রাজা বললেন, 'তোমার ভিটে তো আমার শখের জন্যে নিচ্ছি না, ভগবান কেশবের মন্দির তৈরী করব বলেই চাইছি। এ তো সৎ কাজ, পুণ্যের কাজ, তুমি এতে বাধা দিচ্ছ কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে একজন কর্মচারী বলে উঠলেন, 'ও বাড়িই তোমার এত ভাল লাগছে—ওর থেকে হাজার গুণে ভাল বাড়ি আমরা তোমাকে দিতে পারি। যা দেখলে তাক্ লেগে যাবে তোমার!'

মুচিটি একটু মুচকে হেসে হাত জোড় ক'রে বলল, 'মহারাজ, আমি অমার মনের কথা, মনের দুঃখও বলতে পারেন—আপনার কাছে জানাতে এসেছি। আপনি আমাদের পিতৃতুল্য। বাপ-বেটায় যেখানে কথা হচ্ছে সেখানে এই সব আমলাদের নাক গলাবার দরকার কি? আমার কথাটা আপনাকে জানাই, তারপর আপনার যা আদেশ আপনার মুখ থেকেই শুনব।'

এই বলে একটু থেমে আবার বলল, 'মহারাজ, মানুষ যখন জন্মায় তখনই কর্ণের সহজাত কবচের মতো ভগবান তাকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বা বোধ দিয়ে দেন। এই সহজ প্রবৃত্তিই নিজেকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের যা কিছু তাও—রক্ষা করার প্রেরণা যোগায়।

'আপনার অনেক অলঙ্কার, ভাল ভাল কাপড় আছে সত্য—আমাদের সম্বল শুধ্ এই দেহটা, কিন্তু এর দামও আমাদের কাছে কম নয়। এর জন্যে আমরা বেশী গর্বিত, কেন না এই দেহটাই খেটেখুটে আমাকে খাওয়াচ্ছে। আপনার ঐ সব আভরণ-হীরেমুক্তোর দ্বারা এক পয়সাও উপার্জন হয় না। ঠিক তেমনিই—আপনার কাছে এই প্রাসাদ যেমন—আমাদের কাছে ঐ শুয়োরের খোঁড়ের মতো মাটির ঘরও তেমনিই প্রিয়। জানলা বসানোর সামর্থ্য নেই, একটি ছোট্ট ঘুলঘুলি ভরসা, তা দিয়ে না আসে আলো না আসে হাওয়া, দরজা নেই, বাঁশের আগড় দিয়ে শুতে হয়—তবু ঐ 'বাতল'ই আমায়

মায়ের মতো জন্মকাল হ'তে শীতগ্রীষ্মের কষ্ট থেকে, হিম-রৌদ্র-বর্ষা থেকে রক্ষা ক'রে এসেছে, বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিজের ভিটে থেকে উচ্ছেদের কষ্ট—রাজার রাজ্য হারানো কি দেবতাদের স্বর্গচ্যুত হওয়ার থেকে কিছু মাত্র কম নয় মহারাজ।'

বলতে বলতে গলা ভারি হয়ে এল মুচির। সে একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তবু, শুনছি ঐ ঘরটুকুতে মহারাজের খুবই প্রয়োজন। আপনার ইচ্ছা হলে দিতেই হবে। সেক্ষেত্রে যদি অনুগ্রহ ক'রে মহারাজ আমার সেই—পর্ণকুটিরও নয়—মানুষ-থাকার-গর্তে—আমার 'বাতলে' আপনার পায়ের ধুলো দেন এবং প্রার্থনা করেন তাহ'লে আতিথ্য ধর্মের নিয়ম অনুসারে অতিথিকে তুষ্ট করার জন্য তা নিশ্চয়ই দেব।'

চারিদিক থেকে একটা নিঃশ্বাসের শব্দ উঠল, সবাই যেন একসঙ্গে শিস দিয়ে উঠলেন।

একটা সামান্য মুচির এত বড় স্পর্ধা! এত দুঃসাহস! লোকটা বলে কি! রাজা যাবেন তার ঘরে প্রার্থনা জানাতে—ভিখিরীর মতো! বলল কী ক'রে কথাটা! নাঃ, একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার!

মন্ত্রী ও কর্মচারীদের এতই রাগ হ'ল, এমনই অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা যে, সেই একটা শব্দ করা ছাড়া কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না।

কিন্তু তাঁদের আরও অবাক ক'রে দিয়ে রাজা ধীর শান্ত ভাবে বললেন, বেশ চলো, এখনই যাচ্ছি।'

'এ আমি জানতাম মহারাজ!' মুচি ও'কে আর এক দফা নমস্কার করে হেসে বলল, 'এই জন্যেই ভগবান আপনাকে রাজা করেছেন, এই বোকা লোকগুলোকে করেন নি।'

চন্দ্রাপীড় ওর কুটির বা 'বাতলে'র কাছাকাছি গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে একাই গেলেন ঘরের দরজা পর্যন্ত। সত্যিই গর্তের মতো একটা জায়গা—সেখানে রাজার ঢোকা সম্ভব নয়। তবু হয়ত কোন মতে গুঁড়ি মেরেও ঢুকতেন কিন্তু মুচিই সে পরীক্ষা থেকে তাঁকে রেহাই দিল, সেইখানে দরজার সামনে মাটির ওপর পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বলল, 'মহারাজ, আমি কৃতার্থ। আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, এত বড় ধৃষ্টতা আমার

সত্যিই নেই যে আপনাকে দিয়ে যাচ্ঞা করাব। আমি কথা দিচ্ছি, সাত-দিনের মধ্যেই এ ঘর ছেড়ে আমরা চলে যাব, আপনার মন্দির তৈরির কোন অসুবিধা হবে না।'

রাজা হাতে ক'রে টাকার থলি নিয়েই এসেছিলেন—সোনার মোহর কতকগুলি—এবার সেটা এগিয়ে দিতে গেলেন।

মুচি যেন সাত হাত পিছিয়ে গিয়ে এতখানি জিভ কেটে বলল, 'না মহারাজ, ঐটি পারব না। মাকে বিক্রী করব না, সে তো আগেই বলেছি। অতিথি-সৎকার অন্য কথা। আপনি অতিথি, তায় রাজ-অতিথি—আপনাকে আমার এই পর্ণকুটির—দান বলার আস্পদ্দা আমার নেই—নিবেদন করছি, আপনি গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করুন।'

রাজাকে উনি করবেন দান! এ হ'ল কি? কলি কি সত্যিই ঘোর হয়ে এল!

যে-সব অমাত্য-আমলারা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন। রাজা না থাকলে তলোয়ারের এক কোপে ওর মাথাটা কেটে নিয়ে ওর ঐ জিভটা কুকুর দিয়ে খাওয়াতেন তাঁরা!

কিন্তু রাজা এতটুকু রাগ করলেন না কি বিচলিত হলেন না বরং বেশ খুশী-খুশী মুখেই বললেন, 'স্বস্তি! তোমার দান আমি গ্রহণ করলুম। কিন্তু বৎস, দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথি রাজা—এঁদের দান বা পূজা যা-ই বলো, নিবেদন করলে কিছু দক্ষিণাও দিতে হয়, তা জানো তো? এবার তাহলে আমাকে দক্ষিণাটা দাও!'

এইবার—এই প্রথম মুচির পো সত্যিই বিপদে পড়ল।

একবার ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলল, 'দক্ষিণা! তাই তো মহারাজ, ঘরে যে একটি কানা-কড়ি পর্যন্ত নেই। থাকার মধ্যে আছে কখানা কাঁচা চামড়া, আর সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি। আর দু'একখানা রান্নার বাসনও হয়ত বেরোবে খুঁজে দেখলে, কিন্তু সে আমাদের ব্যবহার করা, উচ্ছিষ্ট—এর তো কোনটাই আপনাকে দেওয়া যাবে না!'

'বেশ, তাহলে আমার আর একটি প্রার্থনা পূর্ণ করো—তাহ'লেই আমাকে দক্ষিণা দেওয়া হবে।'

'বলুন, বলুন মহারাজ!' মুচি ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'দয়া ক'রে—প্রার্থনা

বলবেন না—আদেশ করুন, সাধ্যে কুলোলে অবশ্যই পালন করব। যদি আমার প্রাণ দিতে বলেন, হাসিমুখে এখনই তা দেব।'

'উঁহু। অত কিছু নয়। আমার প্রার্থনা—এই টাকার থলিটা তুমি গ্রহণ করো, তাহলেই আমি দক্ষিণা পেয়েছি মনে করব। এই সকলের সামনেই স্বীকার ক'রে যাব।'

এই প্রথম একেবারে চুপ হয়ে গেল মুচি। বেশ কিছুক্ষণ তার মুখে কোন কথা সরল না। শুধু তাই নয়, তার দুই চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে, কথা বলার মতো ক্ষমতা হতে বলল, 'আমি হেরে গেলাম মহারাজ। তবে আপনার কাছে হার মেনেও সুখ আছে!···আজ বুঝলাম, কেন আপনার এত নাম। আপনার জয় হোক, মহারাজ আমি সামান্য লোক, তবু বলছি, যতদিন এই পৃথিবী থাকবে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য আমাদের আলো দেবে ততদিন আপনার সুনাম করবে লোকে, আপনার সুখ্যাতি করবে।'

বাঁদীর মেয়ে

নাসের মিঞা সেদিন মাঠ থেকে সকাল করেই ফিরেছিলেন। ফি শুক্রবারেই তিনি এই সময় ফেরেন—জুম্মার নামাজ পড়তে হয়, মাঠে বড় অসুবিধা। তাছাড়া এই সময়টা পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি নামাজ পড়েন। মাঠে তা সম্ভব নয়। হ'তে পারে আজ তাঁর অবস্থা খারাপ—তা ব'লে তাঁর ঘরের মেয়েছেলেরা মাঠে যাবে নামাজ পড়তে, এ আজও তিনি ভাবতে পারেন না।

নাসের উঠানে এসে ডাকলেন, 'রাবেয়া!'

কোথায় রাবেয়া?

একটু বিস্মিতই হলেন নাসের মিঞা। রাবেয়ার তো কোন দিন সময়ের হিসাব ভুল হয় না। নিয়মের ব্যতিক্রম তার স্বভাবের বাইরে। অন্যদিন সে তাঁর ভাত মাঠে নিয়ে যায়—দ্বিপ্রহর বেলায়। সূর্য মধ্যগগনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই দূর আলের পথে রাবেয়ার সাদা শাড়িপরা মূর্তিটি দেখা যায়

ভাতের পুঁটুলিটি নিয়ে আলের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। অবশ্য জুম্মাবারে ভাত নিয়ে যেতে হয় না—কারণ নাসের ঐ দিন সকাল ক'রে বাড়ি ফেরেন —নামাজ শেষ ক'রে ভাত খান। তা'হলেও এই শুক্রবারগুলোতেও রাবেয়ার আচরণ একেবারে সূর্যের আহ্নিকগতির মতোই বাঁধা থাকে। গাড়ুতে ক'রে ওজুর জল, গামছা নিয়ে সে এই দাওয়ায় সিঁড়িতে অপেক্ষা করে। এলেই হাতে পায়ে জল ঢেলে দেয়, গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে দেয়। তারপর দাওয়াতে পাটি বিছিয়ে দেয় নামাজ করার জন্য। ততক্ষণে বিবিরা এবং বাড়ির অন্য পরিজন সবাই এসে যায় প্রস্তুত হয়ে।

কিন্তু আজ কি হ'ল ?

অসুখ করল নাকি রাবেয়ার ?

আরও একটু গলাটা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রাবেয়া—এই রাবেয়া ?'

স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন বড়বিবি—দৌলত।

'ওকি ? রাবেয়া তোমার ওজুর জল দেয় নি ? কোথায় গেল সে ? দাঁড়াও আমিই আনছি।'

দৌলত ছুটে গিয়ে জল, গামছা নিয়ে এলেন।

ছোটবিবি আমিনা এলেন পাটি নিয়ে। বাকী সবাইও যথারীতি দেখা দিতে শুরু করল।

'কিন্তু রাবেয়ার হ'ল কি ? তার কি অসুখ-বিসুখ করল নাকি ?'

'কী জানি। ওরে কে আছিস ছ্যাখ্ না রাবেয়া কোথায় ?'

নাসের মিঞা একবার উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রোদ সরে গেছে বহুদূর। নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আর কথা না ক'য়ে নামাজে বসলেন। বাকী সকলে তাঁর দেখাদেখি শুরু করল নামাজ।

রাবেয়া কিন্তু তখনও এল না। .

নাসের মিঞা বোধ হয় মন দিয়ে সেদিন ঈশ্বরকেও ডাকতে পারেন নি। রাবেয়ার জন্য সত্যই চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি—উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

সাধারণত নামাজ শেষ ক'রেই তিনি ভাত খেতে বসেন—কিন্তু সেদিন সে

নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। উঠেই সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। দৌলত ও আমিনা, তাঁর দুই বিবিই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমিনা বললেন, 'আপনি খেতে বসুন, আমি দেখছি।'

দৌলত বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অসুখ ক'রে থাকে আমি দেখছি। তুমি অত উতলা হও কেন। সামান্য একটা বাঁদীর জন্য—'

ললাটে তাঁর বিরক্তির ভ্রূকুটি।

কিন্তু নাসের কোন কথায় কান দিলেন না। অন্তঃপুর গিয়ে সোজা দাসীদের মহলে চলে গেলেন।

মহল অবশ্য নয়—মহলের পরিহাস। কিন্তু সবাই অভ্যাসবশতঃ তাই বলে বিরাট দুটো আটচালায় কয়েকখানা ক'রে ঘর। একটা তাঁর কাছারী বাড়ি—দৌলত বিবি ঠাট্টা ক'রে বলেন, দরবারী মহল। আর একটা অন্দর বা হারেম। হারেমের দুপাশে ছোট ছোট চারটি খোপের মতো ঘরে থাকে ঝি-রাঁধুনি ইত্যাদি। তাকেই বলা হয় বাঁদী-মহল।

এককালে এই সবেই অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা। পঙ্খের কাজ করা দেওয়াল ও পাথরের মেঝে ; তাতে পাতা থাকত বুখারার গালিচা। কিন্তু সেসব আজ স্মৃতি। স্মৃতি বলাও ভুল, কারণ কোনটাই নাসেরের মনে পড়ে না। সবটাই শুধু লোকমুখে শোনা—শ্রুতি বলাই ঠিক।

আজ মসনদ নেই, রাজত্বও নেই। এমন কি জমিদারীও নেই। সাধারণ সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ, এই তাঁর পরিচয়। ছিটে-বাঁশের দেওয়ালে মাটি লেপা, খড়ের চালা—এইখানে আজ তাঁকে জীবন কাটাতে হচ্ছে। মাটির মেঝেতে পা দিতে পারেন না ব'লে পেটা চুনের মেঝে ক'রে নিয়েছেন। বর্ষাকালে চুন লেগে পায়ে ঘা হয়ে যায়। নাসেরকে তাঁর বিবিরা আজও শাহ্‌জাদা বলে কিন্তু বাইরে সকলকার কাছেই তিনি আজ শুধু বড়মিঞা। মুনিব-চাকর সকলকার কাছেই।

তা হোক—নাসের তাতে বিচলিত নন। মসনদ সুদূর, সে পথও দুর্গম এবং কণ্টকাকীর্ণ, সে পথে যাবার জন্য তিনি ব্যস্ত নন মোটেই। তাঁর ভাগ্যেই তিনি সন্তুষ্ট। কী হবে অশান্তির মাঝে গিয়ে—নিজের এবং নিজের আত্মজনের জীবন বিপন্ন ক'রে ? তার চেয়ে এই শান্তির মাঝে, প্রকৃতির এই অবারিত মুক্ত প্রমোদকাননে—পাখীর ডাকে, ফুলের গন্ধে দু-বেলা

হুমুঠো মাছভাত খেয়ে দিন কেটে যায়—এই তাঁর ভালো। শাহী রক্ত তাঁর ধমনীতে বুঝি একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এর চেয়ে বেশী কোন আশা তাঁর নেই—এর চেয়ে বেশী আরাম তিনি চান না এমন কি উচ্চাশার মোহে ভুলে সিংহাসনের ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে না পড়ে যে এখানে এসে এই সামান্য জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন ওঁর মা—সেজন্য তিনি মার কাছে কৃতজ্ঞ।

নাসের বাঁদীদের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলেন, 'রাবেয়া! এই রাবেয়া!'

ও মহলের বারান্দা থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দৌলত দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, 'আদিখ্যেতা!' তিনি আর দাঁড়ালেন না, পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন।

নাসের সাড়া না পেয়ে রাবেয়ার ঘরের সামনে এসে চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে যেতে এখনও তাঁর বাধে। বাঁদীদের ঘরে যাওয়ার আইন নেই তাঁদের।

'রাবেয়া!'

ধড়মড় ক'রে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রাবেয়া।

'জনাবালি—জনাব এখানে!' অতি কষ্টে অস্ফূট-কণ্ঠে উচ্চারণ করে রাবেয়া।

পনেরো ষোল বছরের ছিপছিপে মেয়ে রাবেয়া। উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ—তবে দৌলত কি আমিনা—এমন কি নাসের মিঞার পাশে দাঁড়ালেও কালো বলে মনে হয়। মুখশ্রীও এমন কিছু অসাধারণ নয়। কিন্তু সে মুখের গঠনে কোথায় একটা করুণ মাধুর্য আছে, শান্ত আত্মনিবেদনের ভাব আছে—যা দেখলে পুরুষের চিত্ত স্নেহার্দ্র হয়ে আসে। আর তার চোখ হুটি বড় সুন্দর। টানা টানা আয়ত চোখে যেন সুদূরের স্বপ্নাঞ্জন মাখা। হাসিতে তা শত দীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—কান্নায় তা নীল সরোবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে রাবেয়া এখন এসে দাঁড়াল তার চোখে অবশ্য নীল সরোবরের আভাস নেই—এখন তা হুটি রক্তোৎপল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ অবিশ্রাম কান্নায় চোখ লাল হয়ে উঠেছে, চোখের কোণগুলো পর্যন্ত ফুলো ফুলো।

'ও কি রে রাবেয়া? কাঁদছিলি? কী হয়েছে? অসুখ করেছে? বড়বিবি বকেছে? তাই পড়ে পড়ে কাঁদছিস? আমার আসার কথাও মনে

ছিল না তোর—এমন কি দুঃখ পেয়েছিস রে?'

আরও কাছে এসে ওর মাথায় হাত রাখলেন নাসের মীঞা।

রাবেয়া তখনও কান্নার বেগ সামলাতে পারে নি। তখনও সে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে।

কোন মতে, কষ্টে সে বললে, 'অপরাধ হয়ে গেছে জনাব, মাফ করুন।'

'তা তো করব। কিন্তু কী হ'ল বল দিকি।'

রাবেয়া নিরুত্তর। প্রাণপণে সে কান্নার বেগ সম্বরণ করছে। এ কি লজ্জা, ছি ছি। কোন রকমে সহজ হ'তে পারলে যেন বাঁচে সে।

'কি হ'ল বল না রে। ছাখ, আমি এখনও খাই নি।'

চমকে ওঠে রাবেয়া। ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'এখনও আপনার খানা দেয় নি। চলুন, আমি যাচ্ছি—'

সে ছুটেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালেন নাসের, 'উঁহু, বল্ আগে কী হয়েছে—'

'সে ছেলে-মানুষী, সে শুনলে আপনি হাসবেন, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আমাকে যেতে দিন। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এ যে বিকেল হয়ে গেল। কখন খাবেন আপনি? সেই কখন নাস্তা ক'রে বেরিয়েছেন—নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে আপনার।'

'তা হোক্। তুই বল আগে। নইলে ছাড়ব না। যত ক্ষিদেই পাক আমার।'

অসহায় ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চায় রাবেয়া। ওধারের দাওয়ায়, উঠানে—বহু কৌতূহলী চোখ। কোন চোখে কৌতুক, বিদ্রূপ, কোন চোখে ঈর্ষা।

রাবেয়া সামান্য বাঁদী—তার প্রতি মালিকের এ মনোযোগ—অস্বাভাবিক না হ'লেও কৌতুকপ্রদ বৈকি।

রাবেয়া মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বলল, 'ভোরবেলা বড় বিশ্রী স্বপন দেখেছি।'

'খোয়াব দেখেই এমন মাথা খারাপ হয়ে গেল—সে আবার কী খোয়াব রে?' হেসে ওঠেন নাসের মিঞা।

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রাবেয়া। মাথাটা আরও হেঁট হয়ে যায়। কোন

মতে বলে, 'স্বপন দেখেছি যেন বিস্তর ফৌজ এসেছে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। কারা কারা সব এসেছে যেন, তাদের জমকালো পোশাক, ঘোড়া হাতি—কত কি! তারা যেন আপনাকে ধরে নিয়ে চলে গেল—এই বাড়ি খালি পড়ে, আর আমি—আমিও পড়ে রইলাম।'

নতুন কান্নার বেগে শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট গোলমেলে হয়ে পড়ে।

এবার হা-হা ক'রে হাসেন নাসের মিঞা।

'তা ঘুম ভেঙে উঠে কি দেখলি? লোকে লোকারণ্য? সেনা-সামন্তে মাঠ ভরে গেছে একেবারে? দূর পাগলি—স্বপ্ন তো আর সত্যি নয়—স্বপ্ন স্বপ্নই। তা নিয়ে এত মন খারাপ করার কি আছে?'

'তবে যে—তবে যে বড়বিবি বলেন, ভোরের খোয়াব সত্যি হয়।'

'দূর পাগ্‌লী। তাই কখনও হয়। আমি যে আজ ভোরে খোয়াব দেখেছি যে আমি রাজা হয়েছি। চল্ চল্—যত সব বাজে ঝামেলা!'

নাসের মিঞা উঠানে নেমে এলেন।

চোখ মুছতে মুছতে রাবেয়াও এল তার পিছু পিছু।

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও নাসের মিঞা কিন্তু অন্যমনস্ক হয়েই রইলেন। এমন কি খাওয়ার সময় দৌলতবিবি মুখ অন্ধকার ক'রে সামনে বসে থাকা সত্ত্বেও তিনি তা লক্ষ্যই করলেন না। অথচ দৌলতবিবিকে তিনি একটু সমীহ ক'রে চলেন, তা সবাই জানে। আর তার কারণও আছে। নাসের মিঞার বাবা যখন মারা যান তখন নাসেরের বয়স মাত্র তিন বছর। সে দুর্দিনে বান্ধব বলতে ওঁদের কেউ ছিল না গোটা প্রাসাদে। বরং দুশমনই ছিল চারিধারে। রাজাদের জ্ঞাতিই হ'ল শত্রু, রাজত্বের বিঘ্ন—উন্নতির পথে কণ্টক। সেদিন তাঁকে নিয়ে সেখানে বাস করলে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো কঠিন হ'ত। তাই অনেক ভেবে ওঁর মা সেই শিশুপুত্রকে কোলে ক'রে এক অন্ধকার রাত্রে পিছনের পথ দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন—এবং রাতারাতি ছিপ নৌকায় বহুদূর পালিয়ে আসেন। সেদিন সঙ্গে ক'রে ধনরত্ন আনতে পারেন নি বেশি—লোকজন তো নয়ই। মাত্র জনাদশেক বিশ্বস্ত সেবক ছিল সঙ্গে, আর পুরোনো এক দাসী। সে-ই ছিল নাসেরের ধাত্রী। সুতরাং সেদিন রাজধানী থেকে বহুদূরে না পৌঁছনো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি নাসেরের মা।

যে দুর্দিনে এখানে ওঁদের আশ্রয় দেন দৌলতের বাবা। শুধু আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—সদাচরণই করেছিলেন। সাধারণ আশ্রিতের মতো করুণার সঙ্গে ব্যবহার করেন নি—মহামান্য অতিথির মতোই সম্মান দেখিয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাতে নাসেরের মা তাঁর চার বৎসরের পুত্রের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ দিয়ে বিপুল ঋণ খানিকটা পরিশোধ করেন।

তারপর থেকে দৌলতের বাবাই হন ওঁর অভিভাবক। এই ঘর বাড়ি—জমি জমা সবই তাঁর দেওয়া। যদিও আমরণ তিনি ওকে 'শাহজাদা' বলেই সম্বোধন ক'রে গেলেন—এবং কখনও ওঁর সামনে বসতে পারলেন না, হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়েই কথা ব'লে গেলেন—কিন্তু দৌলত তাঁকে ভয় করতেন না কোন দিনই, খেলার সাথীকে স্বামী ব'লেও খাতির করতে পারেন নি। বরং কথায় কথায় তাঁকে ধমকই দিতেন। তাঁর মুখ অন্ধকার দেখলে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়াই নাসেরের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ তিনি এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন যে দৌলতের অন্ধকার মুখও তাঁর চোখে পড়ল না—তেমনি চোখে পড়ল না সপত্নীর উষ্মায় আমিনার চোখে কৌতুকের হাসি! তিনি খেয়েই চললেন—নিঃশব্দে, কতকটা অভ্যাসবশেই।

কথাটা রাবেয়াকে বলেছেন হাসতে হাসতে—কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সেটা তাঁর কানে বেজেছে।

তাঁর স্বপ্ন আর রাবেয়ার স্বপ্নে কোথাও একটা মিল আছে বুঝি; রাজা হ'লেও তাঁকে নিয়ে যেতে লোকলস্কর আসতে পারে—রাজরোষে পড়লেও তাই। সৈন্য-সামন্ত এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে পারে—চরম সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্য—দুই কারণেই। তাহ'লে, তাহ'লে কি—

পরক্ষণেই মনে মনে নিজেকে বিদ্রূপ ক'রে ওঠেন নাসের মিঞা। আজও ঐ মোহ গেল না, আশ্চর্য! উচ্চাশা থাকা ভালো তা তিনিও জানেন, যদি সে উচ্চাশার পেছনে উদ্যম থাকে। এ শুধুই মোহ।...যদি দৈব কোন অনুগ্রহ করে, এই বৃথা আশা। কিন্তু তা হবার নয়। ইলিয়াস শাহী বংশের সূর্য অস্ত গেছে—নতুন বংশ, নতুন রক্ত এসে দখল করেছে সে গদি।...আর যদি ইলিয়াস শাহী বংশই থাকত, তাতেই বা কি? তাঁর জন্মের পরে ঐ বংশের বহু সুলতান গদীতে বসেছে, আরও বসতে পারত বাধা না পেলে—

ওঁর কথা কোনদিনই উঠত না। ওঁর কিসেরই বা দাবি ?

অকস্মাৎ দৌলতের উচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাঁর চিন্তার সূতো যেন একটানে ছিঁড়ে যায়।

দৌলতবিবি বলছেন, 'তোমার এখন বয়স হয়েছে। ঐ ছুঁড়িটা তোমার মেয়ের বয়সী। তার ওপর বাঁদী। ওর সঙ্গে অত বাড়াবাড়ি করা কি উচিত ? চাকর-বাকর কিষেণ মজুররা পর্যন্ত হাসাহাসি করে। তোমার লজ্জা-সরম না থাকে, আমার তো আছে। আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !'

ভাত খেতে খেতে বিহ্বলের মতো মুখ তুলে তাকান নাসের মিঞা, 'কী হয়েছে, তুমি কার কথা বলছ ?'

'কার কথা আবার বলব। ঐ বাঁদীটার কথা ! ওর আস্পদ্দা তুমি দিন দিন বাড়িয়েই তুলছ। ওর সঙ্গে অত কথা কিসের তোমার ? ওকে অত প্রশ্রয় দেবারই বা কি দরকার ?'

নাসের মিঞার পাঠান রক্ত নিমেষে মাথায় চড়ে যায় আজ। কঠিন কণ্ঠে বলেন, 'বাঁদীদের বিয়ে করা তো আমাদের বংশে নতুন নয় দৌলতবিবি!'

দৌলতের মুখ অরুণ-বর্ণ হয়ে উঠল। তিনিও সমান দম্ভের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ—তা অবশ্য ঠিক। বাঁদী-বান্দা না হোক রাস্তার লোক ধরে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আমাদের বংশেও হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে কেনা বাঁদী —বাঁদীর মেয়ে, ছি !'

নাসের মিঞার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। তিনি হেসে ফেললেন। বললেন, 'বাঃ, এই যে অস্ত্রটি ছেড়েছ দেখছি। তোমার বাবার ভাতের খোঁটা দেওয়াই তো তোমার চরম অস্ত্র। কায়খসরুর তীর।...কিন্তু ওগো বেগম-সাহেবা—আমার মা তোমার বাবার ভিক্ষার অন্ন খান নি। নেই নেই ক'রেও তাঁর সঙ্গে যা জহরৎ ছিল তাতে তোমার বাবার মতো জোত-জমা তিনবার কেনা যেত।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌলত উত্তর দেন, 'কিন্তু আমার বাবা না থাকলে সে ধনদৌলত আর তোমাকে ভোগ করতে হ'ত না—পথেই মেরে দিত চোর-ডাকাতে। আমার বাবাই তো কেড়ে নিতে পারতেন।'

নাসের বললেন, 'কিন্তু তুমি কি ঐ মেয়েটাকে হিংসে করো দৌলত ?'

'ছি! তার আগে যেন আমার গলায় দেবার মতো একগাছা দড়ি

জোটে। কিন্তু লোকে কি বলে।'

নাসের বললেন, 'লোকের কথা শুনতে খুব অভ্যস্ত নই, দৌলত। তুমি না হয়ে অপর কেউ হ'লে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে শাহী বংশে আমার বয়সে দু-দশটা মেয়ে মানুষ রাখা আশ্চর্যও নয়, নতুনও নয়। সে ইচ্ছা থাকলে ওকে আমি এমনিই গ্রহণ করতে পারতুম, ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ সে অধিকার আমার আছে, নিকা এমন কি সাদী করলেও কেউ ঠেকাতে পারত না। কিন্তু সেকথা এখন উঠছে না,—মেয়েটা আমাকে সত্যিই ভালবাসে! তাতেই যদি আমি ওকে একটু পক্ষপাত দেখাই—সেটা কি খুব অন্যায়!'

ঠোঁট বেঁকিয়ে দৌলত বললেন, 'ভালবাসা না ছাই! মনিবের সোহাগ নেবার জন্যে অভিনয়।'

'সব ভালবাসাই হয় তো অভিনয়। সে কথা ভাবতে গেলে পৃথিবীতে বাঁচা যায় না বিবি, সে ভাবতে বসলে মরদরা পাগল হয়ে যেত। তাছাড়া আমার পঞ্চাশের উপর বয়স হ'ল—অভিনয় চেনবার মতো অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে বৈকি!'

দৌলত আবারও কি বলতে গেলেন—গামছায় হাত মুছতে মুছতেই হাত তুলে নাসের বললেন, 'থাক। যথেষ্ট হয়েছে। ও কথা খতম করো।'

দৌলত গুম্ খেয়ে বসে রইলেন। নাসের উঠে গিয়ে দাওয়ায় বসলেন।

অপরাহ্নে দাওয়ায় চেটাই বিছিয়ে তার ওপর ফরাস পাতা হ'ত! তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকতেন নাসের মিঞা, গ্রামের দু'চারজন সমবয়সী ভদ্রলোক সেই সময় এসে জুটতেন একে একে। খোসগল্পও চলত—কারোর ঝগড়া বিবাদ থাকলে সেই সময় সালিশীও চলত।

আজও অভ্যাসবশত এসে শুয়েছেন, চাকর এসেছে একজন পা টিপতে—এমন সময় প্রায় ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে এলেন তাঁর গোমস্তা ফরিদ মিঞা।

'জনাবালি শুনেছেন?'

'কী ব্যাপার! ব'সো ব'সো—অত হাঁপাচ্ছ কেন?'

'গৌড়ের খবর শুনে এলুম হুজুর। এই মাত্র দয়াশঙ্কর বাগচির নৌকো এসে লেগেছে ঘাটে। তিনি সোজা আসছেন গৌড় থেকে।'

'তা তো বুঝলুম কিন্তু খবরটা কি? অত দৌড়বার মতো কি হ'ল?'

বললেন কতকটা নির্লিপ্ত উদাসীনের মতোই কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরটা যেন কি এক আশা, আগ্রহ এবং উদ্বেগে ধড়ফড় করতে লাগল। এ ধরনের অনুভূতি ইতিপূর্বে তাঁর কোন দিন হয় নি।

ফরিদ মিঞা কিন্তু তখনও দম নিতে পারে নি। অনেক কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতেই বললে, 'সেই কাফেরটা নির্বংশ হয়েছে হুজুর, একেবারে শেষ! সুলতান সামসুদ্দিন আহ্‌মেদ আর নেই!'

'সুলতান মারা গেছেন?'

'খতম। ওরই দুই বান্দা—শাদী খাঁ আর নাসির খাঁ—বড্ড নাই দিয়েছিল ওদের বোকার মতো, ইদানীং ওরা বড় বড় ওমরাহ্‌দের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটত একেবারে—তাদের হাতেই জান দিয়েছে উজবুকটা! দুজনে মিলে খোড়কুঁচি ক'রে কেটেছে।'

'খুন হয়েছেন? সুলতান খুন হয়েছেন!'

'খুন বলে খুন! একদম যাকে বলে বেঘোরে খুন হওয়া! আরে যদি সত্যিকারের সুলতানের বংশে জন্ম হ'ত তাহ'লে বুদ্ধি-সুদ্ধিও থাকত কিছু। যারা তিনবার ক'রে ইমান পালটায় তাদের কি কোন আক্কেল থাকে? ও ভেবেছিল যে এরা আমার খুব পেয়ারের লোক, এরাই আমাকে রক্ষা করবে। এই ভেবে দেখিয়ে দেখিয়ে ওমরাহ্‌দের সামনে ওদের মাথায় তুলত। তার ফল ফলল এবার। যে রক্ষক সে'ই ভক্ষক!'

'এমন তো চিরদিনই হয়ে এসেছে ফরিদ! আমাদের বংশেই কি তা হয় নি? জোর যার মাটি তার। আওরৎ আর জমিন—যে যত দিন পারে ভোগ করতে ততদিনই তার। যাক্ তাহ'লে নতুন সুলতান কে হবেন? শাদী খাঁ না নাসির খাঁ?'

'ওরা মতলব করেছে হুজুর দুজনে মিলে চালাবে। ওদের আবার বুদ্ধি দেখুন!'

'যাকগে—।' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেন নাসের, 'যে যা খুশি করুক। ওদেরই আবার হয়তো একজন আর একজনকে মারবে। না মারে তাতেই বা কি—আমরা বহুদূরে আছি ফরিদ। গৌড়ের মসনদ আর এই গাঁ—দুয়ের মধ্যে অনেক ফারাক। গৌড় বহুদূর!'

'তা কি বলা যায় জনাব। পুরুষের নসীব কে বলতে পারে। ইলিয়াস

শাহী বংশে এখন আপনিই জ্যেষ্ঠ।'

'ও হো হো!' কেমন একটা জোর দিয়ে হেসে ওঠেন নাসের, 'তুমি বুঝি তাই ভাবছ! আরে ওরা না থাকে নতুন বংশ গজাবে। বড় বড় আমিররা রয়েছেন, বড় বড় সিপাহ-সালাররা—তাদের হাতে টাকা, তাদের হাতে লোকজন। গরীব নিঃস্ব নাসের মিঞার কথা কারও মনে পড়বে না। আর মনে না পড়াই ভালো, মনে পড়লেই বরং ভয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে যে ইলিয়াস শাহীর এক ফোঁটা রক্ত থাকলেই মসনদের দাবিদার থাকবে। ও শেষ ক'রে দেওয়াই ভালো। নাও, তুমি এখন আদায় উশুলের কথা বলো—'

রাত্রের সন্ধ্যার পর পুরুষরা বিদায় নিলে রাবেয়া এসে পায়ে তেল মাখাতে বসল। অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে তেল মাখিয়ে গেল রাবেয়া। অন্যদিন মালিক আর বাঁদী এইসময় দুজনে অনেক গল্প করে—ছেলে-মানুষী নানা রকমের গল্প। কিন্তু আজ কোন এক কারণে দুজনেই স্তব্ধ। রাবেয়ার মুখ বন্ধ করেছে একটা সঙ্কোচ। আর নাসের অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছেন আকাশপাতাল।

অনেকক্ষণ পরে নাসের আস্তে আস্তে ডাকেন, 'রাবেয়া!'

চমকে ওঠে রাবেয়া, 'জনাব!'

'কাছে আয়। বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দে।'

রাবেয়া কাছে এসে বসে। অল্প তেল দিয়ে বুকটা মালিশ করতে থাকে।

নাসের সস্নেহে ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখেন।

'রাবেয়া, আচ্ছা ধর্ আমি যদি কোনদিন রাজা হই? তোর আনন্দ হবে না?'

চমকে কেঁপে ওঠে রাবেয়া। সে কম্পন নাসের সুদ্ধ অনুভব করেন।

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক কণ্ঠে রাবেয়া উত্তর দেয়, 'হবে বৈকি জনাব, হবারই তো কথা!'

'রাবেয়া তুই আমাকে তো ভালবাসিস। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে ছুঁয়ে মিছে কথা বললে তার অনিষ্ট হয় তা জানিস? হিন্দুরা অন্ততঃ তাই বলে।'

হঠাৎ হাতটা ওঁর বুকের ওপর থেকে টেনে নেয় রাবেয়া—কতকটা নিজের

অজ্ঞাতসারেই। হেসে উঠে নাসের বলেন, 'তার মানে তুই আমার সঙ্গে মিছে কথাই বলছিলি! কিন্তু কেন রে– আমি যদি রাজা হই, তাহলে তোর ভয় কি?...খবরদার, আমার কাছে মিছে কথা বলিস নে, খুলে বল্।'

রাবেয়া চুপ করে থাকে। নীলসরোবরে আবার জোয়ার আসে, দু'চোখ আসে ওর ছলছলিয়ে। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'আপনি সুলতান হয়ে গৌড়ে গেলে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলব জনাব।...আপনার এই পা দুটি সেবা করতে না পারি তো আমার জীবনে আর রইল কি?'

দূর পাগলী। আমি যদি গৌড়ে যাই তো তোকে কি ফেলে যাব? তোকেও নিয়ে যাব।'

'সে হয় না জনাব। গৌড়ের প্রাসাদ আমরা কল্পনা করতে পারি না। সেখানের হারেমে কত সুন্দরী বাঁদী। কত আমিরের মেয়ে আপনার সেবা করার জন্যে লালায়িত হবে। শুনেছি কোন্ দূর হিস্পানী দেশ, কুর্দিস্তান, আর্মানী দেশ থেকে বাঁদী আসে। সেখানে আমার কোন প্রয়োজন থাকবে না জনাব।'

'আমার চোখে রাবেয়াই বেশী সুন্দরী।'

'চেরাগের আলোতেও রোসনাই হয় জনাব—যতক্ষণ না সুরয ওঠে।'

'আচ্ছা আমাকে তুই এত ভালবাসিস কেন রাবেয়া। আমি তো বুড়ো —তোর বাপের বয়সী।'

'তা তো কোনদিন ভেবে দেখি নি। একটু একটু ক'রে যেমন জ্ঞান হয়েছে এই পা-দুটিই জীবনের সবচেয়ে বড় কামনার জিনিস ভেবেছি।'

'বেশ তো, তাই যদি হয় আমি তোকে বিয়ে করব। তুই হবি আমার বেগম—রাবেয়া বেগম। তখন তোরই কত বাঁদী থাকবে।'

'তাতেও আমার লোভ নেই জনাব। আমার বাঁদী থাকবে সত্যি কিন্তু আমি যে চাই আপনার বাঁদী হয়ে থাকতে।...না জনাব, সেখানে আপনার অনেক বেগমের একজন হয়ে আপনার বদলে হীরে জহরৎ নিয়ে ভুলে থাকতে আমি চাই না। বছরে হয়তো একদিন আপনার দেখা মিলবে কি মিলবে না। সেখানে এই পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার মতো অনেক ভালো হাত তপস্যা করবে—সেখানে আপনি আমাকে মনে রাখবেন এমন অসম্ভব আশা আমি করি না।'

'তুই আমার বেগম হ'তেও রাজী নস ? তাহ'লে আমি যদি কোনদিন গৌড়ের তখ্‌ত্‌-এ বসি তুই কি করবি ?'

'এখানে খালি বাড়িতে আপনার ঐ জুতো জোড়া নিয়ে দিন কাটাব। গৌড়ের রাজপ্রাসাদের সুখ-সৌভাগ্যে আমার কোন লোভ নেই জনাব।'

'তাই তো, ভাবিয়ে দিলি। আচ্ছা যদি আমি হুকুম করি ?'

'আমি বাঁদী—হুকুম করলে তা তামিল করতে হবে বৈকি।'

আহত কণ্ঠে নাসের বললেন, 'তুই বাঁদী—এতদিনে কি এই পরিচয়ই তোর দাঁড়িয়েছে। আমি তোকে 'বাঁদী' বলে ভাবি ?'

মাথা হেঁট ক'রে রাবেয়া বলে, 'তা ভাবেন না বলেই তো সাহস ক'রে এত কথা বলতে পারলুম জনাব। আর যদি কখনও সে সৌভাগ্যের দিন আসে, সুলতান হয়ে গৌড়েই আপনি চলে যান—তো সেদিন সেই সাহসেই আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেব আমার স্বাধীনতা—আর এই বাড়ি, আমার এই সুখস্বর্গ।'

নাসের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই যা রাবেয়া, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

দুরাশা নেই নাসেরের কোন কালেই। গৌড়ের মসনদ নিয়ে তিনি কোন দিনই মাথা ঘামাননি। দু'দিনের চিত্তচাঞ্চল্য তাই ঠিক দু'দিনেই চলে গেল। আবার প্রতিদিনের মতো তিনি মাঠে মাঠে চাষের তদারক ক'রে, প্রজাদের ঝগড়া মিটিয়ে, দাবা খেলে—সুখে এবং শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন। গৌড় বহুদূর, সে সব কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে লাভ কি ?

কিন্তু সত্যি-সত্যিই একদিন খবর এসে পৌঁছল—বিরাট এক শাহী ফৌজ এই দিকেই আসছে ! লোক-লশ্‌কর, হাতী-ঘোড়া—সে বিরাট ব্যাপার।

বিরাট ব্যাপার তাই ধীরে ধীরেই চলে। যারা দেখেছে তারা সাতদিনের পথ দু'দিনে এসে খবর দেয়।

আশা নিরাশায়, আনন্দে ও ভয়ে নাসেরের বুক কাঁপে। ছেলেদের মুখ ওঠে শুকিয়ে অথচ অস্পষ্ট কোন এক লোভে চোখ দুটোও জ্বলে। সামনে বিপুল বিপর্যয় সন্দেহ নেই। হয় এসপার নয় ওসপার। হয় তখ্‌ত্‌ নয় তো মৃত্যু ! এ দুটোর মধ্যে অন্য কোন পথ নেই।

রাবেয়া কিন্তু এবার কাঁদে না। কলের পুতুলের মতো প্রাতিদিনের কাজ ক'রে যায়—কোথাও এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে না। নাসের মিঞাও তার আচরণে কোন গলদ পান না—কিন্তু তবু তিনি একটা অস্বস্তি অনুভব করেন। পাষাণের মতো ভাবলেশহীন রাবেয়ার মুখ—কিন্তু চোখ দুটি যে স্তম্ভিত কান্নায় রক্তোৎপল হয়ে উঠেছে তা তিনিও লক্ষ্য করেন।

অবশেষে একদিন প্রত্যুষে গ্রামের প্রান্তে অগ্রবাহিনীর ছাউনি পড়ল। গৌড়ের সাতজন সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত আমির এলেন ঘোড়ায় চেপে, সঙ্গে একটি সুসজ্জিত হাতী—তাতে সোনার শূন্য হাওদা।

নাসের মিঞা প্রশান্ত মুখে বাইরের দাওয়ায় বসেছিলেন ফরাস বিছিয়ে। যদি মরতে হয় তো ইলিয়াস শাহের পৌত্রের মতোই মরবেন। ভয় যেন না প্রকাশ পায় তাঁর ভঙ্গিতে বা আচরণে—ভয় কিংবা প্রাকৃত-জনোচিত কোন বিস্ময়!

আমীরের দল দূরে মাঠের মধ্যেই ঘোড়া থেকে নামলেন। কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে এলেন সামনে—তারপর সামনের ফরাসে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'গৌড় বাংলার ন্যায়সঙ্গত সুলতানের কাছে আমাদের বহুত বহুত সালাম। জাঁহাপনা, গৌড়ের তখ্‌ত্‌ থেকে বেইমানের চিহ্ন তাদেরই রক্তে ধুয়ে গেছে। সে তখ্‌ত্‌ আজ খালি। পুণ্য-শ্লোক ইলিয়াস শাহের পৌত্রকে আজ আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তাঁরই ন্যায্য মসনদে। অনুগ্রহ ক'রে চলুন সম্রাট।'

নাসের মিঞা বিচলিত হলেন না—আনন্দ প্রকাশ করলেন না। বস্তুত কোন ভাবই ফুটল না ওঁর মুখে। তিনি শুধু পুত্রকে ইঙ্গিত করলেন—আতর আর পান দিতে। মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো তাঁর কর্তব্য।

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন, 'শাদী খাঁ নেই তা শুনেছি—নাসের খাঁও তাহ'লে নেই।'

'না জাহাঁপনা—সেও তার এক বান্দার হাতে প্রাণ দিয়েছে। এখন আর কোন বাধা নেই—আপনি চলুন আপনার পাওনা বুঝে নিতে।'

'কিন্তু আপনারাই তো রয়েছেন। আপনারা থাকতে আমি আর কেন? আপনারা কেউ বসলেই ঠিক হ'ত না কি?'

'কী বলছেন। ইলিয়াস শাহের পৌত্র প্রপৌত্ররা জীবিত থাকতে আমরা

বসব তাঁর সিংহাসনে ?'

'কিন্তু তাঁর সিংহাসনে যখন ভাতুড়িয়ার কাফের জায়গীরদার এসে বসেছিল তখন আপনারা তো কেউ প্রতিবাদ করেন নি ! বরং সাহায্য করেছিলেন। এমন কি জৌনপুরের মোল্লার দল এসে যখন তাকে উচ্ছেদ করতে গিয়েছিল তখন আপনারাই তাকে সলা-পরামর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন। জালালুদ্দিনের পরও বহুকাল কেটে গিয়েছে—কই আপনারা তো এতকাল ইলিয়াস শাহের তখ্‌ত্‌ তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে দেবার জন্যে ব্যস্ত হন নি।'

আমীরের দল নতমুখে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন ধীরে ধীরে বললেন, 'আমরা ঠিক এর জন্য দায়ী নই জাহাঁপনা, যদিচ আমাদের পিতা-পিতৃব্যের প্রাপ্য তিরস্কার মাথা পেতে নিতে বাধ্য। আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি মহানুভব, আমাদের ক্ষমা করুন। হাতী প্রস্তুত—চলুন জাহাঁপনা। আমরা সবাই আপনার সামনে আল্লার নাম নিয়ে শপথ করছি, আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে ইলিয়াস শাহের তখ্‌তে আর কাউকে বসতে দেব না। আপনার শাহী রক্ষা করতে আমরা জান দেব। চলুন জনাব।—'

নাসের তবু অবিচলিত।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আপনারা বহুদূর থেকে এসেছেন, আগে আতিথ্য গ্রহণ করুন বিশ্রাম করুন। আমিও কথাটা ভেবে দেখি।'

ভেবে দেখার প্রস্তাবে ওমরাহ্‌রা একটু বিস্মিতই হলেন।

গৌড়ের সিংহাসন যেচে এসেছে এক সামান্য চাষীর কাছে। এখনও ভেবে দেখার কিছু আছে নাকি ?

ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরে নাসের হাসলেন। বললেন, 'ভেবে দেখা দরকার বৈকি ! ভালো করেই ভেবে দেখতে হবে খাঁ খানান রহমতুল্লা, আপনাকেই সোজা-কথাটা বুঝিয়ে বলি। আপনিই এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। এখানে আমার সিংহাসন নেই, অগণিত দাসী চাকর নেই। সোনার থালায় খাবার আসে না। কিন্তু এখানে শান্তি আছে। নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন আছে। সোনার থালার খাবার একজনকে দিয়ে চাখিয়ে নিতে হয়, তাতে বিষ আছে কিনা—কাঁসার থালায় নিজের চাষের ভাত নিশ্চিন্ত মনে আহার করতে পারি। সুখ ও শান্তি একদিকে আর একদিকে প্রাচুর্য, বিলাস এবং

অশান্তি। কিসের বদলে কি পাচ্ছি একটু ভেবে দেখা দরকার নয় কি?'

ওমরাহরা নিরুত্তর রইলেন। তাঁরা দয়া ক'রে একজনকে সিংহাসনে ডেকে নিতে এসেছিলেন—এখন যেন মনে হচ্ছে তাঁরাই অনুগ্রহ-প্রার্থী।

শরবৎ এসে পৌঁছল। উৎকৃষ্ট আখের গুড়ের শরবৎ, লেবুর রস দেওয়া। নিজের হাতে শরবতের ঘটি এগিয়ে দিলেন নাসের মিঞা।

মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ ক'রে দৌলতের ঘরে আসতেই তিনি অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কি ঠিক করলে?'

নাসের ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে তাকালেন, 'দাঁড়াও, কাল সকাল পর্যন্ত সময় নিয়েছি। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ভেবে দেখি—'

দৌলত বলে উঠলেন, 'এতে এত ভাববার কি আছে তাই তো বুঝি না। ন্যায্য প্রাপ্য—তোমার পিতৃ-পিতামহের সিংহাসন, সেই পাওনা বুঝে নেবে। তাতে ভাবার কি আছে। গৌড় বাংলার জনসাধারণ ন্যায়ত তোমার প্রজা—তাদের প্রতিও তোমার একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য তোমার পিতৃঋণ।'

নাসের বললেন, 'দৌলত, মানুষের যখন যেটা সুবিধা হয় সেইটেকেই সে অনায়াসে কর্তব্য বলে খাড়া করে। তাতে বিবেককে ঘুষ খাওয়ানো হয় কিন্তু তাকে ঠকানো যায় কি?'

তারপর একটু কঠিনভাবেই বললেন, 'কিন্তু সে কথা ঠিক তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসি নি। ভেবেছিলুম তোমার কাছে একটু শান্তি, একটু বিশ্রাম পাব। কিন্তু দেখছি আমি ভুল করেছিলুম।'

'আমি তোমার স্ত্রী। তোমাকে ন্যায়ের পথে, গৌরবের পথে চালিত করা আমার কর্তব্য। স্ত্রীর কাছ থেকে তোষামোদ আশা ক'রো না। তার জন্য তোমার ঢের বাঁদী আছে।'

'হ্যাঁ—সেইখানেই যাব। আমার ভুল হয়েছিল দৌলত।'

নাসের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—এবং মুহূর্তমাত্র কোনদিকে না তাকিয়ে কারও দিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে, সোজা রাবেয়ার ঘরের সামনে এসে ডাকলেন, 'রাবেয়া!'

রাবেয়া মালিকের খাওয়ার পরই নিজের ঘরে চলে এসেছিল। এটুকু নাসেরের চোখ এড়ায় নি। এখন দেখলেন তাঁর অনুমানই ঠিক—

রাবেয়া পাষাণমূর্তির মতো তার শয্যায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, চোখ দুটি নিরুদ্ধ কান্নায় জবা ফুলের মতো লাল। প্রথম ডাক তার কানেই যায় নি।

নাসের এবার চৌকাঠের মধ্যে ঢুকে ডাকলেন, 'রাবেয়া !'

চমকে, প্রায় লাফিয়ে উঠল রাবেয়া।

'এ কী জনাব—এখানে না, এখানে না। ছি ছি, এ যে আপনার বাঁদীর ঘর। আমি যাচ্ছি, দয়া ক'রে আপনি বেরিয়ে চলুন।'

'উঁহু', দৃঢ় কণ্ঠে ঘাড় নাড়েন নাসের, 'যাব বলে আসি নি রাবেয়া, তোর কাছেই এসেছি। আজ আমার বিশ্রাম পাবার মতো আর কোন জায়গা নেই। যেখানেই যাচ্ছি সিংহাসন তাড়া ক'রে আসছে। সবাই আমাকে রাজা করতে চায়, সকলে যেন লুব্ধ, হিংস্র হয়ে উঠেছে। বারবাক—আমার বড় ছেলে তো স্পষ্টই বলে দিল যে—আমি যদি না যাই তো সে তার হক্ ছাড়বে না। একটু যে কোথাও নিভৃতে ভাবব, সে স্থানও আমার নেই। তাই এখানে এলুম রাবেয়া—'

রাবেয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, 'কিন্তু এখানে যে থাকতে নেই আপনার জনাব। কে কি ভাববে বলুন তো। আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আপনি অন্য কোথাও চলুন।'

নাসের ততক্ষণে এগিয়ে এসে ওর বিছানায় বসে পড়েছেন। ওর একটা হাত ধরে টেনে নিজের পায়ের কাছে বসিয়ে বললেন, 'জানিস আজ আমি গৌড়ের সুলতান। আমি যেখানে যাই সেইটেই আমার ঘর। নে, বোস, পায়ে হাত বুলিয়ে দে।'

রাবেয়া আর প্রতিবাদ করলে না। নীরবে নতমুখে বসে ওঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নাসেরও অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সহসা রাবেয়ার মাথাটা নিজের হাঁটুর ওপর চেপে ধরে জোর করে ওর মুখটা তুলে ধরলেন। ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে ডাকলেন, 'রাবেয়া—তুই অন্ততঃ আমায় গৌড়ের তখ্‌ত্‌ নিতে পরামর্শ দিবি না ? তুই বলবি না ওখানে যেতে !'

ঠোঁট দুটো কাঁপল অনেকক্ষণ ধরে রাবেয়ার। তারপর কণ্ঠস্বর ফুটল, 'কেন বলব না জনাব। বলাই তো উচিত। এ আপনার হক। তা ছাড়া আপনার প্রজারা, ইলিয়াস শাহী সুলতানের প্রজারা বহুদিনের কুশাসনে

তিক্তবিরক্ত, আপনার মতো লোকের শাসনই তাদের দরকার। বন্ধুর কল্যাণে নিজের সুবিধাও ত্যাগ করা উচিত আপনার।'

'তুইও এই কথাই বলছিস?'

'আপনি তো জানেন জনাব—আপনার কাছে মিছে কথা আমি বলি না।'

'বেশ—তা হ'লে আর একটা সত্য কথা বল। আমি যদি গৌড়ে যাই তুই আমার সঙ্গে যাবি তো?'

রাবেয়া নিরুত্তর।

'বল—উত্তর দে। সত্যি কথা বল—নির্ভয়ে।'

রাবেয়া স্থির কণ্ঠে বললে, 'না।'

'রাবেয়া—তুই তো আমাকে ভালবাসিস—আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?'

'ভালবাসি ব'লেই পারব জনাব। চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যেতে পারব না—তার চেয়ে দূরে বসে আপনার কথা ভাবব। সে ঢের ভাল।'

নাসের ভ্রূকুটিবদ্ধ নেত্রে একদৃষ্টে সামনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে রইলেন। ঘরের মধ্যে নিঃসীম স্তব্ধতা, দুজনের দ্রুত-নিঃশ্বাসের শব্দ দুজনে শুনতে পাচ্ছেন। বাইরে রাজ-অতিথি-সৎকারের কোলাহল যেন দূরশ্রুত সাগর গর্জনের মতোই ওদের কাছে সুদূর হয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পরে নাসের বললেন, 'আমি যদি তোকে বিয়ে করি রাবেয়া?'

'আপনার করুণার সীমা নেই তা আমি জানি। কিন্তু আমার অপরাধ বাড়াবেন না—আমি বাঁদী, বাঁদীর মেয়ে, সেই আমার একমাত্র পরিচয় থাক্।'

নাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আমার মন স্থির হয়ে গেছে রাবেয়া—এবার আমার শাস্তি।'

রাবেয়া যেন নিমেষে পাগল হয়ে উঠল। সে হাঁটু গেড়ে বসে সবলে ওঁর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'কি মন স্থির করলেন জনাব—আমাকে বলে যেতে হবে!'

নাসের আবার বসলেন।—বাইরের দাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রী ও পুত্রের দল। কিন্তু ওদের তিনি চিনে নিয়েছেন, ওদের মতামতের জন্যে তিনি ব্যস্ত নন।

বসে পড়ে রাবেয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তামাম দুনিয়ার রাজগীর চেয়ে একটিমাত্র হৃদয়ের রাজগী অনেক বড় রাবেয়া। আমার খুদা অন্ততঃ

আমাকে তাই বলেন।'

আরও, আরও জোরে ওঁর পা দুটো রাবেয়া বুকের ওপর চেপে ধরে। চোখে তার জল নেই, সমস্ত জল যেন রক্ত হয়ে শিরাগুলি পূর্ণ ক'রে তুলেছে।

অস্পষ্ট, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে বলে, 'আপনি আমাকে ভালবাসেন জনাব —এত ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ—বাসি রাবেয়া। আমাকেও তো এত ভাল কেউ বাসে না। আজ এই বয়সে আমি এ রত্ন হারাতে রাজী নই রে—দুনিয়ার সব জহরতের বদলেও না!'

'আমি—আমি যাব আপনার সঙ্গে জনাব।' বিহ্বল ভগ্ন-কণ্ঠে বলে রাবেয়া।

'বাঁচালি—আঃ—তুই আমাকে বাঁচালি রাবেয়া।'

নাসের ওর ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় চলে গেলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন, 'খাঁ খানানকে ডেকে বলো আমি তখ্‌ত্‌ গ্রহণ করলুম। কাল প্রত্যুষে যাত্রা করতে পারব, তিনি যেন এখনই সব প্রস্তুত রাখেন।'

চারিদিকে কোলাহল উঠল, আনন্দের কোলাহল। নূতন সুলতানের জয়ধ্বনিতে চারিদিকের আকাশ বাতাস কম্পিত হ'তে লাগল মুহুর্মুহুঃ। কেবল সেই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে নিজের ঘরের মেঝেতে তেমনিই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রাবেয়া, নিজের বুকটা নিজেরই দু হাতে চেপে ধরা, দৃষ্টি তেমনিই নির্নিমেষ। শুধু সেই জমাট রক্ত গলেছে। বিস্ফারিত চক্ষুর কোণ বেয়ে নিঃশব্দে ধারায় ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।...

পরের দিন ভোর বেলায় একদল যাত্রা শুরু করলেন। তার মধ্য ভাগে রইলেন সুসজ্জিত হাতীর ওপর সোনার হাওদায় গৌড় বাংলার নূতন ইলিয়াস শাহী সুলতান নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্‌ফর মাহ্‌মুদ শাহ—আর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকনুদ্দিন বারবাক শাহ। স্থির হ'ল গৃহস্থালী ভেঙ্গে বেগম ও অন্যান্য পরিজনরা দু-একদিন পরে যাত্রা করবেন।

শুধু রাবেয়াকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন সুলতান কিন্তু সে রাজী হয় নি। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'ছি! সে বড়

খারাপ দেখাবে জনাব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা করুন—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি গৌড়ে পৌঁছব ঠিক !'

সুলতান হেসে, ওর গাল টিপে আদর ক'রে বিদায় নিয়েছিলেন।···

গৌড়ে পৌঁছে সমস্ত উৎসব সমারোহের মধ্যেও তাঁর শান্তি রইল না। তিনি বারবার দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার পাঠাতে লাগলেন—'দেখে এসো আর কত দূর—কতদূরে হারেম এসে পৌঁচেছে।'

অবশেষে একদিন মহামান্যা বেগম সাহেবারা এসে পৌঁছলেন। তাঁদের মহামূল্য কিংখাপের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি একে একে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে এসে নামল। কিন্তু সুলতানের সেদিকে দৃষ্টি নেই। তিনি উৎসুক ব্যগ্র নেত্রে চেয়ে আছেন—পিছনে বাঁদীদের ডুলির দিকে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ছোট ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, 'সবাই ঠিক ঠিক এসে পৌঁচেছে তো ?'

'সব।' নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে উত্তর দেয়, 'কেবল রাবেয়া—'

'রাবেয়া কি ? রাবেয়ার কি হয়েছে ?'

'ঠিক বোঝা গেল না। ও নাকি পথে কোনদিনই কিছু খায় নি। কেউ সে খবরও রাখত না। আমি যখন খবর পেলাম, তখনই হাকিম সাহেবকে পাঠালাম কিন্তু তিনি বললেন, দীর্ঘ দিনের উপবাসে দেহকে একেবারে নষ্ট ক'রে ফেলেছে—বাঁচানো কঠিন। তবু তিনি চিকিৎসা করেছিলেন—কিন্তু অবস্থা বিশেষ ভালো নয় নাকি। ঐ যে, শেষের ডুলিতে আছে—'

শেষ কথা শোনার জন্য সুলতান অপেক্ষা করেন নি। ছুটে এসে অধীর হস্তে ডুলির পরদা সরিয়ে দিলেন—'রাবেয়া, রাবেয়া, এ কি করলি !'

শীর্ণ হাত একখানি বেরিয়ে ওঁর পায়ে পড়ল, 'আমি আমার কথা রেখেছি, গৌড়ে পৌঁচেছি। এবার ছুটি দিন জনাব !'

চোখের রক্ত বুঝি মুখে নেমেছে, তারই এক ঝলক ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে একটা হাসির ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত হয়ে স্থির হয়ে গেল।

চিরন্তন

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা বলতে বসেছি। আপনারা যাঁরা এ গল্প শুনতে চান, বর্তমান পরিবেশ থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান ইতিহাসের পাতার মধ্যে। সেই একশ বছর আগেকার ভারতকে কল্পনা করবার চেষ্টা করুন।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে সারা ভারতে। সে আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ ব্যারাকপুরে দেখা গেলেও বাংলা মোটামুটি শান্তই ছিল। প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু হ'ল মীরাট থেকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা জেলখানা ভেঙে কয়েদী সিপাহীদের মুক্ত ক'রে ইংরেজদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ক'রে এগিয়ে এল দিল্লীর দিকে। তারপর সেখানে লালকেল্লা দখল ক'রে বৃদ্ধ এবং প্রায়-অন্ধ বাহাদুর শাকে তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা বলে ঘোষণা করতে দেরি হ'ল না। কারণ ইংরেজ কোম্পানীর জোর দিল্লী দুর্গে ছিল না, ছিল মীরাটেই। জেনারেল হিউয়েট দু'হাজার শ্বেতাঙ্গ ফৌজ নিয়ে মীরাটে বসে ছিলেন, তিনিই যখন কিছু করতে পারলেন না, দিল্লীর মুষ্টিমেয় ইংরেজ কি করবে? এই দিল্লী দখল করারই যেন অপেক্ষা করছিল ভারতের বাকী সিপাহীরা। এক সঙ্গে সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠল—কানপুর, আগ্রা, বেরিলি, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ এমন কি রাজপুতানারও কোন কোন স্থানে। যদিচ সেখানে বেশি কিছু হয় নি, কারণ দেশীয় রাজারা সেদিন ইংরাজদেরই সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা যে বহুদিন পরে ইংরেজদের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের স্বাদ পেয়েছেন!

আরায় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন জগদীশপুরের কুঁয়ার সিংহ—বিদ্রোহের প্রধান চক্রী। কিন্তু তিনি অতি সহজেই পাটনা ডিভিসনের কমিশনর টেলারের কাছে হেরে গেলেন! কাশীর বিদ্রোহ দমন করলেন কর্নেল নীল। এলাহাবাদ দুর্গ তখনও কাপ্টেন ব্রেজার মুষ্টিমেয় শিখ সৈন্য নিয়ে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রেখেছেন —বিদ্রোহীদের হাতে পড়তে দেন নি। নীল কাশী দখল ক'রেই আগে এগিয়ে গেলেন এলাহাবাদে, কারণ ব্রেজারকে উদ্ধার না ক'রে অন্য কোন কাজে মন

দেওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারপর আর তিনি ইংরেজ বা শিখ সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না—তারা অন্য সমস্ত কর্তব্য ভুলে প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠল। নীল গবর্নর-জেনারেলের নামে কাশী ও এলাহাবাদ অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করলেন, আর সেই সুযোগ নিয়ে তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা আশ মিটিয়ে সন্ত প্রতিহিংসার লাল সুরা পান করতে লাগল। বিদ্রোহী, সাহায্যকারী, সন্দেহভাজনরা তো বটেই—এমন কি বলিষ্ঠ তরুণ ছেলেরা শুধু মাত্র তরুণ ও বলিষ্ঠ এই অপরাধেই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হ'ল! হত্যার কত রকম উপায় যে নিত্য উদ্ভাবিত হ'তে লাগল তাব ইয়ত্তা নেই। অসামরিক ইংরেজরা পর্যন্ত ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের সঙ্গে মিলে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঘাতকের কাজ করতে লাগল। রক্ত-পাতের মহোৎসব শুরু হয়ে গেল চারিদিকে।

কানপুরে কিন্তু অত সহজে মেটে নি। এই বিদ্রোহের মূল নায়করাই সেখানে ছিলেন—নানা সাহেব ও তাত্যা টোপী। ওখানকার ইংরেজরা সংখ্যায় খুব বেশী ছিলেন না, সামরিক ও অসামরিক মিলিয়ে শ-চারেক পুরুষ, এবং শ-তুই স্ত্রীলোক ও শিশু। এঁরা সকলেই কোনমতে একটা-ঘাঁটি মতো ক'রে তাতে আশ্রয় নিলেন ও প্রাণপণে সিপাহীদের অবরোধ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু একে তো এই ক'টি লোক, তার ওপর ওঁদের সেনাপতি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ হুইলার। সুতরাং প্রাণপণেরও একটা সীমা আছে। অবশেষে আত্মসমর্পণ করতেই হ'ল। তাই ব'লে খুব সহজে করেন নি, বিনা-শর্তেও না—কারণ কটি লোককে নিয়েই সিপাহীরা জেরবার হয়ে পড়েছিল। কথা হ'ল পুরুষরা নিরাপদে নৌকো ক'রে এলাহাবাদে চলে যেতে পারবেন ও মহিলারা একটি প্রাসাদে আশ্রয় পাবেন, সিপাহীরাই তাঁদের আপাতত দেখাশুনা করবে—স্ত্রীলোক ও শিশুর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, দৈব করায় আর এক।

এলাহাবাদ ও কাশীতে নিষ্ঠুর বৈরনির্যাতনের সংবাদ এসে পৌঁছেছে তখন। প্রতিদিনই প্রতিশোধের নামে সেই ভয়াবহ পৈশাচিকতার অসংখ্য বিবরণ—হয়ত বা কিছু অতিরঞ্জিত হয়েই—কানে আসছে। এক্ষেত্রে এতগুলি ইংরেজের প্রতি কর্তৃপক্ষের এই সদয় ও ভদ্র আচরণ অধিকাংশ সিপাহীই সমর্থন করতে পারল না। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'হাতের মধ্য থেকে এই

পিশাচগুলো বেরিয়ে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব?' এই মনোভাব অধিকাংশেরই। কর্তাদের ইচ্ছা থাকলেও তাদের দমন করতে পারলেন না—কারণ তাতে কর্তৃত্বই চলে যাবার সম্ভাবনা। ফলে যখন সকলে নৌকোয় চড়েছে তখন কূল থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হ'ল—খুব অল্প (বোধ হয় চার পাঁচ জনের বেশি হবে না) সংখ্যক ইংরেজই শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে এলাহাবাদে পৌঁছতে পারল।

আর মহিলারা?

যে বাড়িটিতে তাঁদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল, যা পরে বিবিগড় প্রাসাদ বলে খ্যাত হয়েছে ইতিহাসে, একদা সেইখানেই তাদের হত্যা করে একটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া হ'ল। প্রকাণ্ড কুয়া মৃতদেহে ভ'রে উঠল, তবু হত্যা-পিপাসা মিটল না।

সেদিন দু-একটি মহিলাও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। ইতিহাসে সে হিসেব নেই কোথাও।···

এই পর্যন্ত গেল ঐতিহাসিক বিবরণ। ইতিহাস যেখানে পৌঁছয় নি সেখানেই আমাদের গল্প।

সুদূর বাংলা দেশের হুগলী জেলার এক গ্রাম থেকে গিয়েছিল মিহির মুখুজ্জে—বাড়ি থেকে ঝগড়া ক'রে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উনিশ বছর বয়সে; হাঁটা-পথেই পশ্চিম যাত্রা করে, পথে রবাহূত এক বিবাহ-বাড়ি অতিথি হয়ে ছানাবড়া ও মোণ্ডা খাওয়ার প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাস্ত ক'রে গৃহকর্তার চোখে পড়ে যায়। তারপরই তাঁরই নৌকোয় স্থান পেয়ে একদা পশ্চিমে পেঁছয় এবং ঘুরতে ঘুরতে কানপুরে আশ্রয় পায়।

আর সুদূর ইংল্যাণ্ডের সারে অঞ্চল থেকে এসেছিল এড্ওয়ার্ড রলিনসন। সে-ও বাড়ি থেকে ঝগড়া ক'রে বেরিয়ে পড়েছিল একদা ভাগ্যান্বেষণে। তখন ইংরেজরা এরকম বেরিয়ে পড়েই আগে চেষ্টা করত গাড়িভাড়া যোগাড় ক'রে ভারতবর্ষে আসতে, নয়ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লণ্ডন অফিসেই চাকরি দেখত। রলিনসনেরও সেদিন চাকরির অভাব হয় নি। তারপর—'একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে!' পঁচিশ বছরের ইংরেজ যুবকের সঙ্গে পঁচিশ বছরের বাঙ্গালী যুবকের প্রগাঢ় সখ্য হয়ে গেল।

হুইলারের নেতৃত্বে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ যখন পাঁচিল ও কাঁটা তারের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করল তখন এই নেড্ রলিনসনের জন্যই মিহির নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে পারে নি। ও যদিচ কোম্পানীরই চাকুরি করত তবু ভারতবাসী বলে সিপাহীদের হাতে সহজেই ছাড়া পেয়েছিল! ইচ্ছা করলে এ সব গোলমাল থেকে একেবারে অব্যাহতি পেতে পারত বাংলা দেশে যাত্রা ক'রে—কিন্তু মিহির মুখুজ্জে তা না ক'রে নিজে স্বেচ্ছায় সিপাহীদের দলে যোগ দিলে এবং নানা সাহেবকে জানালে যে জান কবুল ক'রে ইংরেজ শিবিরের কার্য-কলাপের খবর এনে দেবে।

সন্দিগ্ধ নানা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কেমন ক'রে?'

'ওখানে আমার এক বন্ধু আছে মহামান্য পেশোয়া। ইংরেজ শিবিরে যাতায়াতে আমার কোন ভয় নেই।'

'তুমি যে ঠিক খবর আনবে তার প্রমাণ কি?'

'একদিন তো প্রমাণ হবেই। তখন আমার জান নেবেন।'

'যদি তুমি ওখানেই থেকে যাও?'

'নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে? আমি কি এত আহম্মক মহান পেশোয়া?'

তবু সন্দেহ যায় না পেশোয়ার।

'কী ছুতোয় যাবে?'

'ওরা শুনছি খেতে পাচ্ছে না। বন্ধুর জন্য সামান্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। আমি যেন আপনাদের গোপন করেই যাবো—কোনমতে সকলের চোখ এড়িয়ে গেছি, এই সবাই জানবে। শুধু সেই হুকুমটা দিয়ে দিন।'

তাত্যা টোপী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। নানাসাহেব নিজে অত ঘোর-প্যাঁচের লোক নন—তিনি সুবেদার যশোবন্ত রাওকে ডেকে আদেশ দিলেন, 'এই বাঙ্গালীকে যদি ইংরেজদের বেড়ার ধারে ধারে যেতে ছাখ তো ধর-পাকড় করার দরকার নেই। তার মানে দেখেও দেখবে না ওকে।'

মিহির আবারও ওঁকে প্রণাম ক'রে বলল, 'একটা সিপাহীর পোশাক চাই হুজুর।'

ভ্রূকুঞ্চিত নানাসাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

'নইলে সিপাহীদের অবরোধ ভেদ ক'রে যাব অথচ কেউ আমাকে দেখতে

পাবে না, সন্দেহ করবে না—একথা ওদের বোঝাব কেমন ক'রে ? এ ধুতি বেনিয়ান চলবে না হুজুর !'

'তা বটে। একে একটা পোশাক আর বন্দুক দিয়ে দাও। কিন্তু এত তোমার গরজ কেন বাঙ্গালী ছোকরা ?'

'স্বাধীনতা পেলে কি শুধু মারাঠিই পাবে—বাঙ্গালী পাবে না ?'

'ঠিক আছে। তুমি যাও এখন।'

কিন্তু মিহিরের প্রাণ যদি বা সিপাইদের হাত থেকে বাঁচল, ইংরেজদের হাতেই যায় যায় হ'ল। ওকে এরা সন্দেহ করবে না—এ তথ্যটা তো ঢাক পিটিয়ে যাওয়া যায় না। মিহির সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছে এইটে বোঝাবার জন্যেই ওকে অনেক কাণ্ড ক'রে আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে যেতে হ'ল—নিঃশব্দে চোরের মতো। ফল হ'ল এই যে বেড়ার কাছাকাছি যেতে ইংরেজের গুলি ছুটল ওর কাঁধের পাশ দিয়ে—এক চুলের জন্যে কাঁধটা বাঁচল—যে ইংরেজকে ও তখনও দেখে নি কিন্তু সে দেখেছে। মিহির এর জন্য প্রস্তুতই ছিল। পকেট থেকে একটা সাদা পতাকা বার ক'রে নাড়তে লাগল। তখন বেড়ার ধারে এগিয়ে এল দু'জন পাহারাদার।

মিহির স্পষ্ট ইংরেজীতে বলল, 'ফ্রেণ্ড !'

'প্রমাণ ?'

'তোমাদের এডওয়ার্ড রলিনসনকে ডাকো। সে চেনে।'

রলিনসন এসে একেবারে ওকে জড়িয়ে ধরল, 'মাই ডিয়ার মিহির ! বাট হাউ—এলে কেমন ক'রে ?'

'সে অনেক কষ্টে—সিপাইদের চোখে ধুলো দিয়ে। এই দ্যাখো তোমার জন্যে কি এনেছি—'

জামার নিচে পিঠের সঙ্গে বাঁধা খানিকটা কাঁচা মাংস বার করলে আর বুকের দিকে বাঁধা খানিকটা আটা—। যে সব অন্য ইংরেজরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাদের চোখগুলো ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই জ্বলে উঠল। কতদিন টাটকা মাংস জোটে নি ! রলিনসন তো মিহিরকে জড়িয়ে ধরে চুমুই খেলে গোটাকতক। বলল, 'মেপে খাবার খাচ্ছি কদিন, ক্ষিদে পেলেই জল—এই চলছে। আজ তোমার দয়ায় অন্তত পাঁচ সাত জন লোক খেতে পাবে।'

মিহির বলল, 'নেড্ একটু আড়ালে চলো—গোটাকতক কথা আছে।'

নিভৃতে গিয়ে সে কি ভাবে এবং কি শর্তে এসেছে সব খুলে বলল, তারপর বলল, 'তোমাদের অনিষ্ট না হয় এমন কয়েকটা খবর দাও, গিয়ে দিতে হবে। তা হলে ভবিষ্যতে সহজে আসতে পারব—চাই কি, বেশী ক'রেই কিছু আনতে পারব।'

নেড্ ভেবেচিন্তে দু-একটা খবর দিয়ে দিল। কিন্তু বললে, 'মুখার্জি, অকারণ এতটা ঝুঁকি নিও না। দু'দিক থেকেই তোমার ভয় আছে।'

'তা থাক্। মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতেই আমার ভাল লাগছে। তা ছাড়া তুমি এখানে উপোস করবে আর আমি—। না, তা হয় না নেড্।'

এডওয়ার্ডের চোখ ছল ছল করতে লাগল।

ফেরবার পথেও বার দুই গুলির ঝাঁক চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। যারা জানে না—উভয় পক্ষেই এমন লোকের সংখ্যা তো কম নয়—তবু মিহির শিস দিতে দিতেই ফিরল!

নানা সাহেবের সামনে গিয়ে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে তিনি বললেন, 'তারপর ?'

মিহির সংগ্রহ করা খবরগুলি দিলে একে একে। নানা সাহেব খুশী হলেন। তার কারণ, কিছুক্ষণ পূর্বেই তাঁর এক বিশ্বস্ত গুপ্তচর এসে যে খবরগুলি দিয়েছে তার সঙ্গে এর দুটো খবরের মিল আছে।

নানা সাহেব ওকে পুরস্কার দিতে গেলেন, মিহির নিল না। বলল, 'যেদিন আপনি দিল্লীর তখ্‌তে বসবেন সেদিন এটা নেব! আজ থাক পেশোয়া।'

তবুও খুশী হয়ে নানা সাহেব একটা মোহরের আংটি ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটে আঙ্গুলে দিয়ে থাকো—অন্তত সিপাইদের হাতে তোমার কোন ভয় থাকবে না।'

ওঁকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এল মিহির। নানা সাহেব না হোক্—ভারতবাসী আবার দিল্লীর তখ্‌তে বসুক, এ ইচ্ছা ওরও। কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাতে হবে, যেমন ক'রে হোক। বিশ্বাসঘাতকতা ? মিহির মনকে বোঝাল যে সে তো কিছু কিছু খবরও এনে দিচ্ছে তাতেই ওর অপরাধ কেটে যাবে।

এমনি ক'রে চলল কয়েকদিন। মিহির কিছু খাদ্য নিয়ে গিয়ে ক্ষুধার্ত উপবাসী ইংরেজদের দিলে—কিন্তু সে তো ওর বন্ধুরই জন্য। তা ছাড়া এমন ক'রে মানুষ মারার সে সমর্থন করতে পারবে না কোন দিনই—

অবশেষে খবর এল—এরা ছাড়া পাবে, নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে এলাহাবাদে।

মিহিরই প্রথম সে খবর এনে দিলে ইংরেজ শিবিরে। দুঃখের মধ্যেও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবাইকার মুখ। কিন্তু রলিনসন মিহিরকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে, 'ভাই মিহির—অনেক উপকার করেছ, তোমার ঋণের শোধ নেই! তবু আমি জানি যা করেছ তা আমাকে ভালবাসো ব'লেই পেরেছ। সেই দাবীতে আর একটি অনুরোধ করব।'

'কী বলো!'

'নানারকমের কথা শুনছি। হয়ত শেষ পর্যন্ত পালাতে পারবই না। যদি সবাই মরি তো দুঃখ নেই। তবে এমন যদি হয় যে পুরুষদের মেরে ওরা মেয়েদের আট্‌কে রাখে, তাহলেই সত্যকার বিপদ বুঝব। আমাদের প্রাণের চেয়ে—মেয়েদের ইজ্জৎ বড়, এটা তো মানো। আমাদের এখানে যে বিবিরা আছেন তার মধ্যে আছে ক্লারা ডবসন বলে একটি মেয়ে। পাদ্রীর মেয়ে, আঠারো উনিশ বছর বয়স। অপরূপ সুন্দরী—অন্তত আমার চোখে। তোমারও ভুল হবার কোন আশঙ্কাই নেই, সে মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায়। কথা ছিল তাকে বিয়ে করব—চাক্‌রীতে একটু উন্নতি হ'লেই। আমি যদি মারা যাই, সত্যিই নিরাপদে পৌঁছব কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে সে বিষয়ে—ওকে তুমি একটু দেখো। যদি সবাইকে ছেড়ে দেয়, কিংবা ওকে অন্তত তুমি মুক্ত করতে পার তো এলাহাবাদে নিয়ে যেও কোনরকম ক'রে। সেখানে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আর যদি না বাঁচি—তোমার বোন ব'লে মনে ক'রো—নিরাপদে কোন ইংরেজ আশ্রয়ে পৌঁছে দিও।

রলিনসনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল—লজ্জিত হয়ে রুমালে মুছে নিল তাড়াতাড়ি। মিহিরের চোখও শুষ্ক রইল না। সে বলল, 'প্রাণ দিয়েও যদি তার কোন উপকার করতে পারি তো করব ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

মনে তার একটু সন্দেহ ছিলই। সে তু'বেলাই শুনছিল, এলাহাবাদ ও কাশীর খবর। সে সংবাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল বৈকি। সিপাইরা কি সহজে ছেড়ে দেবে ইংরেজদের? রক্তের বদলে কি রক্ত নিতে চাইবে না? বিশেষত এই কদিনেও কম বেগ তো দেয় নি এই কটা ইংরেজ! মিহির বিষণ্ণ চিত্তেই বিদায় নিল বন্ধুর কাছে।

তাই—সে আশঙ্কাই যখন শেষ অবধি সত্য হ'ল তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না সে। সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ডের পর মেয়েদের নিয়ে গিয়ে যখন বিবিগড়ে তোলা হ'ল, তখন সোজা নানা সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, 'হুজুর এবার আর একটি ভিক্ষা।'

'কী বলো।'

মনটা ভাল ছিল না নানা সাহেবের। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে নিজেকে তিনি যেন অপরাধী ভাবছিলেন।

'বিবিগড়ের পাহারাদারদের মধ্যে আমার নামটাও লিখিয়ে দিন!'

'কেন?'

'অনেকরকম কথা কানে আসছে। মেমসাহেবদের সাদা চামড়ায় ভুলে কেউ কেউ নাকি চেষ্টা করছে ওদের ছেড়ে দেবার—'

'তাই নাকি? আচ্ছা, তুমি ওখানেই থাকো গে। আমি জমাদারকে বলে দিচ্ছি—'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। কিন্তু ওখানে থেকেও বিশেষ কোন সুবিধা হ'ল না। কারণ চারিদিকে লোক। শুধু দূর থেকে ক্লারাকে দেখে চিনে রাখল মিহির—এই পর্যন্ত। প্রাণপণে নিজের মাথাকে খাটাতে লাগল—কোন উপায় কোথাও থেকে বার করা যায় কিনা, এরই চিন্তায়।

কিন্তু তার আর সময়ও ছিল না। হঠাৎ একদিন শুরু হয়ে গেল মৃত্যুর তাণ্ডব। একদল সিপাহী আর নানার এক রক্ষিতা এবং একজন কসাই মিলে বিবিগড়ের স্ত্রীলোক এবং শিশুদের রক্ত নিয়ে নতুন হোলিলেখা শুরু করল। মিহির ছুটে গেল নানাসাহেবের কাছে, তিনি দেখা করলেন না, তাত্যা টোপীও নেই! সেই সুযোগই নিয়েছিল সিপাহীরা।

একেবারে মরীয়া হয়ে উঠলে অনেক সময়ে মানুষ সামনে পথ দেখতে পায়—যে পথ অন্য সময় কিছুতেই চোখে পড়ে না। ওদিকে কোন উপায়

না পেয়ে সহজ পথটাই বেছে নিল মিহির। জীবন-মৃত্যুর খেলা—ইতস্তত করার অবসর নেই। খোলা তলোয়ার হাতে ক'রেই ছুটে এসে ঢুকল বিবিগড় প্রাসাদে। হত্যা না করুক, হত্যার অভিনয় করতে দোষ কি? কালান্তক যমের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল সে এঘর থেকে ওঘরে। চারিদিকে রক্তের বন্যা। রক্ত আর হাহাকার। হাত নিশপিশ করছিল ওর—এই সব নারী হত্যাকারীদের বুকে নিজের তলোয়ারখানা বসিয়ে দেবার জন্যে। না হয় মরবেই শেষ পর্যন্ত, জীবনের পরোয়া সে করে না! কিন্তু কাজ যে বাকি এখনও—

অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল ক্লারাকে। একটা জায়গায় নিভৃতে হাঁটু গেড়ে বসে বোধ করি বা ঈশ্বরকে ডাকছে, ওকে সেই অবস্থায় এসে পড়তে দেখে একটা চিৎকার ক'রে উঠতে গেল ক্লারা, কিন্তু কোন আওয়াজই শেষ পর্যন্ত বেরোল না। কেমন একটা অসহায় আর্ত চাপা শব্দ উঠল মাত্র। মিহির কাছে এসে বলল, 'কোয়ায়েট ক্লারা, য়্যাম ইওর ফ্রেণ্ড্।'

ক্লারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কিন্তু তখন আর বেশী কথার সময়ও নেই। রলিনসনের যাবার আগে দিয়ে যাওয়া এক টুকরো চিঠি জুতোর মধ্য থেকে বার ক'রে ক্লারার হাতে দিল। তাতে ইংরেজিতে লেখা—'ক্লারা, এ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। একে বিশ্বাস করো।' তবু ক্লারার সংশয় যায় না। অন্য কোন বন্ধুর হাতে নেড্ দিয়েছিল হয়ত এ চিঠি—তাকে মেরে এই নেটিভ সিপাই পেয়েছে ওটা। হয়ত আরও বেশি রকমের কোন শয়তানী মতলব আছে।

ওর চোখে সেই সংশয় আর অবিশ্বাস পড়ে মিহির ম্লান হাসল। বলল, 'মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আর তোমার কি ভয় ক্লারা! কিন্তু তুমি আমার নাম শোন নি?—আমি মিহির।'

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল ক্লারা, 'শুনেছি বৈকি—বহুবার শুনেছি।' কম্পিত-কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু নেড্ কি বেঁচে আছে? এ চিঠি কবেকার?'

'এ চিঠি যাবার আগে দেওয়া। তবে নেড্ বোধহয় বেঁচে আছে।' মিছে ক'রেই বলে মিহির।'

'তবে যে শুনেছি কেউ বাঁচে নি।'

'কে বলল? দশ বারো জন অন্তত পালিয়েছে। হয়ত কিছু বেশিই

হবে। নেড্ লাকী, নিশ্চয়ই বেঁচেছে। কিন্তু ঐ ওরা এদিকে আসছে—আর যে সময় নেই।'

হু হু ক'রে কেঁদে উঠল ক্লারা, 'কি হবে আমার বেঁচে মিহির? মা বোন সব গেল। হয়ত বাবাও—'

'কিন্তু নেড্। নেড্-এর কথা ভাবো। হয়ত সে তোমার জন্যেই প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছে—'

মন্ত্রের মতো কাজ করল কথাটা। নিমেষে শান্ত হয়ে ক্লারা প্রশ্ন করল, 'বেশ, বলো কী করতে হবে।'

'মৃত্যুর অভিনয় করতে হবে। একমাত্র মরেই তুমি মৃত্যুর হাত এড়াতে পারবে আজ।'

ততক্ষণে পাশের ঘরে একটা উন্মত্ত কোলাহল উঠেছে। আর এক মুহূর্তও অবসর নেই। হিড় হিড় ক'রে ক্লারার একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল মিহির। যতদূর সাধ্য মুখে পৈশাচিক শোণিত-তৃষা ফুটিয়ে তুলে।

'আরে এ বাংগালী ভাইয়া! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ শিকার?'

'চুপ। এ আমার শিকার। আমি মারব।' দাঁতে দাঁত চেপে বলে ক্লারাকে, 'তুমি কাঁদো, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করো! অভিনয়টা পুরো হওয়া চাই!'

তবু একটা লোক ক্লারার রূপের আকর্ষণে রুখে এসেছিল ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে—নানাসাহেবের আংটিটার কথা মিহিরেরর মনে পড়ে গেল হঠাৎ। আবারও মন্ত্রবৎ কাজ করল। মাথা নিচু ক'রে সরে পড়ল লোকটা।

মিহির তার তলোয়ার আগেই কোন মৃতা ইংরেজ রমণীর রক্তে রাঙ্গিয়ে নিয়েছিল—এখন আবারও একটা কাটা গলা থেকে তাজা রক্ত মাখিয়ে নিলে, তারপর সেই বিরাট কুয়াটার কাছে যেতে যেতে তেমনিই চাপা গলায় বললে, 'তুমি শুধু রাতটা পর্যন্ত বেঁচে থাকবার চেষ্টা ক'রো। তোমাকে ওখানেই ফেলব—তবে অনেক দেহ জমে উঠেছে, লাগবে না। ওপরেও দু'চারটে পড়বে। তুমি নিচে পৌঁছে এক কোণে সরে যেও—আর নিঃশ্বাস না আটকায় সেইটে দেখো। আমি রাত্রে আসব।'

শিউরে উঠে ক্লারা বললে, 'ঐ অতগুলো শবের মধ্যে আমি গভীর রাত

পর্যন্ত পড়ে থাকব ? আর ও সব আমারই আত্মীয়া ও বান্ধবীর শব ! সে আমি পারবো না !'

'উপায় নেই ক্লারা, দেখছ না পিশাচেরা ক্ষেপেছে। দেখছ না নরকের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বাঁচতে গেলে মরতেই হবে এখন। প্রাণপণে শুধু তুমি নেড্-এর নাম স্মরণ করো—তার কথা ভাবো।'

আরও কারা কাছে আসছে। কথা কইবার আর সময় নেই। সেই তলোয়ারের রক্ত তুলে ওর জামায় মাখিয়ে দিয়ে, ভান করল ওর বুকে তলোয়ার বসাবার, তারপর যতটা সম্ভব সন্তর্পণে ওকে ফেলে-দেবার মতো ক'রেই নামিয়ে দিল।

'ঈশ্বর জানেন নেড্—এছাড়া উপায় নেই !' অস্ফুট কণ্ঠে বলল মিহির।

গভীর রাত্রে স্তব্ধ হয়ে এল নররক্ত-পিপাসুদের বীভৎস হুঙ্কার। বিবিগড় প্রাসাদ থম্ থম্ করছে। সিপাহীরা ক্লান্ত হয়ে শহরে গেছে মদ খেতে। আর পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই ! স্বয়ং মৃত্যুর জিম্মা ক'রে দেওয়া হয়েছে বন্দিনীদের।

তারই মধ্যে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চরণে, ছায়ার মতো অন্ধকারে গা মিলিয়ে এগিয়ে এল মিহির।

ভয় ?

হ্যাঁ—তারও ভয় আছে বৈ কি ! ভয় আর ঘৃণা। ক্ষোভ আর দুঃখে তার আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে এসেছে। তার ওপর সারা দিনের উপবাস। তবু এখানে আসবার আগে সে জোর ক'রেই একটু জল খেয়ে এসেছে। গুড় আর জল : নইলে গায়ে জোর পাবে কেন ?

আলো নেই, জ্বালাও যাবে না। কেউ নেই হয়ত কাছে, কিন্তু যদিই কেউ আলো দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে কৌতূহলী হয়ে ! এক গাছা দড়ি এনেছে, দড়িটা কূয়ার পাথরে লাগানো একটা লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে, সেই দড়ি ধরে নামবে।

শৃগালের দল এরই মধ্যে জমায়েৎ হয়েছে ! তবে তাদের খাদ্য চতুর্দিকে—কূয়ার কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওর পায়ের আওয়াজে দু'চারটে ছুটে পালাল, ওরাই যা জীবিত আছে এখানে।

আস্তে আস্তে নেমে গেল মিহির। ভয় হচ্ছে যদি বহু মৃতদেহে চাপা পড়ে থাকে ক্লারা, কেমন ক'রে বার করবে তাকে ? এতগুলো শব সরাবে কোথায় ? তা ছাড়া—যদি তার দম বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে ?···মিহিরের যেন কান্না পেতে লাগল, কি দরকার ছিল তার এত ঝুঁকি ঘাড়ে নেবার ?

একটু যেতেই পা লাগল—হিম শীতল মৃতদেহ এবং চট্‌চটে রক্তে—অর্থাৎ ক্লারাকে ফেলবার পর বহু দেহ পড়েছে আরও। যা ভয় করছিল তাই। হে ঈশ্বর, সে এখন কী করবে !

কিন্তু ঐ কী একটা আওয়াজ হ'ল না ? মুহূর্তে যেন হিম হয়ে এল বুকটা। না—জীবিত প্রাণীরই শব্দ। ঐ যে, কে একটা অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, 'মাই গড !'

'ক্লারা ! ক্লারা ! কোথায় তুমি !'

'এসেছ মিহির ? এসেছ ? ও, আর যে পারি না আমি।' প্রায় চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল ক্লারা। এতক্ষণের সমস্ত অমানুষিক দুঃখ যেন বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইল সেই কান্নার সঙ্গে।

'চুপ ! চুপ ! চুপ করো ক্লারা, লক্ষ্মীটি ! এত দুঃখ-বহনের যন্ত্রণা এক মুহূর্তের ভুলে ব্যর্থ ক'রে দিও না !'

হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এক সময় হাতে ঠেকে উষ্ণ জীবন্ত একটি হাত। ছেলে-মানুষের মতোই টেনে বুকের মধ্যে এনে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, 'আর একটুখানি ধৈর্য ধরো ক্লারা, লক্ষ্মী বোন্‌টি !'

রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে এক রকম জোর ক'রেই রুমালটা ওর মুখে গুঁজে দেয়। তারপর ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে অতিকষ্টে দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ওঠা সামান্যই—কিন্তু এক হাতে অত বোঝা নিয়ে কি ওঠা যায় ? কোনমতে একটু একটু ক'রে এগোয় সে।

ওপরে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেই ক্লারা টলে পড়ে গেল।

'ক্লারা ! দাঁড়াতে পারবে না বোন ?'

মুখের রুমালটা কোনমতে সরিয়ে ক্লারা বলল, 'অসম্ভব, আমার হাতে-পায়ে কোন জোর নেই ! আর চেষ্টা ক'রেও কোন লাভ নেই, আমি বোধ হয় শিগ্‌গিরই পাগল হয়ে যাবো। তুমি একমাত্র দয়া আমায় করতে পারো মিহির—যদি ঐ তোমার কোমরের ছুরিটা আমার বুকে বসিয়ে দাও।

আত্মহত্যাও করতে পারতুম—কিন্তু কোন অস্ত্র ছিল না হাতের কাছে—'

'চুপ! চুপ! অধৈর্য হয়ো না। নেড্‌-এর খবর পেয়েছি, সে বেঁচে আছে। তার কথা ভাবো!'

মিছে ক'রে বলে মিহির।

ক্লারা কি একটু আশ্বাস পায় সে নামে? অন্তত শান্ত হয় অনেকটা। মিহির বলল, 'আমার গায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে?'

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে ক্লারা বলল, 'না, সমস্ত পা কাঁপছে, কোন জোর নেই। আমার জন্যে তোমার জীবন বিপন্ন করো না মিহির, তুমি যাও—'

নিমেষে ওকে পিঠে তুলে নিল মিহির, বস্তার মতো। হাত দুটো সামনে এনে নিজের দু'হাতে চেপে ধরে হেঁটে চলল। ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়েছিল, নইলে দীর্ঘাঙ্গী ক্লারার পা মাটিতে ঘষে যায়।

ব্যাকুল হয়ে ক্লারা বলতে লাগল, 'পারবে না, পারবে না মিহির! এ অবস্থায় কখনও পথ হাঁটতে পারো? আমাকে ছাড়ো, নয়ত পথের ধারে কোনও ঝোপে ফেলে রেখে যাও—। আমি কথা দিচ্ছি বাঁচবার চেষ্টা করব। ও, ডিয়ার বয়!'

কথার উত্তর দেবার সময় নেই। যে কোন সময় যে কোন লোকের সামনে পড়তে পারে। তাহ'লে দু'জনের কারুর রক্ষা থাকবে না। ঘন আমবাগানের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে মিহির এগিয়ে চলল। ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে, এই অনভ্যস্ত পরিশ্রমে বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে—তবু যেতেই হবে।

এ কী বিড়ম্বনা ওর! অষ্টাদশী তরুণীর দেহলতা ওর দেহের সঙ্গে প্রায় জড়িয়ে আছে, তার ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগছে ওর গালে, সোনালী চিকন চুল গেছে ওর মুখের ঘামে জড়িয়ে—তার নরম গাল ওর গলার এক পাশে লেগে—এক যুবকের জীবনে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা কি ঘটতে পারে? কিন্তু সেটা ভাল ক'রে অনুভব করারও অবসর নেই যে ওর!

দীর্ঘ ক্রোশব্যাপী আমবাগান শেষ হয়ে শহরের উপকণ্ঠে মাঠ। তারই আলের উপর দিয়ে যেতে হবে। নক্ষত্রের আলোয় তাকে দেখা না গেলেও ক্লারার শুভ্র পোশাক বহুদূর থেকেই বোঝা যাবে। তবে তারও ব্যবস্থা

করেছে বৈ কি মিহির। বাগান যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি পুকুর আছে। বাঁধানো চবুতারায় অর্ধমূর্ছিতা ক্লারাকে এনে নামিয়ে নিজেও কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসল সে, ক্লান্তিতে দেহ অনড় হয়ে আসছে। আর বোধ হয় চলা সম্ভব নয়।

তবু, তবু উঠতেই হবে। পুকুরে নেমে আঁজলা আঁজলা ক'রে জল এনে দিলে ক্লারার মুখে-চোখে-মাথায়। ব্যাকুল অসহ তৃষ্ণায় পশুর মতো হাঁ ক'রে সেই জল পান করল ক্লারা। তারপর যেন একটুখানি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উঠে বসল।

'একটু কি ভাল বোধ করছ ক্লারা ?'

ঘাড় নেড়ে সে জানাল, 'হ্যাঁ।'

একটা বড় আম গাছের ডালে, পাতার ফাঁকে লুকোনো ছিল একপ্রস্থ সিপাহীর পোশাক, পেড়ে এনে মিহির বলল, 'এইটে যে পরতে হবে তোমাকে এখন !'

ক্লারা শিউরে উঠল সেদিকে চেয়ে, 'সিপাইর পোশাক ?'

'হ্যাঁ ক্লারা—এ অবস্থায় যার সামনে পড়বে নিশ্চিত মৃত্যু। তোমার আমার তু'জনেরই। এই পোশাক আর ঐ পাগড়ী পরিয়ে ছোক্‌রা সিপাই সাজিয়ে নেব তোমাকে। রং আছে তৈরী, মুখটাও তামাটে ক'রে দেব আমাদের মতো।'

যন্ত্রচালিতের মতই পোশাকটি হাতে নিল ক্লারা, কিন্তু কিছুতেই যেন পরতে পারে না। এ দিকে সময় চলে যাচ্ছে। অসহিষ্ণু হয়ে উঠে মিহির বলল, 'তাহ'লে অনুমতি করো ক্লারা, তোমার পোশাক আমিই বদলে দিই। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কোন লজ্জা, কোন অপমান বোধ ক'রো না !'

আবার হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে সে, 'শুধু বাঁচবার জন্য কী না করলাম মিহির, কী না করলাম ! শবগুলো পড়েছে কয়েকটা ক'রে—আর আমি নিঃশ্বাস রোধ হবার ভয়ে তাদের নিচে ফেলে ওপরে উঠে এসেছি, যেমন জলে ভেসে ওঠে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। প্রাণপণে এই যুদ্ধ করেছি নিজের বিবেকের সঙ্গে, নিজের মনুষ্যত্বের সঙ্গে। পাগলও যদি হয়ে যেতুম—তাহ'লেও রক্ষা পেতুম। আর যে পারছি না আমি ! আমার সমস্ত দেহ মন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ওঃ—কত নীচ আমি ; তুচ্ছ প্রাণটার জন্যে সকলকে

মরতে দেখেও বাঁচবার কী চেষ্টা!'

মিহির আর অপেক্ষা করল না। এ তো উন্মাদই—এর কাছে আর সঙ্কোচ কিসের?

সে ওর পোশাক ছাড়িয়ে কোনমতে সিপাহীর পোশাক পরিয়ে দিলে, মুখে রং ক'রে তার ওপর দিলে খানিকটা ধুলো মাখিয়ে। তারপর পাগড়ী পরিয়ে চুলটা সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়ে, সস্নেহে ডাকলে, 'ক্লারা।'

ক্লারা কিন্তু ততক্ষণে আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে উঠেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা ধরে উঠে দাঁড়াল, 'চলো কতদূর যেতে হবে?'

'বেশী দূর না। আর ক্রোশখানেক হেঁটে গিয়েই নৌকো পাবো। নৌকো ঠিক করা আছে।'

প্রায় সমস্ত দেহের ভার মিহিরের ওপর এলিয়ে দিয়ে ক্লারা হাঁটতে লাগল। মিহিরও এক রকম ওকে বহন করেই নিয়ে চলল। ভোরের আগে এ পথটা পার হয়ে যেতেই হবে। দিনের আলোয় ছদ্মবেশ ধরা পড়তে পারে।

এলাহাবাদে পৌঁছে ইংরেজ আশ্রয় পাওয়া গেল বটে কিন্তু রলিনসনের কোন খবর নেই। পাঁচ-ছ'দিন প্রায় দিন-রাত খুঁজল মিহির—যদিও আশা ছিল খুবই কম।

যাঁর আশ্রয়ে ক্লারা ছিল তিনি বললেন, 'মুখার্জি, বৃথা খোঁজ করছ—আমার মনে হয় সে আর নেই।···যাক্—তুমি যা করেছ তার জন্যে, সমগ্র ইংরেজ জাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, কিন্তু ক্লারার জন্যে তুমি আর ভেবো না। ওকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবার ভার আমার! তুমি নিজের কাজ ক্ষতি ক'রো না।'

বোধহয় ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে ভারতীয় যুবকের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিতই হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

মিহিরও কথাটা বুঝল। এই ক-বছর সে বৃথাই ইংরেজের সাহচর্য করে নি। সেই দিনই অপরাহ্ণে ক্লারার সঙ্গে নিভৃতে দেখা ক'রে বলল, 'ক্লারা, আমি আজই শেষ রাত্রে কাশী রওনা হচ্ছি। সেখানেও রলিনসনকে খুঁজব, যদি পাই তো এখানের ঠিকানা দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব তখনই—'

একটু থামল মিহির। তারপর কি বলবে ভাবতে লাগল সে। কিন্তু ক্লারা তাকে কথাটা শেষ করতে দিলে না, 'যদি না পাও? মিহির!'

মাথা নিচু ক'রে মিহির বলল, 'তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছি—এইটুকুই তখন আমার সান্ত্বনা থাকবে। আমাকে দেশের দিকে ফিরতে হবে ক্লারা!'

'তার—তার মানে—' যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল ক্লারা, 'আর তোমার দেখা পাবো না?'

'আর কি আমাকে কোন প্রয়োজন আছে তোমার? কোন কাজ থাকে তো নিশ্চয়ই ফিরে আসব।' অন্য দিকে চেয়েই মিহির উত্তর দিল।

ক্লারা একটু এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরল। চোখে তার বিচিত্র এক দীপ্তি, সেই চোখ-ছুটি ওর চোখের উপর রেখে কম্পিত গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি, তোমাকে ছাড়তে পারব না মিহির!'

সে চাহনির অর্থ ভুল হবার নয়। মিহির প্রায় শিউরে উঠে বলল, 'ক্লারা, তুমি আমার বন্ধুর বাগদত্তা। আমার ভগ্নির মতো—'

'সে ক্লারা মরে গেছে, রলিনসনও সম্ভবত মৃত। এ ক্লারাকে নবজন্ম দিয়েছ তুমি, এখন আমার ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। মিহির, তুমি কি বুঝতে পারছ না, এই ক-দিনে তুমি—তুমি আমার আত্মার সঙ্গে—সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছ? হ্যাঁ—রলিনসনকে আমি ভালবাসতাম—কিন্তু সেটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র, তোমাকে পেয়ে বুঝেছি ভালবাসা কাকে বলে। তুমি অদ্ভুত, তুমি অপূর্ব—তুমিই আমার ঈশ্বর মিহির!'

'ক্লারা, ক্লারা, এমন ক'রে আমায় লোভ দেখিও না, তোমার ঈশ্বরের দোহাই!' কেঁপে যায় মিহিরের গলা, তালু শুষ্ক হয়ে ওঠে—'ভেবে ছ্যাখো তোমার সমাজ আর আমার সমাজে আকাশ পাতাল তফাত। ধর্ম আলাদা, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। এতে তুমি সুখী হ'তে পারো না। তোমার সমাজ তোমাকে ঘৃণা করবে, আমার সমাজ আমাকে ত্যাগ করবে! নতুনের মোহ যখন কাটবে আমরা ছু'জনেই অভিশাপ দেব পরস্পরকে—জীবন আমাদের ছুর্বহ হয়ে উঠবে।'

ক্লারা ওকে জড়িয়ে ধরল সবেগে, উত্তপ্ত পিপাসু ছুটি ওষ্ঠ ওর মুখের কাছে এনে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'সমাজ ছেড়ে লোকালয় ছেড়ে চলো

আমরা গহন অরণ্যে কোথাও চলে যাই। হিমালয়ে, সমুদ্রতীরের কোন ছেলেদের গ্রামে···যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। আমার তো আর কেউ নেই তুমি জানো। এখন তুমিও আমাকে আর ত্যাগ ক'রো না। যা জুটবে তাই খাবো, আমি তোমাকে পরিশ্রম ক'রে খাওয়াবো। তুমি আমার রাজা, আমার দেবতা···আমাকে শুধু সেবা করার অধিকার দাও।'

স্বপ্নের ঘোর লাগে কি মিহিরের মনে ?

সে যেন নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে।

'তা হয় না ক্লারা, আমাকে বিদায় দাও। এই যদি সত্য হ'ত তো আমি সানন্দে সব ত্যাগ ক'রে তোমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতাম। তুমি রাজার জাতে জন্মেছ ; বিলাস ও ঐশ্বর্যে মানুষ, দুঃখ তুমি বেশী দিন সইতে পারবে না আমি জানি।···তা ছাড়া, আমি এদেশী লোক, ইংরেজ অনেক দুঃখ পেয়ে প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠেছে, তোমাকে নিয়ে আমি যদি বাস করি তো তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমাদের দু'জনকেই পুড়িয়ে মারবে। তার চেয়ে এই ভাল ক্লারা, ডার্লিং—আমি যে তোমার জীবনরক্ষা করতে পেরেছি, পেয়েছি অন্তত একদিনেরও ভালবাসা—এই আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাথেয় হয়ে থাকবে।'

কেমন একটা যেন আচ্ছন্নভাবে কথা বলে ক্লারা, 'তুমি বিপদে পড়বে ঠিকই। এরা কখনও ক্ষমা করবে না। এখনই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।···তবে থাক্। কিন্তু তুমি কেন আমাকে এমন ক'রে বাঁচালে মিহির ? সবাই গিয়েছিল তবু তুমি ছিলে···এতেই নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে ছিলাম! এখন কি নিয়ে থাকব ? কি রইল আমার জীবনে ? ওঃ—ঈশ্বর ! ঈশ্বর !'

আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো খুলে নামিয়ে দেয় মিহির। নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় জীবনের সব চেয়ে শ্রেয় ও রমণীয় বন্ধন থেকে। তারপর চেষ্টা করে ক্লারার সেই আচ্ছন্নভাবের সুযোগে নিঃশব্দে সরে যাবার।

কিন্তু সে দরজার কাছাকাছি পৌঁছতেই ক্লারার যেন চমক ভাঙ্গে। ছুটে এসে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ায়, 'তোমার ঠিকানাটাও কি আমাকে দেবে না ? দেবে না কোন স্মৃতি-চিহ্ন ?'

'লাভ কি ?' ম্লান হাসি হাসে মিহির, 'শুধু শুধু দুঃখকে বাড়ানো ! ···তার চেয়ে ভুলে যাবারই চেষ্টা ক'রো ক্লারা। দেশে গিয়ে নতুন নতুন

মানুষ পাবে। তারাই তোমার স্বজন। অল্প বয়স তোমার—দুঃখ ভুলতে পারবে সহজেই। মিছিমিছি বন্ধন রেখে যেও না। তা ছাড়া, হয়ত এখন তুমি চিঠি দেবে ঘন ঘন, এর পর যখন কমে আসবে সে চিঠির সংখ্যা, আমি অত্যন্ত আঘাত পাবো। তার চেয়ে এতে তবু এই আশ্বাস থাকবে আমার যে, তুমি আমাকে ভোল নি!'

'আশ্বাস!' সাগ্রহে উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে ক্লারা, 'তাহ'লে তুমি কি আমাকে মনে রাখবে মিহির?'

'তোমাকে ভোলা কি সম্ভব? আমাকে ভুল বুঝো না ক্লারা, আমার দেহটা শুধু থাকবে এখানে, আমার মন আর আত্মা দুই-ই তুমি নিয়ে যাচ্ছ চিরকালের মতো!'

'আর কিছু আমি চাই না মিহির। এই দুটো কথা—হয়ত মিছে কথা, হয়ত শুধুই বৃথা আশ্বাস—তবু এই রইল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতি-চিহ্ন। আর আমি বাধা দেব না। তুমি যাও।'···

স্খলিত মন্থরপদে মিহির যখন বেরিয়ে এল ওদের বাড়ি থেকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকের প্রান্তর ঘিরে। চারিদিকের বাড়িঘর সে আঁধারে অস্পষ্ট একাকার হয়ে গেছে। মিহিরের মনে হ'ল এ অন্ধকার যেন নামল ওর অন্তরেই—চিরকালের মতো। জীবনের যা কিছু আলো স্বহস্তে ও স্বেচ্ছায় নিভিয়ে দিয়ে এল সে এই মাত্র।

অগ্নির অগ্নিমান্দ্য

পুরাকালে একবার শ্বেতকি নামে এক রাজা বহুদিন ধরে দারুণ যজ্ঞ করেছিলেন। এখানকার হিসেবে লক্ষ লক্ষ মণ ঘি পুড়েছিল, ক্রমাগত যজ্ঞের ধোঁয়া লেগে অনেক ঋত্বিক্ অন্ধ হয়ে গিছলেন। আর সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল আগুনের—এতদিন ধরে এত ঘি খেয়ে তাঁর হজম শক্তি একেবারে চলে গিছল—অগ্নিরও হয়ে গিয়েছিল অগ্নিমান্দ্য। বিষম অবস্থা তাঁর, না ছিল কিছু খেতে রুচি, না ছিল কোন রকমের ক্ষিদে।

কী করা যায়? চিকিৎসকরা শুনে বললেন, 'তুমি প্রচুর পরিমাণে মাংস খাও, অনেকগুলি পশু গোটা আহার করো—যাতে তাদের রক্ত অস্থি বসা মজ্জা সুদ্ধ খেতে পারো।'

এত পশু এখন পান কোথায়? বনে পশু থাকে বটে—কিন্তু কোন বন পোড়াতে গেলে কি আর পশু পুড়বে? আগুনের গন্ধ পেলেই পশুরা সে বন ছেড়ে পালাবে। একদিক থেকে তিনি এগোবেন আর একদিক দিয়ে তারা পালাবে। মিছিমিছি কতকগুলো গাছপালা খেয়ে লাভ কি?

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা যদি একটু পাহারা দেন—মানে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, যাতে পশুগুলো পালাতে না পারে—তাহ'লে তিনি মনের সুখে খাণ্ডবপ্রস্থ বনটি ভোজন করেন। নইলে তাঁর শরীর আর টিকছে না। আর, আগুন যদি না থাকে, মানুষই কি বাঁচবে?

প্রথমত নিজের দুঃখ জানালেন; তাঁর মৃত্যু ঘটলে, লোকের কি ভীষণ অসুবিধা হবে সে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন; তারপর একটু লোভও দেখালেন—প্রচুর ভাল ভাল অস্ত্র ওঁদের যোগাড় করে দেবেন—ওঁরা রাজী হ'লে।

সব মিলিয়ে কাজ হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন রাজী হলেন। তার বদলে—অবিশ্যি আগুনেরও সুবিধে হ'ল তাতে—তিনি অর্জুনকে গণ্ডারের হাড় দিয়ে তৈরী গাণ্ডীব ধনুক, অক্ষয় তূণীর, কপিধ্বজ রথ, দেবদত্ত নামে ভীষণ শব্দ হয় এমন শাঁখ আর শ্রীকৃষ্ণকে বিষম ভারী কৌমুদকী গদা এনে দিলেন।

অগ্নি নিশ্চিন্ত হয়ে একদিক থেকে বনটি পোড়াতে শুরু করলেন এবার।

মহাভারতে আছে—খাণ্ডবপ্রস্থের সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে মোট ছটি প্রাণী রক্ষা পেয়েছিল। ময় বলে দৈত্যদের এক স্থপতি—যিনি বাড়িঘর প্রাসাদ তৈরীর নক্সা করেন বা তৈরী করান দাঁড়িয়ে থেকে—তক্ষক নাগের ছেলে অশ্বসেন আর চারটি পাখীর বাচ্ছা।

মহাভারতে না থাকলেও আমরা জানি—এ ছজন ছাড়া আরও একটি প্রাণী বেঁচে গিয়েছিল। মহাভারতের লেখক ব্যাসদেব লিখছেন যে, সংখ্যাহীন

পশু পক্ষী সরীসৃপ এমন কি অরণ্যচারী পিশাচরা সুদ্ধ সকলেই সে আগুনে পুড়ে মরেছিল। এই পিশাচরা কিন্তু কোন জানোয়ার নয়, তারাও মানুষ। যারা খুব নোংরার মধ্যে থাকে; যা-তা খায়; কাঁচা বা পচা মাংস খায় রান্না না ক'রেই—দুর্গন্ধে যাদের আনন্দ; অতি ময়লা পোশাক-আশাক পরে—কাঁচা চামড়াই বেশীর ভাগ; কখনও চান করে না, এমনি মানুষকেই পিশাচ বলা হ'ত। পরে অবিশ্যি পিশাচকেও ভূতের দলে টানা হয়েছে, মানে এক শ্রেণীর ভূত ব'লে ধরা হ'ত ওদের। অনেকে পিশাচসিদ্ধ হবার জন্যে ঐ রকম নোংরা হয়ে থাকার চেষ্টা করে, তাদের ধারণা ওতেই পিশাচরা খুশী হয়ে তাদের সাহায্য করবে, এ পৃথিবীতে তারা ইচ্ছামতো যা-খুশি তাই করতে পারবে।

হ্যাঁ—মানুষ অনেকে খুব নিঘিন্নে হয় বৈকি। তখনকার দিনে ঐ রকম নিঘিন্নে কিছু মানুষ বনে বাস করত। কাপড়-চোপড়ের বালাই নেই, খাবার জন্যে ভাবতে হয় না—কাজেই কাজকর্ম করারই বা দরকার হবে কেন? তোফা আরামে—তাদের ধারণা ঐটেই আরাম—থাকত। এই পিশাচই একজন সে অগ্নিকাণ্ডে বেঁচে গিছল। কেমন ক'রে তাই বলছি।

নাম?

তা, নাম যা হয় একটা ধরে নিলেই হয়। পুঁথি কেতাবে তো লেখা নেই—যে নামেই ডাকো, কেউ ভুল ধরতে পারবে না। নাম—ধরো বিষেণ।

বিষেণও শুনেছিল আগুনের কথা। বেড়া আগুনে ঘিরেছে এতবড় বনটা, পালাবার কোন পথ নেই—যেখান দিয়েই পালাতে যাও সাক্ষাৎ যমদূতের মতো দুটো লোক পাহারা দিচ্ছে, তাদের বাণে কেউ নিস্তার পাচ্ছে না। মরা ছাড়া পথ নেই, মরছেও সব দলে দলে।

বিষেণ লোকটা কিন্তু পিশাচের জীবন যাপন করলেও খুব হাঁদা ছিল না। সে একটু খোঁজখবর নিয়ে জানল আসল কথাটা, ক্রমাগত লাখ লাখ মণ ঘি খেয়ে আগুনের বদহজম হয়েছে—মাংস না খেলে সারবে না। মাংস খাবার জন্যেই এই সব বন পোড়ানোর আয়োজন। যেমন ঘি খেয়েছে—মাংসটাও সেই ওজনের হওয়া চাই তো! আগুনের ব্যাপার—এক আধটা জানোয়ারে কিছু হবে না।

তা খাও না বাপু জন্তু-জানোয়ার সাপ-খোপ ধরে ধরে—মানুষ নিয়ে

টানাটানি কেন !

তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পিশাচ,—কেন ? যা-তা খায় বলে ? তা আগুনই বা তাহ'লে পিশাচ নয় কেন ? সে-ও তো সর্বভুক, কী না খাচ্ছে ? এই যে বনটা পোড়াতে শুরু করেছে—এতে নেই কি ? পচা পাতা, পচা মাংস, পশুপক্ষীমানুষের বিষ্ঠা—সবই তো খেতে হবে তাকে। পিশাচদের খাবে যে সে-ও তো তাদের গায়ের ময়লা, ময়লা পোশাক সুদ্ধই পেটে যাবে ! তবে ?

বিষেণের রাগ হ'ল খুব। তবে তার এটুকু বুদ্ধি ছিল যে, রাগ করে শোধ না তুলতে পারলে নিজেরই শরীর নষ্ট। আর, সামনে যখন মৃত্যু এসে দাঁড়ায়—তখন ন্যায়-অন্যায়ের তর্ক না তুলে বাঁচবার চেষ্টা করাই উচিত আগে।

ওর যারা আত্মীয় সঙ্গী সাথী—তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে সবাই। পাগলের মতো শুধু অকারণ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, পালাতে চেষ্টা ক'রে অর্জুনদের হাতে বা সাক্ষাৎ আগুনের হাতেই মরছে। বিষেণ বুঝে নিয়েছে, ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করেও লাভ নেই। এতগুলো লোককে কৌশলে বাঁচানো যাবে না। আত্মীয় স্বজন ? আপন জন ? সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে কেউ আত্মীয় নেই। মরবার সময় সকলেই মরবে আলাদা আলাদা—কেউ কাউকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারবে না। মরবার পরই বা কে কার আপন ?

এত সহজ-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বিষেণ কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন মতলব ঠাওর করতে পারল না। না, ছুটোছুটি করে নি—আগুন যেদিক থেকে আসছে—তার থেকে অনেক দূরে একটা গাছে চড়ে বসে আগুনের গতি লক্ষ্য করছিল, আর ভাবছিল। হঠাৎই চোখে পড়ল তার গোকর্ণর ঝোপড়াটা। গোকর্ণ বিষম চালাক লোক—তার অনেকগুলি গাভি আছে, সে সেগুলি নিয়ে এই বনে বাস করত। গোকর্ণর জমিজমা নেই, ঐ গোরুগুলিই ভরসা, দুধ বা দই নিয়ে নতুন শহর ইন্দ্রপ্রস্থের বাজারে বিক্রি ক'রে আসে, বাকী যা থাকে মাখন তুলে জ্বাল দিয়ে ঘি তৈরী করে। বড় একটা জালা আছে, এক জালা ঘি জমলে সেটা মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে—যা দাম পায় সে টাকা থেকে কিছু দিয়ে আসে স্ত্রীপুত্রকে, কিছু জমিয়ে নতুন গোরু কেনে।

নিজের জন্যেও এটা ওটা কেনে—দরকারী জিনিস। একটু জমিতে নীবার ধানের চাষ করে—তাতেই খাওয়া চলে যায়, ধান কি যব কিনতে হয় না। বনে জমির কোন মালিকানা নেই, খাজনা দিতে হয় না। অনেকটা জমি শালকাঠের মজবুত বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে, রাত্রে সেইখানেই গোরু বাছুর এনে রাখে, বাঘ ভাল্লুক যাতে না খেতে পারে—দিনের বেলা গোরু নিয়ে নিজেই চরাতে বেরোয়। বনের ঘাস আর গাছের পাতা দেদার পড়ে আছে, যত পারো খাও। জন্তুর ভয় বলে খড়্গচর্ম* নিয়ে বেরোয়। বনে থাকতে গেলে নিয়তই আত্মরক্ষার কথা ভাবতে হয়, কাজেই ওটা শিখে নিতে হয়েছে।

ঐ গোকর্ণর জালাতে নিশ্চয় অনেক ঘি আছে। কারণ বহুদিন তাকে রাজধানীর দিকে জালা মাথায় যেতে দেখে নি। গোকর্ণকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, হয়ত কিছু কিছু গোরু নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে—বা চেষ্টা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। এক জালা ঘি বাঁচাবার চেয়ে—যাদের বাঁচালে অমন বহু জালা ঘি পাবে, তাদেরই বাঁচাবার চেষ্টা করবে—এ তো স্বাভাবিক।

বিষেণ এক লাফে মাটিতে লাফিয়ে পড়েই ছুটল গোকর্ণর চালার দিকে। সময় বড় অল্প। আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই, পাতা আর মাংস পোড়ার গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে প্রায়।

গিয়ে দেখল সে যা ভেবেছে তাই। জালাটা কানায় কানায় ভরা—ঘিয়ে। উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি, ঢাকা খুলতেই তার সুগন্ধ গেল নাকে। বিষেণের কাছে অবশ্য ওটা দুর্গন্ধই—পচা মাংসের গন্ধ তার কাছে অনেক বেশী প্রিয়। যে যাতে অভ্যস্ত।

জালাটা বেশ ভারী। কে জানে হয়ত এক মণেরও বেশী ঘি আছে এতে। তবু প্রাণপণে সেটা তুলল—মাথায় ক'রে এই নীচু চালা ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না—বুকে করেই বাইরে নিয়ে এল। প্রতি পদেই ভয়—এই বুঝি মাটির জালাটা ঘিয়ের ভারে আর তার হাতের চাপে ভেঙ্গে যায়—ঘি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘিই তার এখন প্রাণরক্ষার অস্ত্র।

জালাটা ঝোপড়ার‡ বাইরে নিয়ে এসে প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা মাথাতেও

---

* চামড়ার ঢাল আর তলোয়ার।

‡ পাতালতা দিয়ে নীচু যে দোচালা ঘর করা হয়—সাধারণত সাধু-সন্ন্যাসীরা এই রকম কুটিরে বাস করেন এখনও।

তুলল। গোকর্ণরই একটা আঙরাখা পড়েছিল, সেইটে বিড়ের মতো মাথায় বেঁধে জালাটা আগে একটা গাছের বাঁকা ডালে রেখে সেখান থেকে সাবধানে মাথায় তুলে নিল। মাথার চাপে ও ঘিয়ের ওজনে মাটি ভাঙতে কতক্ষণ?

এইবার বীরদর্পে বিষেণ এগিয়ে চলল আগুনের দিকে।

দেবতাটিকে চোখে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আগুনের শিখা আর দহনে তো তিনিই প্রত্যক্ষ।

বেশ খানিকটা কাছাকাছি এসে হাঁক দিল বিষেণ, 'ভো ভো অগ্নি, আমার কথা মন দিয়ে শোন। এই যে মাটির জালা দেখছ—এতে দু-মণের মতো (কে আর মেপে দেখতে যাচ্ছে? বিষেণ নিজের মনেই বলল) উৎকৃষ্ট হবি বা গাওয়া ঘি আছে, যা খেয়ে তোমার অসুখ। যদি আমাকে এই জালাটি সুদ্ধ নিরাপদে তোমার আগুনের বেড় থেকে বেরিয়ে যেতে দাও তো বেঁচে গেলে এ যাত্রায়, না হ'লে আমি এই ঘিয়ের জালার মধ্যে ডুবে বসে থাকব, আমাকে খেতে গেলে এই দু মণ ঘিও খেতে হবে—ভেবে ছাখো কি করবে। অনেক জন্তু জানোয়ার, সাপ খোপ, পাখী মানুষ তো খেলে —একটা হাতছাড়া হলে কিছু বিশেষ ক্ষতি হবে না, কিন্তু এই দু মণ ঘি খেলে আবার তোমার অসুখটি পুরোমাত্রায় চেপে ধরবে—তখন আবারও একটা বন খেতে হবে। আর বার বার কি অর্জুন পাহারা দিতে আসবে? ছাখো, ভাল করে ভেবে ছাখো!'

ভাল করেই ভেবে দেখেন অগ্নি। ঘিয়ের গন্ধ তিনি অনেকক্ষণ ধরেই পাচ্ছেন, পিশাচটা এত কাছে আসবার আগেই। তখন ভাবছিলেন এও একটা রোগ জন্মে গেছে তাঁর ভয়ে ভয়ে—ঘৃতাতঙ্ক ব্যাধি। কিন্তু এখন আর কোন সন্দেহই নেই। উৎকৃষ্ট হবি ঐ মাটির পাত্রটি ভরা—আগে হ'লে এই গন্ধেই তাঁর জিভে জল এসে যেত, এখন গা-বমি করছে, ভয়ে জিভ শুকিয়ে যাচ্ছে।

তবু একটা এত বড় সাজোয়ান মানুষ হাতছাড়া হবে—এ-ই বা কি করে সহ্য হয়।

অগ্নি প্রথমটা হম্বিতম্বি করলেন, ভয় দেখালেন। তারপর অনেক মিষ্টি কথাও বললেন, দু চারটে মিছে কথাও যে না বলেন তা নয়। শেষে বললেন, "বাপু, ইহজন্মে এই পিশাচের জীবন যাপন করছ, পরজন্মে মল-কীট হয়ে

জন্মাতে হবে। আগুনে পুড়লে এ সব দোষ দূর হবে—বুঝলে, সেই জন্যেই আমার আর এক নাম পাবক। মরে সোজা স্বর্গে চলে যাবে—যমরাজের এলাকার বাইরে। আর ছাখো, মরতে তো হবেই একদিন, এত ভাল মৃত্যু আর কি হতে পারে ?'

বিষেণও কাটা কাটা জবাব দিল, 'তোমার ওসব কথায় ভুলছি নি ঠাকুর। বিপাকে পড়লে অমন অনেকেই ভাল ভাল কথা বলে। মৃত্যুর আর ভাল মন্দ কি! মলে আপাতত এই দেহটা ছেড়ে যেতে হবে—সেটা তো দেখতে পাচ্ছি, মরবার পর কী হবো না হবো—কে জানে। কীট হলেই বা ক্ষতি কি! তখন সেই জীবনটাই দিব্যি লাগবে।'

অগ্নি খুব দমে গিয়ে বললেন, 'না, তুমি একটা মানুষ বাঁচলে একটা লোক কম খেলুম—সে এমন একটা বড় কথা নয়। আমি তো কিছু গুণে গেঁথে খেতে আসি নি যে হিসেবে কম পড়ে যাবে—মহাভারত অশুদ্ধ হবে! আসল কথাটা কি জানো, তোমাকে পথ দেওয়া বড় হাঙ্গামা—সেই ফাঁকে আরও এমন দশটা প্রাণী যে পালাবে না—তার ঠিক কি!'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'বরং তুমি এক কাজ করো—ঐ যেখানে কৃষ্ণ আর অর্জুন আছেন, সেইখানে গিয়ে অপেক্ষা করো—আমি কাছে পৌঁছলে বলে দেবে। তাঁরা তোমাকে ছেড়ে দেবেন, কিছু বলবেন না।'

'উহুঁ! সে তুমি কখন পৌঁছবে তার ঠিক নেই, ওরা হয়ত দূর থেকে দেখেই আমার দিকে বাণ ছুঁড়বে। তাছাড়া ওদের অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে শুনেছি, ঘিটা দূর থেকে যদি শুষে নেয়? এই তো ইন্দ্ররাজা রাজ্যের মেঘ নিয়ে তোমাকে নেভাতে এসেছিল, তুমি তো কিছুই করতে পারতে না—ওরাই তো দেখলুম কী অস্ত্র ছুঁড়ে মেঘ উড়িয়ে দিলে। না, না—ও কাজে আমি নেই! তোমার চালাকি আমি শুনছি না। পথ দেবে তো দাও, নইলে এই ঘিয়ের জ্বালায় ডুবলুম।'

কী আর করেন অগ্নি, এমন ফাঁপরে আর কখনও পড়েন নি বোধহয়। পথ ক'রেই দিতে হ'ল একটু—শিখা ত্বদিকে গুটিয়ে নিয়ে, একটা মানুষ যেতে পারে এমন পথ করে দিলেন, তার মধ্যে দিয়ে ঘিয়ের জালা মাথায় ক'রে কোনমতে, প্রাণ-নিয়ে-পালাতে-পারলে-হয় এইভাবে, বেরিয়ে এল বিষেণ। বিশ্বাস নেই কাউকেই—মুখের সামনে দিয়ে খাবার ফসকে গেলে অনেক

সময়ই মানুষ মরীয়া হয়ে ওঠে, দেবতারাও হবেন না—তার ঠিক কি ?

বিষেণ লোকটা পিশাচের মতো জীবনযাপন করলে কি হয়—মোটের ওপর অসাধু ছিল না। ওর স্ত্রীপুত্র ভাই-বোনরাও নিশ্চয় পুড়ে মরেছে, মনটা কি আর একটু খারাপ হয় নি ? নিশ্চয় হয়েছে, তবে খুব একটা শোক দুঃখ বোধ করছিল না। ঐ ভাবে পশুর অধম জীবন যারা যাপন করে তাদের এতটা 'আপন-আপন' ভাব থাকে না, শোকও হয় না। মানুষ মরে গেলে ওরা তাদের মাংসও খায়—কাজেই সাধারণ মানুষের মতো ওদের অত মায়া দয়া নেই।

কিন্তু তা না থাক, ওর চিন্তা এই ঘিটার জন্যে। ঘিটা ওর নয়—পরের। আগুনের বেড় থেকে বেরিয়ে এসে ঘিটা ফেলে দিলেই চুকে যেত, স্বাধীনভাবে কোন-একদিকে চলে যেতে পারত, অন্য একটা বন খুঁজে নিয়ে আবার নিজের মতো জীবন যাপন করত, কিন্তু বিষেণ তা পারল না। ওর কেবলই মনে হতে লাগল, বেচারী গোকর্ণ ! সে পুড়ে মলেও তার স্ত্রীপুত্র নিশ্চয় এখনও বেঁচে আছে। তাদের জন্যেই এই গভীর বনের মধ্যে একা পড়ে থাকত মানুষটা, তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে। এ ঘিও তাদের জন্যেই জমিয়ে রেখেছিল—ভাগ্যে জমিয়ে রেখেছিল, নইলে আজ আর তার প্রাণরক্ষা হবার কোন উপায়ই ছিল না, ঘিটার জন্যেই আগুনকে ফাঁকি দিয়ে বেরিতে আসতে পেরেছে—এ তাদেরই প্রাপ্য, ন্যায্য সম্পত্তি।

এখন তাদের দরকার আরও বেশী, সংসারের কর্তা গেল, গোরু-বাছুর-গুলোও গেল। কেউ খাওয়াবে কিম্বা খাওয়াবার ব্যবস্থা করবে—সে উপায়ও রইল না। এ ঘিটা নষ্ট করার কোন অধিকারই ওর নেই। বিশেষ গোকর্ণর কাছে তার আজ অসীম ঋণ ; তার ছেলেমেয়েদের ভার নেবে সে ক্ষমতা অবশ্য ওর নেই—তবু তাদের পাওনা এ জিনিসটাও যদি পৌছে দিতে পারে, কিছুটা দেনাশোধ হয়। অন্ততঃ ওকে অকৃতজ্ঞ কেউ বলতে পারবে না। পিশাচের জীবনযাপন করে ঠিকই, (তেমনি ওরা নিজেদের মতো থাকে, অন্য লোকের খাবারে জমিতে বাড়িতে ভাগ বসাতে আসে না)—তাই বলে অকৃতজ্ঞ কিম্বা চোর হবে কেন ?

এইসব পাঁচরকম ভেবেই ঘিয়ের বোঝা নামাতে পারল না বিষেণ। মাথায়

করে বয়ে নিয়ে গুটি গুটি নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের দিকেই এগোল। ঐখানেই কোথায় থাকে গোকর্ণর পরিবার—এটা শুনেছিল, সেখানে গিয়ে কি আর খুঁজে বার করতে পারবে না?

কষ্ট খুবই। ওদের খাওয়া পরার বাছ-বিচার নেই, যা পায় তাই খায়, মরা পচা কিম্বা জ্যান্ত সাপও কামড়ে খেতে আপত্তি নেই বলে অনেকটা স্বাধীন ওরা. রোজগারের জন্যে কোন পরিশ্রম কখনও করতে হয় না। সংসারী সামাজিক মানুষের এত দুঃখ কে জানত! এই বিরাট জালা ভর্তি ঘি নিয়ে গোকর্ণ অন্তত মাসে দুবার আসত,—উঃ, কত কষ্টই না হ'ত তার।

বিষেণ ভেবেছিল ইন্দ্রপ্রস্থে এলেই খোঁজ পেয়ে যাবে—ও বাবা! এ যে বিরাট জায়গা। একেই কি নগর বলে? কত রাস্তা, কত লোক, কত বাড়িঘর, পথের দুধারে বড় বড় পাকা ঘরে কত কী জিনিস সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। আশ্চর্য! অকারণে প্রয়োজন বাড়ায় মানুষ, আর এইভাবে তার খেসারৎ দেয়। এত জিনিসের দরকার কি? ওরা কি বেঁচে থাকত না? আন্দাজে আন্দাজে বুঝল এর কতকগুলো খাবার জিনিস—ফল সব্‌জি তো চেনেই কিছুটা—কতকগুলো পরবার। তা ছাড়াও চক-চক করছে কী সব ধাতুর পাত্র; ফুল ফুলের মালা—তাও দাম দিয়ে কিনছে মানুষ। কাপড় ছাড়াও কত জিনিস পরেছে মানুষ—সেগুলো যেন আলো লেগে আলো ঠিকরে ফিরিয়ে দিচ্ছে। একেই বোধহয় গয়না বলে। পায়েও চামড়ার তৈরী জামা পরেছে—ধুলো লাগবে বলে। আচ্ছা বোকা বটে! এত ঝামেলা বাড়িয়ে তার জন্যে এত খেটে লাভ কি! সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো—এই সহজ কথাটা বোঝে না কেন!

তা সে যা-ই হোক. গোকর্ণর বৌ ছেলেমেয়ে কোথায় থাকে সে খোঁজটা দেয় কে?

এখানে সবাই ব্যস্ত। কেউ ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, বলদের গাড়িতে বলদ-গুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ বা কাঠের খাঁচায় চেপে মানুষের কাঁধে চড়ে ছুটছে। সকলেই নিজেদের ধান্ধায় ডুবে আছে—ওর কথা শুনবে, শুনে জবাব দেবে কে? বরং কাছে গেলেই ওর গায়ের আর পরনের কাঁচা চামড়ার গন্ধে নাকে কাপড় দিয়ে বলছে 'দূর! দূর!'

এমনি করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরল বিষেণ, কোথাও কোন খবর মিলল না। তখন

হতাশ হয়ে নগরের পাঁচিলের কাছে জালাটা নামিয়ে রেখে পাঁচিলেই ঠেস দিয়ে বসল। শরীর ভেঙ্গে পড়ছে, চোখ বুজে আসছে তন্দ্রায়—কিন্তু ঘুমোতে সাহস হচ্ছে না। এ এক নতুন দায়িত্ব যেন চেপেছে মাথায়—যদি এই দেড় মণটাক ঘি কেউ নিয়ে চলে যায়—! ওকে তো মানুষই ভাবছে না কেউ। ওকে ঠকাতে কারও বিবেকে লাগবে না। ক্ষিধেও পেয়েছে এখন খুব—পেটে মোচড় দিচ্ছে। মাথা ঘুরছে ক্ষিধেতে। উঠে দাঁড়িয়ে নাকটা তুলে বাতাসের গন্ধ নিল, হ্যাঁ, একটা আধ-পচা মাংসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বটে। মরা শিয়াল কি কুকুর পড়ে আছে।

গন্ধ ধরে ধরে গিয়ে দেখল—ওর অদৃষ্টটাই খারাপ—বড় কিছু নয়, বুনো ইঁদুর একটা। তাই হোক, খোসাটোসা—মানে লোম ছাল ছাড়িয়ে সেইটেই খেয়ে নিল, তবু কিছু তো পেটে পড়ল। তারপর পরিখার পচা জল আঁজলা করে তুলে খেয়ে এসে বাকী রাতটা জেগে বসে ঘি পাহারা দিল।

সারারাত জেগে একটা বুদ্ধি খেলেছে মাথায়। সকালে উঠে—ঘিয়ের জালা মাথায় করে আবার লোকালয়ে ফিরে এল। এবার আর গোকর্ণর বাড়ি নয়—রাজার বাড়ি কোনদিকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। রাজা কখন সভায় বসেন তাও।

উত্তরও মিলল। লোকে নাকে কাপড় দিয়ে দিকটা দেখিয়ে দিল, কেউ কেউ কাপড় চাপার মধ্যে থেকেই সময়টাও বলে দিল—দ্বিতীয় প্রহরের শুরুতেই সভায় আসেন, আর প্রথমেই প্রার্থীদের প্রার্থনা ও অনুযোগকারীদের বক্তব্য শোনেন।

দ্বিতীয় প্রহর-টহর অত বোঝে না বিষেণ। রাতে শেয়াল ডাকে—সে সময় বোঝা যায়। ও সোজা যে দিকটা দেখিয়ে দিল লোকে—সেই মুখো গিয়ে বড় একটা বাড়ি দেখে সেখানে ঢুকে পড়ল।

প্রথমে তো সিপাই সান্ত্রীরা 'মার মার' ক'রে তেড়ে এসেছিল। 'যা বেরো, দূর হ—ইল্লৎ কোথাকার।'

কিন্তু বিষেণ অত কাঁচা লোক নয়, সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি যা-ই হই, আমিও রাজা যুধিষ্ঠিরের একজন প্রজা। আমার বিশেষ একটি প্রার্থনা আছে, তিনি শুনতে বাধ্য।'

অগত্যা কী আর করে—তারা পথ ছেড়ে দিল। রাজাও তো জানে কেমন লোক, কোন দর্শনপ্রার্থী বা বিচারপ্রার্থী ফিরে গেছে শুনলে—ওদেরই শাস্তি দিয়ে বসবেন।

সেই কারণেই—রাজসভাতেও কেউ কিছু বলতে সাহস করল না। মুখটা ফিরিয়ে নিতে পারল না বটে—রাজসভায় এমন কিম্ভূতকিমাকার দৃশ্য কেউ দেখে নি এর আগে—সকলেই নাকে কাপড় দিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এলেন কিছু পরেই। তিনি প্রজার অপমান হবে বলে নাকে কাপড় দিলেন না, প্রাণপণে দুর্গন্ধটা সহ্য ক'রে নিলেন, তবে আগেই ওকে ডাকলেন, 'কী চাই বাপু তোমার?'

ততক্ষণে ঘিয়ের জালাটা মাথা থেকে নামিয়েছে বিষেণ অনেক কসরৎ ক'রে। এখন দু'হাত জোড় ক'রে বলল, 'মহারাজ, এই এক জালা ঘি, আপনারা যাকে হবি বলেন—গোকর্ণ বলে একটি লোকের। সে খাণ্ডববনে গোরু পুষে ক্ষোয়া ক্ষীর আর এই ঘি তৈরী করে বিক্রি করত, তাতেই তার সংসার চলত। গতকাল অগ্নি গোটা খাণ্ডব বনটা পুড়িয়েছেন, খুব সম্ভব গোকর্ণ তাতে গোরু-বাছুর সুদ্ধ পুড়ে মরেছে। এই ঘিটা আমি অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি, এটা তার ছেলেমেয়েদের প্রাপ্য। বেচারারা তো এখন অনাথ হ'ল—এটাও যদি পায় তবু কদিন চালাতে পারবে। আমি তাই এটা এখানে রেখে যাচ্ছি, আপনি তাদের খোঁজখবর করে ডেকে আনিয়ে দিয়ে দেবেন।'

যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আমি যদি তাদের খুঁজে বার করতে না পারি?'

'আজ্ঞে মহারাজ, সে পথও আমি ভেবে রেখেছি। আপনি রাজা, আমার মতো নিঃস্ব পিশাচ তো নন। আপনি ইচ্ছে করলে কি আর এ খবরটা বার করতে পারবেন না? তাহ'লে আর এত লোক পুষছেন কেন? তবে যদি খুব তাড়াতাড়ি চান তো দয়া ক'রে কাউকে বলুন নগরে ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করুক—যে কেউ খাণ্ডববন-বাসী গোয়ালা গোকর্ণর পরিবারের সন্ধান দেবে—তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমার মনে হয় তাতেই কাজ হবে!'

কে একজন সভাসদ ঠাট্টা ক'রে বলে উঠলেন, 'তা সে পুরস্কারের টাকাটা—?'

বিষেণ একটু হেসে বলল, 'সেটা উনিই দেবেন। ওঁর এক গরীব প্রজা

অকারণে বিনাদোষে পুড়ে ম'ল—তার পরিবারের জন্যে এটুকুও না করলে ধর্মরাজ নাম যে মিথ্যে হয়ে যাবে !'

যুধিষ্ঠির বোধহয় খাণ্ডবদাহর জন্য মনে মনে লজ্জিতই ছিলেন, এখন এই কথাতে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সে লজ্জা ঢাকতেই তাড়াতাড়ি বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে, আমি এখনই ঘোষণার আদেশ দিচ্ছি। কিন্তু বৎস, আমি তোমার সততা, হৃদয়বত্তা, বুদ্ধি ও বিবেচনা দেখে খুব তৃপ্ত হয়েছি। তোমাকেও কিছু পুরস্কার দিতে চাই, তুমি কি পেলে আনন্দিত হও, বলো।··· যদি ভদ্রভাবে মানুষের মতো বাস করতে চাও তো আমি তোমাকে চাষের জমি ও বাস করার মতো ঘরও দিতে পারি—'

'রক্ষা করুন ধর্মরাজ। এ জীবন আমার পোষাবে না। এখানে দেখি অকারণ লোভ মানুষের, তার দণ্ড দিতে জীবনান্ত, যত অশান্তি। বোধ হয় এই লোভের জন্যেই যুদ্ধ লড়াই ক'রে মরে লোক। না, আমি বেশ আছি, বেশ থাকি আমরা—যাকে আপনারা অখাদ্য বলেন তাই খেয়েই আমরা বেঁচে থাকি, তার জন্যে খাটতেও হয় না, ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহও করতে হয় না। তেমন খাবার ও পরবার জিনিসের অভাবও নেই। আমি আর একটা বন দেখে নেব, না হয় দুর্গম পাহাড়ে চলে যাব। আপনি যে আমার দায়িত্বটা নিয়েছেন—এতেই আমার শান্তি।'

বিষেণ বেরিয়ে যাচ্ছে—এমন সময় 'দাঁড়াও !' বলে বিকট হুঙ্কার দিয়ে—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন। তাঁর রঙ লাল, চুল দাড়ি-গোঁফ সব লাল, চোখ দুটো যেন জ্বলছে—বিষম রুক্ষ দৃষ্টি আর কঠোর মুখভাব।

তিনি যেন সকলকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমি অগ্নি। আপনার কাছে এই পিশাচটার নামে অভিযোগ করছি। এ আপনার কাছে সত্য গোপন করেছে, পুরো ঘটনাটা বলে নি—আমাকেও একরকম প্রতারণা করেছে—চালাকি করে আমাকে আহারে বঞ্চিত করেছে, তাকেও মিথ্যাচারই বলা যায়—আপনি একে শাস্তি দিন।'

এই বলে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আগুন সব ঘটনাটি খুলে বললেন। বিষেণের বুদ্ধির বিবরণ শুনে অনেকেই মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। বেশ একটু চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গেল রাজসভায়। জোরেই হাসতেন, অগ্নির অভিশাপের ভয়ে চেপে গেলেন।

যুধিষ্ঠিরও বোধহয় অতিকষ্টে হাসি চেপে বললেন, 'অগ্নিদেব, এটা ঠিক মিথ্যাচরণের পর্যায়ে পড়ল না, লোকটি বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে বরং। আমাকেও, অনাবশ্যক বলেই বোধহয়, ও ঘটনাটা বলে নি। তাতে সত্য গোপনও বোঝায় না। আর আমি যতদূর শাস্ত্র পড়েছি, মিথ্যা বললেও দোষ হ'ত না। পরিহাসছলে, স্ত্রীলোকের কাছে, প্রাণরক্ষার্থে, বিবাহ সুসম্পন্ন করতে এবং সর্বস্ব যেখানে যেতে বসেছে তা রক্ষা করতে—মিথ্যা কথা বলায় দোষ নেই।'

থেমে যাওয়া সময়

এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একটা মজার খবর বেরিয়েছিল। আসামের জঙ্গলে নাকি কয়েক লক্ষ বৎসর আগেকার স্যাঁৎসেঁতে বাষ্পে-ঢাকা আব্‌হাওয়ার মধ্যে সেই সময়কারই অতিকায় জন্তু দেখতে পাওয়া গেছে! খুব ঢ্যাঙ্গা মানুষও নাকি তার পায়ের হাঁটু ছাড়িয়ে মাথা তুলতে পারে না—আর সে জন্তুটা নাকি বিরাট বটগাছের সব চেয়ে উঁচু ডাল থেকে কচি কচি ডগা ভেঙে খায়।

সে এক বিরাট হৈ-চৈ কাণ্ড! আসাম সরকার বিলেতে লোক পাঠালেন বিশেষজ্ঞ আনতে। এখানকার প্রাণি-বিজ্ঞান্‌বিদ্‌রা ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলেন। খবরের কাগজের লোক ছুটল ক্যামেরা নিয়ে। পুলিস ছুটল স্থানীয় অধিবাসীদের সামলাতে, পাছে তারা অমন জন্তুটাকে মেরে ফেলে। চিড়িয়াখানায় শোরগোল, ইতিহাসের পাতা থেকে সেই প্রাণীর কাল্পনিক ছবি নিয়ে রাস্তার মোড়ে জটলা! কেউ বলল গাঁজা, কেউ বলল, 'না হে হিমালয়ান রিজ্যনে সবই সম্ভব। ওর ঐ বিরাট গহ্বরে কি আছে কে বলতে পারে! মনে নেই? সেই ডুয়ার্সের জঙ্গলে কুড়ি ইঞ্চি পায়ের ছাপ, কে যেন সাত ফুট মানুষও দেখেছিল? ও-ও তো তোমার সাব-হিমালয়ান রিজ্যন, আধা হিমালয়ান অঞ্চল।'

এমনি করে জল্পনা-কল্পনা উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা এবং বাজী-রাখারাখির শেষ রইল না একেবারে! কত খবরের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পর্যন্ত বেরিয়ে

গেল! একগাদা টাকা খরচ করে মার্কিন হুজুগে বড়-লোকেরা—মানে যাদের এমনি হুজুগ ছাড়া পয়সা খরচ করবার অন্য পথ নেই—হাওয়াই জাহাজ চেপে ছুটে এল মজা দেখতে, আরও কত কি!

তারপর এক সময়ে আবার সব জুড়িয়ে গেল! ঠিক কী হ'ল, ব্যাপারটার কোন হদিস হ'ল কি না তাও জানা গেল না। আসাম গভর্ণমেণ্টও কোন বিবৃতি দিলেন না ভাল ক'রে এ সম্বন্ধে। হয়ত বা সরকারী ফাইলের মধ্যে ধামা-চাপাই পড়ে গেল ব্যাপারটা! তুচ্ছ ছোটখাটো ঝগড়া, জাতিগত স্বার্থের কচকচির মধ্যে এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক বিপর্যয়ের সংবাদ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল, ও সব নিয়ে কে এখন মাথা ঘামায়? তুমিও যেমন! শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল যে ওটা গাঁজাই—অর্থাৎ গাঁজাখুরী খবর।

এরই মধ্যে অমিয় ভাতুড়ী একদিন আমার কাছে এসে হাজির। পরনে হাফ্ প্যাণ্ট, খাকি বুশ-শার্ট, কাঁধে একটা কাঁধঝোলা—তাতেই একটা পাত্‌লা কম্বল ঝোলানো! একেবারে এক্‌সপিডিশনের বেশ!

'ব্যাপার কী রে?' প্রশ্ন করলুম।

'চললুম।' শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে।

'কোথায়? কেন? কবে?' একসঙ্গে আবার প্রশ্ন করি।

'আজই যাচ্ছি—আসাম মেলে। আর মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে। যদি আর না ফিরি মাকে একটু দেখিস—' নাটকীয়ভাবে বলে সে থামল।

কিছুই বুঝতে পারি না ব্যাপার কি। ব্যাকুল ভাবে বলি, 'কিন্তু হ'লটা কি, যে জন্যে একেবারে উইল ক'রে যেতে হচ্ছে?'

'যাচ্ছি হিমালয়ের জঙ্গলে সেই অতিকায় জন্তু দেখতে। কী জানি—বলা তো যায় না, ওখানে নানারকম জন্তু আছে, গণ্ডারও হয়ত পাওয়া যায়, ভালুকের তো কথাই নেই, তার ওপর সাপ—বড় বড় ময়াল, পাইথন!'

সে চোখ বড় বড় ক'রে সংবাদটা দিলে, অর্থাৎ আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা!

'কিন্তু তুই তা ব'লে এই অসময়ে পড়াশুনো ছেড়ে একা চললি কি করতে? তোর কি এখন এই সব বুনো-হাঁস তাড়া ক'রে বেড়াবার সময়? তা ছাড়া তুই মায়ের এক ছেলে। এই ছুতোয় বাড়ি থেকে পালাচ্ছিস।'

'ছুতো নয় রে ছুতো নয়। গভর্ণমেণ্ট তো কিছু করলে না—যদি আমি

এ রহস্য ভেদ করতে পারি তো, শুধু যে আমারই একটা অক্ষয় কীর্তি থেকে যাবে তাই নয়—এই সব মূর্খ গভর্ণমেন্টদেরও কিছু শিক্ষা দেওয়া হবে।'

'ও! তুই সেই গাঁজার পেছনে ছুটছিস—পড়াশুনা সব কামাই ক'রে? ও তো স্রেফ গাঁজা! শুনিস্‌নি পুলিস অনেক কষ্ট করেও সে জন্তু তো দূরে থাক, সে রকম কোন জায়গাই খুঁজে পায় নি!'

'আরে ওরা তো কাজ করে হুকুম তামিল করতে হবে ব'লে তাই। ওরা মূর্খ, ওদের সাধ্য কি এসব ব্যাপারের মর্ম বোঝে? এতে যে সমস্ত মানব-ইতিহাসের তত্ত্বটা বদলে দিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে ওদের? না জ্ঞান কী বস্তু তাই বোঝে? তা বলে আমি তো আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারি না।'

'কেন তুমিই বা এমন কি মাতব্বর?' বিদ্রূপ করি ওকে, 'এত সব রথারথী থাকতে—'

অমিয় বাধা দিয়ে বলল, 'তা নয়। বেশ মনে আছে, অনেকদিন আগে, মানে মরবার কিছু আগে বাবা একটা অদ্ভুত গল্প করেন। সে একজন যেন মিস্টার দাস না রায়, সুধীরবাবুর বইয়ের দোকানে বসে ঐ গল্প করেছিলেন—এখন থেকে ঠিক বিশ বছর আগে, আর বাবা যখন বলেছিলেন তখন থেকেও চৌদ্দ বছর আগে। সে ভদ্রলোক সরকারী কাজে একবার নাকি নাগাদের দেশে গিয়েছিলেন। সাধারণত যে সব কর্মচারী যায়,—কোনমতে কাজ সেরে শহরে পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে, ঠিক সে রকম তিনি ছিলেন না, তাঁরও মনে এসব ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে কী কী দেখবার জিনিস আছে, স্থানীয় ইতিহাস যদি কিছু পাওয়া যায়, কোন্ শিল্প সেখানকার বিখ্যাত, মানুষদের জীবন-যাত্রার ধরন কি—এসব খোঁজ করতেন। একবার তিনিই খোঁজ করতে করতে এক নাগাদের গাঁয়ে গিয়ে পড়েন। কিছুদিন আগেও একবার এসেছিলেন তিনি। তখন সেখানকার সর্দারের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব হয়েছিল। পরিচয় তো ছিলই—তার ওপর আবার এবার তিনি সঙ্গে বিস্তর উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিলেন, ছুঁচ-সুতো, বোতাম, চায়ের কাপ, কাঁচকড়ার মালা, তাস—এই সব। সর্দার খুব খুশী হয়ে গ্রামের অতিথিশালায় তিন দিন ওঁকে ধরে রাখে, একজোড়া হাতির দাঁত আর ভালুকের চামড়া উপহার দেয়, আর শেষদিনে বলে যে, তুই কেবল এসে বিরক্ত করিস—

কী নতুন জিনিস আছে দেখবার জন্য, তা যাবি এক জায়গায়? ও ভদ্রলোক তো উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। সর্দার বলল, পথ খুব দুর্গম কিন্তু, একদিনের রাস্তা! উনি বললেন, তা হোক্। তখন সে নিয়ে গেল ওঁকে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরে। ন' ঘন্টা ক্রমাগত হেঁটে, তিন ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার দু'ঘন্টা হেঁটে, সন্ধ্যার কিছু পরে গিয়ে পৌঁছলেন একটা জায়গায়। সেখানে কোন আশ্রয় নেই। একটা পাহাড়ের গুহার সামনে আগুন জ্বেলে রাত কাটাতে হ'ল। আবার পরের দিন ভোরে অল্প একটু জঙ্গল ভেঙ্গে সে যেখানে নিয়ে গেল সেখানে এখনও জলা স্যাঁৎসেঁতে—সেই প্রাগৈতিহাসিক দিনের মতো। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বড় গাছের ডালপালা ভেদ ক'রে সূর্যকিরণ আসে না সেখানে কখনও, আর সর্বদা একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। সেই রকম স্থানে অনেকক্ষণ একটা গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করার পর দূরে পাঁকের মধ্যে বিরাট কি একটা আলোড়ন উঠল, যেন একপাল হাতী জলে নেমেছে। সর্দার তাঁকে ইশারা ক'রে জানাল যে—ঐ আসছে। তারপর আরও খানিকটা পরে আওয়াজটা যখন কাছে এল তখন হঠাৎ সে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল—ঐ। ভদ্রলোক চেয়ে দেখেন সে একটা পাহাড় যেন হেঁটে হেঁটে আসছে! অবশ্য খুব কাছে সে আসে নি, এলে বিপদ হবে জেনেই সর্দার এমন জায়গায় বসেছিল, যেখানে সে আসে না। কিন্তু যতটা দেখা গিয়েছিল তাতে মনে হয় গিরগিটির মতো একটা অতিকায় প্রাণী, মোটে দুটো পা, বিরাট গলা বাড়িয়ে প্রকাণ্ড মহীরুহের ওপর থেকে কচি পাতা খাচ্ছে আর ল্যাজের ঝাপটে কাদা ছেট্‌কাচ্ছে। সেই মূর্তি দেখেই তো তাঁর হয়ে গিয়েছিল—তিনি সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে দে-ছুট! সর্দারও জন্তুটাকে প্রণাম ক'রে সরে পড়ল। সে বলেছিল যে উনি নাকি কোন্ দেবতা!'

এই পর্যন্ত বলে অমিয় থামল।

বললুম, 'তারপর?'

'তাঁর সঙ্গে ক্যামেরা ছিল না। তিনি স্থানটাও ঠিক ক'রে বলতে পারেন নি—সর্দার এমন পথে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল যে বোঝা শক্ত। চেনাও কঠিন। সুতরাং সবাই তাঁর কথা গাঁজা বলেই উড়িয়ে দেয়। তিনি আর একবার গিয়ে ছবি আনবেন স্থির করেছিলেন, হঠাৎ ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা

যান। সেই থেকে কথাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার বাবা মনে ক'রে রেখেছিলেন, মরবার কিছুদিন আগে আমাকে তিনি একদিন গল্প করেন। বাবা কথাটা খুব অবিশ্বাসও করেন নি। তিনি বলেছিলেন যে, সে ভদ্রলোক মিছে কথা বানিয়ে বলবার লোক নন। আর তা যে নন, এই খবরেই তা প্রমাণ, এতকাল পরে সে কথাটা এমন করে উঠবে কেন? যাক্‌গে, আমার সময় বড় কম, চললুম।'

কথাটা ভাল ক'রে বুঝে তার সঙ্গে তর্ক করার কিংবা কোন বাধা দেবার আগেই সে এক লাফে বেরিয়ে চলে গেল।

এর পর তিন মাস অমিয়র কোন পাত্তা নেই। ওর বিধবা মা কেঁদে মরেন, কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে দেওয়া হবে কিনা ওর কাকা চিন্তা করেন। আসাম পুলিসেও খবর দেওয়া হয়, কিন্তু তারা খুঁজে পায় না ওকে।

হঠাৎ তিন মাস পরে সে ঘুরে এল। ওর অমন সোনালী রং যেন কালি হয়ে গিয়েছিল। আমাশা আর জ্বরে শীর্ণ—যেন ধুঁকছে একেবারে। প্রথমটা ওর সঙ্গে কোন কথাই কওয়া গেল না, কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে একে একে সব গল্পটা শুনলাম। বিশ্বাস অবশ্য আজও করি নি কিন্তু গল্পটা শুনে আপনারা যদি কেউ এ সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর করতে চান তো করতে পারেন। সেই জন্যই সেটা শোনাচ্ছি আপনাদের—

এখান থেকে গৌহাটি, সেখান থেকে অনেক খোঁজ-খবর ক'রেও নাগাদের দেশে পৌঁছয়। ওর অনেক অসুবিধা ছিল, যে কথাগুলো—অভিজ্ঞতা কম বলে—এখানে থাক্‌তে ও ভেবে দেখে নি। প্রথমত টাকা ছিল না বেশি, দ্বিতীয়ত এর আগে কখনও আসামে যায় নি। ভৌগোলিক অবস্থাটা মোটে জানা নেই। তার ওপর সবচেয়ে বড় কথা, ওদের ভাষা জানে না। অমিয় যখন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তখন তারা বোঝে না, আবার তারা যখন উত্তর দেয়—ওরও সেই অবস্থা। তবুও খুঁজে খুঁজে উত্তর-পশ্চিম আসামের দুর্ভেদ্য পাহাড়ে-জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছল। পথ দুর্গম, গাড়ি-ঘোড়া নেই। হাঁটা-পথে রাস্তা ভুল হয়, প্রশ্ন করবে কাকে? তাছাড়া পদে পদে বুনো হাতীর ভয়, ভাল্লুকের ভয়, সাপের ভয়। তার ওপর আছে নাগা আর কুকীরা। প্রথম প্রথম ওর হাফ-প্যাণ্ট দেখে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করত—সে এক

জ্বালা। ওরা পুলিসের ওপর ভারি চটা—পুলিস ওদের বড় বিরক্ত করে। প্রত্যেক লোকালয়ে গিয়ে ওকে আগে প্রমাণ করতে হ'ত যে ও পুলিসের লোক নয়—বেড়াতে এসেছে। সহজে তা প্রমাণ হ'ত না—এক এক সময় ওদের বিষাক্ত তীর বা বল্লমে প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছে! যাত্রী বলে বোঝাতে পারলে তবে আতিথ্য নিতে পারত গ্রামে, নইলে থাকবে কোথায়?

সে আতিথ্যও খুব নিরাপদ নয় অবশ্য। এক গ্রামের সর্দার ওকে একবার গ্রামের বাইরে পঞ্চায়েতি অতিথিশালায় থাকতে দিল। ছেটেবাঁশের বেড়ায় মাটি-নিকানো, বেশ ঝক্‌ঝকে ঘরটি। একপাশে বাঁশেরই মাচায় চৌকি তৈরী করা, তাতে শুক্‌নো পাতার বিছানা। ফল মূল দুধ, সেবার ব্যবস্থাও মন্দ নয়—কিন্তু একটা ব্যাপারে ওর খটকা লাগল। প্রকাণ্ড ঘর, তিনটে দোরের খিলেনও রয়েছে কিন্তু তাতে কোন আগড় বা কপাট নেই। সর্দারকে প্রশ্ন করতে সে বেশ সহজকণ্ঠে শুনিয়ে গেল—কপাট ক'রে তো কোন লাভ নেই, বুনোহাতীর পাল যখন আসে, তখন দরজা বন্ধ দেখলেই ভেঙ্গে দিয়ে যায়। 'আচ্ছা আসি', বলে সে খুব স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে গেল। সামনেই পাহাড়ে-রাস্তা, ওপরে পাহাড়, নিচে খাদ। এরই মধ্যে যদি বুনোহাতীর পাল থাকে? তাছাড়া খোলা দরজা—বাঘ ভাল্লুক তো যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে। শুকনো পাতা জ্বেলে আগুন করবে বেচারী, সে উপায়ও নেই, আগুন দেখলেই হয়ত হাতীর পাল এসে হাজির হবে। অমিয় বলে সেই এক রাত্রির দুশ্চিন্তায় তার এক বছরের পরমায়ু চলে গিয়েছিল।

অমিয় সত্যি-সত্যি অনেকবারই মৃত্যুর দোর পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে এসেছে। একবার ওর চোখের সামনেই বুনোহাতী একটা মোটর গাড়ি উল্‌টে খাদে ফেলে দিলে। সে নিজেও তার সামনে পড়েছিল, অনেক কষ্টে একটা ঢালু জায়গায় গাছ ধরে ঝুলে প্রাণ বাঁচায়, আর একবার একটা বাঘের সামনে পড়ে। দূর থেকে একজন পাহাড়ী তীর মেরে বাঘটাকে সাবাড় করে ওকে রক্ষা করে।

তবু অমিয় হাল ছাড়ে নি। বনের ফলমূল খেয়ে আর এইভাবে চলে একসময় ও এমন একটা স্থানে পৌঁছল যেটা দক্ষিণ-হিমালয়ের একটা দুর্ভেদ্য ও একেবারে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল। এটা আসাম সরকারের অধীন, কি ভূটানের কি তিব্বতের, তা বোধ হয় কোন দেশের সরকারই জানে না। কোন মানুষ

তার আগে সেখানে এসেছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু সভ্য মানুষ যে যায় নি এটা ঠিক। কোন পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন কোথাও নেই, সূর্য দেখে দিক্ বুঝতে হয়। পথ নিজে নিজে ক'রে নিতে হয়। ওর সঙ্গে বহু দূর পর্যন্ত এক নাগা গিয়েছিল, তারপর সেও হাল ছেড়ে পালিয়ে আসে।

কিন্তু জায়গাটায় পৌঁছে ওকে অনেকটা নেমে আসতে হয়েছিল এটা ঠিক, মানে পার্বত্য অঞ্চল ঠিকই, কিন্তু খুব উঁচু নয়। অর্থাৎ হিমালয়ের ও অঞ্চলটা যেন টোল খেয়ে দেবে গেছে! ফলে এখানটায় খুব শীত নয় কিন্তু কেমন একটা চাপা চাপা আব্‌হাওয়া। সর্বদাই মেঘলা ভাব, নিবিড় ঘন লতাপাতা ও জঙ্গল ভেদ ক'রে সূর্যকিরণ সে অঞ্চলে কখনই পৌঁছয় না, চারিদিকের উত্তুঙ্গ পাহাড়ে দিনের আলো যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়, ওখানে আসে না। আর একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব, যেন সব সময় সেখানে বাষ্প জমে আছে খানিকটা।

অমিয় কিছুই জানত না, কিন্তু ঐ আব্‌হাওয়াতে মনে হ'ল সে যা দেখতে চায় তা এই স্থানেই মিলবে! কোথায় মিলবে, কোন্ দিকে তার যাওয়া উচিত, তা অবশ্য সে জানে না। সুতরাং শুধুই ঘুরে বেড়ায় ইতস্তত। সঙ্গে খাবার নেই। সামান্য যা বিস্কুট ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। টর্চের ব্যাটারি নিবু-নিবু, দেশলাই ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে। এ অবস্থায় আর ক'দিন থাকতে পারে মানুষ? যা-তা ফল খেয়ে আমাশা, রোজ জ্বর আসে। সঙ্গে অস্ত্র নেই, ভরসার মধ্যে এক নাগার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া এক বর্শা। তাও কোন জন্তুর সামনে পড়লে হাতে থাকবে কিনা কে জানে?

অগত্যা ওকে ফিরতে হ'ল। কোনমতে তিনটে দিন সেই ভাবে কাটিয়ে হতাশ হয়ে ও ফিরছে—আন্দাজে আন্দাজে দক্ষিণ দিক হিসেব ক'রে ক'রে, এমন সময় এক অঘটন। নিবিড় জঙ্গলে আগাছা সরাতে সরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে একটা গাছের ডালে বসে বিশ্রাম করছে এবং পা থেকে এক মনে জোঁক ছাড়াচ্ছে, এমন সময় সহসা পেছনে যেন মানুষের কণ্ঠস্বর! চমকে চেঁচিয়ে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দেখলে যে, সত্যি সত্যি মানুষ। চুলে দাড়িতে লোমে জট পাকিয়ে কতকটা বনমানুষের মতো দেখতে হয়েছে তাকে, গায়ে বস্ত্রের বালাই নেই, কোনমতে কতকগুলো শুকনো পাতায় লজ্জা নিবারণ করা হয়েছে মাত্র! চোখের দৃষ্টি উগ্র, গায়ের রং ফরসা, কিন্তু লোমে ও ময়লায়

বোঝবার উপায় নেই, নখগুলো বড় হয়ে বেঁকে গেছে ক্রমশ।

ওকে ঐভাবে ভয় পেতে দেখে সে হাসল। এব্ড়ো থেব্ড়ো দাঁত, কিন্তু একটাও ভাঙ্গা নয়। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে বেটা? এখানে কেন এসেছ, তুমি কি আংরেজের গোয়েন্দা?'

অমিয়রও হিন্দীজ্ঞান তথৈবচ। তার উপর ঠক্ ঠক্ ক'রে সে কাঁপছে তখন। তবু কোনমতে বুঝিয়ে দিলে—সে গোয়েন্দা নয় সে বাঙ্গালী। অদ্ভুত একটা জন্তুর সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে।

সে লোকটির তবুও যেন সন্দেহ যায় না। বলল, 'সচ্? আচ্ছা! মহারাণী ভিক্টোরিয়া এখনও রাণী আছেন, না বাহাদুর শাহের ফৌজ আবার দিল্লী দখল করেছে? খবর জানো কিছু?'

অমিয় তো হাঁ। লোকটা পাগল তো বটেই, শেষ পর্যন্ত কিন্তু মার-ধোর না করে ওকে।

ওর মুখের ভাব দেখে সে দু-পা এগিয়ে এল। প্রশ্ন করল, 'কথা বুঝতে পারছ না?'

'আ—আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা তো কবেই মারা গেছে!'

'মরে গেছে? ঝুটি বাত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা গেছেন, তাঁর ছেলে গেছে, নাতি গেছে—এখন নাতির ছেলে রাজা। তা ছাড়া এখন আর ইংরেজদের রাজত্ব নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি।'

'তাই নাকি!' ওর যেন বিশ্বাসই হয় না। সে বলল, 'তা হ'লে কি আবার সিপাইরা লেগেছিল লড়াইতে?'

'উহুঁ, এবার সিপাইরা নয়। মহাত্মা গান্ধী নিরস্ত্র আন্দোলনে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।'

'মহাত্মা গান্ধী? সে আবার কে?'

এতক্ষণে অমিয়র মনে হ'ল যে, কোথায় একটা গণ্ডগোল হচ্ছে! সে সংক্ষেপে মহাত্মা গান্ধীর পরিচয়টা দিলে। তখন লোকটি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে এটা কত সম্বৎ জানতে চাইল। সম্বৎ কাকে বলে অমিয় জানে না—সে ইংরেজী সাল বলল। লোকটি আরও খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, 'সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনেছ?'

'শুনেছি! সে তো আঠারশো সাতান্ন সালের কথা। এখন থেকে প্রায় একানব্বই বছর আগেকার কথা!'

লোকটা বিহ্বল ভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ঝুট্। আমি কে জানো? আমি নানা সাহেব। ত্যাতা টোপী আর আমি সিপাইদের চালিয়েছিলুম।'

এবার অমিয়র পালা। সে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে ওরই মতো গলার সুর ক'রে বলল, 'ঝুট্! তুমি আসলে পাগল।'

এইবার লোকটা যেন জ্বলে উঠল একেবারে, চোখ রক্তবর্ণ ক'রে কী কতগুলো হড়বড় ক'রে বকে গেল! সে যে কি ভাষা, তা অমিয় বুঝতে পারল না। কিন্তু আমার মুখে মারাঠি বুলি শুনে বলেছিল পরে,—সে কতকটা এই রকমই বটে।

তারপর লোকটি হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর সেই থাবার মতো নোংরা হাতে ওকে চেপে ধরে বলল, 'আমি সুরযনারায়ণের দিব্যি করছি, গঙ্গামায়ির দিব্যি করছি, আমিই নানাসাহেব। বিশ্বাস করো। গণপতি ভগবানের দিব্যি করছি, আংরেজরা টোপীকে ফাঁসি দিয়েছে তা আমি জানি, তাই পালিয়ে এসেছি। ঠিক কতদিন এসেছি বলতে পারব না তা তবে তুমি যতদিন বলছ অতদিন হয় নি নিশ্চয়ই, বড়জোর তিন কি চার বছর।'

অমিয় তো ভয়ে কাঠ! কোনমতে পাগলটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারলে বাঁচে! তবে সে জোর গলায় বলল, 'আঠারশো সাতান্নতে সিপাই বিদ্রোহ হয়—এটা উনিশশো আটচল্লিশ। আমি তোমাকে ঠিকই বলছি। শুনেছি আমার ঠাকুরদার বাবা সে সময়ে মিরাটে ছিলেন।'

লোকটি খানিকটা বিহ্বল ভাবে ওর দিকে চেয়ে থেকে ওর হাত ছেড়ে দিল। তারপর খানিকটা চোখ বুজে থেকে বলল, 'আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি তাহ'লে? এতদিন কেটে গেল, অথচ কিছুই টের পাই নি? অবিশ্যি সময়ের হিসেব রাখা এখানে সম্ভব নয়, তা ব'লে এত তফাত!'

তারপর সহসা যেন একটা চমক ভেঙ্গে উঠে সে বলল, 'আচ্ছা, তুমি কি দেখতে এখানে এসেছ বললে?'

অমিয় ওকে সব বুঝিয়ে বলল, মানে যতটা বোঝানো সম্ভব। সব শুনে সে বলল, 'আচ্ছা! সৃষ্টির আগে এই রকম সব জানোয়ার ছিল নাকি পৃথিবীতে?

আমরা এসব খবর কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি যে রকম জানোয়ার বলছ সে রকম কেন শুধু, আরও ঢের অদ্ভুত রকমের অতিকায় জন্তু আমি দেখেছি। প্রথমটা ভাবতুম ভূত, তারপর মনে করেছিলুম যে এদেরই আমাদের শাস্ত্রে দানব বলে। আবার এক রকমের বিরাট পাখী আছে গলাটা তাদের সাপের মতো অথচ এধারে পাখা—বিরাট পাখা। সে স্থানটা কিন্তু এখান থেকে অনেক দূর, আর যে বিশ্রী পাঁক—তরল পাঁকের সমুদ্র যেন! আমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি। ঐ একটা আঁশওয়ালা দৈত্যের মতো গিরগিটি তাড়া করেছিল। ওখান থেকেই কোন একটা হয়ত ছিটকে গিয়ে পড়েছে লোকালয়ে। তবে সে স্থান অত্যন্ত দুর্গম, তুমি যেতে চাও?'

অমিয়র অবশ্য যাবার মতো অবস্থা ছিল না তবু সে বলল, 'আপনি পথ দেখাবেন?'

মাথা নেড়ে নানাসাহেব বললেন, 'না, সেখানে যেতে আমার সাহসে কুলোবে না, তোমারও গিয়ে কাজ নেই; তুমি ফিরে যাও।'

তারপর দু'জনেই চুপচাপ।

খানিকটা পরে নানাসাহেব বলল, 'আমি একটা কথা কি ভাবছি জানো?'

'কি?' অমিয় প্রশ্ন করে।

'এখানটায় বোধহয় সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে সময় হঠাৎ থেমে গেছে। কাল এগোয় নি, বয়স বাড়ে নি—সেই সময়েরই একটা বছর থেকে সব থমকে গেছে। আমিও তার মধ্যে এসে পড়ে সেই বয়সেই থেকে গেছি—এর ভেতর যে একানব্বই বছর কেটে গেছে তা বুঝতেই পারি নি! নইলে এমন হবে কেন?'

লোকটা যে বদ্ধ পাগল সে সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল অমিয়র, তা কেটে গেল। সে তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

কোনমতে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'ঠিক! ঠিক!'

লোকটি বললে, 'তা তুমিও এখানে থেকে যাও না! থাকবে?'

অমিয় বললে, 'না, সে আমি পারব না। তার চেয়ে আপনি ফিরে চলুন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাকে সকলে মাথায় ক'রে রাখবে! হয়ত স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি আপনিই হবেন!'

'তাই নাকি? যাবো তোমার সঙ্গে? আংরেজ নেই, ঠিক জানো? যদি ধরে ফাঁসী দেয়?' তার চোখ যেন জ্বলতে লাগল, আগ্রহে সামনের

দিকে ঝুঁকে পড়ল সে।

অমিয় কথাটা বলে ফেলে ফ্যাঁসাদে পড়ল। তবু মিছে কথা বলতে পারল না। সে বলল, 'কোন ভয় নেই—আপনি নির্ভয়ে চলুন।'

লোকটি তখনই বেরিয়ে পড়ল ওর সঙ্গে, সেও বিশেষ পথ চেনে না—তবুও অমিয়র সঙ্গে হাৎড়ে হাৎড়ে চলল। এরই ভেতর একবার একটা প্রকাণ্ড কী পাখী বিশ্রী একটা গর্জন ক'রে চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এত ভয় পেয়েছিল অমিয় যে ভাল ক'রে চাইতেই পারল না সে অনেকক্ষণ, তবুও ওর সন্দেহ হল সেটা টেরোড্যাক্‌টিল জাতীয় জীব।

নানাসাহেব এতকাল এদেশে থেকে খাদ্য-খাবারের খোঁজ রাখতেন—তিনি খুঁজে খুঁজে নানা রকমের ফল সংগ্রহ করে অমিয়কে দিলেন।

কিন্তু নানাসাহেব বেচারীর আর সভ্যতার মুখ দেখা হয়ে উঠল না। সেই স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা হিমালয়ের গহ্বর থেকে মুক্তি পেয়ে ওরা লোকালয়ের দিকে উঠে আসতেই বিচিত্র এক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ লোকটি যেন শুকিয়ে কুঁকড়ে বুড়ো হয়ে গেল—অসম্ভব রকমের! বোধহয় চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সে এমন পরিবর্তন যে অমিয় ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল! শেষে লোকটা যখন পথের ধারেই পড়ে মিনিট কতকের মধ্যে মারা গেল, তখন আর ওর জ্ঞান রইল না—ভয়ে দিশাহারা হয়ে পাগলের মতো খানিকটা ছুটে গিয়ে এক গ্রামের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ভাগ্যিস্ নাগারা দেখতে পেয়েছিল ওকে! কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেবা ক'রে দুধ খাইয়ে তবে চাঙ্গা করে।

কিন্তু অমিয়র গল্পের সেইটাই শেষ নয়।

সে বলে যে সে যে কাদিন ঐ অঞ্চলে ঘুরেছে তার কোন হিসাব পাচ্ছে না, অর্থাৎ সব দিনগুলো ধরলে ওর তিন মাসের বেশী হয়—কিন্তু ঠিক ঐ কটা দিনই কি ক'রে বাদ পড়ে গেছে!

বিকারের খেয়ালে কী দেখেছে হয়ত—কে জানে!

কিন্তু অমিয় তা স্বীকার করে না।

সে তারপরও বারবার বলেছে—ঘটনাটা সত্যি, তার ওটা বিকারের ঘোর নয়।

সাধুবাবা

সে হ'লও আজ অনেকদিন। আমার ছোটবেলাকার ঘটনা—আজ থেকে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর আগের কথা। যতদূর মনে পড়ছে সেটা ১৯১৯ কিংবা ১৯১৮ সাল।

এখন যাঁরা পুরী যান তখনকার পুরী শহর ভাবতেই পারবেন না। বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দা বা যাত্রী যাঁরা যেতেন, তাঁরা সকলেই স্বর্গদ্বারকে কেন্দ্র ক'রে থাকতেন, ঘনবসতি বলতে ঐটেই বোঝাত। কিছু ধনী লোকের বড় বড় বাড়ি ছিল চক্রতীর্থের দিকে—কিন্তু সে গরমের দু'মাস ছাড়া বেশির ভাগই খালি পড়ে থাকত, সন্ধ্যাবেলা ওদিকে যেতেও গা ছমছম করত।

তাও এখনকার স্বর্গদ্বারের মতো ঘিঞ্জি ছিল না। এত দোকান-পসার কিছুই হয় নি। কোন খাবার কি এক কাপ চাও মিলত না পয়সা দিয়ে। বাঁকে নিয়ে যে খাবারওলারা আসে তারাই ছিল ভরসা, রসগোল্লা পান্তুয়া মিলত, এ ছাড়া মুড়ি চিঁড়ে-ভাজা বাদাম-ভাজা আর কলা—জলখাবার বলতে এ-ই। এসব চিঁড়ে-ভাজা-টাজাও একটু ভেতর দিকে বা মন্দিরের দিকে এলে তবে পাওয়া যেত। অবশ্য তখন জগন্নাথদেবের মিষ্টি প্রসাদ ভাল ঘিয়ে ভাজা হত—তার যেমন স্বাদ তেমনি সুঘ্রাণ। অন্য বাঙালীবাবুরা পছন্দ করতেন কিনা জানি না, আমাদের খুব ভাল লাগত।

আমরা সেবার খুঁজতে খুঁজতে একটা নতুন বাড়ি ভাড়া পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে একেবারে স্বর্গদ্বার বা শ্মশানের ওপরই। এই শ্মশানই হল আসলে স্বর্গদ্বার। ঐ থেকেই পাড়াটার নামকরণ হয়েছে। বাড়িটার নাম 'প্রিয়ধাম'। এখনও আছে, তবে এখন দেখলে আর সে বাড়ি কেমন ছিল বুঝতে পারবেন না। সামনের খোলা বারান্দাটা ঘিরে ঘর ক'রে নেওয়া হয়েছে, তাও সময়ে মেরামত হয় না, বালি-খসা নোনা-ধরা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। নামটাও বোধহয় পাল্টাই হয়েছে। তখন ঐ বারান্দাটাই ছিল সবচেয়ে লোভের, চওড়া অথচ কাঠের রেলিং দেওয়া, একটা বেঞ্চি এবং একটা চৌকিও পাতা থাকত, বসে সমুদ্র দেখার জন্যে। ঘর বলতে দুখানি

মাত্র, একটা বড়, একটা ছোট। বড়টা আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম, ঘর রান্নাঘর পাইখানা বাথরুম। ছোটটারও সব আলাদা—সেটায় থাকতেন এক সাধুবাবা—গেরুয়া নয়, সাদা কাপড়ই কাছা খুলে পরতেন, মাথাটি কামানো, কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু তা আজও জানি না, সবাই বলত সাধুবাবা তাই আমরাও বলতুম। দিনান্তে একবার খেতেন—বেলা একটা নাগাদ, তবে খাওয়ার পারিপাট্য ছিল খুব। নিজেই বসে বসে কুটি-কুটি একঘর রাঁধতেন, একটু ভাত হত, ছ-সাতখানা ছোট ফুলকো লুচি, কোনদিন বা খিচুড়ি আর লুচি, দুধ পেলে পায়েসও করতেন। ডাল তরকারি সুক্তো এসব তো আছেই। এই ছাড়া কেউ কিছু খেতে দিলে তাও ঐ সঙ্গে খেতেন। আমরা মহাপ্রসাদ খেতুম—তাও এক একদিন কিছু কিছু দিলে ঐ সঙ্গেই খেতেন। প্রসাদ যেটুকু খাবার—খেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে নিজের ভাত লুচিতে হাত দিতেন। মহাপ্রসাদের সঙ্গে তেল-দিয়ে-রান্না-করা তরকারি খাওয়া নিষেধ।

এ লোকটির কথা এত বলছি এই জন্যে যে, লোকটি অদ্ভুত। আমরা চোরের ভয় পেলে বলতেন, 'তোমরা দরজা খুলে ঘুমোও—এ বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকতে পারবে না। চুরি যায় আমি তার দায়ী।' পরে দেখেছিলুম ও জেনেছিলুম, উনি সারারাত জেগে তপস্যা করেন। মাঝে মাঝেই কাঙালী ভোজন করাতেন—কেউ না কেউ পয়সা দিতই,—খুবই ভাল খাওয়াতেন কিন্তু খাওয়াবার সময় একগাছা বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কেন না কাঙালীরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-দাঙ্গা করত—উনিও সপাসপ বেত চালিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতেন। বেঁটেখাটো মানুষ কিন্তু গায়ে জোরও ছিল খুব, একবার দুটো ঝটকাওলা (তখন টপ্পর দেওয়া গোরুর গাড়ি গোরুর বদলে ওখানে মানুষে টানত, দক্ষিণ ভারতে বলত ঝটকা, পুরীতে কি বলত মনে নেই) মাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আবার কী অপমানসূচক কথা বলেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল আমাদের ঐ বাড়িটার কাছেই। কার মুখে খবর পেয়ে সাধুবাবা, রান্না করতে করতেই, উঠে এসে দু'হাতে দুটোর গলা ধরে শূন্যে তুলে ঠকাঠক মাথা ঠুকতে লাগলেন। তারা তো পরিত্রাহি চিৎকার একেবারে, উনি তত বলেন, 'আছড়ে মারব ধোপার কাপড়ের মতো, ছাখ্ না কী হাল করি,' শেষে ছাড়া পেয়ে মায়ের পায়ে ধরে রাস্তায় নাকখৎ দিয়ে তবে অব্যাহতি পায়।

একবার ওখানে কুষ্ঠ আশ্রমে কী হয়েছিল, সেবা করার লোক নেই—উনি শুনে স্বেচ্ছায় যেতেন, সন্ধ্যাবেলা ফিরে নিমপাতা ফুটিয়ে সেই জলে স্নান করে বাড়ি ঢুকতেন, বলতেন, 'তোদের বীজাণু ফীজাণু যা থাকে ওতেই মরে যাবে, নিমের কাছে কেউ নয়।' এই বলে গল্প বলতেন একটা, উড়িষ্যার কোন কবিরাজের ছেলে কবিরাজ হয়ে দূর এক শহরে প্র্যাকটিস করতে বসেছে। ছেলে কী রকম কবিরাজ হ'ল দেখার জন্য বড় কবিরাজ একটি লোককে একখানা চিঠি আর কিছু খরচের টাকা দিয়ে ছেলের কাছে পাঠালেন। তখন হাঁটাপথ ছিল তো, বলে দিলেন, 'তুমি বাপু যখন বিশ্রাম করবে কি রান্নাখাওয়া করবে, তেঁতুল গাছের তলা দেখে করবে।' সেইমতো গিয়ে লোকটা যখন ছেলের কাছে পৌঁছল তখন তার গায়ে কুষ্ঠের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ছেলের হাতে চিঠি দিতে সে চিঠি খুলে ছ্যাখে, তাতে কিছুই লেখা নেই, সাদা কাগজ। তখন সে লোকটিকে বললে, 'বাবা কি বলে দিয়েছেন ঠিক করে বলো দিকি।' সে বললে, 'আর কিছু তো বলেন নি, শুধু বলেছেন যে খাবে ঘুমোবে বসবে—সব তেঁতুলগাছ দেখে তার তলায়।' ছেলে বললে, 'বুঝেছি, তুমি এই উত্তর নিয়ে যাও। তবে একটা কথা, ফেরার পথে কিন্তু তুমি যা করবে, নিমগাছের তলা বেছে নেবে। বসো, রান্নাখাওয়া করো বা ঘুমোও—সব ঐ নিমগাছের তলায়।' সে লোকটা যখন এসে পৌঁছল তখন তার কুষ্ঠ সেরে গেছে। কবিরাজ সব শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলে আমার চিকিৎসা ঠিক ঠিক শিখেছে, তাতে কোন ভুল নেই।'

হ্যাঁ, যা বলছিলুম, আসল গল্পটা।

সেদিন সন্ধ্যা সবে হয়েছে তখন, আমরা সমুদ্রের ধার থেকে প্রায় তখনই বেড়িয়ে ফিরেছি, বৌদি চিঁড়ে-ভাজা বাদাম-ভাজা ঘি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখছেন, মনটা আছে সেই দিকে, অলসভাবেই শ্মশানের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় একটি মড়া এল। সেদিনটায় একটু মেঘ মেঘ ভাব ছিল, তাই যতটা হবার কথা তার চেয়ে বেশীই যেন অন্ধকার হয়ে এসেছিল। তখন ইলেকট্রিক হয়নি—শ্মশানে তো আলো নেইই, পথেরও যা তেলের আলো—তার অধিকাংশই জ্বলত না। যারা মড়া পোড়াতে আসত, নিজেরা হ্যারিকেন বা মশাল নিয়ে আসত। তবে তখন স্বর্গদ্বারও ফাঁকা ছিল, দেখতে খুব

অসুবিধা হত না। বিশেষ ক'রে তখন একটা চিতা জ্বলছিল অনেকক্ষণ থেকেই, তার আলোতেও অনেকটা দেখা যাচ্ছিল।

যে লাশটি এসেছিল, মোটাসোটা বিরাট মানুষ একটা। ঘোর কালো রং—দূর থেকে মনে হচ্ছিল বিপুলাকার একটা মোষ পড়ে আছে।

জলখাবার খাচ্ছি আর দেখছি বসে; কীই বা কাজ! আমরা কাশীতে পড়তুম। ক্লাস প্রমোশন হয়েই গরমের ছুটি পড়ত—হোম টাস্কের বালাই ছিল না। নতুন বই তখনও কেনা হত না—তা পড়ব কি? দেখছি ওরা বেশ কাঠটাঠ দিয়ে চিতা সাজাল—বেশী করেই দিল—মানুষটার আন্দাজে—তারপর লাশ চিতায় তুলে আগুন ধরিয়ে দিল।

বেশ আগুন জ্বলে উঠেছে, আমরাও কী একটা গল্পে এ কথাটা ভুলে গেছি—হঠাৎ যেন একটা চাপা চিৎকার শোনা গেল, মানুষ খুব ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে যেমন হয়—কিন্তু এ অনেকগুলো মানুষ—চমকে চেয়ে দেখি, যে লোকগুলো এ মড়া এনেছিল তারা তো বটেই, পাশে যে চিতা জ্বলছিল তাদের লোক, এমন কি সরকারী ডোম—সবাই পড়ি কি মরি করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। বালির ওপর দিয়ে ছোটার জুত নেই, পড়ছে উঠছে আবার পড়ছে—আর ভয়ে চাপা একটা বোকা-বোকা শব্দ করছে।

কী ব্যাপার প্রথমটা বুঝতে পারি নি, কারণ চোখটা ছিল ওদের দিকেই। এবার এই নতুন চিতাটার দিকে চেয়ে বুঝলুম ব্যাপারটা—এবং বলা বাহুল্য আমাদেরও হাত পা হিম হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

দেখি মৃতদেহটা জ্বলন্ত চিতার ওপরই একটু একটু ক'রে উঠছে।

উপুড় হয়ে শোওয়ানো ছিল—পুরুষ মানুষের দেহ উপুড় করেই শোওয়ানোর কথা, এখন অবশ্য অনেকে অত মানে না, তখন মানত—সেই অবস্থাতেই একটু একটু ক'রে উঠছে, মনে হচ্ছে দু'হাতে ভর দিয়ে লোকটি উঠছে আস্তে আস্তে।

কালো চেহারাটা আগুনে ঝলসে আরও কালো হয়েছে—চিতার জ্বলন্ত আগুনে দেখতে কোন অসুবিধে নেই—উঠছে যে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। ওদিকে সাধুবাবাও বসে আছেন তাঁর ছোট্ট টেবিলটার ওপর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পেটে দুটো হাত রেখে—তিনিও দেখছেন।

স্বাভাবিক যা প্রতিক্রিয়া তা হ'ল ছুটে ঘরে গিয়ে দড়াম ক'রে দোর বন্ধ

করে দিই। কিন্তু উঠব কি ক'রে, তাহলে তো নড়তে নয়—হাত-পা তো পাথর হয়ে গেছে, আর একা তো এক পাও যাওয়া চলবে না—একসঙ্গে সবাই ঘরে না গেলে যাওয়া যায় কী ক'রে?

ওদিকে সে লোকটি কিন্তু উঠছে তো উঠছেই। একটু একটু ক'রেই উঠছে তো—অতবড় পাহাড়ের মতো দেহটা—একেবারেই তো টপ ক'রে উঠে পড়তে পারে না—ঘাড়টা শোওয়াবার সময় এদিকে কাত করা ছিল, সেই ভাবেই উঠছে। অনেকক্ষণ পরে, আমাদের তো হাত পা অসাড় হয়ে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ ওরই মধ্যে—মনে হচ্ছে এক যুগ ধরে এই ঘটনা ঘটছে, সাধু-বাবা পরে বলেছিলেন মোট পাঁচ সাত মিনিট হবে হয়ত—প্রচণ্ড একটা কি ফটাস ক'রে শব্দ হ'ল—তারপরই আবার ধুপ ক'রে পড়ে গেল চিতার ওপরই। আর সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাক ছ্যাক ক'রে একটা শব্দ উঠল, মনে হল জ্বলন্ত কাঠে কে কলসী ক'রে জল ঢেলে দিলে। ব্যাপারটাও দাঁড়ালো সেই রকমই, মানে সঙ্গে সঙ্গে চিতাটাও প্রায় নিভে এল। একেবারে নিচের দিকে একটু ছাড়া আর কোথাও কোন আগুনের চিহ্ন রইল না।

তবু আমাদের নিঃশ্বাস যেন পড়তে চায় না, সবটাই যেন পাথর হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ সময় লাগল একটু একটু ক'রে দেহে ও মনে সাড় ফিরে আসতে।

মা এতক্ষণ পরে কেমন এক ধরনের কাতর কণ্ঠে শুধু বললেন, 'বাবা—?'

'বুঝলে না মা, সন্ধ্যেবেলার মড়া, আজ আবার ত্রিলোচনাষ্টমী, একবার মাথা তুলে জগন্নাথের মন্দিরটা দর্শন ক'রে গেল যাবার আগে।'

বিশ্বাস হবারই কথা। কারণ মাথাটা এই দিকেই ঘোরানো ছিল। মুখটা মন্দিরের দিকে। যতটা উঠেছে মনে মনে আন্দাজ করা গেল—ঠিক অতটা উঠলেই চুড়োটা দেখতে পাবার কথা।

সুতরাং মা পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন সেটাই স্বাভাবিক। তিনি অতি কষ্টে আবারও প্রশ্ন করলেন, 'তাহ'লে—মানে তাহ'লে কি লোকটা বেঁচেই ছিল, জ্যান্ত লোককে—? না কি, ওর আত্মাই—? আত্মা হ'লে সে তো এমনিই দেখতে পাবে, শবটা—?'

'দূর বেটি!' সস্নেহে ধমক দিয়ে উঠলেন সাধুবাবা, 'তুই ভেমো গয়লার মেয়ে নাকি? দেহে প্রাণ থাকলেও এতক্ষণ পোড়বার অপেক্ষায় বসে

থাকবে? আর তার অত বুদ্ধি হবে যে মাথা তুলে জগন্নাথকে দেখে আবার স্বেচ্ছায় পুড়ে মরবে? যদি বেঁচেই থাকে, মানে অজ্ঞান লোককে মড়া বলে এনে থাকে, তাহ'লে জ্ঞান ফিরে এলে তার তো প্রথম মনে হবে চিতা থেকে উঠে পালাবো! আসলে উত্তুরীর মড়া, বুঝলি না, ঐ ঢাকের মতো পেট দেখে আমি আগেই বুঝেছি—এক পেট জল জমে আছে, জলটা যত গরম হচ্ছে তত বাষ্প হয়ে উঁচু দিকে ঠেল দিচ্ছে, তাতেই উঠছে একটু একটু ক'রে। তারপর আর পাতলা চামড়া সহ্য করতে পারল না, ফট ক'রে ফেটে যেতেই ভিস্তি ফুটো হওয়ার মতো জলটা বেরিয়ে গিয়ে পড়ে গেছে আবার। দেখলি না, এত জল যে চিতাটা নিভে গেল প্রায়।…এর মধ্যে ভূত-প্রেত দানা-দত্যি কিছু নেই, লোকটাও বেঁচে ছিল না—কিছুই না।'

বাব্‌বা! আমরা এতক্ষণে সহজ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। তবু বউদি সে রাত্রে কিছুতেই আর ঘরের বাইরে যেতে রাজী হ'ল না, আর পাছে যেতে হয় বলে রাত্রে খেলেও না কিছু।

আমরা নিশ্চিন্ত হলেও ব্যাপারটার কিন্তু অত সহজে নিষ্পত্তি হল না।

সঙ্গের লোকগুলি অবশ্য আস্তে আস্তে আবার ফিরে এল। ফিরে এল কতকটা প্রাণের দায়ে। ওদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে তখন খুব ভূতের ভয় ছিল, চিতা নিভে গেল—মড়া পুড়ল না, যদি ভূতই ভর ক'রে থাকে! সুতরাং ওটা আবার জ্বালা দরকার। নইলে 'ওঁরা' মানে উপদেবতারা যাবেন না। জ্বললও আবার, যে যার কাজ শেষ ক'রে রাত এগারোটা নাগাদ ফিরে গেল—আমরা তো তার ঢের আগেই শুয়ে পড়েছি, কখন ঠিক গেছে জানিও না।

কিন্তু তারপরই একটা বিষম ঘোঁট শুরু হয়ে গেল।

শুনলুম আমাদের পিছন দিকে—গোবর্ধন মঠের কাছাকাছি থাকত লোকটি, ছুতোরের কাজ করত। একটি মেয়ে, তার বিয়ে হয়ে গেছে, আরও অনেক ছেলেমেয়ে হয়েছিল, কেউ বাঁচে নি। এখানে নিজেদের বাড়ি আছে, খড়ের ঘর, কিছু জমিজমাও আছে আশপাশে। এখান থেকে কিছু দূরে কোনারকের পথে নিয়াখিয়া নদীর ধারে ওর আসল গ্রাম, সেখানেও বাড়ি আছে, জমি আছে কিছু। অর্থাৎ অবস্থা একেবারে খুব খারাপ না। সম্ভবতঃ

বিধবার হাতে দুচারটে টাকাও আছে। লোকটার নাম ছিল রঘু, বউটির নাম রোহিণী।

এইবার নানা পরামর্শদাতা এসে জুটল রোহিণীর কাছে, এক একজন এক একরকম বলে আর কিছু কিছু টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যায় বিধবার কাছ থেকে।

পাড়ার এক পণ্ডিত বলেছে, 'সন্ধ্যেবেলা মড়া নিয়ে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে। এই সময় অপদেবতাদের ঘোরার সময় তো, তারা তো এমনি শবই খোঁজে। কোন দুষ্ট অপদেবতা ভর করেছে, সে ঐ আধপোড়া শবটা নিয়েই পালাচ্ছিল, চিতা নিভিয়েও দিয়েছিল—ওদের দলের ভূতপ্রেত এসে জল ঢেলেছিল বুঝলে না?—কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ মন্দিরের চূড়োর দিকে নজর পড়তেই—কাল একাদশী ছিল, বিভীষণ দেখবেন বলে চূড়ায় আলো দেওয়া হয়েছিল তো—ঐ দেখেই ভয় হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়েছে আবার তবে সে দুষ্ট আত্মা যায় নি তখনও, ওর আত্মাকে ভর ক'রে আছে। ও দোষ না কাটালে শ্রাদ্ধশান্তি যা করো সব বৃথা!'

রোহিণী তবু একবার ক্ষীণস্বরে বলতে গেল যে, 'একাদশী তো কাল ছিল না, একাদশী তো আজ সবাই বলছে—?'

'হু, হু। উপবাস তো আজ। তিথির শেষ ধরে উপবাস হয় তা জানো না। কাল তো পড়ে গেছে। এবার যে একাশি দণ্ড* সময় পেয়েছে একাদশী তিথি। আজও আছে, আজও আলো জ্বলবে।'

'এত তো পায় না,' কে একজন বলতে গেল, 'কই আমাদের পাঁজিতে—'

'রেখে দাও দিকি বাপু তোমাদের পাঁজি। এখানে ও বাংলা পাঁজি খাটবে? আমাদের এখানে মাদ্‌লা পাঁজি চলে। তাতে লেখা আছে, হয় না হয় মন্দিরে গিয়ে দেখে এসো।'

এর পর আর কথা চলে না। লোকটি মাত্র একশোটি টাকা নিয়ে চলে গেল, সেইদিনই সে গয়ায় রওনা দেবে, সেখানে প্রেতের কাজ ক'রে এলে তবে নাকি এখানে শ্রাদ্ধ হবে। সাধুবাবা বললেন, 'ওকে আমি চিনি,

---

* এক দণ্ড = ২৪ মিনিট। ৬০ দণ্ডে ২৪ ঘণ্টা। সাধারণত খুব বেশী থাকলেও একটা তিথি ৬০ দণ্ডের বেশী ওপর যায় না কখনও।

ভুবনেশ্বরে ওর কে থাকে, সেইখানে গিয়ে সাতদিন তোফা আরামে কাটিয়েই আসবে।'

কাছেই কোন্ এক মঠের পূজারী সব শুনে বললে, 'নিয়ে গেল তো বুজরুকটা কিছু টাকা আদায় ক'রে। বেশ এখন মাসখানের নেশার খোরাক হ'ল। আরে অপদেবতাই যদি ভর করবে সে তো তখনই শবটা নিয়ে পালাতে পারত। আগুন জ্বালা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কেন? আগুন ছুঁলে ভূত পালায়, সেই ভূত আগুনে এসে ভর করবে? শ্রীমন্দিরের চুড়ো দেখলেই যার ভয় হবে—সে কখনও স্বর্গদ্বারের এলাকায় ঢুকতে পারে? ওসব বাজে কথা।...আসল কথা হচ্ছে—বাবা আমরা এতকাল মঠে আছি, ঠাকুর-দেবতা সাধুদের নিয়ে কারবার করছি, আমাদের থেকে এসব কথা কি ও বেশী জানবে?—আসল কথা কোন গুরুতর মহাপাতক ছিল, তাতেই প্রেত হয়ে গেছে নিজেই। ঐ যে দেখলে শব উঠছে—আসলে সেই সময়ই আত্মা বেরিয়ে গেল দেহ থেকে। আগে পর্যন্ত ওতেই আটকে ছিল, যখন দেখল যে দেহই আর থাকবে না, তখন বেরিয়ে গেল, মুক্তি যে হয় নি, ছুটি যে পায় নি এ সংসার থেকে—সেইটেই পাঁচজনকে জানিয়ে দিয়ে গেল ঐ ভাবে। পণ্ডিত কোন ব্যক্তি থাকলে তখনই বলে দিত কথাটা।... এর সবচেয়ে ভাল প্রক্রিয়া কি জানো, ঐ চিতাতেই যজ্ঞ করতে হত, এর একটা ক্রিয়া আছে তন্ত্রে, সহজে মিটে যেত!'

বিবর্ণ মুখে বিধবা প্রশ্ন করল, 'তা এখন কি উপায় বাবা? কোনমতে কি ছুটি দেওয়া যায় না লোকটাকে?'

'কেন যাবে না। খুব যায়। যাবে না তো কি লোকটা প্রেত হয়ে থেকে পাড়ার লোকের অনিষ্ট ক'রে বেড়াবে?...সে আমি ঠিক ক'রে দেব। যজ্ঞ করতে হবে। এ বড় কঠিন যজ্ঞ কিন্তু, তিনদিন লাগবে যজ্ঞ শেষ করতে। কিছু খরচা করতে হবে। তবে আমি তোমার টাকাকড়ি নেব না—যা বলব যোগাড় ক'রে দেবে। তোমার সামনে এই মঠেই যজ্ঞ হবে, নিজের চোখে দেখবে—আমার কাছে কোন লুকোছাপা ব্যাপার নেই। আমি ওর মতো বুজরুক কি জোচ্চোর নই যে করব বলে ভাঁওতা দিয়ে টাকা নিয়ে সরে পড়বো। তবে হ্যাঁ, তিনদিন উপবাস ক'রে থেকে এই কঠিন যজ্ঞ করব, তিন পাঁচে পনেরোটি টাকা আমার দক্ষিণা চাই, আর মঠাধিপতির পূজা ও ধুতি,

মোহান্তর ধুতি এগুলো চাই, নইলে ওঁরা অনুমতি দেবেন কেন? আর আমার একটি পট্টবস্ত্র। কম দামের, খেলো হলেও চলবে। পট্টবস্ত্র না পরে তো আর যজ্ঞে বসতে পারবো না—আমার নিজের নেই। এইগুলি যোগাড় ক'রে দিতে পারো তো আমি হোম ক'রে দেব।'

যোগাড় আর সদ্য-বিধবা কোথা থেকে করবে? পোস্টাপিস থেকে টাকা এনে দেড়শটি টাকা পূজারীর হাতেই ধরে দিলে।······

ওদের যিনি পুরোহিত, তিনি কোথায় বিয়ে দিতে গিয়েছিলেন মফস্বলে, তিনি শুনতে পেয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটতে ছুটতে এলেন—তারপর বিবরণ সব শুনে জিভ দিয়ে টাকরায় 'টক্ টক্' এমনি একটা আওয়াজ ক'রে বললেন, 'নিয়ে গেল তো ঠগগুলো একরাশ টাকা ঠকিয়ে? কেন, এই তিনটে দিন তর সইল না? আমি এসেই যা হয় করতুম। তোর টাকা খুব সস্তা হয়েছে, না? যজ্ঞ করবে? আরে শ্রাদ্ধ হল না যজ্ঞই বা কি করবে, প্রেতশিলায় পিণ্ডিই বা কি দেবে। এ কি অপঘাতে মরেছে যে প্রেতশিলায় যাবে?···শোন্, শোন্, ওসব কিছু নয়, আসলে মস্ত দোষ পেয়েছে। সেদিন মঙ্গলবার, তায় কৃষ্ণাদশমী তিথি, তায় রোহিণী নক্ষত্র—পুরো ত্রিপাদ দোষ পেয়েছে, মানে স্ত্রীর নামে নক্ষত্রের নাম হওয়াতেই আরও এই বিপত্তি! এই দোষটি কাটাতে হবে, তবে সে শ্রাদ্ধের সঙ্গে কি তারপর কোন একাদশী দেখে করলেই হবে। তবে আর একটি খুব মারাত্মক দোষ পেয়েছিল—তাকে বলে ত্রিপুরারি দোষ। সে কেউ জানে না। আমি সেখানে কাজ করতে করতে নারায়ণকে ধ্যান করছি, হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, তখনই বুঝলুম কোথায় কি হল—এক মনে ধ্যান করতে করতে রঘুর মরবার খবরটি পেয়ে গেলুম, সেই সঙ্গে দেখি সর্বনাশ। এই ত্রিপুরারি দোষ পেলে তো আর রক্ষা থাকবে না—রঘুর ভার্যা রোহিণী, ওর মেয়ে ভুবনেশ্বরী, জামাই সকলের তো অপঘাত হবে, ও এমন দোষ যে একবার পেলে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকে না, ভিটেতে দূর্বাঘাসও গজায় না—কি করি, রঘু আমার খুব ভক্তিমান যজমান ছিল তো, তখনই সেই যজ্ঞে বসেই একটা ক্রিয়া করে সে দোষকে থামিয়ে রাখলুম। ঐ ওখানে যেমন আমি 'তিষ্ঠ' বলেছি, তখনই দেহটা আবার চিতায় পড়ে গেছে।···কিন্তু থামিয়ে রাখলেও কাটানো যায় নি তো, ওটা বাপু এই তিন চার দিনের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে।'

'কী করতে হবে?' গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে রোহিণীর, সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করে।

'বেশী কিছু না, করতে হবে যা আমাকেই। তিন দিনে তিন লক্ষ বিরজামন্ত্র জপ করতে হবে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে, সে সময় আমিও কারও মুখ দেখব না, আমার মুখও কেউ দেখবে না। এছাড়া নারায়ণকে গব্য ঘৃতে স্নান করানো, একশো আটটি তুলসী দান ও চরু ভোগ—ও কিছু না, আমার দক্ষিণা ইত্যাদি নিয়ে ষাট পঁয়ষট্টি টাকার বেশী পড়বে না। তারপর শ্রাদ্ধ মিটে যাক, ও ত্রিপাদ দোষ আমি একদিনে কাটিয়ে দেব।'

শ্রাদ্ধশান্তি এবং এই দফায় দফায় টাকা দোহন—এতে রোহিণী প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, নগদ টাকা যা ছিল তা তো গেলই, দু একখানা সোনার গহনাও বিক্রি হয়ে গেল। তাও সেকরা তাকে ঠকিয়ে বলে গেল, 'এ তো পাকা সোনা, গিনি সোনা তো নয়—এ আর কত দাম হবে?' বলে বাইশ টাকা ভরির জায়গায় সতেরো টাকা ভরি ধরে, গালাই, পানমরা বাদ ইত্যাদি দেখিয়ে অতি সামান্য দাম দিয়ে গেল।

কিন্তু তবুও অব্যাহতি পেল না বেচারী। তখনও এক একজন আসে আর যতটা পারে ভয় দেখায়।

এমন নাকি কখনও হয় না। কিন্তু হলে আর রক্ষা নেই। ভয়ংকর ভূত হয়ে আছে রঘুর আত্মা। লোকের আর কি, এদেরই অনিষ্ট করবে, স্ত্রীর, মেয়ে-জামাইয়ের নাতি নাতনীর। উপায়? উপায় কিছু খরচ করো। এক একজনের এক একটা ফরমূলা তৈরীই আছে—ঐ ভয়ঙ্কর ভূতটাকে মুক্তি দেবার। তবে নিঃস্বার্থ কথাও বলল কেউ কেউ, বিষয় সম্পত্তি সব কোন মঠে দিয়ে দাও। নিজে মঠের কাছ থেকে কিছু কিছু খোরাকি নিয়ে খাও। তাহলে নাকি আর পাপের অন্ন থাকবে না। কেউ বললে গুরুকে সব দিয়ে দাও, গুরুর বাড়ি গিয়ে দাসীবৃত্তি করো। কেউ বা—জ্ঞাতিরাই বললে—বলল, জ্ঞাতিদের সব লিখে পড়ে দিয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে যাও, তাহলে আর ভয় কি? তারা কি আর অসময়ে দেখবে না? একজন শুধু বললে, 'নিত্য জগন্নাথ দর্শন করো আর অমাবস্যায় অমাবস্যায় সমুদ্র স্নান, তাহলেই কোন ভয় থাকবে না।'

এই যখন অবস্থা, ভয়ে দিশাহারা, এ দিকে সোনা রুপো গিয়ে ঘটি বাটিতে টান পড়েছে তখন বোধহয়, কেউ সাধুবাবার কথা বলে থাকবে। একদিন এসে সাধুবাবার পায়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল রোহিণী।

সাধুবাবার তো মুখ, খুব খানিকটা খিঁচোলেন। বললেন, 'কেন আবাগী—এর আগে আসতে পারিস নি? সবাই যখন সব খুবলে খেয়ে নিলে তখন আমার কথা মনে পড়ল? কেন, গায়ে এখনও মাংস তো আছে—সেটা যে ছেড়ে দিলে শকুনের দল?'

'কী হবে বাবা, আপনি তো দেখলেন অবস্থাটা, এমন কার ভাগ্যে হয় বলুন। আমার কপালের জন্যেই এ কাণ্ড তোলা ছিল যে!'

আমরা ভাবছি তখন সাধুবাবা উত্তরীর ব্যাপারটা এবার বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু তিনি সে দিক দিয়েও গেলেন না। বললেন, 'আচ্ছা অত কথার দরকার কি, সে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়।'

রোহিণী বুঝতে পারল না কথাটা।

'কে—কাকে বাবা।'

'কে আবার—রঘু রঘু! ব্যাপারটা কি হয়েছিল তার কাছে জানলেই তো পাকা খবরটা পাওয়া যায়!'

'তা—তার কাছে—?' আবার গলা শুকিয়ে কাঠ রোহিণীর।

'আরে তাতে কোন অসুবিধে হবে না। তাকে ডাকলেই সে আসবে। এ তো আমরা হামেশাই ডাকি। তুই শুনিস নি? ইংরেজ সাহেবরা বার করেছে, এক রকম টেবিল? অন্ধকার ঘরে স্নান ক'রে কাচা কাপড়ে তিনজনে বসে টেবিল ছুঁয়ে একমনে যে মরা মানুষের কথা ভাববে সে এসে ভর করবে ঐ টেবিলে। তার তো দেহ নেই, শুধু সূক্ষ্ম শরীর—সে তুই বুঝবি না, মোদ্দা তার কাছে তখন যা জানতে চাইবি সে তাই লিখে দিয়ে যাবে। সাদা কাগজ রাখলে টেবিল আপনিই ঘুরে ঘুরে লেখে। তুই লেখাপড়া জানিস তো? নিজেই পড়তে পারবি।'

রোহিণী বিস্ময়ে চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে থাকে, তার মধ্যেই একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবে বলে, 'আমি তো বাবা পড়ালেখা জানি না।'

'সে ঠিক আছে। আমিই জেনে দোব। আমার আজকাল আর ও টেবিলও লাগে না। অন্ধকার ঘরে ধুনো দিয়ে বসলেই তারা আসে, যা

জানতে চাই জানিয়ে চলে যায়।·· তুই কাল আসিস—আমিই বলে দোব'খন।'

কিছুটা ভক্তি কিছুটা অবিশ্বাস নিয়ে রোহিণী বাড়ি ফিরল। কিন্তু হবি তো হ—'টাকী নিবাসে' সেই সময়ই কে এক বাঙালী সাহেব এসেছেন, তিনি নাকি রোজ সন্ধ্যায় প্ল্যান্‌চেটে আত্মা নামাচ্ছেন। বাড়ি যাবার পথেই রোহিণী কথাটা শুনে গেল।

ব্যস, আর অবিশ্বাস থাকবে কেন, সারা রাত কৌতূহলে উদ্বেগে ছটফট করে ভোরবেলাই আবার এসে হাজির হল রোহিণী।

সাধুবাবাও অবশ্য শেষ রাতেই উঠে পড়েন। ঘুমোনই না যেকালে—সেকালে আর ওঠার কথা কি,—ভোর চারটেতে বাইরে এসে বসেন। (আমি একদিন গভীর রাতে উঠে দেখেছি শুধু কৌপিন পরে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উঠোনে—পাথরের মতো।)

ওকে ইশারা করে বসতে বলে সাধুবাবা বললেন, 'হয়েছে। এসেছিল রঘু। আলো নিভিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির। আসলে সেও কথাটা বলবার জন্যে ছটফট করছিল, তোকে ঠকিয়ে যে যা পারছে লুটে পুটে নিচ্ছে এই জন্যেই তার আরও আপসোস।'

'তা—সে কি বললে বাবা?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করে রোহিণী।

কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে সাধুবাবা পালটা প্রশ্ন করলেন, 'তুই শেষ যেদিন রঘুর সঙ্গে মন্দিরে যাস, ফেরার পথে তুই কি একটা জিনিস কিনে দেবার কথা বলেছিলি রঘুকে মন্দিরে দাঁড়িয়ে—মনে আছে? রঘু বলেছিল, আজ থাক, সঙ্গে টাকা নেই। আর একদিন কিনে নিয়ে যাবো তখন। মনে আছে কথাটা? ভাল ক'রে ভেবে ছাখদি কি।'

রোহিণী তো বিহ্বল একেবারে। আর যাই হোক এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে সে তৈরী ছিল না। প্রথমটা তো কিছুই মনে করতে পারল না, অবাক্ হয়ে সাধুবাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'কই—তেমন তো কিছু, মানে কই মনে তো পড়ছে না—'

'ভাল ক'রে ভাব তবে তো মনে পড়বে। একটা একটা ক'রে জিনিস ধর না। বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়—?'

হঠাৎ যেন লাফ দিয়ে উঠল রোহিণী, 'হ হ, মনে পড়িলা। মু কইথিলি গুটে বড় থালার্অ কথা। একখানা বড় থালা কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলুম বটে, ঘরে সব ছোট ছোট থালা—জামাই এলে খেতে দিতে পারি না। আমি সঙ্গে এসেছিলুম, দেখে পছন্দসই একখানা নিয়ে যেতে পারতুম। তাতেই সে বলেছিল তেমন বড় থালা কিনতে গেলে আট দশ টাকা পড়ে যাবে। অত টাকা এখন নেই। আর একদিন এসে তখন নিয়ে যাবো। ঠিক, ঠিক। তা বাবা তার সঙ্গে—'

'আছে, আছে। ব্যাপার আছে। নইলে কি আর বলেছে!' সাধুবাবা গম্ভীর হয়ে বলেন, 'আসল কথাটা কি জানিস, টাকা সেদিন সঙ্গে ছিল, মিছিমিছি অত থালা থাকতে আর একখানা কিনবি—তাই তোকে মিথ্যে ক'রে বলেছিল। মন্দিরে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলা হল আবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল তো। বলেছিল আর একদিন এসে নিয়ে যাবো, তাও হয়ে ওঠে নি। সে সব খেয়াল ছিল না। মরার পর দেখে যমদূত এসে ঘিরে ধরেছে, কী ব্যাপার, রঘু বললে, স্বর্গদ্বারে মরেছি, এতদিন প্রভুকে দর্শন করেছি—যমদূত কেন? তখন তারাই মনে করিয়ে দিলে। মজা হচ্ছে দেহ যতক্ষণ থাকবে, যমদূত আত্মা নিয়ে যেতে পারে না। তাই ও প্রাণপণে দেহটাই আঁকড়ে রইলো। যখন আগুন জ্বলেছে আর থাকতে পারে না, তখন শেষ একবার ঠেলে উঠে মন্দিরের দিকে চেয়ে জগন্নাথের কাছে মাপ চেয়ে নিল। তাইতেই নিশ্চিন্তি, আর যমদূতের ভয় রইল না। কিন্তু তুই যে এমন বোকা—এমনভাবে নিজের সর্বনাশ করবি তা কি সে জানে! সেই থেকেই ছটফট করছে বেচারী। এইখানেই ঘুরছে কাউকে না বলে স্বর্গে যেতেও পারছে না!'

রঘু যে তার জন্যে এখনও এত চিন্তিত, আর সে যে রঘুরই মুক্তির জন্যে এমন অকাতরে যথাসর্বস্ব খরচ করছে সেটাও যে রঘু জেনেছে—এই দুটো কথাই রোহিণীর মনে লাগল। আনন্দে শান্তিতে তার দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল গড়িয়ে। এত দিন সাধুবাবার কাছে এলে আর এমনভাবে আজ পথের ভিখিরী হতে হত না, এ আপসোস একটা হল, তবে সে কিছু না। আনন্দই তার বেশী। সে আঁচল থেকে দুটো টাকা খুলে সাধুবাবার পায়ের কাছে রেখে বলল, 'আর কিছু নেই আজ্ঞে, এতেই আপনি যা হয় একটু

প্রসাদ সেবা করবেন।

সাধুবাবা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ তা আর নয়। তোমার ঐ দুটো টাকার জন্যে তীর্থস্থানে পরিগ্রহ করার পাপে ডুবি আর কি! যা, নিয়ে যা। সব তো শেষ করেছিস, এ দুটো আমি দিচ্ছি মনে করে রাখ—অসুখ বিসুখ হলে কাজে লাগবে।'

হাসতে হাসতে আর চোখের জল মুছতে মুছতে রোহিণী চলে গেল।

সে বাড়ির পথ ধরতে মা প্রশ্ন করলেন সাধুবাবাকে, 'কাল সত্যিই এসেছিল রঘুর আত্মা?'

'দূর বেটি, বোকা কোথাকার! কে বা নামাচ্ছে আত্মা আর সে-ই বা আসছে কোথা থেকে। তীর্থস্থানে মরেছে, এতকাল জগন্নাথ দর্শন করেছে তার কি আর অধোগতি হয়! যদি স্বর্গ নরক বলে সত্যিই কিছু থাকে—সে তো সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে চলে গেছে!'

'তবে?' বেকুবের মতো চেয়ে থাকেন মা সাধুবাবার মুখের দিকে।

'ওরে পাগলী, আমি যদি ওকে বলতুম যে উত্তুরীর জল বাষ্প হয়ে মড়াটাকে ঠেলে তুলেছিল, ও বিশ্বাস করত? আবার কার কাছে ছুটত—ক বিঘে জমি বুঝি এখনও আছে, সেগুলো বেচে জোচ্চোরদের হাতে দিয়ে একেবারে পথের ভিখিরী না হওয়া পর্যন্ত শান্তি হত না ওর। এ যা বললুম বিশ্বাস হ'ল।'

'তা—তাহলে ঐ থালা-কেনার কথাটা কেমন ক'রে জানলেন?' মা আবারও প্রশ্ন করলেন।

এক রকমের ধূর্ত দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চেয়ে সাধুবাবা বললেন, 'থালা কেনার কথা তো আমি বলি নি। ওর মুখ থেকেই তো বার করলুম।··· আরে বাপু, মেয়েছেলে স্বামীর সঙ্গে এসেছে—সামনেই বাজার, কিছু না কিছু কেনার কথা বলবে না এ কখনও হয়? আর স্বামীদেরও যদি স্ত্রীদের সব বায়না পূরণ করতে হয় তাহলে তো তার কুবেরের ঐশ্বর্যেও কুলোবে না। কাজেই সে মিথ্যে কথা বলবে বা ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করবে—এও তো জানা কথা।···সেই ভাবেই ঘা দিতে থালার কথাটা বেরিয়ে এল—বুঝলি না। তোরাও তো মেয়েছেলে, নিজেদের মন দিয়েই ভেবে দেখ্ না!'

এই বলে সাধুবাবা হা হা ক'রে হেসে নিলেন খানিকটা আপন মনেই।

উপস্থিতি

আমার বন্ধু অশোক হালদারের তারিফ করতে হয়। পুরীতে যে বাঙ্গালীর পরিচালিত এমন একটি ছোট্ট পরিচ্ছন্ন হোটেল আছে তা অনেকেই জানে না। এ পাড়াটাই হোটেল পাড়া নয়, নির্জন সমুদ্র তীরে কয়েকটা বড়লোকের বাড়ি, জ্যৈষ্ঠ মাসের কটা দিন শুধু আলো জ্বলে, বাকী নিবিড় অন্ধকার, বড় বড় বাড়িগুলো মুখ কালো ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে।

এ বাড়িটাও অবশ্য এক বড়লোকেরই। ধনী লোক বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও বেশী, পরিচয় দিলে এক-ডাকে সবাই চিনবে ভারতবর্ষের—এমন এক সর্বজনপূজ্য নেতার বাড়ি। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়িঘর মেরামতের নাম ক'রে এসে সারিয়ে সুরিয়ে এ ভদ্রলোক হোটেল খুলে বসেছেন। তাঁদের এক পয়সা ভাড়া দেন না, চিঠি লিখলে উত্তর দেন না। যাঁদের বাড়ি তাঁরা এতই বড় যে তোড়জোড় ক'রে এসে মামলা মোকদ্দমা ক'রে ওঠাতে ওঠাতে দু'বছর কেটে যাবে তা কেষ্টবাবু ভালই জানেন। তাছাড়া তিনি শুধু নিচের তলাটাই নিয়েছেন, ওপর তলাটা মেরামত না করালেও বসবাসযোগ্য ক'রে রেখেছেন, বাড়িওয়ালারা কেউ এলে তাঁদের থাকার অসুবিধা হবে না। মেরামত করা হয় নি, তার কারণ সেই টাকাতেই হোটেল খুলতে হয়েছে।

সে যাকগে, এসব তাঁদের ভেতরের কথা, অশোক জানত, তাই বলল, আমাদের তো জানার কথা নয়। হোটেল। হিসেবে চমৎকার। ঘরগুলো ঝক্ ঝক্ করছে, চারটি মাত্র ডবল বেডের ঘর, একটি ঠাকুর ও চাকর দিয়ে ভদ্রলোক চালান। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, ঘরদোর ঝাড়ু দেওয়া মোছা হয় প্রত্যহ, বাসনকোসন চায়ের সরঞ্জামে না কোথাও ময়লা থাকে—সেদিকে কড়া নজর। ঠাকুর না পেরে উঠলে কেষ্টবাবু নিজে হাঁড়ি হেঁসেল ধরেন, চাকরের অসুখ করলে ঝাঁটা। চা ক'রে ঘরে ঘরে দিয়ে আসা তো তুচ্ছ কাজ। এতে ওঁর কোন আপত্তিও নেই, অসম্মানের প্রশ্নও নেই। সুতরাং আমরা খুব আরামেই ছিলাম, নিশ্চিন্তও ছিলাম। চার্জটা একটু বেশী, তা এ ধরণের হোটেলে হতে বাধ্য। কেষ্টবাবু বলেন, 'আমার এ সিলেক্ট্‌ ধরণের হোটেল

সিলেক্ট্ লোকেদের জন্যে চার্জ তো স্যার একটু বেশী হতে বাধ্য। এই কটা লোকের ওপর দিয়ে সব খরচ তোলা বুঝতেই তো পারছেন, হেঁ হেঁ। একটু বেশী না নিলে চলবে কেন? এর মধ্যে আর একটা ক'রে বেড ঢুকিয়ে দিলেই অনেক আসান হয়ে যায় আমার, তবে সে স্যার গোয়ালের অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল না? নিরিবিলি একটু থাকা? আমার কাছে স্যার স্পষ্ট স্পষ্ট কথা। আমি জানি কমফর্টের বদলে আমার পেট্রনরা কেউ দু এক পয়সা বেশী দিতে মাইণ্ড করবেন না। হেঁ হেঁ।'

অবশ্য কেষ্টবাবুর ভাষায় 'মাইণ্ড' আমরা করিওনি।

পুরীর মতো জায়গায় এত নিরিবিলি এমন ধরণের হোটেল আমরা আশা করি নি কেউই। এর আবিষ্কারক হিসেবে বরং অশোক হালদারকে দু'শো তারিফ করেছি। তবে কেষ্টবাবু হোটেল রাখতে পারেন নি। আসলে অত বড়লোকের বাড়িতে এ হোটেল ফাঁদতে যাওয়াই উচিত হয় নি তাঁর। যাঁদের বাড়ি—শুনেছি শেষ পর্যন্ত তাঁরা দখল করে হোটেল উঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে পরের কথা। আমাদের সে কদিনের মধ্যে কোন গোলমাল হয় নি।

ছোট জায়গা, চারঘর মাত্র মক্কেল আমরা, সুতরাং দেখতে দেখতে, একদিনের মধ্যেই বেশ ভাবসাব হয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে। আশেপাশে সবই বড়লোকের বাড়ি, অধিকাংশই তালাবদ্ধ, বড় জোর কেয়ার-টেকাররা এক আধ দিন দশ বারো টাকা নিয়ে এক আধজনকে দোর খুলে দেয় কিন্তু সে ঐ এক আধ দিনই। তার বেশী রাখতে সাহস করে না। এই সময়টা মালিকদেরও আসার সময়, কে কখন এসে পড়েন তার ঠিক কি? আসেনও মধ্যে মধ্যে, তবে তাঁরা কারো সঙ্গে মেশেন না, বিশেষ ক'রে আমাদের মতো মাঝারি দরের হোটেলের অধিবাসীদের সঙ্গে তো মিশবেনই না।

সুতরাং আমাদের নিয়েই আমরা ছিলাম।

আমি আর অশোক একটা ঘরে। পাশের ঘরে ছিলেন রমেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী। রমেশবাবু আগে কর্পোরেশনে সিটি আর্কিটেক্ট আপিসে কাজ করতেন, সে চাকরী ছেড়ে ওকালতি ধরেছেন, সেই সঙ্গে কোন এক প্রভাতী কলেজে ইকনমিক্স-এর লেকচারারও। রমেশবাবুর সঙ্গে তাঁর একটি বছর দশেকের ভাইঝিও আছে তন্দ্রা বলে। বাকী দুটো ঘরের একটাতে দিলীপবাবু ও তাঁর কী একরকমের ভগ্নি আছেন। দিলীপবাবু ইন্সিওরেন্সের কাজ করেন

বলেছিলেন, অশোকও এল, আই. সি.-তে কাজ করে শুনে কী কাজ, কোন অফিস বা কোন ইউনিট কিছুতেই বলেন না, প্রশ্ন করলেই এড়িয়ে যান। বলেন—আপন ভাই বোন ('নইলে স্যার আমি থাকতে দেব কেন বলুন, আপনাদের মতো বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে। আমার একটা মরাল রেস্‌পন্‌সিবিলিটি আছে তো? হেঁ হেঁ!' কেষ্টবাবু বলেন) কিন্তু আচার আচরণটা ঠিক তেমন মনে হয় না। ভাই বোন হিসেবে হৃদ্যতাটা একটু অতিরিক্ত বলেই মনে হয়। অবশ্য বর্তমান কালটা এমন দ্রুত এগিয়ে চলেছে যে আমাদের জানা বোঝা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে মাপা চলেও না সব সময়ে। তার চেয়ে চুপ ক'রে থাকাই ভাল। চতুর্থ ঘরটাই একটু পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল। হরিদাসবাবু, তাঁর স্ত্রী, একটি বিধবা শালী, একটি বিবাহিতা মেয়ে, একটি অবিবাহিতা মেয়ে, একটি নাতনী, একটি ছোট নাতি এবং নাতির চেয়েও ছোট নিজের একটি বছর তিনেকের ছেলে—মোট এই সাত সাড়ে-সাতটি প্রাণী। ঘরের দুটো তক্তপোশ জোড়া ক'রে বিছানা করেছেন, এ ছাড়া গৃহিণী ছোটটিকে নিয়ে মেঝেতে শোন—হরিদাসবাবু একটা মাদুর পেতে বাইরের বারান্দায় পড়ে থাকেন। অন্য বোর্ডাররা একটু আপত্তি করেছিলেন, মৃদু মৃদু, কেষ্টবাবু তো বেশ সরবেই আপত্তি তুলেছিলেন (সংবাদ পত্রের ভাষায় সোচ্চার) আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে—কিন্তু হরিদাসবাবু একরকম সকলকার হাতে পায়ে ধরেই রাজি করিয়েছিলেন। একটু কষ্ট ক'রে ম্যানেজ করে নিতে দিন, তিনি তো আর চার্জ কম দিতে চাইছেন না, কষ্ট যা কিছুতো নিজেরাই করবেন—এঁদের আপত্তির এত কারণ কি? দু'দলে ভাগ হয়ে থাকা যায় না, কারণ দলে পুরুষ বলতে অভিভাবক বলতে তিনিই একজন। আর এ সময়ে কোন্ হোটেলেই বা এতগুলো সিট একসঙ্গে খালি পাওয়া যায় বলুন।

অগত্যা থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা। তা হরিদাসবাবুরা মানুষ খুব ভাল। এরই মধ্যে ওঁর স্ত্রী এবং শালী স্টোভে এটা ওটা রেঁধে খাইয়ে আমাদের হাত ক'রে নিয়েছেন। মায় ওঁর শালী শান্তি—কেষ্টবাবুর রাঁধুনী ঠাকুর, মাংস ভাল রাঁধতে পারে না শুনে নিজেই উদ্যোগী হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে মাংস রান্না করে দিয়ে এলেন। মাংসটা হয়েওছিল খুব উপাদেয়, আমরা সকলে ধন্য ধন্য করলাম—বা করতে বাধ্য হলাম।

বেশ জমে উঠেছিল। রমেশবাবু তো 'মাই ডিয়ার' লোক যাকে বলে। সেই শ্রেণীর সবজান্তা দাদা তিনি—যাঁর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ঈশ্বর পর্যন্ত কোন কিছু করতে সাহস করেন না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর গোপনে কি কথা হয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন; মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চীনের কি চুক্তি হয়েছে, ইংরেজদের সঙ্গে রুশদের গোপন আঁতাত—এসব তাঁর নখদর্পণে. কেন তেলের দাম বাড়ে, কেন ডালের দাম বাড়ছে, কেন যথেষ্ট গম এসে পৌঁছচ্ছে না, কর্পোরেশনে আসল গলদটা কোথায়, হাই-কোর্টের সঙ্গে সরকারের ক্ষমতার দ্বন্দ—এমন বিশ্বাসযোগ্য, এমন মুখরোচক করে বলতে আর কাউকে আমি দেখি নি। এমন কি দিলীপরা ভাইবোনও যতটুকু মিশত তাতে আন্তরিকতা ও সৌজন্যের ত্রুটি ছিল না. অর্থাৎ মানুষ তারাও খারাপ নয়, একটু যে দূরত্ব বা ব্যবধান বজায় রেখে চলত সে কতকটা আত্মরক্ষার জন্যই বোধহয়।

এক কথায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে এবং শান্তিতে দিন কাটছিল, হঠাৎ যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল সেদিন।

সেদিন অর্থে রবিবারের ঘটনাটার কথাই বলছি। কিন্তু তারও আগে থেকে বলা দরকার। ঝড়ের আগে ঝড়ের সঙ্কেত আমরা পেয়েছিলাম সকলেই, অতটা বুঝি নি।

শনিবার দিন কী হল, হঠাৎ মন্দির থেকে ফিরে মনে হল আর বাঁচব না। শরীরটাই এত দুর্বল মনে হ'ল—সম্পূর্ণ অকারণে যে, মনে হ'ল আজই রাত্রে কোন স্ট্রোক-ফোক্ হবে এবং মরে যাব। এ যাত্রা আর কারও সঙ্গে দেখা হ'ল না। ঘরে স্ত্রী, মা বাচ্চা মেয়েটা—কাড়কেই একবার শেষ চোখের দেখাটা দেখতে পর্যন্ত পেলাম না। পেলাম না—মানে সুনিশ্চিত ধরে নিলাম যে সেই দিনই আমার পরমায়ু শেষ।

রিক্সা থেকে নেমে এটুকু বালি পেরিয়ে এসে ধপাস ক'রে বসে পড়েছিলাম বাইরের বেতের চেয়ারে। এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি—অশোকও গুম্ খেয়ে বসে আছে একপাশে। হঠাৎ সে কেমন এক ধরণের চাপা গলায় বলে উঠল, 'ধুস—আর ভাল লাগছে না মাইরি, চ কালই চলে যাই।'

শুধু যেটা নিজের বলে মনে হচ্ছিল সেই ভাবটা অপরের মধ্যেও সংক্রামিত

হতে দেখলে একই সঙ্গে আতঙ্ক ও আশ্বাস দুটোই অনুভূত হয়।

'কেন বল তো, তোর আবার কী হল?'

'কী জানি কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কার কোথায় কি বিপদ-আপদ ঘটছে—মানে নিজেদের মধ্যে। ছোট ভাইটার জ্বর দেখে এসেছিলুম। মা অবশ্য লিখেছে যে ঢের কমে গেছে—কিন্তু সে আমাকে স্তোক দেবার জন্যে কিনা কে জানে। হঠাৎ মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল কেন কে জানে। যেন দারুণ একটা অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছি—'

দু'জনই চুপ ক'রে বসে রইলাম। এর ওপরে আর নিজেরটা বলতে ইচ্ছা করল না। বরং একবার এও মনে হ'ল, আমারই আসন্ন মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়েছে বেচারী। অশোক আমাকে সত্যিই ভালবাসে—

দু'জনে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও ভাল লাগল না।

অশোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চ একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায় আবার ঘুরতে যাবি এখন?'

'এই সমুদ্দুরের ধার থেকে। একটু জলের ধারে গিয়ে বসলেও চাঙ্গা হয়ে যাওয়া যাবে—'

'এত রাত্রে? অন্ধকারে?'

'রাত আবার পেলি কোথায়? সবে তো সাড়ে সাতটা। আর এইতো সামনেই গিয়ে বসব। যত ঐরকম গুম মেরে বসে থাকবি ততই মন খারাপ লাগবে।'

অগত্যা উঠতে হ'ল। বালির ওপর দিয়ে খালি পায়ে নামা, আমাদের উপস্থিতি কেউ টের না পেলেও আমরা পেলাম অপরেরটা।

কারা যেন আগে থাকতেই বসে রয়েছে।

চাপা কান্নার—খুবই চাপা কান্নার আওয়াজ কানে এল। সামনে আর একটু ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে আন্দাজে বুঝলাম দিলীপবাবু আর তাঁর সেই বোনটি—

'এই শুনছ? কী হ'ল তোমার? কী হয়েছে কী। কাঁদছ কেন? কাঁদবার মতো কি হ'ল? আমি কি কোন অসদ্ব্যবহার করেছি? তবে? কী বিপদ, যদি কেউ এসে পড়ে আর এই অবস্থায় দেখে, কী ভাববে বল তো?'

তবুও কান্না। বুঝলাম ভদ্রমহিলা মুখে কাপড় গুঁজে দেবার একটা

চেষ্টা করছেন, কান্না থামাতেই চাইছেন, তবু থামছে না।

'বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে?···কিন্তু আজও তো চিঠি পেয়েছ। তবে?···কেউ কিছু বলেছে?

'না।' অতিকষ্টে বলে মেয়েটি।

'তবে? হঠাৎ কাঁদবার মতো কি হ'ল?'

'জানি না। আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন। নিশ্চয় মা কি ভাই বোন কারও কোন অনিষ্ট হয়েছে কি অমঙ্গল হচ্ছে। বিষম কান্না পাচ্ছে আমার। আর আমি থাকব না। আপনার তুটি পায়ে পড়ি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। এখন তো কোন গাড়ি নেই। সেই কালকের গাড়ি তো—সেই ব্যবস্থাই করব। তোমাকে তো একা পাঠানো যায় না, আমাকেও চলে যেতে হবে। তা তাই না হয় যাবো। এখন দয়া ক'রে একটু চুপ করো। নইলে—কেউ শুনলে কি দেখলে আর মুখ দেখাতে পারব না।'······

নিঃশব্দে সরে এলাম সেখান থেকে। সত্যিই এসব বড় অস্বস্তিকর ব্যাপার। তাদের পক্ষে তো বটেই—আমরা পিছন থেকে দাঁড়িয়ে এ নাটক প্রত্যক্ষ করছি টের পেলে আমাদের পক্ষেও।

যতদূর সম্ভব ওপাশে সরে গিয়ে একেবারে জলের ধারে বসলাম। সেও বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। অন্ধকার রাত—তার মধ্যে ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে থাকলে কী একটা রহস্যময় অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকের মধ্যে গুর গুর করতে থাকে।

উঠে হোটেলের বারান্দায় এসে বসতেই রমেশবাবু বলে উঠলেন, 'পুরী—আফ্‌টার অল বুঝলেন অশোকবাবু, ঐ একদিন তু'দিনই ভাল। তারপর এই একঘেয়ে বাতাস আর এই একসা ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ—গেট অন্ ওয়ানস্ নার্ভস।'

কৌতূহল হ'ল, বললাম, 'কেন বলুন তো, কী হ'ল আপনার।'

'কি হ'ল, তাই যদি বুঝব তো ভাবনা কি ছিল বলুন। গিন্নীর তো আজ তুপুর থেকে বুলি হয়েছে—জগন্নাথ আমার মাথায় থাকুন—বাড়ি চল। পয়সা খরচ ক'রে এমন নিবান্দা পুরীতে মন খারাপ করতে আসে কেন যে মানুষ তা বুঝি না। মেয়েটাও বিকেল থেকে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছে, বাড়ি চল! আর

ভাল লাগছে না !···দু'জনকেই বোঝাই, ওরে বাবা যাবো মনে করলেই কি আজকাল যাওয়া যায়—আর পাঁচটা দিন কাদায় গুণ ফেলে থাকতেই হবে যে ক'রে হোক। রিজার্ভেশন না হ'লে যাওয়া যায় কখনো ? তবু তো আসার দিনই ও কম্ম সেরে শহরে ঢুকেছি। তা মেয়েমানুষের জাত—কথা কি বুঝতে চায় ?' তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি আমারও যেন আর ভাল লাগছে না।'

সান্ত্বনা দেবার জন্যে কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই বলি, 'ঘিঞ্জিতে বাস করা অভ্যেস আমাদের, আসলে এত নির্জনে হোটেল ঠিক করাই ভুল হয়েছে। ঐ স্বর্গদ্বারের দিকে থাকলে আর এমনটা হত না—'

কিন্তু নিজে যে খুব সান্ত্বনা পাই তা মনে হয় না।

হৈ হৈ করতে করতে হরিদাসবাবুরা এসে পড়লেন। অনেকক্ষণের পচা গরমের মধ্যে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসের মতো।

'না, এদেশে আর আমাদের মতো ছাপোষা লোকের আসা পোষাবে না।···ডাকাত, ডাকাত বেটারা। একটা চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই। এইখান থেকে মুচীশাহী—আধ মাইলও হবে না—বলে কিনা এক টাকা ভাড়া ! চায় কি করে, কি আস্পদ্দা !'

তাঁর অনুযোগ অভিযোগ একটা নয়। মাটি-পোরা চটিগুলো যা নাকি এককালে আট আনা দশ আনা ক'রে জোড়া কিনেছেন, তাই এখন আট টাকা, দশ টাকা—বারো টাকা—যার যা মুখে আসে তাই বলে। মর্তমান কলা এক পয়সা একটা যথেষ্ট ছিল, এখন একটু ভাল হলেই চেয়ে বসে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা ডজন। বলছেন বটে—তবু দেখলুম মোটের ওপর খুব খুশীই আছেন, কিনেওছেন একরাশ জিনিস—চটি চামড়া বাসন বিছানার চাদর শিশুর খেলনা—পুরীতে এলে বাঙ্গালীর মেয়েরা যা কেনে তার একটাও বাদ দেন নি।

আমাদের জন্যও এনেছেন বৈকি।

গরম চিঁড়ে ভাজা ও চিনেবাদাম ভাজা বেশ বড় এক ঠোঙ্গা কিনে এনেছেন শান্তিদি—ওঁর বড় শালী। শান্তিদি একবার আমাদের সবাইয়ের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে উঠলেন, 'ওকি আপনারা সবাই অমন গুম্ খেয়ে আছেন কেন ? সকলেরই মুখে কালি। যেন নুনের জাহাজ ডোববার

খবর এসে পৌঁছেছে। মানে, অন্য মাল, জলে ডুবলে তবু কিছু উশুল হবার আশা থাকে, নুনের জাহাজে ষোল আনাই লোকসান। বলি—এই জন্যে এত পয়সা খরচ ক'রে সব বিদেশে এসেছেন নাকি?···বসুন খানিকক্ষণ, চা করি তাহলে, আর এই গরম গরম চিঁড়ে ভাজা মাখি ঘি-মরিচের গুঁড়ো দিয়ে।···একটু চাঙ্গা হোন দিকি—কিছু মনে করবেন না—ঐ রকম গোমড়া মুখ ক'রে বসে থাকা আমার দু'চোখের বিষ।···কই, কেষ্টবাবু কোথায় গেলেন গো, একটু চায়ের জল হবে নাকি, না স্টোভ জ্বালতে হবে?'

কেষ্টবাবু সর্বদাই 'ওব্লাইজিং'—জল কেন, চা দুধ সবই তিনি দিলেন। শান্তিদি নিজে হাতে চিঁড়ে ভাজা মেখে প্লেটে ক'রে ক'রে বেঁটে দিলেন সবাইকে, চা তৈরী ক'রে খাওয়ালেন। তাঁদের, হৃদয়ের উত্তাপে আমাদের মনের মেঘও কাটতে দেরি হ'ল না—মায় দিলীপবাবুর সেই বোনটি সুদ্ধ যেন বেশ তেতে উঠলেন।

হাসিতে খুশিতে গল্পে গুজবে খাওয়াদাওয়ায় কোথা দিয়ে রাত এগারোটা বেজে গেল টের পেলাম না কেউ।

টের পাওয়া গেল ভোর চারটেয়, হরিদাসবাবুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে। এসে কেষ্টবাবুর দোর ঠেলছেন, 'ডাক্তার—কেষ্টবাবু সর্বনাশ হয়েছে ডাক্তার যে চাই এখনই—'

সবাই লাফিয়ে ঘরের বাইরে এলুম। শুনলুম শান্তিদির স্ট্রোক হয়েছে, একটা অঙ্গ পড়ে গেছে—

গিয়ে দেখলুম—সেরিব্রাল থ্রম্বসিসের পূর্ণ লক্ষণ।

ডাক্তার এলেন। পরের দিন হাসপাতালে সরানো হ'ল। ওঁর ছেলেদের, স্বামীকে টেলিফোন করা হ'ল। কেষ্টবাবু যথেষ্ট ছোটাছুটি করলেন, আমরাও যথাসাধ্য। হাসপাতালের ডাক্তারেরা অতি সজ্জন, চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করলেন না কেউই। কিন্তু পরের দিন স্বামী পুত্র এসে পৌঁছবার আগেই ভদ্রমহিলা মারা গেলেন, কোন চিকিৎসা যত্ন ছুটোছুটিই কোন কাজে এল না।······

শ্মশান-কৃত্য সেরে হরিদাসবাবুরা আর এক রাত্রি মাত্র ছিলেন। কেষ্টবাবুই তাঁদের রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন বলে কয়ে।······

কিন্তু আশ্চর্য এই—আমাদের সেই অকারণ বিষণ্ণতা আর আমরা কোনদিন বোধ করি নি। শান্তিদির আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিলুম

ঠিকই, মানুষের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাবও দেখা দিয়েছিল সকলের মনেই—কিন্তু জীবন সম্বন্ধে সেই বিতৃষ্ণার ভাব, যেন মৃত্যুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি একটা—সেদিনের মতো আর কোনদিনই অনুভব করি নি।

উপস্থিতি শব্দটা আপনিই বেরিয়ে গেল কলম দিয়ে।

কে জানে কেন! সত্যিই কি সেদিন মৃত্যু এসেছিলেন একটা পূর্ণ প্রাণের সন্ধানে—বেছে বেছে শান্তিদিকেই পছন্দ হ'ল তাঁর—তাই নিয়ে চলে গেলেন?

পাঁঠার প্রতিশোধ

মহিমবাবু পুলিসে বড় চাকরি করতেন—সে সময় সবাই তাঁকে ভয় করত, খোশামোদও করত। তাঁর কড়া মেজাজের কথা গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর যখন অবসর নিলেন তখন আর কেউ তাঁর তোষামোদ করতে আসত না, আগের মতো গালাগাল খেয়ে মাথা নীচু ক'রে থাকত না। উনি কারও ওপর কড়া মেজাজ দেখালে তারাও চড়া চড়া জবাব দিত।

এই সব দেখে মহিমবাবুর মনে কেমন ধারণা হ'ল মানুষ বড় বেইমান। উনি যে কোন উপকার করেছেন, তারা সে কৃতজ্ঞতা মনে রাখে নি—এমন নয়। ওঁর মেজাজ তখন সহ্য করত এখন করে না—এইটেই বেইমানী বলে মনে হ'ল তাঁর।

যেখানে একদিন যথেষ্ট দাপটে কাটিয়েছেন লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে হাঁটতেন বলতে গেলে—সেখানে এখন কেউ পুঁছবে না—এ অবস্থায় থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল এই ভেবে মহিমবাবু তাঁর পৈতৃক বাড়ি বেচে কলকাতা শহরের মায়া ত্যাগ ক'রে চলে এলেন শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে—এইখানে। অনেকখানি জমি নিয়ে বিরাট বাগান করলেন, লোহার ফেন্সিং বা চ্যাপটা সিক দিয়ে ঘিরলেন। বাগানের ঠিক মধ্যিখানে বাড়ি—রাস্তা কিংবা আশপাশের বাড়ি থেকে এত দূরে যে কারও মুখ চোখে পড়বার কোন সম্ভাবনা নেই। (সাধ্যমতে কারও মুখ দেখবেন না, এই প্রতিজ্ঞা।) বাড়িও বড়, বাগানে পুকুর, টিউবওয়েল কিছুরই অভাব

নেই। দেদার জমি—ফলফুলুরী সব্‌জির বাগান করবেন। মানে বাইরে যাবার বিশেষ দরকারও রইল না। পয়সা অনেক করেছিলেন—বাড়িও বেশ বড় দেখেই করলেন—যদিও সে বাড়িতে বাস করার লোক বিশেষ নেই। ছুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—তারা বিদেশে থাকে। ছেলেরও পুলিসের চাকরি, বদলির কাজ। সে বাইরে বাইরে ঘোরে বলে তার ছেলেকে মহিমবাবুর কাছে রেখে গেছে—এইখানেই ইস্কুলে পড়ে। অতবড় বাড়িতে কর্তা গিন্নী আর এই নাতি, আর থাকত এক বিধবা ভাগ্নী উষা, কোন কুলে কেউ নেই বলে এখানে বিনা মাইনেয় ঝিয়ের কাজ করত। এছাড়া যা ঠাকুর, চাকর, মালী। এখানকার এক ঠিকে ঝি এসে বাসন মেজে ঘর মুছে যেত।

বাগানের শখ ছিল খুব, হাতে বিশেষ কাজও তো নেই—ঐ নিয়েই থাকতেন। সকাল বিকেল বাগানে গিয়ে মালীর সঙ্গে লেগে থাকতেন—কখনও কখনও নিজের হাতেও খুরপি বা নিড়ানি নিয়ে কাজে লেগে যেতেন। সেদিন হয়েছে কি, ফুলগাছে ঠেকনো এবং এক রকমের লতানে গাছের চারায় বেড়া দেবার জন্যে আগের দিন এক ঘরামি ডেকে বাঁশ চিরিয়ে বেড়া দেওয়ার মতো ক'রে পাতলা বাখারি করিয়ে রেখেছিলেন, আবার মাটিতে পোঁতবার জন্যে বাখারির একদিকটা সরু ক'রে বল্লমের মতো ধারালো করিয়েছিলেন—সেইগুলো তুলে তুলে দেখছেন ঠিকমতো কাজ হয়েছে কিনা, হঠাৎ দেখেন পায়ের কাছে কি একটা নড়ছে, কালোপানা। বাখারির দিক থেকে চোখ সরিয়ে দেখেন—একটা ছোট ছাগলছানা, পরমানন্দে তাঁর সিজন্‌-ফ্লাওয়ারের গাছগুলো খাচ্ছে।

জমির চারিদিকে ঘেঁষ ঘেঁষ ক'রে লোহার বেড়া দেওয়া—সেখান দিয়ে গরু ছাগল ঢুকতে পারবে না, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। এত ছোট বাচ্চা ছাগলের কথা ভাবেন নি কখনও। বিশেষ লোহার বেড়ার নীচে একহাত উঁচু ইঁটের পাঁচিল আছে। অতটা লাফিয়ে উঠল কী ক'রে এইটুকু বাচ্চা?

বিষম রাগ হ'ল তাঁর। এই ফুলগুলো তিনি গত দু বছর ধরে ফোটাবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু মাটিতে অত্যধিক জল থাকায় গাছগুলো চারা অবস্থাতেই মারা যায়। এই বছর কি ভাগ্যি একটু বড় হয়েছে। সেইগুলোই মুড়িয়ে খেয়ে গেল পাজী ছাগলটা! আশপাশে এত গাছ আছে খেতে পারল না! ছাগলে মুড়ুলে সে গাছ আর কিছুতেই হয় না—এ কথা কে না জানে! তাঁর

ঐ ডানদিকে ভট্‌চাযরা থাকে—এদিকে তো বামুন—হাঁস ছাগল এমনকি মুরগীও পালে। লুকিয়ে ডিম বিক্রি করে তাও শুনেছেন। তা সে যা খুশী করুক—এসব একটু সামলে রাখতে পারে না!

রাগটা ঐ ভট্‌চাযদের ওপরই বেশী হ'ল—কিন্তু তারা হাতের কাছে নেই—এটা আছে, এখনও মনের সুখে গাছে খেয়ে যাচ্ছে—ভ্রূক্ষেপও নেই যে তাকে একজন এইভাবে লক্ষ্য করছে—সমস্তটা রাগ ওর ওপরই গিয়ে পড়ল। এর ওপর দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন তিনি। বুঝবে কত ধানে কত চাল।

মহিমবাবু সেই বাখারিটাই বাগিয়ে ধরলেন বল্লমের মতো, তারপর সজোরে বিঁধিয়ে দিলেন ছাগলটার গায়ে। সামনের ডান পাটার ওপরে, গর্দান ও পায়ের মাঝামাঝি জায়গায় বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। বাচ্চাটা একবার 'ব্যা' ক'রে উঠেই চুপ করল। মহিমবাবু বাখারিটা বার ক'রে নিয়ে মাটিতে রক্তটা মুছে নিলেন, তারপর মরা ছাগলটার দুটো পা ধরে বেড়ার ধারে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ওপারে ফেলে দিলেন, রাস্তার ওপরে।

মালীটা ওদিকে কাজ করছিল—সে ততক্ষণে এসে পৌঁচেছে. মালিকের কাণ্ড দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল—একটিও কথা না বলে পা পা ক'রে পিছিয়ে গেল আবার।

মহিমবাবু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ফুল গাছের কেয়ারির খানিকটা মাটি যে রক্তে লাল হয়ে উঠল তা নিয়েও মাথা ঘামালেন না, যেমন বাখারিগুলো পরীক্ষা করছিলেন, ঘরামিটা ফাঁকি দিল কিনা দেখছিলেন—তেমনিই দেখে যেতে লাগলেন। যে অন্যায় করেছে তাকে শাস্তি দিয়েছেন—তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে, এই হ'ল তাঁর মনের ভাব।

কেদার ভট্‌চাযের ছাগল ওটা। তিনি হাঁস মুরগী পালেন রোজগারের জন্যে, কিন্তু ছাগলটা রেখেছেন নিজের দরকারে। নাতি দুধ খায়। গোরু পোষবার ক্ষমতা নেই, অথচ একটু দুধের দরকার—তাই ছাগল রাখা। বাচ্চা হলে অবশ্য এক আধটা বেচেছেন—তবে আর একটু বড় ক'রে। এটা নেহাতই কচি বাচ্চা, তার ওপর নাতিটার বড় প্রিয়—সে দিনরাত ওর সঙ্গেই খেলা করে, এটা বড় হ'লেও বেচতে পারতেন না বোধহয়।

সেই ছাগলছানার এই পরিণাম দেখে তিনি দুঃখিত হলেন খুবই—কিন্তু

একে অত বড়লোক, বিস্তর চাকর দারোয়ান নিয়ে বাস করেন, তায় এক-কালের বড় পুলিস অফিসার—কিছু বলতেও সাহসে কুলোল না। ওঁর নাতিটা কেঁদে কেটে সারা হ'ল—সেদিন দুপুরে তাকে খাওয়ানো পর্যন্ত গেল না—মরা ছাগল-ছানাটাকে কোলে ক'রে বসে রইল—তবে কী আর করা যাবে, কেদার ভট্‌চায যতটা পারলেন তাকে সান্ত্বনা দেবার ভোলাবার চেষ্টা করলেন—এই পর্যন্ত। তাই বলে অত বড়লোকের সঙ্গে তিনি তো আর ঝগড়া করতে যেতে পারেন না।

সেইদিনই বেলা তিনটের সময় মহিমবাবুর নাতি অশোকের কী শখ হয়েছিল—বেড়ার ধারে বড় কদমগাছটা থেকে ফুল পাড়বে। সেদিন ইস্কুলের ছুটি ছিল—এখানে নয়, নিত্য গাড়ি গিয়ে অশোককে তিন মাইল দূরের বড় ইস্কুলে দিয়ে আসত, আবার নিয়ে আসত, এখানে কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না মহিমবাবু, ছুটির দিনগুলো তাই আর কাটতে চাইত না তার। সেজন্যে অবশ্য মহিমবাবু বাড়িতে যতরকম খেলা সম্ভব সবরকমই আয়োজন রেখে-ছিলেন, গান শেখাবার মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, যাতে বিকেলের ঘণ্টা দুই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়—তবু দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে? খেলার সঙ্গী না থাকলেও অশোক বাগানে বা মাঠে খেলে বেড়ায় একা একা।

এই কদম গাছটার একটু বিশেষত্ব ছিল—বর্ষার সময় ছাড়াও, বারমাসেই দুটো একটা ফুল ফুটত। এটা শরৎ কালের শেষ—তবু অন্ততঃ দশ বারোটা ফুল ফুটে আছে—তা নিচে থেকেই দেখা যাচ্ছে। অশোক এদিক ওদিক চেয়ে—দাদু কাছাকাছি কোথাও নেই দেখে আস্তে আস্তে গাছে উঠে গেল। গাছে চড়াটাও তার শেখবার কথা নয়—মানে মহিমবাবু জানলে শিখতে দিতেন না—আপনি-আপনিই চেষ্টা ক'রে শিখেছে, দাদুকে লুকিয়ে।

গাছে উঠে অশোক বুঝল—ফুলগুলো বড় পাজী, সরু সরু ডালের ডগায় ফুটে আছে। এত উঁচুতে যে নিচে থেকে লগি দিয়েও পাড়া যায় না, আবার এখান থেকে হাত বাড়িয়ে নেবে তাও সম্ভব নয়। এক এখানে ওঠার পর কেউ যদি লগিটা হাত বাড়িয়ে দিত তো কথা ছিল—কিন্তু তখন কথাটা মনে পড়ে নি। এখন এখান থেকে কাউকে ডাকতেও সাহস হ'ল না। তাহলেই দাদু টের পেয়ে যাবেন। অগত্যা যতটা সম্ভব—মাঝারি ডালগুলোয় পা দিয়ে ওপরের ডালের পাতা ধরে সরু ডালগুলো কাছে টেনে এনে, ফুল

পাড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

আর তারই মাঝে একসময়—ঐ ডালের ওপরই আঙুলের ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টায় প্রাণপণে নিজেকে লম্বা ক'রে ওপরের ডালের পাতা ধরবে এই ইচ্ছা ছিল—একসময় প্রায় লাফ দেবার মতো ক'রেই পাতার দিকে হাত বাড়াল—সে পাতাও ধরা গেল না, পা-ও গেল ফসকে।

সেখান থেকে নিচে সেই লোহার বাখারি মতো রেলিং-এর ওপর—যার মুখগুলো বর্শার মতো সরু ও ধারালো করা, ছিঁচকে চোর বা পাড়ার ছেলেরা যাতে ফুল চুরি করতে আসতে না পারে—মাথা নিচু করে পড়ার ফলে—বুক আর কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল—ঠিক যেখানে ছাগল ছানাটাকে বিঁধে ছিল ঠিক সেইখানটাতেই।

সে তবু একবার 'ব্যা' ক'রে চেঁচিয়ে উঠে ছিল, অশোক তাও পারে নি বোধহয়!

অন্ততঃ কেউ শোনে নি।

কেউ সেদিকে ছিল না। সবাই বিশ্রাম করছে। আধঘণ্টারও পরে মহিমবাবুরই ঘুম ভেঙে বাইরের বারান্দায় এসেছিলেন—দূর থেকে সাদামতো কী একটা রেলিং-এ ঝুলছে দেখে—চোর মনে ক'রে জোর পায়ে তেড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখেন—ঐ কাণ্ড!

চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এল—মায় পাড়ার লোক পর্যন্ত। কদম ফুল, ছোট ছোট ডাল আর পাতা ছড়ানো দেখে বুঝতে বাকী রইল না—কেন কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল অশোক; আর কী ক'রে এ অবস্থা হ'ল।

কিন্তু কারণ জেনে আর তখন লাভ ছিল না—বেচারী অশোক তার অনেক আগেই মারা গেছে।

ফুটফুটে মিষ্টি স্বভাবের ছেলে অশোক—তার এই শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই খুব দুঃখিত হ'ল। ঝি চাকর মালী সুদ্ধ কেঁদে আকুল। ঠাকুমা পিসিমাদের তো কথাই নেই। মামার বাড়ি থেকেও হাহাকার করতে করতে ছুটে এল সবাই—ছেলে বউ এসে মহিমবাবুকে একরকম তিরস্কার করলেন—ছেলে রাখার শখ অথচ নজর রাখার ক্ষমতা নেই বলে—কিন্তু সে কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কারণ তাঁরা তখন শোকে পাগলই হয়ে গেছেন বলতে

গেলে—কিন্তু মহিমবাবুর চোখে এক ফোঁটা জল কেউ দেখতে পেল না। তিনি চেঁচালেন না, হায় হায় করলেন না—কাঁদলেন না, অদৃষ্টকে গালি-গালাজ করলেন না—পাথরের মতো হয়ে গেলেন একেবারে। কোন কথার উত্তর দেন না—অপরের কথা কানে যাচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায় না। এত যে সবাই চারিদিকে হাহাকার করছে, কাঁদছে মাথা কুটছে—তাও যেমন শোনেন না, তেমনি ছেলে বউ এবং আরও কেউ কেউ যে তাঁকেই দোষ দিচ্ছে সেদিকেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এর মধ্যে ছাগলছানার ব্যাপারটাও এদের কানে গেছে—মালী চাকররাই বলে থাকবে, তাদের বিশ্বাস এটা ভগবানেরই শাস্তি—সে কথাও তুলল কেউ কেউ। মহিমবাবুর ছেলেমেয়েরাও দোষ দিল কিন্তু তারও কোন উত্তর দিলেন না। দোষ স্বীকারও করলেন না, কাটাবারও চেষ্টা করলেন না। চুপ ক'রে শুনেই গেলেন শুধু। তারপর সব গোলমাল চেঁচামেচি কান্নাকাটি একসময় থিতিয়েও গেল। মেয়েরা যে যার বাড়ি চলে গেল, ছেলে-বউও কর্মস্থানে ফিরল—অশোকের মামারা তো শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্তও অপেক্ষা করেন নি—আবারও সেই বুড়ো আর বুড়ী পড়লেন একা। আর অবশ্য সেই উষা—সে তো বেশির ভাগ সময় ভাঁড়ারেই ব্যস্ত থাকে।

ছাগলছানার ব্যাপারটা নিয়ে যত লোক মহিমবাবুকে দোষ দিয়েছে তার মধ্যে একজন মহিমবাবু স্বয়ং। মানুষের মনে ছোটবেলা থেকেই একটু একটু ক'রে ন্যায়-অন্যায়-বোধ জেগে ওঠে। এ কাজটা করা উচিত নয়; এটা করা কি বলা ঠিক হ'ল না; এটা খুব অন্যায় হয়ে গেল—মানুষ যখন কোন দোষ কি অন্যায় করে তখন প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে আর একটা কোন লোক যেন ঐ কথাগুলো বলে। একে বলা হয় মানুষের বিবেকবোধ। এই বিবেক প্রত্যেকেরই মনে আছে, সে ঠিকসময় তাদের সাবধানও ক'রে দেয়—তবু মানুষ অন্যায় করে, যখন করে তখন জোর ক'রে সেই বিবেকের দিক থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখে।

মহিমবাবুরও একটা বিবেক ছিল বৈকি।

যে সময় ছাগলছানাটাকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে মারেন তখনও সে বিবেক যে বাধা দেবার চেষ্টা করে নি তা নয়, কিন্তু রাগে পাগল হয়ে গিছলেন বলেই

সে দিকে কান দেন নি। এখন ফাঁক পেয়ে সে যা-তা বলতে লাগল। বাইরের লোকের সঙ্গে সেও বলতে শুরু করল, 'এই জন্যেই তোমার নাতিটা অমন বেঘোরে মারা গেল। তোমার পাপেই তোমার বংশনাশ হ'ল।'

ঘরে বাইরে এই অভিযোগ শুনতে শুনতে যেন ক্ষেপে গেলেন মহিমবাবু।

আসলে ঐ যে চুপ ক'রে ছিলেন—তার মানে তখন থেকে প্রচণ্ড রাগ পুষে রেখেছেন। এত রাগ হয়েছিল বলেই অমন চুপ ক'রে গিছলেন। রাগটা হওয়া উচিত নিজের ওপর কিংবা বড়জোর বরাতের ওপর, কিন্তু মহিমবাবুর সবই উলটো—তিনি কেদার ভট্চাযদের ওপরই রেগে উঠলেন। ওরা যদি ছাগল না পোষে, তাহলে তো আর ঐ ছানাটা এখানে আসে না, ওঁর গাছও খায় না। বামুনের ছেলে হাঁস, মুরগী, ছাগল পোষা কি? সে তো তাদের দেশে নিকিরীরা পুষত—ছেলেবেলায় দেখে ছিলেন। এখানেও দেখেছেন ঐ ধরনের লোকরা পোষে। বামুন কায়েত কখনও ওসব কাজ করে!

যত ভাবেন তত রাগ বাড়ে। শেষে আর যেন থাকতে পারেন না—কেবলই ভাবেন কি ক'রে এর শোধ তুলবেন, কেমন ক'বে কেদার ভট্চাযদের সর্বনাশ করবেন। কদিন ধরেই এই একটা কথা ভাবছেন, কোন উপায় হয়ত মাথায় যাচ্ছে কেদারবাবুদের ওপর শোধ তোলবার—আবার সেটার মধ্যে খুঁত দেখছেন, সেটা বাতিল ক'রে দিচ্ছেন মনে মনে—আবার অন্য উপায়ের কথা ভাবার চেষ্টা করছেন; এই সব তোলাপাড়া করছিলেন বলেই কারও কথা তাঁর কানে যায় নি, তিনিও কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি।

নিজের কোন অনিষ্টের জন্যে, বিশেষ যদি নিজের দোষেই সে অনিষ্টটা হয়—অপর কাউকে দায়ী করলে, আর প্রায়ই সেটা করে মানুষ, নিজের দোষটা কমিয়ে দেবার জন্যে—যত সময় যায় তত নিজের দোষ বা দায়িত্বের কথাটা মন থেকে মুছে যায়—ক্রমশঃ সেই লোকটার অপরাধই সত্যি বলে মনে হয়, আর সেটা বিরাট হয়ে ওঠে। মহিমবাবুরও ক্রমশঃ মনে হতে লাগল যে কেদারবাবুরা ইচ্ছে করেই এটা করেছেন। ওঁকে দিয়ে ঐ গর্হিত কাজটা করিয়ে নেবেন বলেই ছাগলছানাটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা, নইলে এটুকু বাচ্চার সাধ্য কি যে অতটা উঁচুতে উঠে বেড়া গলে আসে। শেষে এও মনে হতে লাগল মহিমবাবুকে বিপদে ফেলার জন্যেই ওঁরা ছাগল পুষেছেন।

আত্মীয়-স্বজন সবাই চলে গেলে, যখন ক্রমশঃ বাইরের লোক দুর্ঘটনার কথাটা ভুলেই এল তখন মহিমবাবু মন ঠিক ক'রে ফেললেন, আগুন দিয়ে ওদের পুড়িয়ে মারবেন। কেদারবাবুরা গোরু পোষেন না—সুতরাং গোরু মারার ভয় নেই, আর যা আছে, ছাগল হাঁস মুরগী সবসুদ্ধ যমালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

মন স্থির করলেন। এবার কাজটাও করা দরকার। অন্য লোক হ'লে আর কাউকে টাকা দিয়ে হাত করত, সেই লোকটাকে দিয়ে কাজ হাসিল করত। কিন্তু মহিমবাবু অত বোকা নন। দীর্ঘদিন—চল্লিশ বছর পুলিসে কাজ করেছেন, তিনি জানেন, এ সব কাজে পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। প্রথমতঃ লোকটা যদি বোকা হয়—এমন সব চিহ্ন রেখে আসবে যাতে দোষীকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না। নইলে পেট আলগা হয়ে হয়ত কাউকে বলব না মনে করেও দু একজনকে বলে ফেলবে, তা থেকে কথাটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। আরও যেটা ভয়ের কথা—যে করবে সে তখনকার মতো একটা মোটা টাকা পেয়ে খুশী হ'লেও পরে আরও টাকা চাইবে—না পেলে লোককে কি পুলিসকে বলে দেব বলে ভয় দেখাবে।

না, তিনি অত কাঁচা কাজ করবেন না। যা করবেন, একাই করবেন। কাউকে সাক্ষী না রেখে, কাউকে না জানিয়ে।

কাউকেই জানালেন না তিনি। এমনকি স্ত্রীকেও নয়। একটা বোতলে ভরতি করে কেরোসিন তেল ঢেলে নেওয়া এমন কঠিন নয়। এ ছাড়া তিনি একটা ন্যাকড়া নিয়ে পাকিয়ে লম্বা সলতের মতো করলেন, সেটাতে মোমবাতির মোম মাখিয়ে নিলেন। দেশলাই ফস করে জ্বাললে অনেকদূর থেকে লোক দেখতে পায়—সিগারেটের লাইটার যোগাড় করলেন একটা। সব ঠিক করে গভীর রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খাওয়া শেষ করে ঠিক সময় লোক দেখানোর জন্যে শুতেও চলে গেলেন। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি ঘরে শুতেন। স্ত্রী শুয়ে পড়লেন, ক্রমশঃ তাঁর নাক ডাকতে শুরু হ'ল—বোঝা গেল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। উষাও নিজের ঘরে চলে গেল শুতে, মালী ঠাকুর চাকররাও একে একে ঘুমিয়ে পড়ল। মহিমবাবু জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, দূর গ্রামে কোথাও কোন বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার আলোও বেশির ভাগই নেভানো, মানে

বাল্‌ব চুরি গেছে—তু একটা যা জ্বলছে তা বহুদূরে।

মহিমবাবু আস্তে আস্তে উঠে খালি পায়ে বাইরে এলেন। বাড়ির সব চাবিই তাঁর কাছে জমা দিয়ে শুতে যেতে হ'ত চাকরদের—সেদিক দিয়েও কোন অসুবিধা নেই। বাগানের কাজ করেন রবারের জুতো পায়ে, সেটা বাইরের রকে পড়ে থাকে—বেরিয়ে এসে জুতোটা পায়ে দিলেন, রবারের জুতোর আওয়াজ হয় না—তারপর দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দিনের বেলা দরজার কব্‌জায় তালায় তেল দিইয়েছেন—জং ধরার নাম ক'রে—কোথাও এতটুকু শব্দ হ'ল না তাই।

মতলব ঠিক করাই ছিল।

গিয়ে আগে এই মোম লাগানো সলতেটা জ্বালিয়ে পেছনের একটা বেড়ার গায়ে লাগিয়ে দেবেন, ওদিকটা অনেক গাছ-গাছালি—অন্য কোনও বাড়ি থেকেও দেখা যাবে না, মৃদু মোমের আলো। তারপর ঐ বোতলের কেরোসিনটা তাড়াতাড়ি চারিদিকের বেড়ায়, বাড়ির দরজা জানলায় ঢালতে ঢালতে এগিয়ে যাবেন ঐ সলতেটার দিকে, কাছাকাছি গিয়ে সলতেটার গোড়া পর্যন্ত ঢেলে ভিজিয়ে দিয়ে দ্রুত ফিরে আসবেন নিজের বাগানে। সলতেটা জ্বলতে জ্বলতে গিয়ে ঐ তেলে ভিজানো বেড়া পর্যন্ত পৌঁছলেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে—সমস্ত কেরোসিন তেলটা, একেবারে বেড়া আগুন লেগে যাবে, বাড়িটার চারিদিক ঘিরে—কারও পালাবার কোন পথ থাকবে না।

সব তো ঠিক—কিন্তু সলতেটা লাগিয়ে জ্বালতে যাবেন, কী একটা এসে তাঁর পায়ে ধাক্কা দিল। অপরাধী ষড়যন্ত্রকারীর মন ভয়ে চমকে উঠে নিচের দিকে চাইতেই তাঁর বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগল, মনে হ'ল দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল এক নিমেষে।

লাইটার ধরাই ছিল, দেখার কোন অসুবিধা হ'ল না। নিচু হয়ে আলো ফেললেনও।

একটা ছাগলছানা।

ছাগলছানাটাই এসে ঢুঁ মারছে তাঁকে।

কিন্তু এ কী।

এ যে অবিকল সেই ছাগলছানাটা! সেই কপালে সামান্য একটু সাদা

দাগ। একটা কান একটু কাটা।

এটা কোথা থেকে এল?

একে তো তিনি নিজে হাতে মেরেছেন এই মাসখানেক আগে।

যতদূর শুনেছেন আর কোন বাচ্চা ছাগল তো কেদার ভট্‌চাযের নেই। তবে কি সেটারই যমজ ভাই?

কিন্তু—ঐ একটুখানি সময়ের মধ্যেই ছুঁদে পুলিস অফিসারের বুদ্ধি তার কাজ ক'রে যাচ্ছে—ছাগলছানারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়, তার যমজ হ'লে এই এক মাসের মধ্যে অনেকখানি বেড়ে যেত।

তবে?

তা, যাই হোক, ছাগলছানা ছাড়া তো কিছু নয়। আবারও মনে বল আনলেন মহিমবাবু।

বড্ড জ্বালাতন করছে বেটা, ক্রমাগত ঢুঁ মারছে তাঁর পায়ে। তিনি মারলেন টেনে এক লাথি। সে লাথিতে না মরুক—অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ার কথা।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। মনে হ'ল এক ইঞ্চিও নড়াতে পারলেন না তিনি ছাগলটাকে।

আর—

এ কি! চোখকে যে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। ছাগলটা যেন একটু একটু করে বড় হচ্ছে না?

লোকে বলে গোখরো সাপ যখন ফণা ধরে দোলে—তখন তার চাউনিতে মানুষের কেমন যেন নেশা লাগে! সেও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর চোখের দিকে—পালাতেও পারে না, সাপটাকে মারবারও চেষ্টা করতে পারে না।

মহিমবাবুরও সেই অবস্থা হ'ল।

লাইটারটা নিভে গেছে—কিন্তু কোথা থেকে যেন একটু আলোর মতো এসে পড়েছে সেই জায়গাটাতে। তাতেই তিনি দেখছেন ছাগলটা নিমেষে নিমেষে বাড়ছে।

প্রথম বড় বাচ্চা, তারপর সাধারণ ছাগল, পরে দেখতে দেখতে রামছাগল, ক্রমে একটা বাছুর, আরও একবার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গোরুর মতো হয়ে উঠল—

মনে হ'তে লাগল মহিমবাবুর, সেই প্রকাণ্ড পাহাড়ের মতো ছাগলটার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আর একটু পরে মনে হ'ল সে চোখ দিয়ে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে। সে আগুন যেন ওঁকে এখনই ঘিরে ফেলবে।

এবার একটা বড় ঘোড়ার মতো হয়ে গিয়ে শিং বাগিয়ে তাঁকে গুঁতোতে আসছে—

আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে মহিমবাবু। বিকট চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালালেন। পিছনে যে ঐ দৈত্য কিংবা রাক্ষস কিংবা ভূতটা তেড়ে আসছে—সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। এখনই মেরে ফেলবে তাঁকে।

গ্রাম-জাগানো গলাফাটানো সে চিৎকারে সবাই উঠে পড়ল। ওঁর বাড়ির লোকও। তারা দেখল কেউ কোথাও নেই, উনিই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন আর চেঁচাচ্ছেন আঁ-আঁ ক'রে।

কোনমতে ফটক পেরিয়ে বাগানের রাস্তাটুকু পার হয়ে ওঁর বাইরের বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দড়াম ক'রে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে।

কেউই কিছু বুঝল না, কেউই কিছু দেখে নি। পরের দিন কেরোসিনের বোতলটা আর পলতেটা দেখে, কেদারবাবুরা আন্দাজ করেছিলেন মহিমবাবুর শয়তানী মতলবটা।

কিন্তু এর কোন শাস্তি দেওয়া গেল না আর।

জ্ঞান হ'ল বটে, কিন্তু জ্ঞান হওয়া তাকে ঠিক বলে না। কারণ সেই থেকেই উন্মাদ পাগল হয়ে আছেন মহিমবাবু। কাউকে চিনতে পারেন না, কারও সঙ্গে কথা বলেন না—শুধু থেকে থেকে আঁ-আঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে ওঠেন—দিন রাত সবসময়ই। ছেলেমেয়েরা ডাক্তার দেখিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেছে ভাল করার, কোন ফল হয় নি।

অন্তরাগ

উড়িষ্যার এক শহরে পৌঁছে এক নব পরিচিত বন্ধুর বাড়ি অতিথি হলাম। বন্ধু অমিয়বাবুর বাবা বড় উকিল, বাড়িটিও সেই পরিমাণে বিরাট। অনেকখানি বাগান চারিদিকে, তারই মধ্যে প্রকাণ্ড দোতালা বাড়ি। একেবারে নতুন

বাড়ি, আগাগোড়া আধুনিক বন্দোবস্ত। অতিথির জন্য একটি পৃথক ঘরই আছে, খাট, আলনা, টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিল, টেবিল-ল্যাম্প, আলো—সুসজ্জিত। সঙ্গেই বাথরুম। ঘরের সামনে একটু বারান্দা—সেটিও যেন মূলবাড়ি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বস্তুত বাড়ির দিকে পেছনে-ফেরা সেটা। বারান্দার সামনে এক ফালি নিজস্ব বাগান, পাঁচিল—পাঁচিলের কোল বেয়ে চওড়া একটা নালা—আর ওপাশে অনেকখানি-ব্যাপী এক আমবাগান। গরমের দিন—সিঁদুরে রঙের আমে বোঝাই হয়ে আছে গাছগুলি। বড় বড় গাছ—তার ফলে জায়গাটা ছায়ামধুর ও স্নিগ্ধ হয়ে আছে, সেদিকে চাইলে আরাম লাগে।

অমিয়বাবুর এই ঘরটি আমার বড় ভাল লাগল। একটা দোর খুললেই সমস্ত বাড়িটার সঙ্গে যোগাযোগ হ'তে পারে—দোরটা বন্ধ করলেই সম্পূর্ণ পৃথক একটি জগৎ। একেবারে নির্জন। শহরের বুকে বাড়ি, ওদিকে দাঁড়ালেই জনতা ও গাড়িঘোড়ার ভীড়—অথচ এই বারান্দাটা এমন একান্তভাবেই উত্তর দিকের এই আমবাগানের দিকে ফেরানো যে একটি কোণ ছাড়া শহরের কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। সম্বলপুর শহর যেন দূর থেকে এই বাগানটিকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে, এই ভূখণ্ডটি রয়ে গেছে—বোধ করি একশ বছর আগেকার পৃথিবীতে।

ভারি ভাল লাগল আমার জায়গাটা। বিশেষত সারারাত অগ্নি-বৃষ্টির পর ভোরে যখন ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করত, তখন সেই নির্জন বারান্দায় চুপ ক'রে বসে থাকতাম বহুক্ষণ ধরে। দূরে শহরটা জেগে উঠত একটু একটু করে, তার আভাস পেতাম কিন্তু আমার সামনের সেই আমবাগানে একটি মানুষের পদশব্দও জাগত না। নির্জন নিস্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন সেই বাগান একটি রহস্যভরা অস্তিত্ব নিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকত আমার মুখোমুখি। রাত চারটেয় আমার ঘুম ভেঙে যেত তখন থেকেই বেরিয়ে এসে বসতাম, ছটা নাগাদ চাকরে চা দিয়ে যেত একবার—চা খেতাম সেখানে বসেই। একেবারে আটটা নাগাদ বন্ধুবর এসে তাড়া লাগালে তবে উঠে স্নান করতে যেতাম। সন্ধ্যার আগেও যখন ছায়া ঘনিয়ে আসত আবার তখন যেন নতুন আর এক রূপ ধরত বাগানটা কিন্তু সেটা দেখবার বিশেষ অবসর মিলত না। সভাসমিতি, নিমন্ত্রণ, শহর ভ্রমণ, কাছাকাছি বিখ্যাত স্থানগুলি দেখা—একটা না একটা ব্যবস্থা

করেই রাখতেন অমিয়বাবু। আমি ঘুরতাম, কিন্তু মনটা পড়ে থাকত সেই আমবাগানে ও সেই বারান্দায়। বাগানটা আমাকে এমনিই পেয়ে বসেছিল!

প্রথম দিন লক্ষ্য করি নি,—তার কারণ সকালে পৌঁছে খানিকটা হৈ-হৈয়ের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে,—দ্বিতীয় দিনেই প্রথম নিরিবিলি বসবার সুযোগ পেলাম—আমবাগানটি শুধুই বাগান নয়, সেটি গোরস্থানও বটে এবং সঙ্গে সঙ্গে, গাছভর্তি পাকা আম থাকা সত্ত্বেও ছেলের দল আমতলায় এসে জড়ো হয় নি কেন, তার কৈফিয়ৎটাও পেয়ে গেলাম।

পুরানো গোরস্তান। গুটি-পাঁচেক মাত্র বাঁধানো সমাধির অস্তিত্ব আছে; আর গুটি-কতক ভাঙ্গাচোরা তুচারখানা ইট বা পাথর বহন ক'রে কোনমতে নিজেদের চিহ্নমাত্র বজায় রেখেছে; কয়েকটা জায়গায় মাটি ঈষৎ উঁচু হয়ে আছে এখনও—হয়ত ওগুলোর নীচেও নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে খোঁজ করলে —বহুকালের বারিবর্ষণে বাকী সব মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেছে, বিরাট আমগাছগুলি তাদের গুঁড়ি বিস্তৃত ক'রে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে হয়ত বা। আজ আর ঠিক ক'রে বলা শক্ত, কোন্‌খানে সমাধি আছে, কোন্‌খানে নেই।

অমিয়বাবুকে প্রশ্ন ক'রে জানলুম ডানদিকের ঐ ছোট পাহাড়টা ঘেঁষে এককালে এখানে ফৌজের ছাউনি ছিল। তারই স্মৃতি বহন করছে ঐ পল্‌টন কুয়া নামে মাঠের মধ্যেকার বড় ইঁদারাটা। একশ বছর আগে, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে ইংরেজ ফৌজেরও সমাবেশ হয়েছিল। সেই ফৌজের আমলেই মুসলমান ও খ্রীস্টানদের গোরস্তান ছিল এইখানে। অনেকগুলো ভেঙ্গেচুরে গেছে; কেউ কেউ সে সব নিশ্চিহ্ন ক'রে বাড়ি-ঘরও ক'রে ফেলেছেন—এই সামান্য জায়গাটুকু আজও আছে। তবে এখন আর এখানে কেউ গোর দেয় না, এখন গোরস্তান হিসেবে অন্য জমি ব্যবহার করা হয়।

বিকেলে একটু বেলা থাকতেই, অর্থাৎ কাছারীর ফেরৎ উকীলবাবুরা বাড়ি পৌঁছবার আগেই, একা বেরিয়ে পড়লাম। আমবাগানে ঢুকে বেড়াতে লাগলাম সেই সমাধিগুলির মধ্যে। অপূর্ব একরকম মনের ভাব হ'তে লাগল। মনে হ'ল কারা এরা, কবে এসেছিল এই পৃথিবীতে—কত কী ক'রে, কত অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ বুকে নিয়ে আবার পৃথিবী থেকে চলে গেছে। হয়ত আজও এদের কিছু বলবার আছে, সেই অকথিত কথা এইখানে সামান্য এই

কখানি ইষ্টকখণ্ডের মধ্যে গুম্‌রে মরছে।

ঘুরতে ঘুরতে একটি সমাধির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বিরাট আমগাছের ঠিক নিচে সমাধিটা, এখনও অটুট আছে। কিন্তু বিস্ময় সেজন্য নয়, তার ওপরে ঘন একটি মাকড়সার জালের আস্তরণ, এমনভাবে সেটি বিভিন্ন গাছের ডালে আট্‌কে বোনা হয়েছে যে দেখাচ্ছে যেন একটি চাঁদোয়ার মতই! শুধু তাই নয়, মাকড়শা জাল বোনে গোল ক'রে—এটি চতুষ্কোণ। চারকোণা মাকড়শার জাল এই প্রথম দেখলাম, কোন প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ কাছাকাছি থাকলে জিজ্ঞাসা ক'রে নিতাম যে এটা স্বাভাবিক কি না।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, আর কোন সমাধির ওপরই তো এরকম জাল নেই। হয়ত গাছের খাঁজে কোথাও একটু-আধটু থাকতে পারে—কিন্তু এভাবে? না, আর নেই।

কী খেয়াল হ'ল, হাতে ছড়ি ছিল—ছড়ির ডগা ক'রে জালটা ছিঁড়ে দিলাম। বেশ ভাল ক'রেই ছিঁড়লাম। কোথাও তার কোন অস্তিত্ব রইল না। মাকড়শাটা আগেই কোথায় চলে গিয়েছিল—তাকে দেখতে পাওয়া গেল না।

তারপর অবশ্য কথাটা আর মনে ছিল না, দূরবর্তী এক প্রাচীন শিবমন্দির দেখে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিলাম, ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্গল তখনও সেই নির্জন মন্দির এবং তার সংলগ্ন বিচিত্র কুণ্ডটির কথাই মনে পড়ছিল; সঙ্গে ছিলেন একজন স্থানীয় এম. এল. এ. তিনি গাড়িতে যেতে আসতে এখানকার নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী শোনাচ্ছিলেন—মন সেই রসেই ডুবে ছিল।

যত রাতেই শুই—গরমের জন্যই হোক, অথবা এখানে তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত ফরসা হয়ে যাবার জন্যই হোক—ঠিক সওয়া চারটেয় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উত্তপ্ত ঘরের বিজলীপাখা বন্ধ ক'রে বাইরের ভোরাই ঠাণ্ডা বাতাসে এসে বসলাম। তখনও চারিদিক নির্জন, দূরে, বহুদূরে ক্ষীণ আর্তনাদ তুলে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে, কোণাকুণি শহরের যে পথটুকু দেখা যায়—সে পথও সম্পূর্ণ জনবিরল। শুধু গাছে গাছে নানা সুরে নানা ভাষায় অসংখ্য প্রাণী ডাকছে। সে ঐকতানে স্নায়ু সজাগ হয় না বরং যেন এক রকমের মোহগ্রস্ত হয়ে আসে। সেই দিকে কান পেতে থাকতে থাকতে ভোরাই মিষ্টি বাতাসে চোখ দুটি আবারও তন্দ্রায় বুজে আসছিল, এমন সময় হঠাৎ যেন

একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলাম।

ওকি—

কাল সেই সমাধিটার ওপর থেকে লুতাতন্তুর যে চন্দ্রাতপ আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে দিয়েছি, আজ আবার তা পূর্ণ-গৌরবে অবস্থান করছে। শেষ রাত্রের শিশির পড়ে আজ তা এখান থেকেই স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এক একটি ঘনীভূত শিশির-বিন্দু মুক্তোর মতোই জ্বল্‌জ্বল্ করছে তার মধ্যে।

অবাক হয়েই চেয়ে রইলাম।

সেই চতুষ্কোণ চন্দ্রাতপ। সদ্য-নির্মিত বলে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এমনই সূক্ষ্ম কারিগরী যে শিশির না জমলে হয়ত এখান থেকে দেখাই যেত না।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে বসে রইলাম। মাকড়শাটাকে তো কাল কোথাও দেখিনি। কোথা থেকে আবার এল, এমন নিখুঁতভাবে এই জালটি রাতা-রাতি বুনল! ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম আর কোনও সমাধির ওপর এরকম জাল নেই। কোন কোন গাছের ওপরের ডালে দু-একটা বিশ্রী ধূম-মলিন পুরোনো জাল আছে বটে, কাল বিকেলে তাও দেখা যায় নি, ভোরাই শিশিরের দৌলতে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিন্তু এমন পরিপাটী কোনটাই নয়। আজ আরও একটা জিনিস দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, সমাধি বেদীটি ঠিক যতটা লম্বা এবং চওড়া, চন্দ্রাতপটিও তাই।

একটু পরেই অমিয়বাবু স্বয়ং আমার 'বেড-টী'র কাপ হাতে ক'রে এসে বসলেন। কথাটা তাঁকে বললাম আজ। তিনি তো স্তম্ভিত। স্পষ্টই স্বীকার করলেন, তাঁরা কোনদিনই এটা লক্ষ্য করেন নি। এতকাল এইখানে বাস করছেন—এবাড়ি নতুন হ'লেও দু-তিন বছর তো হয়েই গেছে—অথচ কোন-দিনই এই বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ে নি তাঁর, এও এক আশ্চর্য ব্যাপার। লক্ষ্য তো করেনই নি—এখনও বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না, বললেন, 'ওটা একটা প্রাকৃতিক খেয়াল মাত্র। মাকড়শাটার খেয়াল। অথবা ওখানে ওর ঐ রকম জাল বুনলেই সুবিধে হয় তাই—'

আমি কিন্তু অত সহজে ভুললাম না, সেদিনও বেলা চারটে নাগাদ উঠে বেড়াতে বেড়াতে বাগানে গিয়ে লাঠির ডগা দিয়ে ছিঁড়ে দিলাম জালটা। বেশ ভাল ক'রে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলাম।

সেদিন কথাটা মাথায় ছিল। চাঁদনী রাত, রাত্রেই শোবার আগে অমিয়বাবুকে নিয়ে যেতে চাইলাম, তিনি রাজী হলেন না। বললেন, তাঁর মা আর স্ত্রী তাহ'লে রক্ষা রাখবেন না। মায়ের এক ছেলে তিনি—আবার নববিবাহিত। কথাটা বুঝলাম। কিন্তু আমাকেও তিনি যেতে দিতে রাজী হলেন না। বললেন, 'ভূত না মানুষ মশাই, আশা করি সাপ মানেন। এই রাত্তিরে আর বাহাদুরী করতে গিয়ে কাজ নেই—। প'ড়ো ডাঙ্গা জমি—সাপখোপের হেড কোয়ার্টার।' সুতরাং তখন যাওয়া হল না। তবে কথাটা ভুলি নি। উত্তেজনায় ভাল ক'রে ঘুমোতে পারলাম না। স্বপ্নেও দেখলাম বিরাট এক মাকড়শা কঠিন জালে আমার সর্বাঙ্গ জড়াচ্ছে—

চারটের আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল পরদিন। একরকম ছুটেই বাইরে চলে এলাম।…ঐ তো পরিষ্কার চাঁদোয়াখানি দুলছে বাতাসে, শিশিরে তেমনি ঘনীভূত ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আশে-পাশে আর কোথাও না, অন্য কোন সমাধি-বেদীর উপরে নেই সে জাল—

সকালে জলখাবার খেতে বসে অমিয়বাবুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ সমাধিটা কার—কিছু জানেন না কি ? কোন বিশেষ ইতিহাস জড়িত আছে কিনা— ?'

ভদ্রলোক খুব নাম-করা উকীল। হার্ড ফ্যাক্ট্স্ বা কঠিন তথ্য নিয়ে তাঁর কারবার, স্বপ্নবিলাস বা কল্পনা ধারে-কাছে থাকলে কখনই এত পয়সা করতে পারতেন না। তিনি হেসে বললেন, 'ওসব উদ্ভুট্টী কথা নিয়ে মাথা ঘামালে তো আমার চলবে না মশাই, আমার অত সময় কোথা ! আপনারা লেখক মানুষ, সব রকম তুচ্ছ কথা নিয়ে সময় নষ্ট করা আপনাদেরই সাজে।'

অমিয়বাবুকে বার বার অনুরোধ করলাম যে এই বিষয়ে কিছু জানা যায় এমন কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে—কিন্তু তিনিও ব্যস্ত মানুষ, এসব খেয়াল রাখতে গেলে তাঁর চলে না। অথচ দিনের পর দিন দেখতে লাগলাম সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এমন কি সাড়ে পাঁচটার সময় জাল ছিঁড়ে দিয়ে সাতটার সময় টর্চ হাতে ক'রে গিয়ে দেখেছি জাল তৈরী হয়ে গেছে।

অবশেষে নিজেই খুঁজে বার করলাম লোক।

সেই এম. এল. এ. বন্ধুটিই সন্ধান দিলেন। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর

যিনি বৃদ্ধ পূজারী, তাঁর বাবা এখনও জীবিত আছেন। অন্তত একশ দশ বছর বয়স তাঁর। মিউটিনির আমলে যখন ঐ গোরস্তান ব্যবহৃত হ'ত—তখন তাঁর বেশ জ্ঞান হয়েছে। তাছাড়া লোকমুখেও কিছু শোনবার সুযোগ মিলতে পারে। নিচের দিকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে ব'লে উঠতে পারেন না কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি নাকি এখনও অটুট আছে তাঁর!

বন্ধুটি পরের দিন সে পূজারীর কাছে নিয়ে যেতে রাজীও হ'লেন। দিনের আলোয় নাকি তিনি চোখে চাইতে পারেন না—কথা হ'ল রাত্রে আমাকে নিয়ে যাবেন।

গেলাম রাত্রে। মহানদীর কাছে একটি ব্রাহ্মণ পল্লী—অধিকাংশ বাড়িই পাকা গাঁথুনী কিন্তু খড়ের চাল, তা আবার অত্যন্ত নিচু। জানলার বালাই বিশেষ নেই, কোন কোন বাড়ীতে ছোট্ট কুলুঙ্গীর মতো একটু গবাক্ষ আছে, তাইতেই বোধ করি ওদের চলে যায়। বেশী হাওয়াটা সম্ভবত এদের পছন্দ নয়।

এমনিই একটি বাড়ির বাতাসহীন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। একটা ছোট্ট পিদীম মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলছে এক কোণে, তাতে কিছুই ভাল ক'রে দেখা যায় না। বরং একটা রহস্যময় ভয়াবহ আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করে সে আলোতে। শুধু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখলাম। মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বসে আছেন একটি বৃদ্ধ। যে বালকটি আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সে-ই ওঁর পা দুটি মুড়ে দিয়ে গেল। ওঁর নিজের কোন শক্তি নেই। সারা ঘর থেকে ভ্যাপ্‌সা একটা গন্ধ আসছে, তার সঙ্গে চুয়াযুক্ত গুণ্ডির গন্ধ। বৃদ্ধ দন্তহীন মাড়িতে অবিরত পান চিবুচ্ছেন।

আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় তোলবার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'কে?' আমার বন্ধু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলেন। আমিও তাঁকে প্রণাম ক'রে মাদুরে বসলাম। অসহ্য গরম—কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করলে চলবে না। বন্ধুর অভিজ্ঞতা আছে, তিনি দেখলাম পকেটে করে একটি ভাঁজ-করা ছোট্ট পাখা এনেছেন।

পূজারীজীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। দেখলাম সত্যিই বৃদ্ধের চিন্তা ও ধারণাশক্তি এখনও বেশ পরিষ্কার রয়েছে। তিনি আমার প্রশ্নটা শুনে খানিকটা চোখ বুজে বসে থেকে বললেন, 'ও, বুঝেছি—আপনি কোনটার কথা

বলছেন।···বাবু, আপনাকে আজ আমি একথার উত্তর দেব না। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, এখন বোধ হয় রাত আটটা বাজে—আপনি এখনই চলে যান। রাত নটার সময় দ্বিতীয় প্রহর পড়বার ঠিক মুখে ঐ সমাধির কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন।···তারপর কাল আসবেন। আমার কাহিনী শুনতে গেলে আপনি ঠিক সময়ে পৌছতে পারবেন না, অথচ এ দিন সহজে পাবেন না; দৈবাৎ আজ এখানে হাজির আছেন। বছরে এই একটি দিনই এ ঘটনা ঘটে—"

তখনই উঠে পড়লাম। আটটা তখন বেজেই গেছে—সৌভাগ্যক্রমে আমার বন্ধু তাঁর গাড়ি এনেছিলেন, তাই কোনমতে নটার আগেই আমরা অমিয়বাবুর বাড়ি পৌঁছলাম। ওড়িয়া বন্ধু সঙ্গে রইলেন, তিনি অমিয়বাবুকে ডেকে নিতে চাইছিলেন, আমি বারণ করলাম। কী দরকার—মায়ের এক ছেলে, তাঁকে এসব ঝামেলার মধ্যে টেনে কাজ নেই।

সঙ্গে টর্চ ছিল না কিন্তু সেজন্য আজ আর অসুবিধা নেই, চাঁদনি রাত, ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। ঘন-পল্লব আমগাছের ছায়া এক এক জায়গায় খুব নিবিড় হলেও পথ দেখে চলতে কোন অসুবিধা হ'ল না।

সমাধিটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম—ঠিক নটা। কিন্তু কই, কিছুই তো নেই। কোন রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর অনুভূতি তো হচ্ছে না। বন্ধুর দিকে চাইলাম। তিনি চুপিচুপি বললেন, 'এখনও তিন মিনিট বাকী আছে। আপনার ঘড়ি বোধ হয় ফাস্ট আছে একটু—

তা হবে। মনে পড়ল ইদানীং দৈনিক আধ মিনিট ক'রে ফাস্ট যাচ্ছে বটে। মেলানোও হয়নি ক'দিন—

তিন মিনিট নয়, আরও মিনিট পাঁচেক পরে টের পেলাম ব্যাপারটা।

অকস্মাৎ মনে হ'ল ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঠিক সাধারণ ধূপ নয়; কস্তুরী-চন্দন-লবান দেওয়া ধুনোর মতোই সুবাস কতকটা। আরও একটু পরে পেলাম ফুলের গন্ধ, রাশি রাশি চাঁপা ও বেলফুল। তার সঙ্গে মৃদু চন্দনের সৌরভ। মনে হ'ল কোন দেবমন্দিরে উপস্থিত হয়েছি পূজার সময়।

অবাক হয়ে গেলাম আমরা দুজনেই। জনমানব নেই ধারে-কাছে। একটা কোন জীবিত প্রাণী পর্যন্ত নজরে পড়ে না। অথচ এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে?···বন্ধুর মুখ শুকিয়ে উঠল, তিনি চাপা অথচ কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'চলুন চলে যাই—এসব ব্যাপার ভাল না—'

ভয় যে আমারও একেবারে হচ্ছিল না তা নয়—কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে অদূরে বিদ্যুতালোকিত কোলাহল-মুখরিত শহরের দিকে চেয়ে মনে বল আনলাম! পাশেই অমিয়বাবুদের বাড়ী, লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাছাড়া আমরা দুজন আছি, এত ভয়ই বা কি। আমি বন্ধুর হাতটা ধরে আর একটু থেকে যাবার ইঙ্গিত করলাম।···

আর মিনিট তিন চার, তারপর আমরা দুজনেই শুনতে পেলাম একটা চাপা অথচ তীব্র আর্তনাদ। না—-নারীকণ্ঠের নয়, পুরুষ কণ্ঠেরই। মুহূর্ত খানেক—তারপরই সব চুপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল সে ফুল আর ধূপের গন্ধ। তার জায়গায় রৌদ্রদগ্ধ মাটি ও শুকনো আম পাতার গন্ধ।···আর সেটা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস উঠল—সরসর ক'রে আওয়াজ উঠল স্খলিত শুকনো আমপাতার রাশির মধ্যে, টুপটাপ ক'রে ঝরে পড়ল পাকা আম দু-চারটে—

আমার বন্ধু আর ইতস্তত করলেন না। আমার হাত ধরে প্রাণপণে টানতে টানতে দৌড় দিলেন। একেবারে অমিয়বাবুর হাতার মধ্যে ঢুকে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে শুধু বললেন, 'জল, একটু জল!' গরমের দিনে বাগানে বসবার জন্যে বিকেলে এই চেয়ারগুলো নিয়মিত পাতা হয় ভাগ্যে—আমারও আর দাঁড়াবার মতো অবস্থা ছিল না।

পরের দিন সন্ধ্যা না পড়তে পড়তে পূজারীর বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। তিনি সব শুনে হাসলেন একটু। তারপর কাহিনীটা বললেন। এ ঘটনা ঘটে আঠার শ' সাতান্ন সালে, তিনি তখন বালক মাত্র। তাঁর কিছু মনে নেই। এটা পরবর্তী কালে তিনি শোনেন তাঁর মার কাছ থেকে। সত্য মিথ্যা তিনি কিছু জানেন না। তবে খানিকটা যে সত্য তার প্রমাণ তো আমরাই পেয়ে এসেছি।

কাহিনীটি এই:

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও তেলেঙ্গী সিপাইরা যখন এসে ঐ পাহাড়ের কোলে ছাউনি ফেলে তখন এখানে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। ধান-চাল-খাদ্য-খাবার তো কারুর রাখবার যো ছিলই না—মান ইজ্জৎ প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠল। যাদের পয়সা ছিল—বা

পালাবার জায়গা ছিল তারা সবাই গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলে, কিন্তু যারা উপায়হীন তারা এখানেই থেকে আতঙ্কে প্রহর গুনতে লাগল। প্রতিদিনই একটা না একটা অত্যাচারের কাহিনী কানে আসে—অথচ তার কোন প্রতিকার নেই। প্রতিকার বা প্রতিবাদ করবে এমন সাহস কার? ইংরেজরা তখন ক্ষেপে উঠেছে, এদেশের প্রতিটি লোকের ওপর তাদের বিজাতীয় আক্রোশ জেগেছে তখন!

সবচেয়ে বিপদ হল এই পূজারী-পল্লীর। প্রতিটি পরিবারেই সেবার পালা পড়ে ঘুরে-ঘুরে। দেবীর নিত্যসেবা বন্ধ রেখে পালাবে কে? তবে তাঁরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেন, সন্ধ্যের আগেই মন্দির বন্ধ ক'রে এসে ঘরে ঢুকতেন যে-যার—তারপর কোন কারণেই আর বেরোতেন না।

এরই মধ্যে এক ঘটনা ঘটল। তাঁদের এই পূজারীবংশের একটি মেয়ের এখানেই বিয়ে হয়েছিল। তার শ্বশুর বাড়ীর কাছেই পড়েছিল ছাউনি। অত কাছে আর কেউই থাকতে সাহস ক'রে নি, সকলেই প্রায় অন্য কোথাও না কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল। কেবল কোনও উপায় ছিল না মালতীর। তার বৃদ্ধ শ্বশুর একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে সুদ্ধ কোথায় কে আশ্রয় দেবে? তাছাড়া তার মাথাতেও কেমন একটু গোলমাল হয়েছিল, বাড়ী থেকে নড়াতে গেলে তিনি কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ করতেন। সুতরাং মালতীর যাওয়া হয় নি।

তবু তারা খুব সাবধানেই ছিল বৈ কি। মালতী দিবালোকে বাড়ীর উঠানে পর্যন্ত বার হ'ত না। তাকে ঘরের মধ্যে স্নানের জল ও পাকের যোগাড় পৌঁছে দিত তার স্বামী। মালতী এদেশের হিসেবে রীতিমত সুশ্রী ছিল, সেইজন্যে আরও এত সতর্কতা।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা—একদিন মালতীকে একাই বেরোতে হ'ল শুধু উঠোনে নয়, একেবারে রাস্তায়। ওর স্বামী মাঠ থেকে ফিরে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ঘরে আর কোন লোক নেই, শ্বশুর পঙ্গু, অসমর্থ। কে বৈদ্য ডাকে? ধারে-কাছে তেমন কোন বৈদ্যও নেই। যারা ছিল সবাই পলাতক। মালতীর মনে পড়ল ছাউনীতে মিলিটারী সার্জন আছে একজন—গোরা ডাক্তার—যদি তার হাতে পায়ে পড়া যায়, দয়া কি হবে না?

তখন অত ভাববার সময় নেই, বিবেচনারও নয়, মালতী পাগলের মতো রাস্তায় বার হয়ে দৌড়োতে লাগল ছাউনীর দিকে।

কিন্তু ছাউনী পর্যন্ত যাবার আগেই এক ঘটনা ঘটল। মহম্মদ ইসমাইল নামে এক তেলেঙ্গী সিপাই আর গাফ নামে (নামটা ঠিক মনে নেই পুজারীর, তবে ঐ রকমই হবে) একজন ফিরিঙ্গি গোরা—ছাউনি থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল, ঐ পথে চুপি চুপি ফিরছিল তারা। সেদিনও বৈশাখী পূর্ণিমা। মদোন্মত্ত ফৌজী সিপাই নির্জন পথে সুশ্রী তরুণীকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। দুজনে দুটো হাত ধরে নিয়ে চলল অপেক্ষাকৃত নিরালা বনছায়ার উদ্দেশে। মালতী কান্নাকাটি কাকুতি-মিনতি ঢের করল। গোরা গাফ তার কথা বুঝল না। কিন্তু ইসমাইল বুঝল। অসুস্থ স্বামীকে ফেলে সতী নারী উন্মাদিনীর মতো, বলতে গেলে বাঘের গুহায় যাচ্ছিল—কথাটা শুনে নরম হ'ল তার মন। অবশেষে দুর্দান্ত গাফ্ যখন মালতীর প্রতি চরম অত্যাচারে উদ্যত হ'লে সে ইস্‌মাইলের পায়ে পড়ে বলল, 'তুমি আমার দাদা, আমি তোমার ছোট বোন, আমাকে বাঁচাও।' তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না। তারও ঘরে একটি ছোট বোন ছিল, সে তাকে ভালও বাসত। সে গাফের হাত ধরে বললে, 'বাস, খবরদার। ছেড়ে দাও ওকে।'

গাফের সেদিন নেশার মাত্রা বেশী হয়েছিল। চোলাই-করা দেশী মদ, তার সঙ্গে এদেশের লোকেরা চড়াদামে সাহেবদের কাছে বেচবে বলে গাছ-গাছড়ার রস মিশিয়ে দিত—তার নেশা তখন গাফের মাথায় উঠেছে। সে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি দিয়ে উঠল।

ইসমাইল কিন্তু তাতেও তাতে নি। সে গাফকে বুঝিয়ে বলতে গেল। যখন কিছুতেই পারল না তখন জড়িয়ে ধরে রেখে বললে, 'বোন তুমি পালাও, দৌড়োও। বাড়ী ফিরে যাও তোমার। ছাউনিতে যাবার চেষ্টা করো না আর।' মালতীও দৌড়তে লাগল। তবে সে বেশীদূর যাবার আগেই এক কাণ্ড ঘটে গেল। এক ঝট্‌কায় গাফ্ ইসমাইলের হাত ছাড়িয়ে নিয়েই কোমর থেকে তলোয়ারখানা বার ক'রে—ইসমাইল' ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই বসিয়ে দিলে ওর বুকে। একটি মাত্র আর্তনাদ ক'রে পড়ে গেল বেচারী।

ঝোঁকের মাথায় অথবা নেশার মাথায় মেরে ফেলেছিল গাফ্, কিন্তু তার

পরই প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল। সে আর মালতীকে ধরবার চেষ্টা করলে না। তার নিজেরই প্রাণ বাঁচানো সমস্যা। সেও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলে।

মালতীর নিজের ভয় তো ছিলই, তার ওপর চোখের সামনে এই হত্যাকাণ্ড দেখে বিহ্বল অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কোনমতে অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এল। সৌভাগ্যের বিষয় তার স্বামীর তখন আপনিই জ্ঞান হয়েছে, সে সুস্থও হয়েছে। স্বামীর বিষয় নিশ্চিন্ত হ'য়ে মালতীর অন্য কথাটা বেশী ক'রে মনে হ'তে লাগল! বেচারী ইসমাইল তার জন্যই প্রাণটা দিলে। তার সত্যিকারের দাদা হ'লেও তাকে বাঁচাতে এমন ভাবে প্রাণ দিত কিনা সন্দেহ! সে কিছুতেই ভুলতে পারল না সেদিনের ঘটনা, সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে থাকত, আড়ালে একা থাকলেই চোখের জল ফেলত।

মালতী সেদিন কোথায় গিয়েছিল অত রাত্রে, ডাক্তারের খোঁজে গিয়ে থাকলে ডাক্তার আনলে না কেন—একথা তার স্বামী ও শ্বশুর দুজনেই বার বার প্রশ্ন করেছেন কিন্তু মালতী ভয়ে তাদের কাছে সত্য কথাটা বলে নি। এটা সহজাত ভয়—কি দরকার খুন-খারাপির ব্যাপারে নিজেকে জড়ানোর। বিশেষত ইস্‌মাইলের রহস্য-জনক হত্যার কথাটা তখন চারিদিকেই আলোড়িত হচ্ছে। মালতী একবারও কথাটা মুখে আনলে না।

এক বছর ঘুরে গেল আবার এল বৈশাখী পূর্ণিমা। মালতী আর স্থির থাকতে পারলে না। ইসমাইলের সমাধি কোথায় দেওয়া হয়েছিল তা সে লক্ষ্য করেছিল, কতদিন গোপনে গিয়ে ও ফুল দিয়েও এসেছে সেখানে। সেদিন রাত্রে স্বামীকে পুজো দেবার ছুতোয় দূরে শিবের মন্দিরে পাঠিয়ে একা ফুল, চন্দন, ধুনো নিয়ে গিয়েছিল ঐ সমাধিটিতে পুজো করতে বা স্মরণ করতে। ফুল দিয়ে সমাধি সাজিয়ে ধূপধুনো দিয়ে আলো জেলে যেমন ফিরবে, দেখা হয়ে গেল ওর এত দূর সম্পর্কের নন্দাইয়ের সঙ্গে। তিনি নির্জন গোরস্তানে একা স্ত্রীলোককে ঢুকতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে পিছু পিছু এসেছিলেন—সবই লক্ষ্য করেছেন।

এর ফল যা হবার তা হ'ল। কথাটা জ্ঞাতি-মহলে ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানের সমাধিতে ফুল আলো দিয়ে যে পুজো করে, সে নিশ্চয় মুসলমানী তার আর জাত কি থাকতে পারে? ঘোঁট হ'তে হ'তে ঠিক হ'ল যে ওকে ত্যাগ করতে হবে, আর ত্যাগ যদি না করা হয় তো তাঁরা অর্থাৎ জ্ঞাতিরা ওর

স্বামী-শ্বশুরকে একঘরে করবেন। স্বামীরও একটা চাপা বিদ্বেষ এবং প্রকাশ্য-সংশয় ছিল। তিনিও ত্যাগ করতে রাজী হলেন!

দেখা গেল সেদিন মালতীর আশ্রয় নেবার মতো স্থান আর এই এতবড় শহরে কোথাও নেই—এক বেশ্যাপল্লী ছাড়া। সে ওদের বাগানে একা কুটির বেঁধে থাকতে চাইলে, স্বামী সে অনুমতিও দিলেন না। অগত্যা যা স্বাভাবিক মালতী তাই করল।

দূর থেকে তাদের বংশের ইষ্টদেবীকে প্রণাম জানিয়ে মহানদীতে গিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই থেকে আজও প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমার ঠিক দ্বিতীয় প্রহরের মুখে ঐখানে ফুল, চন্দন ও ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। আর শোনা যায় আহতের একটা চাপা আর্তনাদ। আর একটি ক'রে মাকড়শা চিরকাল ধরে শহীদের সমাধির উপর ঐ লুতাতন্তুর চন্দ্রাতপ রচনা ক'রে রাখে—কখনও এর ব্যতিক্রম হয় না।

মহাপ্রসাদ

গল্পের মতো ক'রে বলছি বটে—কিন্তু আসলে এটা গল্প নয়। গালগল্প বা আষাঢ়ে গল্প তো নয়ই। এর পনেরো আনাই সত্যি—এক আনা হয়তো মিথ্যে বা বানানো।

ও হরি! মূলেই যে ভুল! এখন আবার টাকায় ষোল আনা নেই, হয়েছে একশ' পয়সা। সে হিসেবে—নব্বুই সত্যি আর দশ মিথ্যে বলাই ভাল হিসেবটা ঠিক পছন্দসই হয়। অবিশ্যি নামটাও মিথ্যে। সত্যি নামটা তো আর লিখতে পারি না—ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন।

প্রভাসদা মানুষটি কিন্তু ভাল ছিলেন। ভারী ভাল মানুষ, সাদাসিধে অমায়িক, কখনও জেনে শুনে মিথ্যে বলতেন না—কারও অনিষ্ট করতেন না। আমাদের—মানে তখন যারা পাড়ার ছোটছেলের দল—তাঁর ভাইয়ের মতো —সত্যিই খুব ভালবাসতেন। ভাললোক 'ছিলেন' বলাটাও ঠিক নয়। এখনও এই বয়সেও তাঁর মতো সৎ ও স্নেহপরায়ণ মানুষ বড় একটা দেখা

যায় না। মনে হয় সত্যযুগের লোক।

সবই ভাল, কেবল ঐ বাতিকগুলো ছাড়া।

বাতিকগুলোই—কারণ বাতিক তাঁর একটা নয়।

প্রথম কথা তিনি গল্প উপন্যাস পড়তেন না। মানে ছোটদের গল্প কি উপদেশমূলক কাহিনী পড়তে তিনি খুব রাজী। কিন্তু বড়দের গল্প বা উপন্যাস—যাকে নভেল বলে—তাতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। বলেন, 'ওসব বই পড়া ভাল নয়, ওতে মানুষের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, মনের গঠন খারাপ হয়। তাছাড়া, ও তো ঝুড়ি ঝুড়ি মিছে কথা, ও সব পড়ে কি হবে?'

ফলে এই বাতিকের জন্যেই নাকি, তাঁর এম. এ. পাস করা হয়ে ওঠে নি, অত ভালছেলে হওয়া সত্ত্বেও। অন্ততঃ কয়েকটা উপন্যাস না পড়লে নাকি এম. এ. পরীক্ষা পুরোটা দেওয়া যায় না। অথচ উনি কিছুতেই সেসব বই পড়বেন না—পাস করার খাতিরেও না।

আর সেইজন্যেই চিরকাল ওঁকে বালিপোতা ইংরেজী ইস্কুলের সেকেণ্ড টিচার হয়ে কাটাতে হল—কখনও হেডমাস্টার হতে পারলেন না। অথচ ইংরেজী গ্রামারে ওঁর যা দখল ছিল—হেডমাস্টারমশাই তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবেন না কোনদিন।

আর এক বাতিক ওঁর—উনি কোন দেবদেবী এমন কি ভগবানও মানতেন না।

আমাদের পাড়ার বারোয়ারি পূজোর মণ্ডপে আসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন—হাসিঠাট্টাও যতটা সম্ভব করতেন। এমনি খুব দিলখোলা মানুষ ছিলেন তো—কিন্তু তাঁকে কখনও ঠাকুর নমস্কার করতে কি অঞ্জলি দিতে দেখি নি। মণ্ডপে দাঁড়াতেন সর্বদা প্রতিমার দিকে পিছন ফিরে। বিজয়া দশমীর দিন কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন—পাছে কারও সঙ্গে কোলাকুলি করতে হয় কি প্রণাম নিতে হয়। এর সঙ্গে পূজোর কি সম্পর্ক তা বুঝতুম না। উনি কিন্তু ওটাকেও দুর্গাপূজোর অঙ্গ বলে মনে করতেন।

ওঁর জন্যেই বউদি বেচারীরও পূজো-আর্চা করা হত না। ঘরে দেবদেবীর ছবি দেখলেও প্রভাসদা ক্ষেপে যেতেন। দৈবাৎ কোন ঠাকুরদেবতার ছবিওলা ক্যালেণ্ডার এলে টাঙাতে দিতেন না। ফলে বউদিকে কোন প্রণাম

কি স্তব পাঠ করতে হলে সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠে কিংবা সকালবেলা রান্নাঘরে বসে সারতে হত। বৈশাখমাসে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে আঁজলা করে জল নিয়ে জলের ওপর ফেলেই শিবপূজা সারতেন।

এমনিভাবেই কাটিয়ে ছিলেন প্রভাসদা দীর্ঘকাল। ছেলেমেয়েরাও সেইভাবেই মানুষ হচ্ছিল। অন্ততঃ উনি তাই মনে করতেন। মানে—ওঁর সামনে গল্পের বই পড়া নিষেধ ছিল তাদের, কোন পূজোয় যোগ দেওয়া এমন কি সরস্বতী পূজোয় অঞ্জলি দেওয়াও। অবিশ্যি তারা যে অতটা ঠিক মানত তা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ তাদেরও সমাজ আছে একটা। ইস্কুলের সরস্বতী পূজো না হয় ইস্কুলে না গিয়ে এড়ানো যায়—চাঁদাটা প্রভাসদা বিনা প্রতিবাদেই দিতেন। বলতেন 'ওটা হল গে সোস্যাল ট্যাক্স, সাজাজিক খাজনা'—কিন্তু পাড়ায় বন্ধুবান্ধবদের পূজোর জায়গায় না গেলে তারা ক্ষেপিয়ে শেষ করে দেবে, সে ধাক্কা কি আর তাদের বাবা সামলাতে আসবেন ?

তারা তাই লুকিয়ে চুরিয়ে ঠিকই পূজামণ্ডপে যেত, অঞ্জলিও দিত এদিক ওদিক দেখে নিয়ে—বাবা সেদিকে আসছেন কিনা। প্রসাদ তো খাবেই—তা হয়তো প্রভাসদাও অনুমান করতেন, তবে সামান্য ব্যাপার নিয়ে কিছু বলতেন না।

এহেন প্রভাসদার জীবনে এক মহা অঘটন ঘটে গেল সেবার।

হঠাৎ শুনলেন তাঁর বন্ধু নরেন বোস আর অবনী চাটুয্যে পুরী যাচ্ছেন ক'দিনের ছুটি নিয়ে। তাঁরও তখন গরমের ছুটি চলছে ইস্কুলে। শেষ হয়ে এসেছে অবশ্য—তেমনি পরীক্ষার খাতা দেখার কাজও শেষ, হাতে তাঁর বিস্তর অবসর।

তিনি বললেন, 'চলো, আমিও ঘুরে আসি তোমাদের সঙ্গে।'

সে কি!

বন্ধুরা তো অবাক। প্রভাসদা বলছেন কি। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

শুধু বেড়াবার কি হাওয়া খাবার জায়গাই তো নয়—পুরী তো একটা প্রধান তীর্থও। আমাদের চার প্রধান ধাম বা তীর্থের একটি। ওখানকার দেবতা জগন্নাথকে বলা হয় সাক্ষাৎ ভগবান। কলিতে নাকি ঐ একমাত্র দেবমূর্তি যার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে, 'দারুভূতো মুরারি'।

দারু মানে কাঠ, জগন্নাথের মূর্তি কাঠের, সেইজন্যেই ঐকথা বলা হয়। বারো বা আঠারো বছর অন্তর যেবার আষাঢ় মাসে মলমাস বা অতিরিক্ত মাস পাওয়া যায়—সেই বছরই 'নবকলেবর' হয়। মানে নতুন কাঠের মূর্তি তৈরি করা হয়। নইলে বছরে একবার—স্নানযাত্রার পর রথযাত্রার আগে কদিন দর্শন বন্ধ রেখে নতুন ক'রে রঙ করা হয় শুধু।

জগন্নাথের আরও অনেক মহিমা আছে। ওঁর অন্নপ্রসাদ—ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন—ভাতের মধ্যে নয়। ভাতেরই প্রসাদ কিন্তু সে প্রসাদ খেতে কোন ছুঁই ছুঁই কি জাতিভেদের ব্যাপার নেই। যার তার হাতে খাওয়া যায়, যার তার সঙ্গে খাওয়া যায়। মেয়েদের ব্রত উপবাসে খেলেও উপবাস নষ্ট হয় না। এ প্রসাদ কেউ খাওয়াতে এলে তখনই খেতে হয়, তা যে যেভাবেই থাকুক না কেন। প্রবাদ আছে এক কুকুর খেতে খেতে একদানা প্রসাদ পথে ফেলে দিয়েছিল, তারপর আর খুঁটে খায় নি—তাই দেখে স্বয়ং ব্রহ্মা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় রেখে ছিলেন।

এসব নিশ্চয়ই গল্প-কথা, তবু এ থেকেই বোঝা যায়, ভারতের হিন্দুরা কী চোখে দেখে জগন্নাথকে আর তাঁর প্রসাদকে।

শোনা যায়, আগে যখন রেলগাড়ি ছিল না, হাঁটাপথে যেতে হত—তখন পাণ্ডারা, বা পাণ্ডার ছড়িদাররা বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে অপেক্ষা করত—নতুন যাত্রীদের মুখে কে আগে প্রসাদ দিতে পারবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

কেন না, যিনি প্রথম প্রসাদ দিতেন যাত্রীরা তাঁকে টাকা পয়সা উজাড় ক'রে দিয়ে খুশী করত। খুশী হয়েই দিত তারা, সামর্থ্যের ঢের বেশীই দিত। এ প্রসাদ মুখে পড়লে পূর্বপুরুষরা উদ্ধার হবেন—এই ছিল সকলের বিশ্বাস।

এহেন পুরীতে যেতে চাইছেন প্রভাসদা !!

ঠিক শুনছেন তো তাঁরা—ভুল শুনছেন না তো ?

'কী ব্যাপার প্রভাসদা,' নরেনবাবু বললেন, 'তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?'

'কেন ?' প্রভাসদা বেশ ঠাণ্ডা ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'নইলে তোমার মতো লোক জগন্নাথের দেশে যেতে চাইছে !'

'ওটা সমুদ্রেরও দেশ, ভুলে যেও না। বহুলোকে হাওয়া বদল করতে

যায়। সমুদ্রের ধারে শুনেছি হাজার খানেক বাড়ি আছে, বেশির ভাগই বাঙ্গালীর। তাবড় তাবড় বড়লোকও সব বাড়ি করেছে সেখানে। গরম পড়লেই তারা ঠাণ্ডা বাতাস খেতে ছুটে যায়।'

'ও, তুমি তাহলে সমুদ্রের হাওয়া খেতেই যাচ্ছ।...তা তাই যদি হয়তো গোপালপুর কি ওয়ালটেয়ার যাও না কেন!'

'অনায়াসে। তোমরা গেলে তাই যেতুম। একা একা কি আর হাওয়া খেতে যাওয়া চলে?' উত্তর দিলেন প্রভাসদা।

তাছাড়া আরও বললেন, 'পুরীর আর একটা আকর্ষণ আছে—মন্দির।'

'মানে? তুমি কি মন্দিরে যাবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন অবনীদা।

'যাব বইকি!' প্রভাসদাও যেন অবাক হলেন এবার, 'ঠাকুর দেখব না বলে মন্দিরও দেখব না—একথা কে বললে?...অতদিনের পুরনো মন্দির, অত বিশাল—তার একটা আলাদা দাম নেই?...সেটা দেখতে যাব শিল্পকর্মের নমুনা হিসেবে। যেমন তাজমহল দেখতে যাই, তেমনি মন্দিরও দেখব। আমার কাছে দুই-ই সমান।'

আর কেউ কথা বাড়ালেন না। প্রভাসদা মানুষ ভাল, সঙ্গী হিসাবেও চমৎকার। নরেন আর অবনীর তো দীর্ঘকালের বন্ধু, ওঁদের সঙ্গে নিতে তো কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। তাঁরা বেশ আগ্রহের সঙ্গেই রাজী হলেন।

যথাসময়ে ওঁরা পুরী রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে খুঁজে খুঁজে স্বর্গদ্বারে একেবারে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন।

তখন ভিড় খুব, কোন নামকরা হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল না। তা হোক, ওঁদের তাতে খুব দুঃখ নেই। যে বাড়িতে এই হোটেল হয়েছে, আগে এখানে একটা বিখ্যাত হোটেল ছিল, তারা নিজেদের বড় বাড়ি ক'রে উঠে গেছে। এ বাড়িটা ছোট, একতলা—তবু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তা থেকে কয়েক পা বালির ওপর দিয়ে গিয়েই বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি—সিঁড়িও এমন কিছু নয়, মোটে চারটে নীচু নীচু ধাপ, তারপর একটা চওড়া বারান্দা, তার পিছনে একসার ঘর। সামনে আর কিছু নেই, বারান্দা বা ঘর—যেখানেই বসে থাকো—দিনরাত সমুদ্র তোমার সামনে।

ভারী খুশী হলেন এঁরা। প্রথম দিনটা তো বারান্দা ছেড়ে নড়লেনই না, বসে বসে খালি সমুদ্র দেখলেন। বিকেলে শুধু বেরিয়ে জলের ধারে গিয়ে বসেছিলেন। একবার আচমকা খানিকটা জল এসে কাপড়চোপড় ভিজিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি আবার চলে এলেন! তারপরও বহু রাত পর্যন্ত সেই বারান্দাতেই বসে রইলেন। রাতের সমুদ্রেরও শোভা কম নয়, যত দেখেন তত অবাক হয়ে যান।

কিন্তু প্রথম দেখার নেশা—কাটতেও বেশী সময় লাগল না। এইবার শহর—বিশেষ মন্দির ও জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—অবনীদারা।

এখানে এসে আগেই দর্শন করতে যাওয়া দরকার। সে জায়গায় তো পুরো একটা দিনই কেটে গেল।

প্রভাসদার কাছে একটু ইতস্তত: করেই কথাটা পাড়তে গিছলেন ওঁরা—কিন্তু দেখা গেল তাঁরও উৎসাহ কম নয়। বললেন, 'বেশ তো. চলো না, তোমরাও দর্শন করবে—আমিও দর্শন করব। তোমরা ঐ কাঠের তৈরী কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখো. ঠুঁটো জগন্নাথ—আমি দেখব বিরাট শিল্পকীর্তি, মন্দির। মানুষের কল্পনা ও সাধনা কতদূর যায়—তাই দেখে ধন্য হবো।'

কিন্তু মন্দিরে ঢোকার মুখেই মনটা খিঁচড়ে গেল।

সিংহদ্বারের কাছে পৌছতেই পাণ্ডার দল এসে ঘিরে ধরল। পাণ্ডা না বলে 'গাইড' বলাই উচিত অবশ্য, কারণ এরা কেউই পূজারী পাণ্ডা নয়, উটকো কতকগুলো লোক, দুটো চারটে পয়সার জন্য সারাদিন ঐখানে ধন্না দেয়, পাণ্ডা বলে চালায় নিজেদের। নতুন কোন যাত্রী বাগাতে পারলে মন্দিরটা ঘুরিয়ে দেখায়—তারপর যতটা যা পারে আদায় করে নেয়।

এদের উৎপাত খুব খারাপ লাগে এটা ঠিক। প্রভাসদার তো আরও লাগবে। তিনি বেশ একটু রেগেও গেলেন কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দা একেবারে। 'বাবু দর্শন হবে?' 'পূজো দেওয়া হবে?' 'চলুন আমার সঙ্গে—ইত্যাদি বলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল ছিনে জোঁকের মতো।

তাদেরই বা দোষ কি! আর কিছুই শেখে নি, এই যা সামান্য রোজগার। এককালে এতেই বেশ চলত, এখন সারাদিনে একটা নতুন যাত্রী ধরতে পারে কিনা সন্দেহ। সে অবস্থায় একবার সুযোগ পেলে কি আর কেউ সহজে ছাড়তে চায়? ওঁরা এদের মধ্যে থেকে একজন কাউকে বেছে নিলেই

সবচেয়ে ভাল হত, বাকী সকলে ছেড়ে দিয়ে চলে যেত। আর এমন কিছু লাখে পঞ্চাশের ব্যাপার নয়, আট আনা কি বড়জোর একটা টাকা দিলেই ওরা খুশী হয়ে প্রায় নাচতে নাচতে চলে যেত। কিন্তু এঁরাও কলকাতার লোক, পাণ্ডা ধরলে এদের মান থাকে না। পাণ্ডায় 'ঠকিয়ে' পয়সা নেবে ?

ফলে বাঘের পেছনে ফেউ লাগার মতোই লেগে রইল তারা। শেষ অবধি নিতেও হল একজন, কারণ সত্যিই ওঁরা তো কিছুই জানেন না—এত বড় মন্দিরের কোথায় কি আছে—মাঝখান থেকে প্রভাসদার মেজাজটা রইল খারাপ হয়ে।

আরও খানিকটা টানাহেঁচড়া হল জগমোহনের সামনে গিয়ে। সেই পাণ্ডাটি তো বটেই—সামনের পাহারাদার সিপাইরা পর্যন্ত। (মূল মন্দির—যেখানে দেবতা থাকেন তাকে বলে গর্ভ দেউল, তার ঠিক সামনের ঘরটা হল জগমোহন) মন্দিরে এসে কোনো হিন্দুর ছেলে দেবতা দর্শন করে না—এ তাদের জানা নেই। তারা ভাবতেই পারে না একথা, এমন লোক যে কেউ আছে তাও শোনেনি কখনও।

সুতরাং তারা ধরে নিল এটা প্রভাসদার রাগ বা অভিমান একটা। আর রাগটা তাদের ওপরই ভেবে খুব কাকুতি মিনতি খুব খোশামোদ করতে লাগল। তাতে আরও ক্ষেপে গেলেন প্রভাসদা। শেষে একজন হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে চরমে পৌঁছল ব্যাপারটা, মারমুখোভাবে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হনহন ক'রে যেদিকে-চোখ-গেল হাঁটতে লাগলেন।

তবুও, আরও কিছু বাকী ছিল তখনও।

আগুনে শেষ ঘিটুকু তখনও ঢালা হয়নি।

সেটা হল আনন্দবাজারে গিয়ে—যেখানে প্রসাদ বিক্রি হয়।

ততক্ষণে অবনীদারা এসে ধরে ফেলেছেন ওঁকে। কোনমতে দর্শন সেরে চলে এসেছেন। এমন লোককে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসা ঠিক হয় নি তা বুঝেছেন। শান্তিতে দর্শন হয় না এতে। আর একদিন প্রভাসদাকে হোটেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আসতে হবে। সে যাই হোক—এখন লোকটা রেগে-মেগে কোথায় গেল কার পাল্লায় পড়ল দেখা দরকার।···তাঁরাও প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে আনন্দবাজারে ধরেছেন ওঁকে।

এখন সরকারের হাতে পড়ে আনন্দবাজারে অনেক বদল হয়েছে, 'স্টল',

শো কেস' প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। আমি যখনকার কথা বলছি তখন ইচ্ছা-মতো যেখানে সেখানে বসে যেত সূপকার বা সওয়াররা—প্রসাদ বিক্রি করতে, যে-সে হাত ডুবিয়ে খানিকটা তুলে খেয়ে দেখত—কেমন রান্না হয়েছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও—লোকে বলে, প্রসাদ খেয়ে কারও অসুখ করেছে—এমন কথা শোনা যায় নি কখনও।

কিন্তু প্রভাসদার তো অত ভক্তি নেই, আনন্দবাজারে ঢুকে ঐ সব কাণ্ড দেখে তাঁর মেজাজ পঞ্চম থেকে সপ্তমে চড়ে গেছে। তিনি কোনমতে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, একটা চিট্-ময়লা-কাপড়পরা ভিখিরী-মতো লোক এসে কয়েকদানা প্রসাদ ওঁর মুখে পুরে দিতে গেল—

আসলে এও একরকম ভিক্ষাই। সেই যে আগে পাণ্ডারা মুখে প্রথম প্রসাদ দিয়ে মোটা টাকা আদায় করত—সেই ধারাটাই এই ভিক্ষেয় এসে ঠেকেছে। প্রসাদ দিয়েই হাত পাতে। ছুটো একটা পয়সা পেলেই খুশী। কেউ যদি চার আনা ছ আনার প্রসাদ কিনে খাওয়ায় তাহলে তো কথাই নেই।

পয়সা দিক বা না দিক, প্রসাদ মুখের কাছে এলে কেউই ফেলে না, বড় জোর কলকাতার বাবুরা হলে আগে থাকতে সতর্ক হয়ে সরে পড়েন—নয়তো, তেমন বেকায়দায় পড়লে প্রসাদসুদ্ধ হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে সরিয়ে দেন।

কিন্তু ভক্তি বা সৌজন্যবোধ কোনটাই তখন আর প্রভাসদার নেই। রাগে তাঁর-যাকে বলে—ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে উঠেছে। তিনি সজোরে সেই লোকটার হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে সেই প্রসাদ কটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে দলে দিলেন !!

উঃ! তারপর সে কী কাণ্ড! চারিদিক থেকে প্রসাদ-বিক্রেতা, ক্রেতা আর পাণ্ডার দল এসে ঘিরে ধরল। প্রভাসদাকে তো অকথা কুকথা যথেষ্ট বললই, সাধারণ ভাবে কলকাতার বাবুরাও রেহাই পেলেন না।…ছপাতা ইংরিজী পড়ে ধরাকে সরা দেখতে শুরু করেছে একেবারে! ভেবেছে কি? জগন্নাথ নেই? প্রভু এর ফল হাতে হাতে দেবেন।

সব চেয়ে ছুরবস্থা ছুজন সঙ্গীরই। তাঁরা তখন কোনমতে ওঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচেন। লজ্জায় তো মুখ দেখাতে পারছেনই না, ভয়ও যথেষ্ট। জনতা যা মারমুখী হয়ে উঠেছে—যদি সত্যিই গায়ে হাত তোলে তো বাঁচা শক্ত হবে।

যাই হোক—একরকম ছুটেই পালালেন তাঁরা—প্রভাসদাকে টেনে নিয়ে। বাইরে যখন এসেছেন তখনও একদল লোক বক্তৃতা করতে করতে গাল দিতে দিতে পেছনে পেছনে আসছে। একেবারে রিক্‌শায় চড়ে বসে তবে অব্যাহতি পেলেন !

কাজটা করে ফেলে প্রভাসদাও বুঝেছেন বোধ হয় যে এতটা বাড়াবাড়ি করা ভাল হয়নি। তার ওপর অবনীদারাও এর ভেতরই যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন। নিজের বিশ্বাস না থাক অপরের বিশ্বাসকে এভাবে আঘাত দেওয়া ঠিক হয়নি। শুধু হাতটা সরিয়ে দিলেই হত, পায়ে ক'রে দলে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? বিশেষ এই গোঁয়ার্তুমির ফলে তিনটে লোকেরই জীবন সংশয় ঘটতে পারত।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মুখখানা হাঁড়ি-পানা করে প্রভাসদা ফিরছিলেন। গরমও বিস্তর তার ওপর মাথা আরও গরম হয়ে উঠেছে, এসে পর্যন্তই অশান্তি। আসলে এখানে আসাই উচিত হয় নি তাঁর।…কালই চলে যাবেন তিনি। থাকতে হয় ওরা থাকুক।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবেই রিক্‌শা থেকে নেমেছেন। নরেনদা ছুটো রিক্‌শারই ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছেন দেখে আর ওদিকেও তাকান নি, হনহন করে এগিয়ে চলেছেন দালানের দিকে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় খানিক চুপ করে না বসলে মাথার এই দপদপানি যাবে না; বোধহয় এই অন্যমনস্কতা আর তাড়াতাড়ি পৌঁছবার আগ্রহেই অত লক্ষ্য করেন নি—প্রথম ধাপ ভেবে একেবারে দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়ে ফেলেছেন। আবার ঠিক অতটার মতো পা তোলেননি, ফলে ধারে লেগে পা পিছলে এসে সজোরে মচকে গেল। এমন মচকাল যে, 'বাপ্‌' বলে সেইখানেই বসে পড়তে হল প্রভাসদাকে।

আবারও এঁরা দুজন ছুটে এলেন। ছুটে এল হোটেলের অন্য লোকেরাও। সাধারণ পা-মচকানোই ভেবেছিলেন সকলে—কিন্তু তুলে দাঁড় করাতে গিয়ে দেখা গেল যে উনি একেবারেই সে পাটায় ভর দিতেই পারছেন না।

তখন একরকম ধরাধরিই করেই এনে বেতের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। কেউ বলল পা টেনে দাও, কেউ বলল জল দাও। কেউ বা বরফ খুঁজতে লোক পাঠাল। গুলার্ড লোশনের কথাও বলল কেউ কেউ, অথবা চুন-হলুদ। সে

সবরকমই ক'রে দেখা হল—মোদ্দা কিছুতেই কিছু হল না, একটু পরেই পা রীতিমতো ফুলে উঠল, অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল।

সেই ডান পা, যেটা দিয়ে প্রসাদ মাড়িয়ে দলে ছিলেন।

সে কথা আর তখন বলে লাভ নেই। বললেনও না অবনীদারা। প্রভাসদা ঐ অবস্থাতেও তর্ক করতেন। বলতেন ঘটনাটা কাকতালীয়। কাক তালগাছে এসে বসল আর একটা পাকা তাল মাটিতে পড়ল। তার মানে এ নয় যে কাক তালটা ফেলল। তাল পেকে পড়বার সময় হয়েছিল, সে পড়তই, কাক এসে বসার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

না, সে সব কথা চাপা দিয়ে রেখে অন্য যা করা উচিত তাই করলেন নরেনদা অবনীদা। একজন ভাল ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তার বললেন সিভিল সার্জনকে আনতে, তাও আনা হল। তিনি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্সরে করালেন, দেখেশুনে বললেন, ফ্র্যাক্চার, হাড়ে চিড় খেয়েছে। সেটা খুব বেশী নয় অবশ্য, তবে তা ছাড়াও ভয়ের কথা আছে, টেণ্ডন্টা জখম হয়েছে সেই সঙ্গে। টেণ্ডো য়্যাকিলিস্ না কি যেন বলে, আসলে আমরা যাকে পায়ের দড়ি বলি, দেনাদারদের বাড়ি টাকা আদায়ের জন্যে হেঁটে হেঁটে যা ছিঁড়ে যায়। খুবই জখম হয়েছে সেটা, এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম না দিলে সারবে না।

অগত্যা বাড়ি ফেরা। যে মানুষটা হেঁটে চলে সহজভাবে গিয়েছিলেন, তাঁকেই বেশী ভাড়ার কামরায় শুইয়ে এনে স্ট্রেচারে ক'রে ঘরে তুলতে হল।

এখানে এসে আবারও এক্সরে ছবি তোলা হল। সেই ছবির অনুযায়ী পায়ে প্লাস্টার করে দিয়ে ডাক্তার সাবধান ক'রে দিলেন, দুমাসের আগে যেন হাঁটা চলার চেষ্টা না করেন, তাহলে পা সারানো মুশকিল হবে, হয়ত চির-জীবনের মতো খোঁড়া হয়ে যাবেন।

সে দুমাসের পর আরও একমাস কাটল একটু একটু ক'রে চলে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে। তিন তিনটে মাস নষ্ট। আর টাকা যে কত খরচ হল তার ইয়ত্তা নেই। গরিব ইস্কুলমাস্টার, ছাপোষা লোক—জমা টাকা বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না, মাইনেও শেষ মাসটা পুরো পান নি, তার ফলে স্ত্রীর দুখানি গহনা বাঁধা দিতে হয়েছে এর মধ্যে।

এ খবর তাঁকে না শোনাবার জন্যেই চেষ্টা করেছিলেন সবাই, তবু তাঁর

কানে গেছে। তাতেই আরো মন খারাপ।

মাসখানেক ইস্কুলে বেরোবার পরই হাফ-ইয়ালি পরীক্ষার খাতা এসে পড়ল। এবার ওঁর জন্যেই পরীক্ষা একটু পেছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সামনেই পুজো—ছুটির আগে খাতা দেখে দিতে হবে। কী ফল হয় তা বুঝে ছুটির টাস্ক দিতে হবে, ফার্স্ট ক্লাসের কয়েকটা দিন কোচিংএর ব্যবস্থা করতে হবে। কাজ অনেক, সময় কম। সুতরাং প্রভাসদা শেষ রাত্রে উঠে খাতা দেখতে শুরু করলেন। দুই ক্লাস মিলিয়ে পাঁচ সেকশ্যনের খাতা—কম তো নয়।

অনেকদিন এত ভোরে ওঠেন নি। অসুখে যখন পড়ে ছিলেন তখন ভোরে ওঠার কোন দরকারই ছিল না। এখন যেন নতুন ক'রে আবার পুরনো দিনগুলোকে ফিরে পেলেন। কিন্তু ঠিক তাই আছে কি? না, নেই। কেবলই মনে হতে লাগল কোথায় যেন কী বদলে গেছে আগেকার জীবন।

তিন চার দিন এমনি ভাবতে ভাবতে দু একটা ব্যাপার চোখেও পড়ল! লক্ষ্য করলেন, তাঁর স্ত্রী ভোরে উঠে স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই চুপি চুপি আগে রান্নাঘরে চলে যান। মিনিট চার পাঁচ বাদে বেরিয়ে এসে কাপড়জামা ছেড়ে আবার গিয়ে চা করতে বসেন।

এমনি রোজই।

খুবই চুপি চুপি যান, দরজার পর্দাও ফেলা থাকে—তবু শোবার ঘরে মেঝেতে বসে খাতা দেখেন বলে প্রভাসদা সেটা টের পান। পর্দার নিচে দিয়ে কাপড়ের পাড় দেখা যায়—কোনটা ভিজে আর কোনটা শুকনো তা তো দেখলেই বোঝা যাবে।

শুধু তাই নয়। এদিকে কৌতূহল বাড়তেই কান আর চোখও সজাগ হয়ে উঠল। আরও লক্ষ্য করলেন—তাঁর বড় মেয়ে আর বড় ছেলেও স্নান করার পর, এদিক ওদিক তাকিয়ে - মানে তাঁর নজর এড়াবার চেষ্টা করতে করতে—একবার ক'রে রান্নাঘরটা ঘুরে আসে, মিনিটখানেক ক'রে।

স্ত্রী ছেলেমেয়ে যে তাঁকে লুকিয়েই কিছু একটা করছে ওখানে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু সেটা কি? কোন্ ষড়যন্ত্রে আছে ওরা? তাঁকেই বা গোপন করার চেষ্টা কেন?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। তবু চট্‌ ক'রে তখনই কোন চেঁচামেচি করেন না। এই গত তিনমাস ওরা সকলে তাঁর যা সেবা করেছে, আর যে কষ্ট পেয়েছে—তাতে সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাঁর। বোধহয় কোন কারণেই ওঁদের ওপর রাগ করার আর অধিকার নেই।

তাই একদিন, স্ত্রী যখন কলঘরে ঢুকেছেন স্নান করতে, ছেলেমেয়েরা তখনও ঘুমোচ্ছে—পা টিপেটিপে রান্নাঘরে গেলেন। সদ্য উনুনে আঁচ দিয়ে গেছেন স্ত্রী, ধোঁয়া এখনও খুব বেশি হয় নি, এখনও চোখ তাকিয়ে রাখা যায়, দেখাও যায় চারদিক—বেশ ভাল করে চেয়েই দেখলেন তিনি। কিন্তু কোথাও তো এমন কোন বৈলক্ষণ্য পেলেন না।

তবে কেন আসে ওরা, কী কারণে?

স্নান ক'রে শুদ্ধ হয়ে আসে সবাই।

তবে কি পুজোটুজো কিছু করে ওঁকে লুকিয়ে?

লক্ষ্মীপুজো?

আবারও যেন ছলাৎ ক'রে রক্ত চড়ে যায় মাথায়—ভাবতে ভাবতেই। রাগ করা উচিত নয় বুঝেও অসহ্য ক্রোধ বোধ করেন একটা।

কিন্তু কই? তেমন কোন চিহ্ন তো কোথাও নজরে পড়ে না!

আরও একবার ভাল ক'রে দেখেন চেয়ে চেয়ে।

ঠাকুর দেবতা পট—কিছুই তো নেই।

ফিরেই আসছিলেন না-মেটা কৌতূহল নিয়ে—একেবারে শেষ মুহূর্তে চোখে পড়ল।

চাল-ঝাড়া কুলোটা টাঙ্গানো থাকত যে পেরেকে, সেখানে আর থাকে না। এখন যেখানে টাঙ্গানো হয়েছে—সেখানে পুরো দেওয়াল পায় না, ঘরের যে তাকে ভাঁড়ারের জিনিস থাকে, তারই খানিকটা পর্যন্ত এসে গিয়েছে—ফলে সেখানটা ঢাকা পড়ে আছে।

সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার, ওদেরই সুবিধার অসুবিধার প্রশ্ন। তবু কী মনে হল কুলোটা সরিয়ে দেখলেন—

একটি ছোট্ট কাঠের জগন্নাথ মূর্তি।

কেউ বা কারা পুজো করে নিশ্চয়। গত কালের ফুল কতকগুলো আধ শুকনো হয়ে পড়ে আছে মূর্তির সামনে।

নিশ্চয় তাঁরই কল্যাণের জন্য, রুষ্ট জগন্নাথকে তুষ্ট করতে—স্ত্রী ছেলেমেয়েরা এই কাজ করেছে।

ভাবতে গিয়ে রাগের বদলে হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তাঁর। তাঁকে ওরা এত ভালবাসে?

তারপর আর এক কাণ্ড ক'রে বসলেন তিনি, কুলোটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে দুই হাত জোড় ক'রে তিনিও একটা প্রণাম করলেন কাঠের সেই মূর্তি-টাকে, তারপর আবার কুলোটা যথাস্থানে টাঙিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন।

পিতৃ-ঋণ

আলিপুরদুয়ারে এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক দিন ধরেই লিখছেন ভদ্রলোক, বহুবার কলকাতাতে এসেও অনুরোধ ক'রে গেছেন—সুতরাং তিনি আন্তরিকভাবেই আমাকে চান এমন সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার অনুমান ভুল অথবা আমার ঠিক সে সময় যাওয়াটা তাঁর মনঃপুত হয় নি। কারণ আমি যা চেয়েছিলাম—ক'দিন হাত-পা মেলে বিশ্রাম করতে—তার উল্টো ব্যবস্থাই করে রেখেছেন তিনি। এবং সেটাকে রীতিমত জব্দ করার ব্যবস্থাই বলা চলে।

অর্থাৎ এক কথায়, তিনি গুটি-কতক সভা যুগিয়ে রেখেছেন আমার জন্যে পরপর। তারিখ, সময়, দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে আছে—আমার জন্যে কিছুই আর বাকী নেই। ঠাসা এবং পাকা প্রোগ্রাম, অনেক লোকের সঙ্গে অনেক বন্দোবস্ত—এক্ষেত্রে আমার মতামত এবং সম্মতির প্রশ্নটা নিতান্তই তুচ্ছ।

আর আমার সম্মত হওয়া ছাড়া উপায় বা কী? নইলে আমার আশ্রয়দাতা অপমানিত হন। তিনি আমার বন্ধু বলে দিকে দিকে রটনা ক'রে দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন অতগুলি লোককে, এখন আমি রাজী না হলে তাঁর মুখ থাকে না। অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গেলাম। মনে মনে নিজেকে নির্বোধ বলে গাল দিতে লাগলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম

যে অতঃপর কোন পরিচিত লোককে খবর দিয়ে কোথাও বিশ্রাম করতে যাওয়ার মতো মূর্খতা আর কখনও করব না।

অবশ্য প্রথম প্রথম তিন-চারটে দিন মন্দ লাগল না। সভা যেমনই হোক, সভা উপলক্ষে যে ভ্রমণটা হচ্ছিল সেটার মধ্যে যথেষ্ট রোমান্স ছিল। ডুয়ার্সের চা-বাগান জঙ্গল এতকাল কিছুই দেখি নি—সেটা বেশ ভাল ক'রেই দেখা হয়ে গেল। অধিকাংশ সভার আয়োজন চা-বাগান এলাকায় এবং তার কোনটাই শহর থেকে কুড়ি মাইলের কম দূরে নয়। জীপ বা গাড়িতে করে এই 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা'য় যাতায়াত করতে সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে যেত সত্য কথা—এক এক রাস্তা এমন দুর্গম যে প্রাণ হাতে ক'রে যেতে হ'ত প্রতিটি মুহূর্ত—তবু একেবারে এই অপরিচিত পরিবেশে, নতুন আবহাওয়ায় বাংলাদেশের এই অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেয়ে মনে মনে বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞই বোধ করছিলাম।

কিন্তু বিপদ বাধল, কালচিনি চা-বাগানে গিয়ে।

এখানটাও শহর থেকে বাইশ মাইলের মতো। পথে শুনলাম নিবিড় ঘন জঙ্গল পড়বে। বন্ধু অভয় দিলেন, 'অপূর্ব পথ, খুব ভাল লাগবে আপনার!'

সেখানে সভাটা নাকি সন্ধ্যায়। সাড়ে ছটার আগে সভা করা সম্ভব নয়—অফিস আছে। কথা হল তাঁরা আমাকে পাঁচটা নাগাদ নিয়ে যাবেন এখান থেকে। ওখানে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে বড় জোর, একটু বিশ্রাম করে সভায় যাব। সভায় প্রোগ্রাম যা-ই থাক, ওঁরা আমাকে আহারাদি করিয়ে নটায় ছেড়ে দেবেন—যাতে আমি ঠিক দশটায় শহরে ফিরে আসতে পারি।

সভাতে নিয়ে যাবার সময় যতটা আগ্রহ ফেরার সময় ততটা থাকা সম্ভব নয়—এটুকু অভিজ্ঞতা আমার এতদিনে হয়েছে। সুতরাং মনে মনে ঐ দশটা-টাকে এগারোটা হিসেব ক'রে নিলাম, দেখলাম তাতেও খুব ক্ষতি হবে না। এসেই শুয়ে পড়া তো। এগারোটার আগে এমনিও ঘুমোবার অভ্যেস আমার নেই।

প্রোগ্রামের প্রথমার্ধে অবশ্য কোনও গোলমাল হ'ল না। তাঁরা বরং পাঁচটা বাজবার দুদশ মিনিট আগেই গাড়ি নিয়ে এলেন। পথে আর এক

চা-বাগানে মিনিট কতক থেমে একটু 'চা-যোগ' ক'রে নিয়েও আমরা সওয়া ছটার মধ্যে অকুস্থলে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলাম সব উৎসাহ যেন কেমন মিইয়ে গেল। আমাকে এক ভদ্রলোকের বাসার বাইরের ঘরে বসিয়ে উদ্যোক্তারা যে ডুব মারলেন, সাড়ে সাতটার আগে আর কারুর টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

যাঁর ওখানে সাময়িক ভাবে অতিথি হ'য়েছিলাম তাঁর বাবা বসেছিলেন আমার কাছে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা, 'আজ এখানে শুনছি, কী একটা মেশিন খারাপ হয়ে গেছে, যে জন্যে অনেকে ব্যস্ত। আমার ছেলেরা তো কেউ বাড়িই আসে নি এখনও। অনেকেই ছুটির পর আটকে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া এখানে কারেন্ট খোলে সাড়ে ছটায়—স্টেজের কাজ কিছু বাকী আছে, আলো না জ্বললে সেসব নাকি ঠিক হবে না। কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—সাতটা সাড়ে সাতটার আগে সভা আরম্ভ করতে পারবে না!'

চা-জল খাবারের অবশ্য কোন ত্রুটি হ'ল না—ইতিমধ্যে অকারণেই বারকতক চা এসে পৌঁছল—কিন্তু একা এইভাবে প্রায়-অন্ধকার ও গরম ঘরে বসে থাকা যে নিতান্ত বিরক্তিকর। প্রায়-অন্ধকার বললাম এই জন্য যে যদিও ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল—আলোর জোর ছিল না। হয় কম পাওয়ারের বালব্—নয়তো কারেন্টের জোর নেই।

তার ওপর—তবু যা হোক বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বসে দু-একটা কথা চালাচ্ছিলেন—তিনিও সন্ধ্যাহ্নিক করতে চলে গেলেন! স্রেফ একা বসে রইলাম জন্তুর মতো। সঙ্গী কতকগুলি কীটপতঙ্গ শুধু। কত কী পোকা আলোয় আকৃষ্ট হয়ে অনবরত ঘরে ঢুকছে, তাদের বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখলে ভয় করে। এখানকার আরশুলাগুলো পর্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার দেখতে। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক এত প্রবল যে আশপাশের কোয়ার্টারে কথাবার্তার শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে হরেক রকমের নিশাচর পাখির ডাক—এর আগে সে ধরণের আওয়াজ কখনও শুনি নি। সবটা জড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন নিশীথ রাত্রি।

রাগ এবং বিরক্তি—এঁদের ওপর এবং আমার বন্ধুর ওপর তো বটেই—নিজের ওপরও বড় কম হচ্ছিল না। অন্য কোন সভ্য জায়গা হলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে গাড়ি ডেকে চলে যেতাম। কিন্তু এখানে নিরুপায়।

অজানা অচেনা জায়গা, জঙ্গলের পথ—মানবসভ্যতা থেকে বহু দূরে। এঁরা দয়া ক'রে গাড়ি না দিলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং বসে বসে সে বিরক্তি পরিপাক করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা সত্য ক'রে উদ্যোক্তারা দেখা দিলেন ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। অবশ্যই যাঁরা গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে গিছলেন তাঁরা আসেন নি, বুদ্ধি ক'রে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

'একটু স্যার দেরি হয়ে গেল। মানে এমন মুস্কিল—আজই য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার আটকে রাখলে—শালা পাঞ্জাবী তো, এসব সাহিত্য সভাটভা অত বোঝে না! ওদের কাছে কাজের দামটাই সব চেয়ে বড়। কিছু মনে করবেন না স্যার। এটুকু মেকাপ্ ক'রে দেব—'

কতকগুলো চড়া কথা বললাম। কিন্তু সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা তা বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম। তারপর বললাম, 'আমাকে কিন্তু আগেই ছেড়ে দিতে হবে! আপনাদের ফাংশন থাকে পরে যা হয় করবেন—আমি অতক্ষণ থাকব না!'

'সে তো নিশ্চয়ই। সে কথা বলতে! নটার মধ্যে ছেড়ে দেব আপনাকে!'

আশ্বাস দিয়ে উঠলেন তিনচার জন।

ছাড়লেন তাঁরা ঠিক সাড়ে দশটায়।

উপায়ও নেই! উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত ছাড়া দুটি মাত্র 'আইটেম'। একটি সঙ্গীতালেখ্য আর একটি নৃত্যনাট্য। সঙ্গীতালেখ্যটির কথা সবাই জানেন, কতকগুলো প্রলাপের সঙ্গে কয়েকটি গান বাঁধা। গানটা গাওয়াই উদ্দেশ্যে কিন্তু শুধু গান দিলে যারা গাইতে পারে না তাদের কিছু দেবার থাকে না। তাতেই প্রলাপগুলোর অবতারণা। একজন লেখে, তার কাছ থেকে মোটা চাঁদা পাওয়া যায়—আগে একজনই পড়ত, এখন পড়ে বহু লোকে। সবাই খুশী।

আমার অনুমতির কেউ অপেক্ষা করল না—বলা বাহুল্য। সভাপতিকে আজকাল সভা পরিচালনা করতে হয় না—করে অন্য লোকে, প্রধানত উদ্যোক্তারা। (নইলে চাঁদা ওঠে না, যিনি মাইকে ঘোষণা করবেন—তিনি সম্ভবত বেশ কিছু দেন!) সুতরাং সভাপতিবরণের পরই সঙ্গীতালেখ্য ঘোষণা

করা হ'ল। এক ঘণ্টার ওপর চলল সে যন্ত্রণা, শেষের দিকে একজনকে ডেকে বললাম যে 'এবারেই আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করুন—নৃত্যনাট্য পরে হবে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সে আর আপনাকে বলতে হবে না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু সঙ্গীতালেখ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নৃত্যনাট্য ঘোষিত হয়ে গেল, হারমোনিয়ামে সুর উঠল এবং কতকগুলি ফুলের মালা পরা কিশোরী নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল।

অগত্যা 'চিত্রার্পিতের মত' বসে থাকা ছাড়া আর আমার কী করবার থাকতে পারে?

রাগ এতই হয়েছিল যে চালে একটা বড় ভুল ক'রে ফেললাম। বক্তৃতা দিতে উঠে কিছু মনের ঝাল ঝাড়লাম উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে। ফলে হয়তো তাঁরা চটে রইলেন এবং আমাকে জব্দ করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

যাইহোক, সভা থেকে বেরিয়ে আবার সেই টিনের বাংলোর বাইরের ঘরটিতে এসে বসলাম। বড় বড় গাংফড়িং, বীভৎস চেহারায় 'মথ্' ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুবরে পোকায় ভরে গেছে ঘর—তার সঙ্গে সেই লম্বা লম্বা ভয়াবহ ধরণের আরশুলা।

বললাম, 'আমি খাওয়া দাওয়া কিছু করব না—দয়া ক'রে আমাকে এখনই ছেড়ে দিন!'

সকলে হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন।

'সবই প্রস্তুত, একটু কিছু মুখে না দিলে এঁরা বড় দুঃখ পাবেন যে স্যার!'

'আর কতক্ষণই বা। গাড়ি যখন তৈরী আছে—তখন ব্যস্ত হয়ে লাভ কী! এখন রাত্রিবেলা, পথ ফাঁকা—তিন কোয়ার্টারের মধ্যে শহরে পৌঁছে যাবেন!' ইত্যাদি, ইত্যাদি—

কিন্তু আমি বেঁকে দাঁড়ালাম।

আমি বসবও না, খাবও না। এখনই আমার গাড়ি চাই।

আবারও সেই স্পষ্টবাদী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'গাড়ি তো আমাদের এখানের নয়, গাড়ি হল পালছেঁড়া চা-বাগানের ম্যানেজারের। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে তাঁর ফ্যামিলিকে আনতে গিয়েছিল—তাঁরা সবাই ফাংশনে ছিলেন—তাঁরই পাঁচ মেয়ে, দুজন নাচল, তিনজন গানে ছিল। এখন তাঁদের পৌঁছতে গেছে—

সাত মাইল সাত মাইল চৌদ্দ মাইল। ফিরে না এলে কোন উপায় নেই!'

অসহ্য রাগে এবং নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে দুঃসহ ক্ষোভে মাথা ধরে উঠল; চোখে যেন জল এসে যেতে লাগল বিরক্তিতে। কিন্তু সবই হজম ক'রে এসে বসলাম। লুচি ও মুরগীর মাংসেও হাত দিতে হ'ল। রাত হয়েছে, অবিরাম চা খেয়ে খেয়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—কিছু না খেলে আরও ভেঙ্গে পড়বে। ওদের ওপর রাগ ক'রে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

খেতে খেতে হঠাৎ সব আলো নিভে গেল।

'ওরে হ্যারিকেন রে, হ্যারিকেন জ্বাল। শিগগির! ছাখ ছাখ—গোলমালে বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

গৃহকর্তা, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির ছেলে চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শোনা গেল, এখানে প্রত্যহই রাত সাড়ে এগারোটায় কারেণ্ট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ফ্যাক্টরীর কাজ চালু হয়। ডায়নামো থেকে কারেণ্ট তৈরী হয়—তার এত শক্তি নেই যে বাড়ি ও রাস্তার সব আলো জ্বালিয়েও ভারী ভারী মোটর চালায়। এঁরা নাকি ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিলেন, অন্তত ঘণ্টাখানেক বেশী আলো জ্বেলে রাখার, সাহেব ম্যানেজার রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। বিজলীঘরের ইনচার্জ বলছে যে, যেহেতু সে কোন লিখিত অর্ডার পায় নি--সেহেতু নিয়মের ব্যতিক্রম সে করতে পারবে না।

এখন উপায় আছে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে গিয়ে বলার কিন্তু সে দেখলাম কেউই এগোতে চান না।

অগত্যা হ্যারিকেনের আলোতেই ভোজন পর্ব শেষ ক'রে আবার বাইরে এসে বসলাম।

চারদিকে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। সামান্য বসতি—বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশটি কোয়ার্টার হবে সব জড়িয়ে—সব গুলোই প্রায় নিশুতি হয়ে এসেছে। একটা হ্যারিকেন বা প্রদীপের চিহ্নও কোথাও দেখা যায় না। ওদিকে সম্ভবতঃ মেঘ ঘনিয়ে এসেছে খুব, কারণ গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

আকাশের দিকে চেয়ে বোঝার উপায় নেই। বড় বড় গাছে আকাশ ঢেকে আছে। তাছাড়া এত জোনাকি যে, কোনটা তারার আলো আর কোনটা জোনাকি বোঝা মুশকিল।

এ বাড়ির এঁরাও সব শুয়ে পড়লেন। শুধু গৃহস্বামী বসে বসে হাই তুলছেন আর বিড়ি খাচ্ছেন। আরও আছেন তিন-চারটি তরুণ ছেলে। নেহাৎ ঘাড়ে পড়ে রয়েছি—বিদায় না ক'রে যেতে পারছেন না। তাঁরা যেতে চাইলেও এ বাড়ির ইনি সহজে ছাড়বেন না—তা তাঁর মুখ-ভাব দেখেই বোঝা গেল।

এত স্থানাভাব যে বাকী রাতটুকু শুয়ে যেতে বলবারও সাহস নেই এঁদের। এই বাইরের ঘরের একটি সংকীর্ণ বিছানাতেও দুটি ছেলে এসে শুয়েছে ইতিমধ্যেই, শুনলাম গৃহস্বামীও ওখানেই শয়ন করবেন। সেটা কি ক'রে সম্ভব, তা আজও ভেবে পাই নি।

বারোটা, ক্রমে সাড়ে বারোটাও বেজে গেল।

এঁরাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন এবার।

এত দেরি তো হবার কথা নয়।

তবে কি—

ফিসফিস ক'রে যা কথা হ'ল ওঁদের নিজেদের মধ্যে—তাতে ক'রে বুঝলাম, গুর্খা ড্রাইভার হয়তো নেশা ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে—গাড়ী আনবার কথা মনে নেই। তখন কথা হ'ল যে সাইকেল ক'রে কেউ যাবে নাকি?

চোদ্দ মাইল উঁচু-নীচু পাহাড়ে-রাস্তা—কে যাবে এই অন্ধকারে, ফিরবেই বা কখন?

এঁদের এতক্ষণের প্রশান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেই আমার যা শান্তি। নইলে আমার তখন অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছে, একটু শুতে পেলেই বেঁচে যাই আমি। শোবার মতো একটা নিরিবিলি ভাল জায়গার জন্যে আমি তখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করতেও রাজী ছিলাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। যে গাড়ীতে এসেছিলাম সে গাড়ীর ইঞ্জিনে গোলমাল আছে। আসবার সময় দুবার তিনবার দাঁড়িয়েছে। এই অন্ধকার বিজন পথে যদি একেবারেই বিগড়ে যায়?

ওধারে তো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে। মেঘেরও যে ডাক,—তাতে খুব অল্পে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না!

ডুয়ার্সের বৃষ্টি—নামলেই প্রবল ধারা শুরু হয়ে যায়।

কথাটা বললাম খুলে।

এঁদের মুখ যেন একটু উজ্জল হয়ে উঠল।

'তাহলে একটু কষ্ট ক'রে লরীতে যাবেন স্তার? লরী কিন্তু একটা হাতের মধ্যেই আছে!

'এই বৃষ্টিতে খোলা লরী!'

'না, মানে ড্রাইভারের পাশে বসলে খুব জল লাগবে না। বরং একটা বর্ষাতি দিয়ে দিচ্ছি, ড্রাইভারের হাতে ফেরৎ দেবেন। বলেন, তো আমরাও কেউ সঙ্গে যেতে পারি!'

অগত্যা তাতেই রাজী হলাম। আর উপায় কি? তখন রাত একটা বাজে। আমি আর বসতে পারছি না।

গৃহস্বামী তো চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন—অনেকক্ষণ।

মুখের কথা খসাতেই একজন ছুটে বেরিয়ে পড়লেন—সেই জলের মধ্যেই।

কিন্তু তার পরও আধ-ঘণ্টাটাক সেই দুঃসহ প্রতীক্ষা।

বাড়ীওলা তো অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমোচ্ছেন, এতক্ষণে ঘুমটা বোধ করি গাঢ় হয়ে এল। বিছানা থেকে একটা ছেলের নাক ডাকা শোনা যাচ্ছে। যে দুটি তরুণ কর্মকর্তা আমার জন্যে আটকে ছিলেন, তাঁরাও বেশ ঢুলতে শুরু করেছেন।

শুধু ঘুম নেই আমার চোখেই। ঘুম আসা সম্ভবও নয়। যন্ত্রণায় কোমর-পিঠ খসে যাচ্ছে। বসে বসে হাঁটুতে ব্যথা শুরু হয়ে গেল, চোখ দুটো করকর করছে, দুটো রগেই অসহ্য টনটনানি। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে?

অগত্যা বসে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগলাম। শোনবার মতোই শব্দ। মেঘ ডাকছে মুহুর্মুহু, যেন ভারি ভারি রোলার চালিয়েছে কে আকাশের পথে—গুরু-গুরু গুম-গুম শব্দ বিদ্যুতের শিখার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রান্ত থেকে আরও এক প্রান্ত গড়িয়ে যাচ্ছে; সে শব্দ এই নিস্তব্ধ অরণ্যে দূরে পাহাড়ে পর্যন্ত ভয়াবহ প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়বার আওয়াজও কম নয়—কারণ আশেপাশে সব কোয়ার্টারেরই টিনের চাল। বৃষ্টির ফোঁটাই তো বেশ বড়, তার ওপর তার অধিকাংশই গাছপালায় পড়ে আরও বৃহত্তর জলবিন্দু রচিত হয়ে পড়ছে। সে শুধু শব্দ নয়—তাকে কোলাহল বলাই উচিত।

অবশেষে দূরে গাড়ীর আওয়াজ একটা শোনা গেল। মোটরের এবং হর্ণের শব্দ। সচকিত হয়ে উঠলেন এঁরা। একটু ক্ষীণ আশা আমার মনেও দেখা দিল।

সকলে মিলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, ঐ তো আলোও দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ যে দুজোড়া আলো, দুদিক থেকে!

লরী আর গাড়ী প্রায় একসঙ্গেই এসে পৌঁছল।

ড্রাইভার বাহাদুর ভোলেওনি, নেশাও করে নি—গাড়ীটাই পথে বিগড়েছিল—গাড়ী সরিয়ে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেছে। সঙ্গে অন্য লোক তো নেই, তায় এই অন্ধকার পথ—নিজেই টর্চ ধরে সারানো এক হাতে—সুতরাং দেরি তো হতেই পারে।

এখন কিসে যাবো—গাড়ীতে না লরীতে?

দুই ড্রাইভারই আশা ও আশঙ্কায় আকুল হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল। দুজনেরই ইচ্ছা আমি অপর যান ব্যবহার করি।

আমি এঁদের দিকে ফিরে বললাম, 'দেখুন আপনারা আমাকে ঢের কষ্ট দিলেন, এবার আপনাদের একটু কষ্ট করা উচিত। আমি গাড়ীতেই যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের কেউ লরী নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। এই ভয়াবহ পথ, গাড়ী যদি বিগড়োয় তো কি অবস্থা ভাবুন দিকি! গাড়ীর অবস্থা তো বোঝাই যাচ্ছে, লরী কেমন তাই বা কে জানে। একটা সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স সঙ্গে থাকা ভাল।'

হ্যারিকেনের আলোতে মুখভাব খুব ভাল ক'রে দেখা যায় না—তবু ঠিক খুশী যে কেউ হলেন না কথাটা শুনে, সেটুকু বেশ বোঝা গেল।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তিনজনে তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একজন বললেন, 'তাই হোক তাহলে, অভিজিৎ তুমিই বরং সঙ্গে যাও, তুমি তো তবু কল-কব্জা একটু বোঝ-সোঝ।

অভিজিৎ অভিহিত ছোকরাটি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল, 'যেতে আমি পারি কিন্তু একা যাব না। আপনারাও সঙ্গে চলুন।'

'কিন্তু ড্রাইভারের পাশে তিনজন তো ধরবে না—'

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'আমার বোনের টাইফয়েড তা তো জানেনই

সুশীলদা, আমি কি ক'রে যাই বলুন?'

সুশীলদা সামান্য একটু চুপ করে থেকে শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'বেশ, আমিই যাচ্ছি অভিজিতের সঙ্গে।…এই উপলক্ষে তোমার রুগ্ন বোনের কথা যদি মনে পড়ে থাকে তো সেই তবু একটা লাভ। কবে যেন, হ্যাঁ, আজই বোধহয়—তোমার বাবা দুঃখ করছিলেন যে, পাড়ার লোক এসে রাত জাগছে, যার বোন সে খবরও রাখে না! যাক গে—'

এ অভিযোগের অবশ্যই কোন উত্তর এল না। যাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হবে, তাকে সব সময় কথার উত্তর দিতে গেলে চলে না।

আর আমি তো একেবারেই নীরব শ্রোতা। কথা কইতে গেলেই নানা বিবেচনার কথা উঠবে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোন বিবেচনা করতে প্রস্তুত নই। যা পাইনি—তা আমিই বা দিতে যাব কেন?

অগত্যা অভিজিৎ আর সুশীলবাবুকে তৈরী হতে হ'ল। সেও এক পর্ব। বর্ষাতি টর্চ প্রভৃতি ঘুমন্ত প্রতিবেশীদের ডেকে সংগ্রহ ক'রে বাড়িতে খবর দিয়ে প্রস্তুত হ'তে হ'তে আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল।

তারপর এক সময় সত্যি-সত্যিই সেই দুঃসহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আমাদের দুটি গাড়ীই, ঘোরতর নৈশ দুর্যোগের মধ্যে সুপ্তিমগ্ন ছোট্ট গ্রামটিকে উচ্চকিত ক'রে প্রবল শব্দে স্টার্ট দিল ও অকারণেই হর্ণ দিতে দিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত শব্দের কোলাহল তুলে এসে এক সময় পাকা সরকারী রাস্তায় উঠল।

এরপর আর কোন হাঙ্গামা নেই; শুধুই চলা। পর পর দুটো কী চা-বাগান এলাকার বিরল জনবসতি পেরিয়ে গিয়ে একটানা ঘন বন শুরু হ'ল। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রের অন্ধকারে অরণ্য বসতি একাকার হয়ে গিয়ে সবই নিবিড় বন বলে মনে হচ্ছে অবশ্য—নেহাৎ হেড লাইটের তীব্র আলোতে দুটো সাইন বোর্ড দেখেই চা-বাগানের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম। কদাচিৎ কোন ভিজে করোগেটের ছাদে আলোটা পিছলেও পড়েছিল দু-একবার। কিন্তু এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না বন ছাড়া; গাছে পালায়, লতায় জড়াজড়ি নিরন্ধ্র জঙ্গল শুধু।

আমাদের গাড়ীটা আগে আগে যাচ্ছে, লরীটা পিছনে। তার হেড লাইটের আলো আমাদের পিছন দিক থেকে এসে গাড়ীর মধ্যেটা আলোকিত

করছে—আমি নিশ্চিন্ত আছি।

অবশ্য মধ্যে মধ্যে পিছনের আলোটা সরে যাচ্ছে, পিছনের অন্ধকারে লুকিয়ে যাচ্ছে কোথায়। তবে তাতে চিন্তার কোন কারণ বোধ করি নি, কারণ উঁচু-নিচু পাহাড়ে-পথ, বাঁকও অজস্র, সব সময় দুই গাড়ী এক লাইন ধরে চলা সম্ভব নয়।

কিন্তু একবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেও আলোটার পুনরাবির্ভাব না ঘটায় সচেতন হয়ে উঠলাম। বাহাদুরের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বললাম, 'একটু দাঁড়াবে নাকি বাহাদুর, ওরা যেন বড্ড পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

ঘ্যাচাং ক'রে সশব্দে ব্রেক কষল বাহাদুর।

'পিছিয়ে পড়েছে, না পিছন ফিরেছে?'

কণ্ঠে নিদারুণ সংশয় বাহাদুরের, ঈষৎ ব্যঙ্গও যেন উঁকি মারছে তার সঙ্গে।

সংশয়টা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে জেগেছে আমরাও। সন্দেহ জিনিসটা বুঝি এমনিই মারাত্মক।

কিন্তু সত্যিই—সরে পড়বার এই তো চমৎকার সুযোগ। এতক্ষণে সোজা পিছন দিকে দৌড় মেরেছে নিশ্চয় ওদের লরী। এতটা পথ যে বৃথা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করব না এটা তো ঠিক।

'কী করব?' প্রশ্ন করল বাহাদুর।

একটু গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেখবে নাকি? ধরো পথে যদি কোথাও বিগড়ে টিগড়ে গিয়ে থাকে?'

আসলে নিজের নিরাপত্তার চেয়েও ওদের জব্দ করাবার নেশা প্রবল হয়ে উঠেছে। তেড়ে গিয়ে যদি ধরতে পারি তো এবার ওদের আগে দিয়ে নিজে পিছনে থাকব। রাত দুটো বাজে—আমার ঘুমের দফা তো শেষ হয়েই গেছে, কাল ভোরেই আর একটা সভা, হয়তো পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত হবার প্রশ্ন উঠবে। এ ক্ষেত্রে ওদের এখন ফিরে গিয়ে আরাম করার চেষ্টাটা যদি পণ্ড করতে পারি, সেইটেই বড় লাভ।

বাহাদুর পূর্ববৎ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তাহলে হর্ণ দিত ওরা—অনেক আগেই।'

'হয়ত দিয়েছে। যা ঝড়-জলের শব্দ আর মেঘ ডাকছে, তোমার তো জানলার সব কাঁচ আঁটা—শুনতে পাও নি হয়ত।'

বাহাদুর কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'দেখুন সত্যিই যদি ওরা ফিরে গিয়ে থাকে তো এতক্ষণ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তাহ'লে ওদের ধরতে হ'লে আবার সোজাসুজি কালচিনিতেই ফিরে যেতে হবে। কী লাভ হবে তাতে? তার চেয়ে চলুন, যেমন যাচ্ছি তেমনি গিয়ে আপনাকে তো পৌঁছে দিই। যে বর্ষা নেমেছে তাতে হয়ত খানিকটা পরে শহরে পৌঁছনোই যাবে না। শহরে ঢোকবার মুখে জায়গাটা নিচু, বড় জল জমে!'

ওর কথায় যে যুক্তি আছে তা মানতেই হ'ল। আমিও একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'তাহলে চল যেমন যাচ্ছিলে। এখন দেখছি ওদের কাউকে এ গাড়িতেই নেওয়া উচিত ছিল। ওরা দলছাড়া হয়ে থাকবে—এত বিবেচনা করতে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

'তাহলে অন্তত আমার আসবার সময়টা কষ্ট হ'ত না। এই পথে একা আজ আর ফিরতেই পারব না। বাকী রাতটা ওখানেই এই গাড়িতে বসে কোথাও কাটিয়ে দিতে হবে!'

বেশ স্পষ্ট অনুযোগের সুর বাহাদুরের কথায়। কিন্তু তখন আর এসব কথায় লাভই বা কি? অগত্যা চুপ ক'রে রইলাম।

বাহাদুরও আবার স্টার্ট দিল।

অর্থাৎ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু গাড়ি আর নড়ল না। প্রথমটা অত কিছু ভাবি নি, পুরনো গাড়ি, ছাড়তে একটু দেরিই হয়—তবে যখন তিনচার মিনিট ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পরও কোন ফল হ'ল না—তখন হঠাৎ এখানে এই মধ্যপথে গাড়ি অচল হওয়ার সম্ভাব্য ফলাফল কল্পনা ক'রে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

'কী হ'ল বাহাদুর?'

'কী হ'ল তাইতো বুঝতেই পারছিনা বাবু। এরকম তো হবার কথা নয়।

'খুলে দ্যাখো না একটু—'

বোধকরি কণ্ঠস্বর অকারণেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'দেখব কি ক'রে?' বাহাদুরও ঝেঁঝে ওঠে, 'এই বৃষ্টিতে কে আলো ধরবে, কে কাজ করবে! একজন একটা বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেললে তবে হয়। তা আপনার সঙ্গে তো একটা ছাতি পর্যন্ত নেই।'

ওর মেজাজ খারাপ হবার যে অত্যন্ত সঙ্গত কারণ আছে তা বুঝি। ওর

সাহিত্য-প্রীতি নেই, সভাসমিতির উদ্যোক্তা নয় ও—এমন কি এ বাগানের লোকও নয়। মিছিমিছি ওর এ দুর্ভোগ কেন!

সুতরাং ভয়ে ভয়ে ঈষৎ অনুনয়ের ভঙ্গীতেই বলি, 'তা আমিই না হয় নেমে টর্চ ধরছি, তুমি ছাখো কোথায় কী বিগড়েছে। একটু ভিজব হয়ত, তা আর কি করা যাবে। গরজ বড় বালাই।'

বাহাদুর দেখলাম সঙ্কোচের বিশেষ ধার ধারে না। সে বললে, 'একটু নয় বেশ ভিজবেন। কিন্তু আপনি ভিজলেও কোন সুবিধা হবে না। এই জলের মধ্যে ইঞ্জিন খুলে কাজ করব কি করে? ওপরে একটা কিছু আড়াল দরকার। আমার এই একটি পুরনো বর্ষাতি ভরসা। এ যদি ঢাকা দিই তো আমি গায়ে দেব কি? আমি ভিজতে পারব না, তিন মাস আগেই আমার নিমোনিয়া হয়েছিল।'

এবার আর তিক্ততা চেপে রাখতে পারি না। বলি, 'বেশ হয়েছিল। তবে আর কি, আপদের শাস্তি। সারা রাত গাড়িতেই বসে কাটাই, সকালে যদি কেউ এদিকে আসে তো ভাল, নইলে হেঁটেই ফিরতে হবে।…অবশ্য তার আগে যদি বাঘ-ভালুকে খেয়ে না শেষ করে।'

'গাড়িতে বসে থাকলে বাঘ-ভালুকে খেতে পারবে না, সে সব কিছু ভাববেন না। জানালার কাঁচ ভেঙ্গে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে এ কখনও শুনিনি। তবে হাতীর কথা আলাদা। তেমন বজ্জাত হাতী হ'লে গাড়ি সুদ্ধ উল্‌টে দিয়ে যাবে…তা কৈ, এদিকে তো এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি, হাতীর পালে তো পড়ি নি কোন দিন।'

খুব যে ভরসা পেলাম না তা বলা বাহুল্য—তবে বললামও না আর কিছু। কিই বা বলব। অদৃষ্ট ছাড়া এখন তো আর পথও নেই। যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে।…তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি রাগে বিরক্তিতে দৈহিক কষ্টে চোখে আমার তখন জল এসে গিয়েছে—কথা বলার মতো অবস্থাও নেই।

বাহাদুর বোধ হয় আমার অবস্থাটা বুঝল। হয়ত তার মায়াও হল একটু। সে বলল, 'আপনি মিনিট কতক একা বসতে পারবেন? আমি তাহলে একটু খোঁজ করে দেখি ওদের। যদি সত্যিই কোথাও আটকে গিয়ে থাকে—। ওদের পেলে গাড়িটাও মেরামত হয়, চাই কি লরীতে বসে চলেও যেতে পারেন আপনি।'

'একা বসতে পারবেন' এ প্রশ্নটার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তা গ্রহণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর কি ? 'কলকাতার বাবু'দের দুর্নাম প্রমাণিত করতে রাজী নই আমি।...তা ছাড়া যদিই একটা উপায় হয়, এই অকুল সমুদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার—সেটাও বিবেচ্য। সুতরাং উত্তর দিলুম, 'তা আর পারব না কেন, লক্ ক'রে বসে থাকব। তুমি থাকলেই বা কতটা আটকাবে ? তবে তুমি কত দূর এই জলে হাঁটবে ?'

'না, বেশী দূর কি আর পারব ? যদি দু চারশ' গজের মধ্যে থাকে, কি মাইলটাকের মধ্যে—। ঐ আগের বাঁকটার আড়ালে থাকলেও এখান থেকে টের পাওয়া মুশকিল, বুঝলেন না ?'

বলতে বলতেই সে বর্ষাতিটা গুছিয়ে গায়ে দিয়ে টর্চ নিয়ে নেমে পড়ল। তারপর শুধু তার হাতের আলোটা ছাড়া আর কিছু দেখা সম্ভব নয়, দেখা গেলও না। পিছনের সেই নিবিড় কালো আঁধার আর দৃষ্টিনাশা প্রবল বর্ষণের মধ্যে তার টর্চের আলোটা একটি সূক্ষ্ম রেখার মতো এঁকে বেঁকে যেতে যেতে ক্রমশ সূক্ষ্মতর হয়ে হয়ে একসময়ে সেই অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। অতঃপর নিঃসীম নিশ্চিহ্নতার মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে গেলাম আমি। এমন কি গাড়িটার অস্তিত্বও হাত দিয়ে অনুভব করতে হচ্ছে—দেখার কোন উপায় নেই!

কোথাও এতটুকু আলো নেই। ওপরে আকাশেরও কোন অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না। আকাশে অরণ্যে পথে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। যেন মনে হচ্ছে সৃষ্টির আদি যুগে, জীব সৃষ্টিরও আগে যে প্রলয়ঙ্কর বর্ষণের কথা ইতিহাসে পড়ি, হঠাৎ সেই যুগেই গিয়ে পড়েছি আমি—একটি মাত্র জীবিত প্রাণী। শুধু মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের ফলে এক একবার বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছি—সামনে পিছনে বিসর্পিত টারম্যাক রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। তাও শুধু ঐ রাস্তাটাই, তাছাড়া তো সেই দুদিকে নিরন্ধ্র বন এবং ওপরে স্লেট রঙের ক্রুদ্ধ আকাশ। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। মানুষ তো দূরের কথা—অপর কোন প্রাণীর চিহ্ন পেলেও বাঁচতাম। সে সময়ে মনে হচ্ছিল একটা বাঘ-ভালুকের দেখা পেলেও মন্দ হ'ত না। তবু বিশ্বাস হ'ত যে আমি বেঁচে আছি।

চুপ ক'রে স্থাণুর মতো বসে থাকা—তার ওপর এই অপরিসীম শারীরিক ক্লান্তি, তাই তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি—টের পাই নি।

একেবারে হঠাৎ কানের কাছে একটা কাশি কিম্বা গলা খ্যাঁকারির শব্দ পেয়ে ধড়মড়িয়ে চমকে জেগে উঠলাম।

'কে, কে—বাহাদুর? প্রশ্ন করি বটে কিন্তু গলাটা নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত শোনায়।

আর প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নের ব্যর্থতা ধরা পড়ে; কারণ গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁচে যে টোকা দিচ্ছে সে বাহাদুর নয়। অত কাছে বলে তার সাদা পোশাকটা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল—স্পষ্ট মনে আছে বাহাদুরের খাকি শার্ট ছিল গায়ে—তাছাড়া ঠিক সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম সাহেবী পোশাক পরা লোক একজন এবং সম্ভবত সাহেবই।

নিমেষে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। এই বিজন অরণ্যে, লোকালয় থেকে অন্তত সাত-আট মাইল দূরে—ঘোর বর্ষায় সাহেব কোথা থেকে এল?

কিন্তু সে ঐ নিমেষ মাত্র। পরক্ষণেই এই আতঙ্কের ছেলেমানুষীটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। নিশ্চয় সাহেবও এই পথে যাচ্ছিল—আমার গাড়ি অন্ধকারে এমন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খোঁজ করতে নেমেছে। ওদের জাতে এ ভদ্রতা খুব আছে।

আশ্বস্ত হয়ে—বোধ হয় আনন্দের চোটেই তাড়াতাড়ি জানলাটা ইঞ্চি দুই নামিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দমকা ঝোড়ো বাতাস আর খানিকটা জল ঢুকে যায় ভেতরে। সেই সঙ্গে পুরোপুরি ইংরেজী কণ্ঠে প্রশ্ন আসে 'Well, can I do anything for you gentleman? হামি আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারি?'

সে কে, কোথা থেকে এল এবং তার গাড়িই বা কোথায়—এ সব খবর নেবার কথা মাথাতেই এল না। এতক্ষণে একটা মানবকণ্ঠ শুনে এবং বলিষ্ঠ ইংরেজকে হাতের কাছে পেয়ে মনের আনন্দে গল-গল ক'রে সব দুঃখ খুলে বললাম। অবশ্যই সংক্ষেপে—কারণ ঐটুকু খোলা দিয়েই জল এসে রীতিমতো ভিজিয়ে দিচ্ছিল আমায়।

সব শুনে সাহেব একটা প্রবল সহানুভূতিসূচক স্-স্-স্ শব্দ ক'রে বলল, দেখি কি ব্যাপার ইঞ্জিনের—'

তারপর আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে

ইঞ্জিনের ঢাকাটা খুলে ফেলল। সেই অন্ধকারে সেই মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে কি দেখল আর কি করল কে জানে—একটু পরেই ঢাকাটা আবার বন্ধ ক'রে সামনের দরজাটা খুলে ভিতরে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

এতক্ষণের নীরব মৃতপ্রায় যন্ত্র যেন কোন্ মায়াবী জাদুকরের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে গর্জন ক'রে উঠল, রুদ্ধগতি গাড়ি কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

'নাও, এখন পারফেক্টলি অল রাইট হয়ে গেছে—। চল বরং তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আলিপুর যাবে তো?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। অনুমতির অপেক্ষাও করল না।

প্রথমটা খুশীই হয়েছিলাম,. কি হচ্ছে ভাল ক'রে তলিয়ে না বুঝে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলাম। কিন্তু একটুখানি যাবার পরই সবটা যেন ভাল ক'রে মনে পড়ে গেল।

'কিন্তু বাহাদুর? বাহাদুর যে পড়ে রইল!'

দাঁতে দাঁত চেপে সাহেব বলল, 'চুলোয় যাক বাহাদুর! সে তার ব্যবস্থা ক'রে নেবে এখন। তার ভাবনা ভাবতে হবে না, তুমি তোমার ভাবনা ভাবো!'

সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা জটিল সংশয় দেখা দিয়েছিল মনে। বললাম, 'কিন্তু তোমার গাড়ি কোথায়? তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? সে গাড়ির কি হ'ল? কৈ দেখলাম না তো!'

'আঃ, তুমি বড্ড পরের জন্য মাথা ঘামাও বাবু, আগে নিজে বাঁচো তার-পর পরের চিন্তা করো!'

এই বলে একটু শব্দ ক'রে হাসল সে।

সামান্য হাসি, অতি ক্ষীণ একটা ধাতব শব্দের মতো—কিন্তু তাতেই বুকের মধ্যেটা যেন কেমন অকারণ আতঙ্কে গুরগুর ক'রে উঠল।

আর সেই সময়েই আর একটা কথা মনে পড়ল। বাইরে প্রলয়কাণ্ড চলছে; এ রকম বর্ষণ, এত বড় বড় জলের বিন্দু আমরা শহরের লোক দেখা তো দূরে থাক কল্পনাই করতে পারি না। এই বৃষ্টিতে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে তো ভিজে ন্যাতা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে সে রকম জলের আভাস তো টের পাচ্ছি না—

কথাটা ভাবছি এমন সময় আর একবার বজ্রগর্জনের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে গেল সে বিদ্যুৎ। তারই আলোতে স্পষ্ট দেখলাম—আমারই চোখ থেকে বোধ হয় মাত্র এক হাত দূরে, দেখার কোন অসুবিধাও নেই—তার সাদা পোশাক নি-ভাঁজ ইস্ত্রির সমস্ত গৌরব নিয়ে অনার্দ্রই রয়েছে !!

একটা দিক-দিশাহারা আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য না রইল কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়বার ক্ষমতা আর না রইল কথা কওয়ার শক্তি। বিমূঢ় জড়ের মতো বসে রইলাম। তারপরই বোধ হয় প্রাণপণ চেষ্টায় বিকট চিৎকার ক'রে উঠলাম, 'থামাও, থামাও। গাড়ি থামাও, এখনই। আমি আর যাব না, আমি নেমে যাব ! !'

কোন উত্তর এল না সামনে থেকে। শুনতে পেলে কিনা তাও বোঝা গেল না। কিন্তু গাড়িও থামল না, বরং মনে হ'ল যেন তার গতি বেড়ে গেল আরও।

কি করব ? দরজা খুলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ব ?

কিন্তু সে তো নিশ্চিত মৃত্যু !

ওর গলাটা টিপে ধরব ?

উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই পেলাম—সে সাহস হবে না।

তবে ?

তবে যে কি করব সেইটেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। কিছুই ঢুকল না মাথায়। অসহায়ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম শুধু।

হু হু ক'রে ছুটে চলতে লাগল গাড়ি। এত জোরে যে, হেড্‌লাইটের তীব্র আলোতেই সামনের গাছপালাগুলো একাকার আব্‌ছা মেঘের মতো মনে হ'তে লাগল। কিছুই বোঝা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে বেগ এত বাড়ল, যেন মনে হ'ল চাকাগুলো আর মাটি স্পর্শ ক'রে চলছে না, এরোপ্লেনের মতো বাতাসে ভর দিয়ে ছুটছে।

কি একটা বলতে চেষ্টা করলাম আবারও—পারলাম না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোন মতেই স্বর ফুটল না তাতে। ঘামে সমস্ত কাপড়-জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, হাতে পায়ে কোন জোর নেই।

তবে কি অন্তিমযাত্রাতেই চলেছি !

জীবনের এপারে কি কোথাও এ চলার শেষ হবে না ?

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই কি প্রকৃতির এ প্রলয়ায়োজন ?

কত কি এলোমেলো চিন্তা মাথাতে আসতে লাগল। কত কি নিরুত্তর প্রশ্ন।

ভয়ে কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি ?...

অসাড় অনড় হয়েই বসে আছি, অকস্মাৎ সামনে দূরে আর একটা কী সাদামতো নজরে পড়ল।

বহু দূরে। কি পদার্থ, গরু কি মানুষ—কি অন্য কোন বস্তু, কিছুই ঠাওর হ'ল না। কিন্তু সাহেব আর একবার হেসে উঠল। আবারও সেই মৃদু অথচ কঠিন ধাতব শব্দ পাওয়া গেল একটা।

আবারও কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গে। শিরশির ক'রে উঠল সমস্ত দেহটা।

কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি আরও এগিয়ে গেছে। সেই সাদামতো পদার্থটা কাছে এসেছে। আর বুঝতে কোন বাধা নেই। দেখতেও না—আলোটা সম্পূর্ণই ওর ওপর পড়েছে।

মেয়েছেলে!

তরুণী বাঙ্গালীর মেয়ে একটি। ঘরোয়া ধরণের শাড়ি পরে স্থির অবিচল-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, পথের ঠিক মাঝখানে। এই দিকেই চেয়ে আছে।

আরও কাছে আসতে বোঝা গেল, বেশ সুশ্রী মেয়ে, ভদ্র বংশের তো বটেই।

কিন্তু গাড়ি যে সোজা ওর দিকেই ছুটে চলেছে!

আরে, ও যে নড়ে না।

'সাহেব হর্ণ দাও—দেখতে পাচ্ছ না ?'

নিজের অজ্ঞাতসারেই কণ্ঠে স্বর ফুটেছে কখন—উৎকণ্ঠায় আতঙ্ক গেছি ভুলে। নিজের অবস্থার কথা মনে নেই আর, এই আসন্ন সর্বনাশ, শোচনীয় দুর্ঘটনাটাই প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠেছে তখন।

সাহেব আর একটু হাসল শুধু।

মেয়েটাই বা সরছে না কেন ?

ও কি তাহ'লে মরতেই চায় ?

এই গহন বনে ও-ই বা এল কোথা থেকে ?

তবে কি—

কিন্তু আর কিছু ভাবার সময় নেই তখন। আর কোন সময়ই নেই। ওকে বাঁচাবারও না। গাড়ি সোজা নক্ষত্র বেগে ওর দিকেই এগিয়ে চলেছে। ওর ওপরই এসে পড়ল যে!

আর সামান্য, আর চার হাত।

আর না। আর বাঁচানো গেল না।

মেয়েটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির সামনে— নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে।

আতঙ্কে দুঃখে ক্ষোভে প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠলাম।···

প্রচণ্ড নাড়া খেল গাড়িটা, তীব্র ঝাঁকানি লাগল একটা—বোধ হয় ঐ মেয়েটার দেহে ধাক্কা খেয়েই—তারপর সেও আর্তনাদের মতো একটা দারুণ শব্দ ক'রে গেল থেমে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত সেই প্রবল ধাক্কাতেই হেড্‌লাইট দুটোও নিভে গেল।

তারপর সব আবার চুপচাপ। আবার সেই নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু একটানা বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ। আর মধ্যে মধ্যে দূরাগত মেঘ-গর্জন, গুরুগুরু গুমগুম।

তখন কিছু ভাবছি না ঠিক, কিছু করার তো উপায়ই নেই। সব শক্তি গেছে নিঃশেষ হয়ে, সব চেতনা গেছে হারিয়ে। চুপ ক'রে বসে আছি শুধু—

এমন সময় আবারও গাড়ির ঠিক পাশে কার একটা কাশির শব্দ হ'ল। একটা যেন সূক্ষ্ম আলোর রেখার মতোও কি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল এক নিমেষে!

ব্যস্, আর আমার কোন জ্ঞান নেই! ঠিক কি ভেবেছি কি করেছি তা আর আজ বলতে পারব না—তবে নাকি বিকট একটা চিৎকার ক'রে দরজা খুলে লাফ দিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়—অন্তত বাহাদুর তাই বলেছিল।

'বাবু বাবু, ও কি করছেন? এই যে আমি, আমি বাহাদুর। চিনতে পারছেন না আমায়। ভয় পেলেন নাকি?'

হয়তো বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে, হয়তো বৃষ্টির জলে অথবা বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে—কিসে জানি না, যেন প্রকৃতিস্থ হলাম একটু।

ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'বাহাদুর? তুমি কোথা থেকে এলে? কেমন ক'রে এলে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তো বহু দূর চলে

এসেছি, কি ক'রে ধরলে আমায় ?'

'কি বলছেন বাবু যা তা ? ভয়ে পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? এই জন্যেই তখন আগে বাজিয়ে নিয়েছিলাম যে থাকতে পারবেন কিনা !··· আপনারা শহরের লোক, আপনাদের দৌড় তো আমি জানি !···নিন উঠুন গাড়িতে !'

বাহাদুরের বিদ্রূপে ও তিরস্কারে আরও অনেকটাই প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলাম। লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দোর খুলে গাড়িতে উঠে পড়লাম। কিন্তু ঐটুকুতেই ভিজতে আর কিছু বাকী রইল না।

বাহাদুরও উঠে বসল গাড়িতে। বর্ষাতিটা খুলে নিচে ফেলে দিয়ে বলল, 'আরও আপনার ভাবনাতেই আমি বেশী দূর যেতে পারলাম না। কত—বড় জোর পনেরো কুড়ি মিনিট তো গেছি। তাতেই এত ভয় পেয়ে গেলেন ?'

স্পষ্ট অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ তার কথায়।

কিন্তু পনেরো কুড়ি মিনিট! লোকটা বলে কি ? সত্যিই কি আমি ভয়ে পাগল হয়ে গেছি ?

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করি, 'ওদের পাত্তা পেলে ?'

'না। তারা এতক্ষণে ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়েছে !' তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বাহাদুর, 'আমারই দুর্ভোগ। এখন সারা রাত এইখানে বসে কাটাই, কালও আট মাইল না হাঁটলে উপায় হবে না। এক যদি কোন চলতি ট্রাক কি লরী এসে পড়ে তো তবু বাঁচোয়া।'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বাহাদুরকে বলি, 'একবার স্টার্টটা দিয়ে দেখবে—এখন চলছে কিনা ?'

'মাথা খারাপ নাকি বাবু। তখন অত ধস্তাধ্বস্তি করলুম তাই চলল না, এখন তো সব ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে !'

ওর ভাবভঙ্গী দেখে বার বারই মনে হচ্ছিল যে আর কিছু না বলাই উচিত। তবু কি মনে হ'ল—প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললাম, 'তবু একবার ছাখোই না। আমি বলছি—একবার চেষ্টা করো। তোমার তো কোন কষ্ট নেই—এটুকু তো বসে বসেই পারবে !'

বিরক্তি চাপবার কোন চেষ্টা করল না বাহাদুর, তবে কথাটা শুনল। বোধ হয় আমাকে অপ্রতিভ করবার জন্যই—পরে অনেক বেশী অপমান

করতে পারবে এই ভরসায়। রিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে সুইচটা টিপে ক্লাচে হাত দিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অনড় অচল যন্ত্রটা যেন প্রবল গর্জন ক'রে উঠল, গাড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে। ইঞ্জিন যে স্টার্ট নিয়েছে সে সম্বন্ধে আর কোন রকম সন্দেহের অবকাশ রইল না।

'আরে! বহুত তাজ্জব বাত!'

একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি ক'রে চমকে ওঠে বাহাদুর। অবাক হয়ে বলে, এ কি ব্যাপার বাবু? আপনি কি কিছু ক'রেছিলেন? আপনি কি জানেন এ সব মেরামতির কাজ? তাহলে তখন বললেন না কেন?'

'বলছি বলছি। তার আগে তুমি এখান থেকে একটু এগিয়ে যাও দিকি!

এবার আর বাহাদুর কোন আপত্তি করল না, বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

খানিকটা চলবার পর মনে জোর পেলুম খানিকটা, মনের মধ্যে কিছু-পূর্বের অভিজ্ঞতাটাও ভেবে একটু গুছিয়ে নিতে পারলুম। তখন ইঙ্গিতে ওকে থামতে বলে একে একে সব বললুম।

শুনতে শুনতেই যে বার কতক শিউরে উঠল ও, তা এই অন্ধকারেই টের পাওয়া গেল। দু হাত নিজের কানে ও নাকে ঠেকিয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করল কাকে, তারপর রীতিমতো-কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'জয় রামজীকি, জয় শিউজীকি! মা কালী আর আপনার গুরুজীর বহুত কৃপা তাই আজ প্রাণে বেঁচেছেন। নইলে এক আঁধেরা রাত আর আপনি একা—আপনার তো অপঘাত হবারই কথা।·· হ্যাঁ, ওরা এখানেই থাকে, আমি শুনেছি বহুত বার—তবে কথাটা মনে ছিল না। নইলে আপনাকে ছেড়ে যেতাম না। অবশ্য আমি কখনও দেখি নি, আর দেখবই বা কি ক'রে—আমি তো এত রাত্রে কখনও গাড়ি চালাই নি এ-পথে।·· ওরা এই রাত দুটো-তিনটের সময়ই নাকি পথে বেরোয়!'

'কিন্তু ওরা কারা? এমনভাবে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? এখানেই বা এল কি ক'রে? একজন তো দেখলাম সাহেব—তার সঙ্গে ও বাঙ্গালীর মেয়ে? সে-ও কি অপদেবতা? যা দেখলাম সবই মায়া? আচ্ছা গাড়ি তুমি যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলে সেখানেই পেলে?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করি অনেকগুলো।

'ঠিক সেখানেই পেয়েছি বাবু। একটা বড় শিরীষ গাছ চিহ্ন করা ছিল। ওখানটার মস্ত বাঁক বলে সরকার থেকে সাদা দাগ দিয়ে দিয়েছে কাঠের গুঁড়িতে।

তারপর একটু হেসে শুরু করল, 'হ্যাঁ বাবু, ওরা দুজনেই ভূত। শুনবেন ওদের গল্প?'

প্রশ্ন করল বটে তবে সম্মতির অপেক্ষা করল না।

বাহাদুর যা বলল তা সংক্ষেপে এই :

ঐ জায়গাটায় এর আগে একটা বড় চা-বাগান ছিল, ডাইনীমারা বা-বাগান। সাহেবের বাগান, সাহেবই ম্যানেজার থাকত। বেশী দিনের কথাও নয়, চল্লিশ বছর আগে ঐ সাহেব আসে এদেশে, রোল্যাণ্ড সাহেব, নতুন ম্যানেজার হয়ে। মালিকের ভাগ্নে, সুতরাং ঠিক সাধারণ মাইনে-করা কর্মচারীর মতো নয়—মালিকের মতোই যা-খুশী তাই করত।

অত্যন্ত মদ্যপ আর লম্পট ছিল লোকটা। এখানে এসে চা-বাগানের মেয়েদের কারুরই সর্বনাশ করতে বাকী রাখে নি। কিন্তু ওদের নিয়েই চলছিল, ভদ্রলোকদের দিকে হাত বাড়ায় নি। হঠাৎ ওখানকার বড়বাবুর রাণী বলে মেয়ে সাহেবের চোখে পড়ে গেল। সাহেব পাগল হয়ে উঠল, রাণীকে তার চাই। তিনি লোক দিয়ে বড়বাবুকে বিস্তর টাকা কবুল করলেন—একটা রাত পেলেই চলবে তাঁর, তার জন্য হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছেন। বড়বাবু ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে! তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন শুরু হ'ল নানা রকমের জুলুম্। দূরের কোন পাহাড়ে দেশ হ'লে কিম্বা আগেকার দিন হ'লে জোর করেই কাজ উদ্ধার করত সাহেব কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সোজাসুজি জোর করতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে জব্দ করবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে বিরক্ত হয়ে বড়বাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যেতে চাইলেন। শিকার হাতছাড়া হয় দেখে সাহেব এক মহা শয়তানী করল, তহবিল তছরূপের দায়ে জড়িয়ে ওঁকে গ্রেপ্তার করল। সাহেবের টাকা ছিল, আর সে সময় এদেশে সাধারণ কেরাণীদের মধ্যেও জিনিসটির তেমন সচ্ছলতা ছিল না। টাকা খাইয়ে বড়বাবুরই জন দুই ্যাসিস্টান্টকে সাক্ষী খাড়া করল। খাতাপত্রও রাতারাতি পাল্‌টে দেবার ব্যবস্থা হ'ল।

প্রথমটা বড়বাবু অত ভয় পান নি। শেষে গতিক দেখে প্রমাদ গুণলেন। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের বলে পাঠালেন, সব ফেলে রেখে কোন মতে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে পালাতে—তাঁর অদৃষ্টে যা আছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু যে জন্যে এত কাণ্ড সেই মেয়ের ইজ্জৎটাও না যায় শেষ পর্যন্ত।

ওর স্ত্রী সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তবে তাও যে সম্ভব হবে না, গোড়া থেকেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে রাণীর জন্য এত, সেই রাণীই সব ওলট পালট ক'রে দিলে।

সে এবার ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিলে। সটান সোজা সাহেবের বাংলোয় গিয়ে বললে যে সে নিজেই এসে ধরা দিতে প্রস্তুত আছে যদি সাহেব তার বাবার নামে নালিশ তুলে নিয়ে সসম্মানে মুক্তি দেয় এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মাইনের টাকা সব মিটিয়ে দিয়ে আরও দু হাজার টাকা বেশী দেয়।

সাহেব তখনই রাজী হয়ে গেল। শুধু বললে, 'জামিন?'

রাণী জবাব দিলে, 'জামিন আমি! আমি আমার মার নামে দিব্যি গেলে যাচ্ছি —এ কথার নড়চড় হবে না। সন্ধ্যার মধ্যে তুমি তোমার কাজ শেষ করো, আমি রাত আটটার মধ্যে তোমার বাংলোয় হাজির হব!'

সাহেব তো মহা খুশী, আনন্দে শীস দিয়ে উঠল।

তবে সে-ও বাহাদুর ছেলে। সেই দিনই, অবশিষ্ট ক ঘণ্টার মধ্যেই, ওদের চুক্তির তার দিকের শর্ত নিঃশেষে পালন করলে। এমন কি সকলের সামনে বড়বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করল। জানাল সে অনুতপ্ত।

সকলেই সেই কথা জানল, এমন কি বড়বাবুও। কারণ রাণীর এই ব্যাপার কেউ জানত না। তবুও বড়বাবু যাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন, এখানে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয়। কে জানে মাতালটার মতি বদলাতে কতক্ষণ?

কেউই কিছু জানল না। তখন এদিকে বিজলীর আলো হয় নি, হ'লেও কিছু রাস্তায় আলো থাকত না। কালো কাপড় পরে বেরিয়ে কখন সাহেবের বাংলোয় গিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসেছিল রাণী তা কেউ টের পায় নি। ওর কথামত সমস্ত ঝি চাকরকে সে সময়টা সরিয়ে দিয়েছিল সাহেব, কথাটা ছড়াবে সে সম্ভাবনা ছিল না।

সাহেব খুব খুশী, ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে বলে নিশ্চিন্তও।

খুশী মনেই ফুর্তি করতে শহরে গিয়েছিল। বহু রাত্রি পর্যন্ত ক্লাবে চেঁচামেচি হল্লা ক'রে মদ খেয়ে বাগানে ফিরছিল সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে রাণীর মনে এই ছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক ঐ জায়গাটাতেই, আমাদের গাড়ি যেখানে ছিল। রাণী একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ওরই অপেক্ষায়। পুরো স্পীডে গাড়ি আসছে এমন সময় পথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। সাহেবের তখন মদে আচ্ছন্ন দৃষ্টি, যখন বুঝল এবং চিনতে পারল তখন আর ব্রেক কষবার সময় ছিল না, ওরই গাড়ির চাকার তলায় পিষে গেল রাণী।

এর পর যে কি হ'ল—যেন একেবারে জন্তু হ'য়ে গেল সাহেব। তারপর বেঁচেও ছিল মোটে সাত-আটটা দিন। একদিন গভীর রাত্রে সেই বড় গাছটারই একটা ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল সে। তারপর থেকেই নাকি ওরা দুজন এখানে আছে। দৈবাৎ কোন দিন রাত্রে একা এপথে কেউ গেলে ওদের দেখতে পায়—বেশ বড় বড় কটা দুর্ঘটনাও ঘটেছে এখানে। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুর হয়ে গেছে গাড়ি—অকারণেই বলতে গেলে।

'তারপর থেকেই এখানকার চা-বাগানটা নষ্ট হয়ে গেছে' জানালো বাহাদুর, 'অনেকে চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ নাকি টিকতে পারে নি। এমন এমন সব উপদ্রব হ'তে লাগল যে বাঙ্গালী তো বাঙ্গালী, সাহেবরা পর্যন্ত পালাতে পথ পেলে না—বাগান ছেড়ে। তবু তো সেই গলায়-দড়ি গাছটা ওরা কেটে পুড়িয়ে দিয়েছিল—কিছু কিছু যাগ হোমও করেছিল। কিন্তু সাহেবের বাগান, সাহেবেরা তো আর ও সব করবে না, তা সম্পত্তি থাক আর যাক।...গেলেই অবশ্য, এমনি পড়ে পড়েই যন্ত্রপাতি সব গেল নষ্ট হয়ে, বাড়িঘর গেল ভেঙ্গে। সকলকার মনেই এমন ভয় ঢুকে গেল যে অত দামী দামী জিনিস পড়ে পড়ে নষ্ট হ'ল তবু কোন চোর পর্যন্ত এল না চুরি করতে। এখনও জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করলে হয়ত সে-সব জিনিস খুঁজে পাবেন।'

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল—বাহাদুর, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে বসে রইল সে।

আমি ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'এবার গাড়িটা ছাড় বাহাদুর, রাত তো পুইয়ে গেল প্রায়। চারটে বাজে, এখনই ফরসা হয়ে যাবে। যা দেশ তোমাদের!'

'এই যে ছাড়ি বাবু।' সে আবারও স্টার্ট দিয়ে বললে, 'তবে একটা কথা বাবু, আপনার কিন্তু সত্যিই খুব বরাত জোর। আপনার কোন অনিষ্ট তো করেই নি—উল্‌টে গাড়িটা সত্যিই খুব ভাল সারিয়ে দিয়ে গেছে। খাসা হাত ব্যাটার, তা মানতেই হবে!'

শাঁখের আংটি

একই সঙ্গে মানুষের মনে এমন আশা আর আশঙ্কা দেখা দেয়—এমন প্রবলভাবে, একই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে, তা জানত না পরমেশ। দিতে পারে এমন ধারণাও ছিল না। দুটো অনুভূতিই এখানে স্পষ্ট। আশঙ্কটা স্বাভাবিক, কিন্তু আশাটা বড়ই কলঙ্কজনক, কলুষিত মনের পরিচায়ক। সেটার অস্তিত্ব স্বীকার করলে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হয় লজ্জায়, দেওয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করে। অথচ তা অস্বীকার করারও সাহস নেই ওর। বড়ই স্পষ্ট, বড়ই প্রত্যক্ষ।

ঘটনাটা খুবই সামান্য অবশ্য। ওর ডান হাতের কনিষ্ঠায় যে শাঁখার আংটিটা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ নিয়ে এতটা বিচলিত হওয়া—আপাতদৃষ্টিতে বড় হাস্যকর, চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলার মতো। ছ'আনা দামের আংটি, আছেও হাতে অনেক বছর। এখন অবশ্য হয়ত আর ছ'আনায় পাওয়া যায় না—পরমেশ কিন্তু ছ'আনাতে কিনেছিল বেশ মনে আছে। এমনিই কিনেছিল। কেউ যে বলেছিল তা নয়, ধারণ করার মতো ক'রে পরেও নি। অথবা খুব একটা শখও ছিল না! নেহাৎই একদিন শাঁখার দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নিচু শো-কেসে সাজানো দেখে কিনেছিল। সেই থেকে হাতেই আছে। সে বহু দিনের কথা হ'ল, অন্ততঃ দশ-এগারো বছর। ছ'আনা দাম সুদসুদ্ধ উশুল হয়ে গেছে।

তবু যে সেই সামান্য আংটিটা হারানো নিয়েই ওর মনে এমন প্রচণ্ড তুফান উঠেছে, দুই বিপরীত মনোভাবের এমন বিপুল সংঘাত—তার কারণ আছে।

কাকতালীয় হয়ত—হয়ত ভেবে ভেবে বার করেছে বলেই সব ঘটনাগুলোকে নিজের চিন্তার অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছে—তবু এ ধারণাটা তার মনের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়েছে। এখন আর তাকে বিদায় দেওয়া বা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।···

এ আংটিটা তার হাত থেকে কখনও খোলে না, টানাটানি ক'রেও খুলতে পারা যায় না। তবু অজ্ঞাত কারণে হারায় এক এক সময়। আর যখনই হারিয়েছে তখনই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটেছে। অনিষ্ট হয়েছে, প্রাণহানি হয়েছে। এমনই বিচিত্র ব্যাপার যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে যাবার পর আবার ফিরে পেয়েছে আংটিটা। ফলে আংটিটা যে তার শুধু প্রিয় হয়ে উঠেছে তাই নয়—এটাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই কতকটা এক ধরনের রক্ষা-কবচ বলে ভাবতে শুরু করেছে। বরং এক এক সময় তার ভয়ই হয়—আংটিটার দিকে চেয়ে। কোন্ ভাগ্য এটা এমন ক'রে জড়াল তার জীবনের সঙ্গে, এ কোন্ দেবতা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ নিয়তি।

আংটিটাকে মধ্যে মধ্যে তার সজীব পদার্থ বলে মনে হয়। যেন ওর জীবন, ওর চিন্তা, ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে, আর কৌতুকের হাসি হাসছে। একটা এই সামান্য জিনিস এমন ভাবে ওর দেহের অংশীভূত হয়ে গেল, ফেলতে গেলে ফেলা যায় না, ফেলবার সাহসও নেই আর—এ কী জ্বালা হ'ল ওর!

একদিন একদিন রাগ ক'রে—মনের আতঙ্ক থেকে অব্যাহতি পেতেই—খুলে ফেলতে গেছে। খোলা যায় নি। সাবান দিয়ে তেল দিয়ে অনেক রকমে চেষ্টা করেছে, খুলতে পারে নি। যেন সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতোই চামড়ার সঙ্গে মিশে গেছে ওর, কেটে না ফেললে এর থেকে মুক্তি নেই।

অথচ হারায় যখন—নিশ্চয়ই খুলে পড়ে যায়—কখন যায়, কেন যায় তাও বোঝে না।

প্রথম পড়েছিল যেদিন, সেইদিনই ওর সেজ ভাই বিজয়েশ স্কুল থেকে ফেরার পথে লরীচাপা পড়ে। সাতদিন হাসপাতালে ছিল, চেষ্টা বা চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নি, অসংখ্য অস্ত্রোপচার হয়েছে, তবু বাঁচাতে পারা যায় নি। আট দিনের দিন মারা গেছে।

এই আটটা দিন খুব একটা খোঁজাখুঁজি করার সময় পায় নি সত্যি কথা।

তবে মাঝে মাঝেই ঘর, বাথরুম, খাবার ঘর, বারান্দা, নিজের বিছানা— যেখানে সেখানে পড়া সম্ভব খুঁজে দেখেছে, কোথাও পায় নি। কিন্তু ভাইকে দাহ ক'রে শ্মশান থেকে ফিরে—সদরের বাইরে নিমপাতা আর মটর ডাল দাঁতে কেটে আগুন ছুঁয়ে ভেতরে যাবে—খালি পায়ে কী একটা ঠেকল। হেঁট হয়ে দেখল—সেই শাঁখার আংটিটা। কেমন ক'রে ওখানে এল, কে ফেলল, আর কারো চোখে পড়ল না কেন—এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তরই মিলল না। বাড়িসুদ্ধ সকলকে জেরা ক'রেও না।

তারপর বছর-দুই আর কিছু হয় নি। হঠাৎ আবার একদিন হারাল আংটিটা।

তখনও আংটির সঙ্গে কোন দুর্ঘটনার যোগাযোগ থাকতে পারে এমন কথা মাথাতে যায় নি ওর, এ বিষয়ে কোন সংশয় দেখা দেয় নি। তাই আংটিটা এদিক-ওদিক খুঁজেছে কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত হয় নি। বরং এক এক সময় মনে হয়েছে অনেকদিন তো পরল, এবার যায় তো যাক, আর একটা নতুন হবে।

পরের দিনই খবর এসেছে, দেশে ওর জ্যাঠতুতো ভাই দেবেশদা ওদের পৈতৃক বাড়ির যে অংশে থাকতেন সেই অংশের দুটো ঘর পড়ে গেছে ক'দিন অহোরাত্র বৃষ্টির ফলে এবং দেবেশদার দুটি ছেলেই মারা গেছে—দেওয়াল ও ছাদ চাপা পড়ে। সেকালের ভারী ভারী শালের কড়ি আর ডবল টালি— তার চাপে থেঁতলে গেছে বাচ্ছা দুটো।

খবর পেয়েই ওরা সকলে দেশে চলে গিয়েছিল। দিন সাতেক পরে যখন ফিরল, সেইদিনই, ছেড়ে-যাওয়া ময়লা শার্টটা কাচতে দিতে গিয়ে অভ্যাসমতো পকেটে হাত ঢোকাতেই হাতে পড়ল আংটিটা।

এইবার বেশ একটু ভাবিয়ে তুলল পরমেশকে। হাত থেকে খুলে পড়লে, মেঝেয় পড়বে বিছানায় পড়বে—কিম্বা কলঘরটরে। সে-সমস্ত জায়গাতেই কয়েকবার খুঁজে দেখেছে তন্নতন্ন ক'রে। কোথাও পায় নি। পকেটে যাবার কোন কারণ নেই। ইচ্ছে ক'রে খোলে নি যে পকেটে রাখবে। তাছাড়া ময়লা জামার পকেট থেকে সে নিজে পয়সা কাগজপত্র রুমাল বার ক'রে নিয়ে গেছে—যতদূর মনে পড়ছে, ভাল ক'রেই দেখেছিল আর কিছু পড়ে রইল কিনা। থাকলে তো তখনই হাতে ঠেকত। তবে?

সংশয়টা সেই প্রথম দেখা দিয়েছিল ওর মনে। তবু তখনই ততটা

আমল দেয় নি। যত স্পষ্ট হয়েছে, আকার ধারণ করেছে, ততই দূরে ঠেলে দিয়েছে।

তবে তৃতীয়বার যে দিন হারাল—সেদিন, যাকে বলে 'তোল মাটি ঘোল করা' তাই করেছে সে। কোথাও খুঁজতে বাকী রাখে নি। সবাই মিলে খুঁজেছে বাড়ি সুদ্ধ। কিন্তু কোথাও চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় নি।

পরের দিন বাবা আপিস গিয়ে শুনেছেন, তাঁরা গবর্ণমেণ্ট টেণ্ডারে আসামে যে মাল পাঠিয়েছিলেন সে মাল 'মান অনুযায়ী নয়',—মানে যে নমুনা দেওয়া হয়েছিল সেরকম হয় নি, এই অজুহাতে ফেরৎ এসেছে। যাতায়াতের সব খরচ ওঁদের, টেণ্ডারের টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ছোট ব্যবসা তাঁর, এমনিতেই নানা কারণে টালমাটাল যাচ্ছিল, তার ওপর এতগুলি টাকা লোকসান, সর্বস্বান্ত হবার উপক্রম। সরকারি হিসাবের বাইরেও খানিকটা খরচ হয়েছে। ঘুষ দিতে হয়েছে। ঘুষ ছাড়া সরকারী ঠিকা পাওয়া যায় না—আসলে ঘুষ কিছু কম দিয়েছিলেন বাবা বলেই ঠিকা নাকচ হয়ে গেছে, অপরে নিশ্চয় বেশী ঘুষ দিয়েছে—কিন্তু তবু খানিকটা টাকা তো দিতেই হয়েছে, তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়—সেটাও বাজে খরচে গেল। আরও মুশকিল এসব খরচ ইন্‌কামট্যাক্স বিভাগ মানবে না।

এ ধাক্কা বাবা সামলাতে পারলেন না। তিন চারদিন পরেই সেরিব্রাল থ্রম্‌বসিস হল, চার ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ।

এবার আংটিটা পাওয়া গেল শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হবার পর, নিয়মভঙ্গের দিন। দেরাজে কিছু খুচরো টাকা ছিল। তিন চার খানা দশটাকার নোট, দরকার পড়তে বার করতে গিয়ে দেখল, সেইখানে যেন সযত্নে কেউ আংটিটা রেখে দিয়েছে—নোট কখানা চাপা দিয়ে।···

এর পর একেবারে ওর বিয়ের সময়।

ততদিনে ওর রীতিমতোই ভয় ধরে গেছে। সর্বনেশে আংটিটা কোন-মতে ভেঙে ফেলে দিতে পারলে বেঁচে যেত—কেবল বৃহত্তর কোন অনিষ্টের আশঙ্কাতেই পারে না। সাহসে কুলোয় না।

কিন্তু এবার যখন হারাল তখন আর ফেরবার সাহস নেই।

যাত্রা ক'রে বেরোচ্ছে, গাড়ীতে উঠেছে, তখন নজরে পড়ল হাতে আংটিটা

নেই।

নিমেষে হিম হয়ে গেল বুকের মধ্যেটা। একবার মনে হ'ল দেবেশদার বৌ যখন ওর বাবার দরুণ বড় পোখরাজের আংটিটা পরিয়েছেন তখন হয়ত পুরনো সস্তাদামের জিনিস বলে খুলে রেখেছেন কোথাও। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হ'ল—অত সহজে তো খোলা যাবে না। কত টানাটানি ক'রে কত সাবান জল দিয়ে যা খুলতে পারে নি—সে আংটি খুলবে আর ও টের পাবে না, তা কখন সম্ভব নয়।

তবে ?

তবে যে কি—তা ভাবতেও মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু তখন আর ফেরবার সময় নেই। যাত্রা স্থগিত করারও না। বহু লোক যাচ্ছে সঙ্গে। বাড়িও আত্মীয়-কুটুম্বে ভরে গেছে। প্রায় তিনশ লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বৌ-ভাতে। কাল বাদ পরশুই দিন—এখন বিয়ে বন্ধ করা মানে হাজারো কৈফিয়ৎ। দাঁড়িয়ে অপমান হওয়া। তাছাড়া, সে ভদ্রলোকদেরও জাত যাবার প্রশ্ন আছে। আজকাল যদিও আগের মতো জাত যায় না—কিন্তু কার্যত সেই রকমই দাঁড়ায়!

সুতরাং—বসেই রইল পরমেশ স্থির হয়ে। কিন্তু এই ফুলের মালা, এই বর-বেশ, এই সাজানো গাড়ি—বান্ধুবান্ধবদের কৌতুক-বিদ্রূপ—চারিদিকের আনন্দ-কোলাহল, সমস্তই যেন একটা অকরুণ পরিহাস বলে মনে হতে লাগল। সব যেন ম্লান হয়ে গেল—আনন্দ উৎসব-সমারোহ। আশপাশে কে কি বলছে—তার এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না।

সংবাদটা পাওয়া গেল পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে।

কলকাতা থেকে মাইল চব্বিশ দূরে বিবাহ। শহর কিছু না, বড় জোর গণ্ডগ্রাম বলা যেতে পারে। বিবাহের লগ্ন গভীর রাত্রে বলে ওরা সন্ধ্যাতে রওনা দিয়েছিল। পথে 'জ্যাম্' পাওয়ায় পৌঁছতে দেরি হয়েছে। ওরা যখন গেছে তখন রাত প্রায় নটা। তবু বিয়ে বাড়িতে এমন শোকাভিভূত গৃহের মতো নীরবতা আদৌ স্বাভাবিক নয়। অথচ কেউই নিদ্রাভিভূত নয়—জেগেই আছে, লোকও কম নেই কিন্তু তারা সবাই চুপ ক'রে গুম্ খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাষাণ মূর্তির মতোই; অধিকাংশরই মাথা নিচু। মেয়েদের সংখ্যাও যথেষ্ট, সাধারণ বিয়ে বাড়িতে যেমন হয়—তবু বর পৌঁছতে একটা

শাঁখ বাজল না, অথবা কেউ ছুটে এল না গাড়ির চাকায় জল দিতে।

ফলে এঁরাও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অপমানে মুখ কালো হয়ে উঠল সকলের। বর গাড়িতেই বসে রইল—বরকর্তা ছোট কাকা অন্ধকার মুখ ক'রে নেমে এলেন।

কারণটা বোঝা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পাত্রীর বাবা ছুটে এসে ছোট কাকার হাতটা ধরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। তাঁর হাতটা ধরে কপালে আঘাত করতে লাগলেন বার বার।

সন্ধ্যা বেলায় যখন সকলে নানা কাজে ব্যস্ত, সেই সময় পাত্রী কনে-সাজ পরেই কোথায় পালিয়ে গেছে। ওঁদের যখন খেয়াল হয়েছে—খোঁজ পড়েছে তখন আর কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে কার সঙ্গে পালিয়েছে তা জানতে পেরেছেন। কারণ যে মাস্টার মশাই ওকে পড়াতেন তাকেও সেই সময় থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা কানাঘুষো অবশ্য এর আগেও উঠেছিল কিন্তু মেয়ের বাবা জগৎবাবু খবর পেয়ে পড়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেটিকে যাচ্ছে-তাই ক'রে বকেছিলেন। বাড়িতে আসা বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। মেয়েকেও কোথাও বেরোতে দিতেন না। এতকাল সে শাসন লঙ্ঘনও করে নি কেউ—প্রায় বছর খানেকের ওপর হয়ে গেল, কোন পক্ষেই কোন বেচাল দেখেন নি। তাই কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বিয়ের সম্বন্ধ করতে এগিয়েছিলেন। ওরা যে ওঁর এই সর্বনাশ মনে মনে ভেঁজে আছে তা একবারও মনে করেন নি।

এর পর ফিরে আসবারই কথা। ফিরেই আসছিল পরমেশরা—কিন্তু গ্রামের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি এসে বাধা দিলেন। বললেন, 'দেখুন কিছু বলবার অবশ্য আমাদের মুখ নেই কিন্তু এতে দুপক্ষেরই অপমান; বরং আপনাদের বেশী, আমাদের তো যা হবার তা হয়েই গেছে—ঢিঙ্কার পড়ে গেছে, আপনারাও বৌ না নিয়ে ফিরে গেলে ওখানে মুখ দেখাতে পারবেন না। তার চেয়ে একটা কাজ করুন, জগৎবাবুর একটি ভাইঝি আছে, প্রায় ঐ বয়িসীই হবে, দেখতে মন্দ নয়। কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। সংসারের কাজকর্মও সব জানে,—আর সবচেয়ে যেটা বলবার—স্বভাব চরিত্র অতুলনীয়। দিদির বিপরীত একেবারে। ওকে কেউ কোন বেটাছেলের সঙ্গে আড্ডা দিতে বা ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে নি। আমরা এতগুলি ভদ্রসন্তান জামিন থাকছি—এ মেয়েকে আপনারা নিঃসঙ্কোচে নিয়ে যেতে পারেন।'

গরজ সত্যিই তখন পরমেশদের বেশী। এদের যা অপমান বা লোক-জানাজানি হবার তা তো হয়েই গেছে—এখন ওঁদেরও, যদি বৌ না নিয়ে ফিরতে হয়—কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। অগত্যা ওঁরা রাজী হয়ে গেলেন, দেবেশদা, ছোট কাকা, মামা সবাই। পরমেশকেও রাজী করালেন শেষ পর্যন্ত।

আর, সত্যি কথা বলতে কি, আংটির ফাঁড়া, কারও জীবনান্ত না ক'রে অল্পে কেটে গেছে ভেবে সে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছে—তার তখন কোন প্রস্তাবেই আপত্তি নেই!

তারপর এই।

কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে।

বৌ রেবা ছ্যাবলা নয়, পরপুরুষের দিকেও দৃষ্টি নেই, সবই ঠিক মিলেছে, যা যা ওঁরা বলেছিলেন। শুধু একটা কথা কেউ বলেন নি। মেয়েটি চির-রুগ্না। কোন্ রোগটা নেই তা বলা শক্ত। হিষ্টিরিয়াই প্রধান, তা ছাড়া যাবতীয় স্ত্রীরোগ, স্নায়ু-ঘটিত ব্যাধি, হজমের অসুবিধা, হাঁপানির টান—এঁরাও আছেন। কোনটাই কম নয় বা সহজ নয়। তাও যদি বা চলছিল, এক উৎকট নতুন ব্যাধিতে ধরেছে সম্প্রতি। স্নায়ুগুলো শুকিয়ে আসছে ক্রমশঃ।

গোড়াতে বোঝা যায় নি। ডাক্তাররা 'নিউরটিক' পেশেন্ট বলে অতটা গ্রাহ্যও করেন নি। যখন ধরা পড়ল তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে রোগ, আরোগ্যের আশা আর নেই। আগেও নাকি বিশেষ ছিল না—আজ পর্যন্ত এ রোগের কোন ভাল চিকিৎসা বেরোয় নি।

এমনিতেই তো জেরবার, ধনে-প্রাণে মরবার উপক্রম, দিনে রাতে দুটি আয়া রাখতে হয়েছে সেবা করার জন্যে, পাশ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে হয় আজ-কাল, চিকিৎসাও একটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে—কোন ফল হবে না জেনেও—আর সেও বেশ ব্যয়বহুল চিকিৎসা, তার ওপর রেবা মহা-অশান্তি বাধিয়ে তুলেছে।

তার ধারণা হয়েছে যে পরমেশ তার দিদি শুভাকে পছন্দ করেছিল, সেই পাত্রী না পেয়ে ওর আশাভঙ্গ হয়েছে। শুভা রূপসী, স্বাস্থ্যবতী, প্রাণোচ্ছল—তার বদলে বাধ্য হয়ে রেবাকে বিয়ে করতে হয়েছে বলে রেবার ওপর

পরমেশের একটা জাতক্রোধ, দু'চোখে দেখতে পারে না। তার ওপর এত ভুগছে রেবা, অবিরাম পয়সা খরচ করতে হচ্ছে পরমেশকে—ফলে সে বিদ্বেষ প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে। পরমেশ ইচ্ছে ক'রে চিকিৎসার নামে বিষ ইন্‌জেকশ্যন দিইয়ে এমন মহাব্যাধি ধরিয়ে দিয়েছে।

পরমেশ প্রথম প্রথম অনেক বুঝিয়েছে। শুভাকে সে নিজে গিয়ে দেখে নি সুতরাং তার পছন্দ করার প্রশ্নই উঠছে না,—একথা নানারকম দিব্যি গেলে বলেছে বারবার, মরা মা-বাবার নামে, মাকালীর নামে দিব্যি গেলেছে। তাছাড়া বিষ দেওয়া সম্ভব নয় এই জন্যে যে বড় বড় ডাক্তার—বত্রিশ টাকা চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে পরমেশ, ওর কথায় তাঁরা বিষ দেবার ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন খামখা? তাদের ঘুষ দিতে গেলে লাখটাকা অন্ততঃ ঘুষ দিতে হয়, সে টাকা ওর কই?

বোঝাবার চেষ্টা করেছে প্রাণপণেই, প্রাণের দায়েই বলতে গেলে—কিন্তু রেবা কোন যুক্তিতেই কর্ণপাত করে নি। প্রকাশ্যে সকলের সামনে গালাগাল দেয়, তুমি পিশাচ, তুমি রাক্ষস, আমি মলে আমার মড়াটার বুকের ওপর নাচবে ধেই ধেই করে—তোমাকে বেশ চিনে নিয়েছি। আর একটা বিয়ে করার জন্যে ছটফট করছ—তা কি আমি জানি না।

ক্রমশঃ এটা বেড়েছে। পাগলামিতে পরিণত হয়েছে।

কথা কইতে এখন রীতিমতো কষ্ট হয়, তবু অকথ্য-কুকথা গালিগালাজ ক'রে যায় সে স্বামীকে—দিনরাত শাপ-শাপান্ত করে। বিরক্তি তো আছেই—অপমানও বড় কম নয়। ঝি চাকর আয়ার সামনেই এইসব বলে। অশান্তির শেষ থাকে না। আয়ারা বিরক্ত হয়, কাজ ছেড়ে দেবার ভয় দেখায়। অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে টাকা বাড়িয়ে দিয়ে রাখতে হয় তাদের। ঝি-চাকরও তাই।

শেষে এমন একটা সময় আসে যে সত্যি সত্যিই স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে পরমেশ। আর তো কোন আশাই নেই, গলা পর্যন্ত বুজে আসছে, ডাক্তাররা শক্ত খাবার দিতে বারণ করেছেন; ভাত চটকে দুধে গুলে ঝিনুকে করে খাওয়ানো—পৃথিবীর কোনো সুখ কোনো সম্ভোগই আর ওর অদৃষ্টে নেই, কোনো সৌভাগ্য কোনদিন আসবে না জীবনে, কোনো আনন্দের স্বাদ পাবে না—তবে আর কেন এই মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? ওরও—এদেরও। দৈহিক যত না

হোক মানসিক কষ্টটাই অসহ্য যে। দিবারাত্র এই বিরক্তি, দুশ্চিন্তা এবং নিজের মাইনে করা দাসদাসীর কাছে এই অপমান। তারা যে ওর আড়ালে কী পরিমাণ হাসাহাসি করে তা কি আর বোঝে না পরমেশ। --

প্রথম প্রথম, চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠত—দু'হাত দিয়ে ঠেলে বার ক'রে দিতে চাইত মন থেকে। কিন্তু পাপের বীজাণু সহজে মরে না, কোন কোন চর্মরোগের মতো নিশ্চিহ্ন ক'রে দিলেও আবার এক সময় মাথা তোলে। ওর এই চিন্তাও একটু একটু ক'রে বাসা বাঁধে, কিছু পরে সেটা স্থায়ী বাসায় পরিণত হয়—ক্রমে প্রাধান্যও পায়। শেষে একসময় চিন্তাটা আর অত অসহ্য অতি লজ্জাকর মনে হয় না।

অবশ্য, মৃত্যু কামনা করা এক জিনিস—মৃত্যু ঘটানো আর এক।

সেটা পরমেশের দ্বারা হবে না। তা চায়ও না সে। যেটা হবেই, যা অবশ্যম্ভাবী—নিয়তির বিধান, সেই ঘটনাটাকে ত্বরান্বিত করতে চায় মাত্র। চায়—মানে ঘটলে খুশী হয়। ত্বরান্বিত করার কোন উপায় সে জানে না। চায়ও না ও পথে যেতে। শুধু পাপ বলে নয়—বা আইনের চোখে সমাজের চোখে দণ্ডনীয় বলেও নয়—এ রকম কোন নৃশংস কাজ করা ওর শক্তির বাইরে।

না, বিষ ও খাওয়াতে পারবে না। গলাও টিপতে পারবে না। ওর দিকে চাইলে এখনও তার মায়াই হয় বরং। শারীরিক কোন উপায়ে নয়, সে নিজে কোন মৃত্যু ঘটাতে পারবে না। এছাড়া যদি কোন উপায় থাকে—প্রার্থনাতে যদি হয় তো সে রাজী আছে। ভগবান ওকে মুক্তি দাও। ওকে—আর আমাদেরও।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন আংটিটার দিকে নজর পড়ল। এটা যদি হারাত—কোন মতে! এতবার তো হারাল, আর একবার হারাতে পারে না?

অবশ্য—হারালেই যে অনিষ্ট বা অমঙ্গল এই পথে আসবে, তার কোন অর্থ নেই। কিন্তু সে সম্ভাবনা পরমেশ ভাবতেও চায় না। চায় না বলেই মাথাতেও আসে না। সে শুধু—কী ক'রে হারানো যায় এটা, অন্ততঃ খুলে ফেলা যায়, সেই চিন্তাই করে। নতুন ক'রে চেষ্টা শুরু করে আবার। সাবান দিয়ে দেখে, লুব্রিকেটিং তেল দিয়ে আস্তে আস্তে চুড়ি খোলার মতো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। শেষে একসময় আঙুলের ওপর নোড়া দিয়ে ঘা

দেয়—আংটিটা ভাঙতে গিয়ে যদি আঙুলটা ভাঙ্গে—সেও ভাল।

কিন্তু সেই নিতান্ত ভঙ্গুর শাঁখের আংটি নোড়ার ঘায়েও ভাঙ্গে না। অগত্যা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

সেই আংটি আজ আপনিই হারিয়েছে।

আশা, যদি এতেই তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আর সেই আশার জন্য একটা দুর্নিবার লজ্জাও।

আশঙ্কা, সেটা ছাড়া যদি অন্য কোন অমঙ্গল হয়!

দুটো এই বিপরীতমুখী চিন্তার সংঘাতে বিবর্ণ হয়ে ওঠে সে, তার কপালে ঘাম দেখা দেয়। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে।

ভাল ক'রে খুঁজতেও পারে না। সে শক্তিও নেই, বিশেষ ইচ্ছাও নেই। যায় তো যাক, একেবারেই যাক।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নেয় একটু। চাকরকে ডেকে বলে আংটিটা খুঁজতে, ঝিকে বলে ঘর মোছার সময় ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে। নিজেও খোঁজে সাধ্যমতো—বিছানায়, দেরাজে, টেবিলে, তাকে—যেখানে যেখানে পড়া সম্ভব—সর্বত্র।

বলা বাহুল্য—পাওয়া যায় না। এমনভাবে পাওয়া যাবেও না তা জানে পরমেশ। সে তার সময়মতো—ওর প্রতি নিয়তির পরিহাসের মতো এক-সময় দেখা দেবে।...

খানিকটা পরে হাল ছেড়ে স্নান করতে যায়।...

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই দিনের আয়া এসে বলে, 'বৌদি ডাকছেন আপনাকে একবার।'

মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। সাত-সকালে আবার সেই অশান্তি। গলা প্রায় বুজে এসেছে, ফিসফিস ক'রে কথা কইতেও কষ্ট হয়—তবু অব্যাহতি দেয় না!

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আয়া একটা নতুন খবর দেয়, 'বৌদি আজ কিন্তু বেশ হাসিখুশী আছেন দাদা, মনে হয় আজ অনেকদিন পরে মাথাটা ঠাণ্ডা আছে। কথাও কইতে পারছেন একটু—'

দেবার মতো সংবাদ নিশ্চয়ই। বিস্ময় বোধ করে, সেই সঙ্গে প্রবল

একটা আশঙ্কাও। তার কি আংটি হারানোর ফল অন্য কোন দুঃসংবাদের আকারে অপেক্ষা করছে ?

তখন অবশ্য অত ভাববার আর সময় নেই। পরমেশ স্ত্রীর ঘরে এসে দাঁড়ায়।

সত্যিই আজ রেবা একটু খুশী-খুশী আছে। পরমেশ যেতেই সে হেসে বলে, 'ওগো ছাখো, আজ আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। গলাটাও যেন একটু পরিষ্কার শুনছ না ?···নিজে নিজেই পাশ ফিরলুম এই মাত্র—'

মিষ্টি কথার উত্তরে মিষ্টি কথাই আসে। পরমেশও কোমল কণ্ঠে বলে, 'তাহলে বোধহয় ডাক্তারের এই নতুন ওষুধটায় কাজ দিল একটু।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে. য্যাদ্দিনে ঠিক ওষুধটা খুঁজে পেয়েছে ডাক্তার।···সত্যি, তোমাকে কত গালাগাল দিয়েছি, নতুন ওষুধটা খাওয়াতে শুরু করলে বলে।···আমি যেমন অভাগী, জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেলুম, একটা দিনের জন্যে শান্তি পেলে না আমাকে নিয়ে!'

অভিভূতের মতো শোনে পরমেশ। এ কি সত্যিই রেবার গলা, তার কথা শুনছে সে ?

অনেক উন্নতি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গলাটা সত্যিই অনেকখানি স্বাভাবিক। ডাক্তার ঘোষ অবশ্য শুনিয়ে দিয়ে গেছেন, 'দীপ নেভার আগে একবার জোরে জ্বলে ওঠে—কবিরা বলেন না ?—এ ওষুধেও য্যাক্‌শান একটা পাবেন, তবে তা কতদিন স্থায়ী হবে জানি না।'

এ কি সেই জ্বলে ওঠাই ? না সত্যিই ভাল হয়ে উঠবে এবার (বুকের মধ্যে কি কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন হিম-হিম ভাব অনুভব করে পরমেশ ?)

'জানো, সকালে একখানা বিস্কুট চেয়ে খেলাম। নিত্য ঐ দুধে গোলা সন্দেশ আর ভাত ভাল লাগে না। বেশ খেতে পারলুমও চিবিয়ে—। তোমার স্নান হয়ে গেছে ? জলখাবার টাবার কিছু দিয়েছে তোমায় বন্ধু ?'

বলতে বলতেই কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে ওঠে, আর্তনাদের মতো শোনায়—'ওকি. তোমার আংটি ? ··য়্যাঁ!···শাঁখের আংটিটা কোথায় গেল ?'

কিছুপূর্বের মধুর শান্তিময় পরিবেশ যেন তীক্ষ্ণধার কোন অস্ত্রের আঘাতে ফালা ফালা হয়ে কেটে যায়।

'নিশ্চয় ইচ্ছে ক'রে খুলেছ আমকে মারবে বলে—সে তো সহজে খোলে না। নিশ্চয় ভেঙেছ বসে বসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইচ্ছে ক'রে।...হারায় নি, কিচ্ছু না। এ তোমার শয়তানী। তুমিই তো বলেছ আংটিটা হারালেই কেউ না কেউ মরে?... তুমি খুনে, তুমি পিশাচ, তুমি রাক্ষস।'

তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে গলার আওয়াজ। শেষের দিকে চিৎকারের মতো শোনায়। তারপরই হঠাৎ থেমে যায় একেবারে। স্থির হয়ে যায় সমস্ত দেহ। চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিও এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে, শুধু চোখ দুটো তেমনি বিস্ফারিত থাকে।

আর কিছু করার ছিল না। তবু ডাক্তার এলেন, সার্টিফিকেটও লিখে দিয়ে গেলেন। লোকজনও ডাকা হ'ল। যা করণীয় তা তো করতেই হবে।

সে আংটিটাও পাওয়া গেল যথারীতি।

মৃতদেহটা সরাবার সময়ই পাওয়া গেল—রেবারই বালিশের নিচে।

কে নিয়ে সেখানে রেখেছে, কেন রেখেছে, কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল—হাজার জিজ্ঞাসাবাদ ক'রেও জানা গেল না।

কী তব প্রার্থনা

সাধুসন্ত, মহাপুরুষ দেখে বেড়ানো—নরেশবাবুর একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অল্প বয়স থেকেই চলছে এটা, মা-র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন ছেলেবেলা থেকে—সাধু মহাপুরুষ তখন যাঁরা বিখ্যাত ছিলেন, অনেককেই দেখা হয়েছে। ভোলাগিরি মহারাজ, কেশবানন্দ স্বামী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী; এদিকে মহাপুরুষ, মহারাজ, কালীকৃষ্ণ মহারাজ, এঁরা তো আছেনই। পাগল হরনাথকেও নাকি দেখেছেন শৈশবে, মনে নেই ভাল। কেবল বামাক্ষ্যাপাকে দেখা হয় নি, কারণ বীরভূমের ওসব পথ-ঘাট অজ্ঞাত ছিল। মায়ের জানাও ছিল না অত।

তারপর—বড় হবার পর ওটা নিজেরও বাতিকে দাঁড়িয়েছে। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্যরতন' এই ছিল ওঁর মূলমন্ত্র। সাধু শুনলেই ছুটতেন তিনি পড়ি-কি মরি ক'রে, তা নিয়ে

কেউ ঠাট্টা করলে চটে যেতেন, 'আরে মশাই কে কোথায় কখন কি বেশে থাকেন—কেউ বলতে পারে? ঐ ভণ্ড সেজেই থাকেন ওনারা অনেক সময়ে, পাছে কেউ বিরক্ত করে।'

১৯৩৭ থেকে নিয়মিত কুম্ভমেলায় যাচ্ছেন নরেশবাবু।

প্রয়াগেও গেছেন কিন্তু সেখানে বড্ড খোলা, ছড়ানো ব্যবস্থা, বড় বেশী হাঁটতে হয়—কে ভাল কে মন্দ অত ঘুরে দেখা যায় না। সেদিক দিয়ে নরেশবাবুর হরিদ্বারটাই পছন্দ। সেখানেও গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হয়ে যায় বটে—বিশেষ গঙ্গার ওপার যেখানে সাধুদের আস্তানা পড়ে—সেখানে তো যায়ই না রিক্সা-টাঙ্গা—তবু অতটা অসুবিধে হয় না। জায়গাটা তো মোটের ওপরে অল্প, হেঁটে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয় না।

ঘুরেওছেন খুব। প্রতি কুম্ভে গিয়ে চষে ফেলেছেন সাধু-মহল্লা।

এছাড়াও আছে। কাশীতে রাত আড়াইটায় মণিকর্ণিকায় গিয়ে ওৎ পেতে বসে থেকেছেন, পুরীতে গিয়ে মঠে মঠে ঘুরেছেন। বৃন্দাবনে দোল ও ঝুলনের সময় কুঞ্জে কুঞ্জে সন্ধান ক'রে বেড়িয়েছেন। উত্তরকাশী ঋষিকেশ স্বর্গাশ্রম কোথাও বাদ নেই। কে একটি উনিশ-কুড়ি-বছরের নেপালী ছেলেকে দেখিয়ে মলয় বলেছে 'ওঁর একশো সাতাশি বছর বয়স, খুব নাম করা তান্ত্রিক সাধক' সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে পড়ে কেঁদে ফেলেছেন। গোবিন্দপুরে এক থুত্থুড়ে-বুড়োকে দেখিয়ে আশুদা বলেছেন, 'এই যে দেখছ গুরুজী মহারাজ, পলাশীর যুদ্ধের সময়ও ইনি ঠিক এমনি দেখতে ছিলেন। আসলে ক্লাইভ এসে আগে ওঁর পায়ে পড়েছিল বলেই না অমন বরাত খুলে গেল বেটার!' কাশীতে কে এক সিদ্ধপীর থাকেন—তাঁর বয়স পঞ্চাশও হতে পারে পাঁচশো হতেও বাধা নেই—তিনি নাকি নিজে কিছু বলেন না, ভক্তদের আর্জি জানলে, যে কোন চিড়িয়াকে ধরে তাঁকে দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করান; বারাসতের কাছে কোথায় এক ফকিরের সমাধিতে জুম্মাবারে জুম্মাবারে তাঁর আবির্ভাব ঘটে—এসব কোন জায়গা বাদ দেন নি উনি।

এতে পয়সা খরচ কম হয় না, সময়ও বিস্তর যায়। আপিসে যা ছুটি পাওনা তার সবটাই এতে চলে যায়, কিছু বেশিও যায়। মানে, মাঝে মাঝে হাফ-পেতে ছুটি নিতে হয়। ফলে কো-অপারেটিভের দেনা আর কমে না। শরীরও খারাপ হয়। এমনি অনিয়ম তো হয়ই, অন্য কারণেও হয়। গঙ্গা-

সাগরের ফেরত কলকাতায় গঙ্গার ধারে যে-সব সাধুদের ওপ্‌ন-এয়ার তাঁবু পড়ে, সেখানেও যান নরেশবাবু। তার মধ্যে একবার এক সাধু খানিকটা দুধে গোলা শরবৎ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরমানন্দে বাদামের শরবৎ ভেবে খেয়েছেন, তারপর প্রাণ যায় যায় অবস্থা। বাদাম-মিশ্রী ছিল ঠিকই—কিন্তু তাছাড়াও তাতে নাকি সিদ্ধির সঙ্গে গাঁজা বেটে শরবৎ করা হয়েছিল। একেবারে উন্মাদ অবস্থা ভদ্রলোকের। এঁরা—মানে বাড়ির লোকেরা তো বুঝতেই পারে না ব্যাপার কি, ডাক্তারেরও সেই অবস্থা।—অনেক দিন পরে সুস্থ হয়ে বললেন ঘটনাটা, কিন্তু তখন সে সাধুরা ডেরাডাণ্ডা তুলে কোথায় চলে গেছেন। আর না গেলেই বা কি, উনি স্বেচ্ছায় খেয়েছেন। তাঁরা তো আর বদ মতলবে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেবেন বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়ান নি।

এই অবস্থাতেই দীর্ঘ ষাট বছর কাটিয়ে দিলেন নরেশবাবু। আপিস থেকে রিটায়ার করলেন, নানা কারণে দেনাপত্তর কেটে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটাও বেশী পেলেন না—আর কামাই বেশী, হাফ পে, উইদাউট পে-তে ছুটি নেওয়া যে, সেই বিবেচনায় পেন্‌সন্‌ও অনেক কম হল। সরকারী আপিস নয়—ওঁদের আপিসে পেন্‌সন্‌টা কর্ম-ইতিহাসের ওপর অনেকটা নির্ভর করে।

এবার সাধু খোঁজাটা কমাতেই হ'ল। প্রধান কারণ টাকার অভাব। বেশী বয়েসে বিয়ে করেছেন। একটি ছেলে সবে চাকরিতে ঢুকেছে একটা আপিসে, তাও বাবার অবস্থা দেখে, সংসারের হাঁড়ি চড়া অচল হয় দেখে যা সামনে পেয়েছে তা-ই নিতে হয়েছে, ভাল চাকরির জন্যে অপেক্ষা করতে পারে নি। বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরোবারও আগে আপিসে বসে গেছে সে। তাও ছেলের এক মামা ঐ আপিসে ছিলেন বলেই, নইলে নরেশবাবুর ভাল আপিস, তৎসত্ত্বেও নরেশবাবুর যা রেকর্ড—ছেলের জন্যে সুপারিশ ক'রে কোন ফল হয় নি। এছাড়া এক মেয়ে বি. এ. পড়ছে। আর একটি ছেলে ইস্কুলে। এদের দায়িত্ব তো বড়ছেলেকেই বহন করতে হবে। ওঁর সাধ্যাতীত।

এই সব কারণেই আজকাল খুব মন-মরা থাকেন নরেশবাবু। স্ত্রী আগে খুব কথা শোনাতেন। এমন লোকের বিয়ে করা উচিত হয় নি, সন্ন্যাসী হওয়াই উচিত ছিল। এত যখন ঐ দিকে নেশা, সন্ন্যাসী হলেই তো পারতে? ইত্যাদি বলে। এখন নরেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে—ওঁর চুপচাপ ঘরে বসে থাকা দেখে তাঁর মন-কেমন করে। কিছু বলেন না আর। বড়ছেলেও বারণ

করেছে, 'একে দেখছ, মরমে মরে আছে লোকটা তার উপর আর কথা শোনে না—শেষে কোন্ দিকে চলে যাবে তখন কেঁদে কেটে মরবে। মদ নয়, গাঁজা নয়—জুয়া কি রেস নয়—একটা সৎ নেশা, তাই মেটাতে পারে না—মিছিমিছি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না!'

বন্ধুবান্ধবরাও সান্ত্বনা দেয়। বলাইদা বলেন, 'আচ্ছা ধর সত্যিই একটা ভাল সাধুর দেখা পেয়ে গেলি. সেই রকম সাধুবাবা যে দিনকে রাত করতে পারে—কী চাইবি তার কাছে? মোক্ষ? না, আর কিছু?'

নরেশবাবু বলে ওঠেন, 'মোক্ষ ফোক্ষ আমার দরকার নেই—মোক্ষ পেয়ে কি করব। আর যদি সত্যই অত বড় সাধুর দেখা পাই—দেখা পাওয়া মাত্র তো সব পাপ ঘুচে গেল—অবধারিত মুক্তি। আগে অনেক প্ল্যান ছিল—সাধনার মধ্যে ঢুকব, নির্বিকল্প সমাধি চাইব, ব্রহ্ম-দর্শন করাতে বলব—সে সব গেছে। এখন টাকা, স্রেফ টাকা চাইব। টাকার টানাটানিতে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি বলাইদা, সত্যি বলছি, এমন টাইট কর্নারে জীবনে কখনও পড়ি নি।'

'ধর টাকা পেলি—তার পর?'

'তারপর দেদার ঘুরে বেড়াব। দিনকতক ভোগ ক'রে নেব জীবনটাকে।'

'দূর পাগল! বাষট্টি বছর বয়স হ'ল নিজেই তো বলছিস। কী ভোগ করবি? বেড়াবি! তখন দেখবি আর একা যেতে সাহস হবে না, আগে যা কষ্ট করেছিস করেছিস—এখন যেখানে সেখানে পড়ে থাকা কি ভীড় ঠেলে গাড়িতে ওঠা, ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ ক'রে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো, বিনা বিছানায় মাঠে পড়ে রাত কাটানো—এসব তো আর হবে না। ঐ গুলোই হ'ল জীবনের আসল ভোগ, শক্তি স্বাস্থ্য ভোগ করা, ঐ সম্পদ ওড়ানো। এখন কি ভোগ করবি—মেয়েমানুষ করতে পারবি? এয়ার-কণ্ডিশনের ঘর তো সহ্য হয় না, বাতের ব্যথা বাড়ে। ফ্রীজের জল খেতে পারিস না, গলায় ব্যথা হয়। সিনেমা দেখতে পারিস না, চোখে লাগে—কি করবি তবে?'

এসবের উত্তর দিতে পারেন না নরেশবাবু, চুপ ক'রে থাকেন।

এই অবস্থাই চলছে, আরও বছরখানেক পরে। নরেশবাবুর এইভাবে হাত-পা গুটিয়ে পঙ্গু হয়ে বসে থাকা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে—ছেলের বন্ধু গোপনে একদিন বহুদিনের রুদ্ধ ঘরে বসন্ত বাতাস এনে দিল। ছেলেটি ভাল,

পাল্‌টি ঘর না হলেও বড়ছেলে আর তাঁর গৃহিণী ওর ঘাড়েই যে বেলাকে চাপানের তালে আছেন, নরেশবাবু তা জানেন। তাঁর উৎসাহও নেই, অনিচ্ছাও নেই। তিনি যখন অক্ষম, এক-পয়সা খরচ করতে পারবেন না, সংসারের এই অবস্থা, তাঁর দেড়শো টাকা পেনসনে তো তাঁরই খরচ চলে না—ছেলে চাকরির ওপর টিউশানী ক'রে সংসার চালাচ্ছে—তখন আর তিনি মত-অমত জানাতে গিয়ে কি করবেন? যা পারে ওরা করুক। ছোটজাত কিছু নয়, ব্রাহ্মণের ছেলে—বৈদিক বামুন এই যা, বি. এ. পাস করে এক বড় মারোয়াড়ীর গদীতে ঢুকেছে। এখনই তাদের প্রিয় হয়ে উঠেছে, ব্যবসা বাণিজ্যের নানা ঘোঁৎ-ঘাঁৎ শেখা হয়ে গেছে—আশা করা যায়, শিগ্‌গিরই নিজে একটা কিছুতে ঢুকে পড়বে, চাকরি বজায় দিয়েই।

গোপেন এসে বলল, 'জ্যাঠাবাবু আপনার তো শুনেছি খুব সাধু-দর্শনের শখ। যাবেন এক জায়গায়? শুনছি খুব বড় সাধু—যা বলেন তাই ফলে যায়।'

তারপর, ওঁর মুখে হর্ষ বিষাদের খেলা লক্ষ্য ক'রে—অতিরিক্ত উৎসাহে চোখ দুটি জ্বলে ওঠবার পরই সেই চোখে সুগভীর দুঃখের ছায়া নামতে দেখে—আসল কথাটাই আগে বলে নিল।—'না না, আপনার এক পয়সা খরচ হবে না। আমাদের বাবুরা যাচ্ছেন। পেল্লায় পেল্লায় দুখানা গাড়ি সঙ্গে। আমার জ্যাঠাবাবু খুব ইন্টারেস্টেড, তাঁর জীবনে বহু সাধু দেখেছেন বলায়, তাঁরাই খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বলছেন, এমন লোককে সঙ্গে নেওয়ায় পুণ্য আছে। তাছাড়া উনি বিস্তর দেখেছেন, আসল সাধু কি নকল সাধু—উনি অনেকটা ধরতে পারবেন।'

'তা সে কোথায়, সে সাধু? কোথায় যেতে হবে আমাদের?' উৎসাহে সোজা হয়ে বসেন নরেশবাবু।

'উড়িষ্যায় কি বিরজাদেবীর মন্দির আছে—সেইখানে নাকি তিনি এসেছেন। এখনও বেশী লোক জানে না, হঠাৎ এসেছেন—এদের এক আত্মীয় দেখে এসেছেন। মন্দিরের বাইরে বসে আছেন এক জায়গায়, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তিনি যে জায়গাটায় বসে আছেন, চার হাত রেডিয়াস নিয়ে —সেখানটা ভিজছে না। এতেই খুব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—জানাজানি হলে ভিড় হতে শুরু হবে, সাধু হয়তো পালাবেন। বাবুরা কাল ভোরেই রওনা হতে চান। যাবেন আপনি?'

সেখো ভাত খাবি ? না, তার পর হাত ধোব কোথায় ?

যাবেন মানে ? গিয়ে বসে আছেন। বললেন, 'সে যদি তুমি বল তো বাবা, আমি আজ রাত থেকেই গিয়ে ওদের ওখানে থাকতে পারি।'

'না না। ছি, তা যাবেন কেন ? ওঁরা গাড়ি এনে এখান থেকে তুলে নেবেন।'

'এই ডামাডোলের বাজার। এ পাড়ায় আসবেন আবার ? তাছাড়া যদি ভুলে যান, কি গাড়িতে আর না ধরে ?' উৎকণ্ঠিত মুখে নরেশবাবু বলেন।

'খুব আসবেন। কথা আছে আমি ভোরে এসে তুলে দেব। আমিই বরং ওঁদের সঙ্গে এখানে চলে আসব। আপনি কিছু ভাববেন না, সাধু দর্শন আপনার হবেই।'

হলও, গোপেনের কল্যাণে। বেঁচে থাক, সুখী হোক, মনে মনে বিস্তর আশীর্বাদ করলেন নরেশবাবু। আর এমন রাজকীয় ভাবে থাকা। বিরাট গাড়ি, সঙ্গে লোকজন, এই চা খাওয়াচ্ছে, এই খাবার খাওয়াচ্ছে। ওদের মালিকের বাবা যাচ্ছেন সঙ্গে, তিনিও একাধিক কুম্ভে ঘুরেছেন—সেই সব গল্প হতে নরেশবাবুর খাতির আরও বেড়ে গেল।

ওঁদের পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, আর সত্যিই গোপেন যা বলেছিল—ইতিমধ্যেই লোক-জানাজানি হয়ে গেছে। বিস্তর ভিড় হতে শুরু হয়েছে। ওঁরা যখন গেলেন তখনও লোকারণ্য। এঁদের শাঁসালো মক্কেল দেখে মন্দিরের পাণ্ডারা বলল, 'আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। কাল ভোরবেলা কেউ ঢোকবার আগে আপনারা গিয়ে দেখা করবেন। আমরা নজর রাখব—আপনারা দেখা ক'রে আসার আগে না কেউ মন্দিরে ঢুকতে পায়। এমনিই তো পুলিশ বসে গেছে—ওদেরই দু'এক টাকা কবলালে ওরা আটক রাখবে।'

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। কিন্তু নরেশবাবু মনে শান্তি পেলেন না। ভোরে তো এরাও যাবে, বড়লোক—সাধুই হোক আর যাই হোক—বড়লোকের দিকেই মন সকলকার। সেখানে কি আর দেড়শো টাকা পেন্‌সন্ পাওয়া বুড়ো কেরানী পাত্তা পাবে ?

অনেক ভাবলেন, অনেক ছটফট করলেন—শেষে রাত দুটো নাগাত ঘরের

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নিঃশব্দে। যে বাড়ি ওঁদের জন্যে ঠিক ছিল, একেবারে মন্দিরের সামনেই। দোর খুলতেই নজরে পড়ল, মন্দিরের বাইরে সেই খোলা জায়গাতে, বিকেলে যেখানে দেখেছেন—সাধু তেমনিই স্থিরভাবে বসে আছেন—এবং জেগে আছেন।

বড় সাধু যে, এতেই প্রমাণ। সেই বিকেল থেকে দেখছেন ঐ এক ভাবে বসে আসেন, হয়তো তার আগে থেকেই আছেন। পাণ্ডারা বলল, খেতেও ওঠেন না—কেউ কিছু খেতে দেখেও নি এই ক'দিন। কেবল একবার রাত তিনটের সময় উঠে স্নান সেরে আসেন।

একটু ইতস্তত করলেন নরেনশবাবু। তারপর দ্রুত সামনের রাস্তা পেরিয়ে কেউ দেখার কি বাধা দেবার আগেই পায়ে গিয়ে পড়লেন সাধুর। এবং বহুক্ষণের চেপে থাকা আবেগে সংশয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেঁদেই ফেললেন।

'বাবা আমার বড় কষ্ট।'

সাধুটি গেরুয়াধারী নন, সাদা কাপড়ই বহির্বাসের মতো ক'রে পরা। লম্বা লম্বা চুল, বড় বড় গোঁফ-দাড়ি—কাঁচা-পাকায় মিশনো। বয়স নির্ণয় করা শক্ত। মনে হল বাঙালী শরীর, কারণ বাংলা কথা বেশ বলতে পারেন। অবশ্য যথার্থ সাধু যে—তার কোন ভাষাই বলতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

সাধু ওঁর কান্নায় বিচলিত হলেন না। বৃথা সান্ত্বনা দেবারও চেষ্টা করলেন না। খুব ধীর শান্ত ভাবে বললেন, 'তুমি কি চাও বাবা? অর্থ না পরমার্থ?'

'আজ্ঞে অর্থ। পরমার্থর ব্যাপার অনেক দেখলুম। এই পরমার্থর সন্ধান করতে গিয়ে ইহকালের দিকে একেবারেই নজর দিতে পারি নি। জীবনটা ভোগ করাই হ'ল না। যে ক'টা দিন বাঁচি—একটু ভোগ করতে চাই।'

হাসলেন সাধুবাবা। বললেন, 'বাবা, ভোগ টাকায় হয় না, ভোগ যে করবে তার সে শক্তি থাকা চাই। বুড়ো বয়সে পঞ্চাশ রকম রোগে ধরেছে—কী ভোগ করবে বাবা? প্রধান ভোগ পুরুষের হল—খাওয়া-পরা, উত্তম স্ত্রীলোক, সব ক'টার জন্যেই অল্প বয়স চাই। বরং টাকা না থাকলেও চলে।...তা বেশ, আমি তোমাকে দুটোই অফার দিচ্ছি। টাকা চাও তো এক লাখ টাকা পাবে, কোথা থেকে পাবে সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

আর না হলে ত্রিশবছর বয়স কমিয়ে দিতে পারি, মানে সেই রকম স্বাস্থ্য-যৌবন সব পাবে। কোনটা চাও ভেবে দেখে কাল ঠিক এমনি সময় আমাকে ব'লো। তারপর কি করতে হবে আমি বলে দেব। এখন যাও।'

এই বলে তিনি উঠে পড়লেন, বোধহয় স্নান করতেই যাবেন এবার।

মানসিক একটা স্তম্ভিত অবস্থায় বাসায় নিজের শয্যায় ফিরে এলেন নরেশবাবু। ইংরেজীতে যাকে 'ডেজ্‌ড্‌' অবস্থা বলে সেই রকম।

কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না। কি করবেন, হাসবেন না কাঁদবেন না ডিগবাজী খাবেন—কিছুই বুঝতে পারছেন না।

যা শুনে এলেন এই মাত্র, সত্যি? পারবেন ঐ সাধু দিতে—যা চাইবেন নরেশবাবু? না তামাশা করলেন? বোকা বানালেন? ওঁর নির্বন্ধাতিশয্য দেখে আপাতত এড়াবার জন্যে স্তোক দিলেন?

তবে সাধু সত্যিই উঁচু দরের, তাতে সন্দেহ নেই। ভণ্ডদের মতো আড়ম্বর নেই, শান্ত সমাহিত ভাব। ধীরে কথা বলেন, কিছুতেই উত্তেজিত হন না। খান না কিছু, পাণ্ডারাই তো বলেন। প্রসাদ দিতে এলেও নাকি কণামাত্র তুলে মুখে দেন। অন্য সময় যে লুকিয়ে খাবেন, তারও তো জো নেই। এই খোলা জায়গায়, অসংখ্য লোক চারিদিকে। ঠায় যে বসে আছেন ক'দিন এক ভাবে, এই তো আশ্চর্য ব্যাপার। যোগ-শক্তি না থাকলে সম্ভব হয় না।

আর ওঁকে বোকা বানিয়ে যে কিছু আদায় ক'রে নেবে তাও নয়। ওঁর অবস্থা তো দেখছেই—অত্যভক্ষো ধনুর্গুণোঃ। ভণ্ড সাধু হলে ধূর্ত হবে, তারা এক নজরে মক্কেলের ভক্তদের অবস্থা বুঝে নেয়।

না, সাধু ঠিকই। ওঁরা পারেন সব। ইচ্ছে করলেই পারেন। দিনকে রাত করতে পারেন। টাকাটা তো কিছুই নয়, কোন একজন ভক্তকে হুকুম করলেই সে দিয়ে দেবে, কিংবা লটারীর প্রাইজ পাইয়ে দেবেন। তিরিশ বছর বয়স কমিয়ে দেওয়াও ওঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না। কত কি গাছ-গাছড়া আছে ওঁদের কাছে, কত ওষুধপত্র জানেন।

যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া আর এমন কি কঠিন কাজ!

এখন কথা হচ্ছে—নরেশবাবু কি চাইবেন, টাকা?

একলাখ টাকা?

কিন্তু, ঐ যা সেই বলাইদা বলেছিলেন, এই বয়সে টাকা নিয়ে কি করবেন? ভাল বাড়ি একখানা করতে পারেন, এই পর্যন্ত। একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা? সে ছেলেমেয়েদের সুবিধা হতে পারে, তাদের বয়স কম। বুড়ো-বুড়ির তো হজমই হয় না কিছু। রাত্রে একখানা রুটি খান, কোনদিন লোভে দেড়খানা খেলেই পেট ভুটভাট করে। চিংড়িমাছ ভালবাসেন—সে একেবারে সহ্য হয় না। মিষ্টি খাওয়া বারণ, বাতের জন্যে লুচি-পরোটা খাওয়ার উপায়ও নেই। আর কি ভোগ? কাপড় জামা পোশাক? এই বয়সে টেরিলিনের কাটা পোশাক করাবেন? তাতেই বা কি, কোথায় পরে যাবেন, বেরুনোই তো বন্ধ। গিন্নীকে দেবেন? তাঁরও বয়স হয়েছে—রঙীন শাড়িই পরা ছেড়ে দিয়েছেন। বেনারসী কী উপভোগ করবেন তিনি?

শাড়ি কিনে দিলেও পরা হবে না কোন দিন।

সত্যি, কিই বা ভোগ করবেন। স্ত্রীর অম্বলের ব্যারাম, বাত, ইদানিং প্রেসার হয়েছে। ওঁরও বাত আছে তার ওপর সর্দির ধাত হয়ে গেছে, কথায় কথায় ঠাণ্ডা লেগে যায়, গলাভাঙা কাশি লেগেই আছে। যে জন্যে সিনেমা যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল। ঠাণ্ডা ঘরে বসতে হয় বলে। বাত তো এমন কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে—এই বেশ ভাল আছেন, সহজ সুস্থ মানুষ—হঠাৎ হাঁটু ফুলে উঠল কি পায়ের গাঁট—চলনশক্তি রহিত হয়ে গেলেন। টাকা পেলে, বাইরে ঘুরবেন? এই তো অবস্থা, একটু চলাফেরা করলেই তো হাঁপাতে হয়, পা ঠক ঠক ক'রে কাঁপে।

আর ঘুরেই বা কি হবে? সাধু দেখা? এই তো এত সাধু দেখলেন—মনের কি উন্নতি হল? এই তো আজই এত বড় সাধুর দেখা পেলেন—কই, পরমার্থ-মোক্ষ এসব তো চাইতে পারলেন না। এতদিনের এত সাধু খোঁজা সবই তো ব্যর্থ হ'ল। সেই তো কামনা আর সম্ভোগের বরই চাইলেন।

এমনি ঘুরে বেড়াবেন? দেশ-ভ্রমণ?

সে রং আর চোখে নেই। শক্তিও নেই। মনে হয় ঐ যে সব ছবি দেখেছেন, ঐ তো ভাল। একবার চো'খ দেখলেই বা কি চারটে হাত বেরোবে? আর দেখবেনই বা কি ক'রে? পয়সা হলে ফার্স্ট-ক্লাসে বা এ. সি. ক্লাসেও যেতে পারেন—কিন্তু কিছুটা তো ঘুরতে হবে পায়ের জোরে।

ওপর-নিচে তো করতেই হবে। আজ থেকে দশবছর আগেই আগ্রাফোর্ট দেখে এসে পায়ের ব্যথায় এক দিন উঠতে পারেন নি।

মান সম্মান বাড়বে অবিশ্যি, টাকা হলে। আত্মীয়রা সমীহ করবে। প্রতিবেশীরা সম্ভ্রমের চোখে দেখবে। তেমনি ধারও চাইবে। কেউ ধার, কেউ সাহায্য। কার ছেলের লেখাপড়া হচ্ছে না, কার মেয়ের বিয়ে—দাও টাকা। না দিলেই তুমি মহা বদলোক হয়ে গেলে। এ উনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন। ওঁদের আপিসের উমেশবাবু একবার একটা লটারীতে—বোধহয় রেঞ্জার্সের থার্ড প্রাইজ একটা—আট হাজার কত টাকা পেয়েছিলেন। ওঃ সে কি কাণ্ড, আত্মীয়-স্বজনরা এসে খুবলে খায় আর কি। পাড়ার যত বারোয়ারী কেউ একশো টাকার কম চাঁদা নেবে না, ক্লাবরা সব হাজার টাকা ক'রে ডোনেশন চায়। আপিসেই বকশিশ দিতে আর খাবার খাওয়াতে ভদ্রলোকের বোধহয় পাঁচশো টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর সবাই ধার চায়। তার ওপর কথায় কথায় বলে, 'অত টাকা নিয়ে কি করবে বাবা? যখ্ দিয়ে যাবে?' যা চাহিদা—হিসেব ক'রে দেখেছিলেন উমেশবাবু—আট-লাখ টাকা হলে কোন মতে ঠেকানো যেত!

তা এই তো ব্যাপার।

খাওয়া-পরা ভোগ-বিলাস কোনটাই আর সইবে না। দু পাঁচটা মেয়ে-মানুষ ভোগ করবেন—সে বয়স বা ক্ষমতা নেই। থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখতে পারেন না। ভ্রমণ করা? সেও তো দেখা যাচ্ছে কষ্টকর। লোক সঙ্গে না নিয়ে বেরনো যাবে না—তাও সব ঘুরে দেখতে পারবেন না। ফিলিম কোম্পানী করবেন? পাঁচ বেটায় ঠকিয়ে খাবে, ওসব ওঁর জানা আছে, ভাগাড়ে গরু পড়ার মতো শকুনের দল এসে জুটবে। অন্য ব্যবসা? টাকা বাড়িয়ে লাভ কি, এই লাখ টাকাই যখন খরচ করতে পারছেন না!

না—টাকায় কোন সুখ নেই। তার চেয়ে যৌবন ফিরে পাওয়া ঢের ভাল।

প্রথম বয়সের সেই স্বাস্থ্য আর শক্তি যদি ফিরে পান, দুঃখের মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যেও জীবনটা ঢের বেশী উপভোগ করতে পারবেন।

সেই ভাল। তা-ই চাইবেন কাল গিয়ে।

উত্তেজনায় আর একবার উঠে বসলেন।

সত্যি, টাকার কথাটা মাথায় গেলই বা কেন?

আসল সুখ স্বাস্থ্য আর যৌবন—এ তো সেই ছেলেবেলা থেকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বইতে পড়ে আসছেন। 'স্বাস্থ্যই সুখের মূল।'

বয়স থাকতে থাকতে, দেহে শক্তি থাকতে থাকতে, যা খুশী ক'রে নাও। তীর্থ-ধর্ম বলো, দেশ বেড়ানো বলো—সবই অল্পবয়সের কাজ, দেহে শক্তি থাকতে থাকতে ক'রে নেওয়া দরকার। সেটা এখন, এই বয়সে পৌঁছে, হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

স্বাস্থ্যই সম্পদ।

ত্রিশ বছর বয়স কমে যাবে মানে—বত্রিশ বছর বয়সের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবেন। ওঃ, তাহলে তাঁকে পায় কে। কী দিনই গিয়েছে সে সব! বিয়ে-থা করেন নি, কোন পিছটান ছিল না, কোথায় কুম্ভমেলা, কোথায় কোন তীর্থে কে সাধু এসেছেন, বক্রেশ্বরে কোন অঘোরীবাবা, সীতাকুণ্ডে ফলাহারী বাবা—ব্যস, কানে গেলেই হল, ড্যাং ড্যাং ক'রে গাড়ীতে চড়ে বসলেন একেবারে। কোন দুর্ভাবনা নেই, সংসারের চিন্তা নেই। আপিসে ছুটি পাওনা না থাকে—না হয় মাইনে কাটবে বেটারা। খরচের জন্যেও ভাবনা ছিল না। কোনমতে ট্রেন-ভাড়াটা যোগাড় হলেই হল। তাও এখনকার মত গাড়িতে উঠেই শোবার জায়গা খুঁজতে হত না। সারারাত দাঁড়িয়ে চলে গেছেন হাসিমুখে, টেনেটুনে হয় তো বসা চলে—তবু বসেন নি। খাওয়ার জন্যও পরোয়া ছিল না, দুপয়সার ছোলাভাজা খেয়েই কাটিয়েছেন একটা দিন।

ওঃ সত্যি, সে এক দিনই গিয়েছে। সেই সময়ই বেঁচে ছিলেন তিনি প্রকৃত পক্ষে। এখন তো মরে বেঁচে আছেন। একে কি বাঁচা বলে! ছোঃ!

অল্প বয়সে উপভোগের উপকরণের জন্যে ভাবতে হয় না, নিজের যৌবনই সে উপকরণ যোগায়।

এখনও, বয়সটা কমে গেলে—আর একবার দেখবেন জীবনটাকে নেড়ে চেড়ে—এখন তো অভিজ্ঞতা বেড়ে গেছে, যা-তা করে উড়িয়ে দেবেন না জীবনটা, বেছে বেছে চেখে চেখে উপভোগ করবেন বাকী পরমায়ুটা।

কিন্তু, তাই কি?...

কী করতে পারেন আর?

ঘুরে বেড়াবেন ? নিদেন গাড়ি ভাড়াটা চাই তো। আগেকার ট্রেনের ভাড়া আর নেই। এককালে পুজো কনসেশ্যনে ষোল টাকায় দিল্লী যাতায়াত করেছেন। এখন এক পিঠেই তার ডবলের বেশী লাগে। সংসারের যা অবস্থা, দিন দিনই খরচ বেড়ে যাচ্ছে, আয় বাড়ছে না। কোনমতে ডাল ভাত একটা তরকারী—এইতে তো এসে ঠেকেছে, ভাত বলাও ভুল, ডাল-রুটিই বেশির ভাগ—বড়জোর তার সঙ্গে একটু আলুভাতে কি আলুভাজা। বেগুন পটল ভাজতে তেল বেশী লাগে বলে ওগুলো উৎসব-দিনের মতো কদাচ কখনোও ভাজা হয়। মাছ রবিবারে আসে শুধু, অন্যদিন কুচো-চিংড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু সস্তার কুচো মাছ পেলে—তাও মৌরলায় হাত দেবার উপায় নেই, পোনামাছের সমান দর—তবেই আঁশমুখ হয়। এটুকুও আর পেরে উঠছে না ছেলে, মাসের শেষে তার মুখ শুকিয়ে যায়।

খরচ সব দিক দিয়েই বেড়েছে।

ট্রেন-ভাড়া না হয় যোগাড় হ'ল, ধরেই নিলেন তিনি—তারপর ? স্টেশনে ছোলা-সেদ্ধ বিক্রি হয়, এক-গালে দেবার মতো—তাই দশ নয়াপয়সা। গোটা পাঁচ-ছয় চিনেবাদাম গাঁজার কলকের মতো ক'রে কাগজে পাকিয়ে ফিরি করে—দশ পয়সা। পয়সার নাকি দাম নেই আজকাল, কৈ, রোজগার করার সময় তো সহজে পাওয়া যায় না। মাসে তিনশো টাকা আনতে ছেলেকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কালঘাম ছুটে যায় একেবারে।

না, দেশ বেড়াতে গেলে এখন অর্থবলও চাই। লোকবলও চাই।

তবে আর কি ভোগ করবেন ?

পয়সা না হলে খাওয়া-পরার মানও বাড়ানো যাবে না। সে আরও ছটফটানি, এখন কিছু হজম হয় না, চুপ করে বসে থাকেন, সে একরকম। যৌবন ফিরে পেলে ক্ষিদেও বাড়বে, প্রচণ্ড ক্ষিদে—খাবেন কি ? যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনকালের মতো জিনিসের দাম বা সামাজিক অবস্থাও ফিরবে না তো। ট্রেনে চড়ার আগে রিজার্ভেশনের জন্যে ছুটোছুটি করতে হয় থার্ডক্লাসেও—দশদিন আগে দিন ঠিক করো, রোদে জলে গিয়ে কিউ দাও—তারপর যদি কোন অঘটন ঘটল, শেষ মুহূর্তে যাওয়া না হল, তো খেসারৎ দাও খানিকটা টাকা। আগে এসব কেউ ভাবত না। স্টেশনে যাও, টিকিট কেনো, গাড়িতে চড়। বরাত ভাল থাকে তো শুয়ে যাবে—মেলার সময়

হলে শুতে পাবে না, হয়তো বসে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। তবু ওঠা যেত, এখন আন-রিজার্ভড্ একটিই বগি থাকে এক একটা ট্রেনে, সেখানে কোন মতেই ওঠা যায় না, অন্তত ওঁরা পারেন না।

তাহলে আর জীবন উপভোগের কি থাকল?

নতুন ক'রে খেলা-ধুলো শিখে নাম করবেন? সে সম্ভব নয়। ত্রিশ নয় পঞ্চাশ বছর কমলে চেষ্টা করে দেখা যেত।

ফিল্মে নামবেন—সে চেহারা নেই।

তবে?

স্ত্রীসম্ভোগ?

বৃদ্ধা স্ত্রী বেঁচে, আর একটা বিয়েও করতে পারবেন না। সে ইচ্ছেও নেই। বেচারী অনেক কষ্ট পেয়েছে তাঁর হাতে পড়ে, এখনও পাচ্ছে। তাতেও কখনও কোন বিদ্রোহ করে নি—একটু-আধটু অভাবের মুখে বকাবকি, সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ভালই বাসে তাঁকে, ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা করে। সংসারটা এখনও মাথায় ক'রে রেখেছে। না না, বিয়ে যদি করতেই হয় এই রকম স্ত্রীই কাম্য। ভগবান অনেক বঞ্চিত করেছেন জীবনে, স্ত্রী সম্বন্ধে করেন নি অন্তত। কোন অভিযোগ নেই তাঁর এ সম্বন্ধে।

সুতরাং ওদিকটা তো চুকে গেল। আর কি করতে পারেন—একটু-আধটু প্রণয়? হ্যাঁ—সেটা করা যায় অনায়াসে। আজকাল যেমন সহজলভ্য হয়েছে—ঘরে বসে বসে কতই তো দেখেন, পাড়াঘরে সব বেলেল্লাগিরি—বলে, 'উঁচু দেখে বেঁধেছি টং বসে বসে দেখছি রং'—তা, তাঁরও হয়েছে তাই; মেয়েগুলোর বাছ-বিচারও নেই, পছন্দও নেই, হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই ধরে, প্রেম করতে হবে বলেই করা—ইচ্ছে করলে, বয়স কমে গেলে, তিনিও আধডজন মেয়ে জোটাতে পারবেন নিদেন পক্ষে।

কিন্তু—

তাঁর বয়স কমলেও ছেলে মেয়ের কমবে না তো—ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে দিলেই হয়, সংসারের এই অনটনের জন্যেই দেওয়া চলছে না, মেয়ে বি. এ. পাস করে একটা কিছু রোজগার ধরলে একটু সচ্ছল হতে পারে—তাও গোপনে ছোকরা বা লেগেছে, কোনদিন ছোঁ-মেরে নিয়ে চলে যাবে—

এত বড় ধেড়ে যুবতী মেয়ে ঘরে থাকতে তিনি যদি পাড়াঘরে প্রেম ক'রে বেড়ান, তারা কি মনে করবে? মুখ দেখাতে পারবে না যে, বাবা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করবে তাদের।

না না, ছিঃ। তা হয় না।

খাওয়া-পরায় একটু ভোগ করতে গেলেই টাকা চাই। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা চলবে না—তবে?

যৌবন এবং টাকা ছুটোই চাই জীবনটা ভোগ করতে গেলে। ছুটোর একটা পেলে হয় না কিছু।

মহা ধড়িবাজ লোকটা। বলে, হয় ওটা, না হয় এটা। কেন রে বাপু, পঞ্চাশ-হাজার টাকা আর পনেরো বছর বয়স কম—এই রকম একটা আধা-আধি রফা করলে কি হয়? পনেরো বছর পিছিয়ে গেলে সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছর বয়স হত, তখনও যা স্বাস্থ্য ছিল, একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে, একা ঘুরে বেড়াতে পারতেন। একটা টেরিলিন না কি বলে ছাই, তারই কাটা-পোশাক করিয়ে, চাই কি বিদেশে গিয়ে কোন ভাল হোটেলে উঠলে, একটু-আধটু এদিক-ওদিক করা যাকে বলে, তাও চালাতে পারতেন। সব দিক বজায় থাকত তাহলে, একটা সামঞ্জস্য করা চলত।

তা-ই বলবেন নাকি লোকটাকে? মানে ঐ সাধুকে?

কিন্তু যা অল্প কথা বলে, এক কথায় টপ ক'রে বলে দিল—ও যে কথার নড়-চড় করবে মনে হয় না। হয়তো অনেক ভেবে-চিন্তেই বলেছে, উনি এই রকম অসুবিধেয় পড়বেন জেনেই—।

ভোরে সকলে উঠে যখন দর্শন করতে গেল, নরেশবাবু দূর থেকে লোক-দেখানো একটা প্রণাম করে চলে এলেন শুধু। কথা হল সেদিনটা ওঁরা থাকবেন, সুতরাং, ওঁর রাত ছুটোয় উঠে যাওয়ার কোন অসুবিধা রইল না।

সবই ঠিক—কিন্তু গিয়ে কি চাইবেন উনি? কোন্‌টা বেছে নেবেন?

আগের রাতে সারারাত ঘুম হয় নি, সারাদিনও ঘুমোলেন না—ছট ফট ক'রে বেড়ালেন সারাটা দিন—সেদিনও সন্ধ্যা থেকে একটু ঘুমোতে পারলেন না।

কিন্তু এত চিন্তা করেও মীমাংসায় পৌছনো গেল না। রাত ছুটো

বাজল। আড়াইটে, সাধু স্নানে চলে গেলেন—ক্রমে ভোর হয়ে গেল—নরেশবাবুর মনও ঠিক হল না, সাধুর কাছে গিয়ে কিছু চাওয়াও হল না।

ভোরে রওনা দেবার আগে এঁরা গিয়ে যখন প্রণাম করলেন, নরেশবাবুও সঙ্গে গেলেন এই মাত্র, দূর থেকে একটা নমস্কার সেরে চলে এলেন। কেবল, কেমন যেন মনে হল ওঁর—মনের ভুলও হতে পারে—ওঁর সঙ্গে চোখোচোখি হবার সময় সাধুর প্রশান্ত দৃষ্টিতে একটু বিদ্রূপের আভাস খেলে গেল। কে জানে! হতেও পারে! মহা বদ লোকটা। ইচ্ছে ক'রেই ওঁকে এত কষ্ট দিল নিশ্চয়!—

কাকতালীয়?

এ সব কাহিনী কোন দিনই ভরসা করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারতুম না—যদি না আমাদের মণ্টুদা, পরম শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় মহাশয় তাঁর অঘটন কাহিনীগুলি অমন অকুতোভয়ে আমাদের পরিবেশন করতেন। তাঁর 'অঘটন আজো ঘটে' বা 'অঘটনের ঘন ঘটা'—(আরও অনেক বই ইতিমধ্যে তিনি লিখেছেন, কতক ছাপা হয়েছে কতক হচ্ছে) প্রভৃতি বইগুলি জনপ্রিয় হতে, আরো অনেকে ভরসা ক'রে এই পথে নেমে পড়েছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় তরুণ বন্ধু তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীও তার মধ্যে একজন।

অবশ্য আমার এ কাহিনীগুলি অঘটনের মতো যথেষ্ট নাটকীয় নয়। অঘটন বলে আমি দাবীও করছি না। আদৌ কোন দৈব শক্তির প্রকাশ বা মিরাকল তাও জানি না। হয়ত নিতান্তই কাকতালীয় হতে পারে। কি, সেটা যদি কোন পাঠক ধৈর্য ধরে পড়েন তিনিই বিচার করবেন।

তবে এইটুকু বলতে পারি—ঠিক যা ঘটেছিল, যেমন যেমন—ঠিক তেমনি-ভাবেই লেখার চেষ্টা করব, যতটা মনে আছে। স্মৃতিতে যাদ কিছু ত্রুটি থাকে তো নাচার—তবে ইচ্ছাকৃত রঙ ফলাবার চেষ্টা এর মধ্যে থাকবে না। এসব ঘটনার যাঁরা সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের অনেকে এখনও বেঁচে আছেন, রঙ ফলালে যদি তাঁদের চোখে পড়ে—তাঁরাই তো চেপে ধরবেন। বলবেন, গাঁজায় দম দিচ্ছ নাকি আজকাল?

প্রথম শুরু করা যাক আমার বাল্যকাল থেকেই।

১৯২০ সাল সেটা, তখন আমরা কাশীতে থাকি। লক্ষ্মী কুণ্ডুর যে বাড়িতে আমরা থাকতুম—নারায়ণবাবুর বাড়ি—সে অংশটা ডাক্তার বামনদাস-বাবু কিনেছেন এখন। আমরা থাকতুম তিন তলায়, নিচের দোতলায় আর এক ভদ্রলোকেরা থাকতেন—এ বাড়ি ও পাশের বাড়ির দোতলা নিয়ে। ফ্ল্যাটের মতোই বাড়িগুলো ছিল, সিঁড়ির দিকের দরজা খুললে অনায়াসেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি করা যায়।

সেটা একটা দুপুর। মায়ের সঙ্গে তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, একটি কালো-মতো পনেরো-ষোল বছরের হিন্দুস্থানী ছেলে, হাঁটুর কাছাকাছি কাপড় পরা—গায়ে ছাপা বৃন্দাবনী চাদর—রাস্তায় এসে দাঁড়াল আমাদের বারান্দার নিচে। ওপরে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'মা একটি ফল ভিক্ষা দেবেন?' ওর কথাবার্তায় মা একটু সন্দিগ্ধ হলেন, বললেন, 'ফল বাবা আজ কিছু নেই'। 'কিছু নেই?' একটু জোর দিয়েই বলল ছেলেটা, 'আমি বাবা বদ্রিনাথের পাণ্ডার ছেলে, মানসিক আছে পাঁচটি ফল ভিক্ষা ক'রে নিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পুজো দেব।' তখন মা স্বভাবতই একটু বিচলিত হলেন—বললেন, 'ফল সত্যিই কিছু নেই, এক হরিতুকী আছে।' 'সে তো খুব ভাল মা, হর্তুকী তো শ্রেষ্ঠ ফল। তাই দিন।' তখন মা সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন, 'ঐখান দিয়ে উঠে এসে নিয়ে যাও, আমি নামতে পারব না।'

ছেলেটা কিন্তু তখনই নড়ল না। সেইখান থেকেই মার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর তিনটি ছেলের সম্বন্ধে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী করল। একটি আমার বড়দা সম্বন্ধে, তিন দিনের মেয়াদ, আর একটি মেজদা সম্বন্ধে পনেরো দিন পরের কথা—আমার সম্বন্ধে যেটা সেটা দূর ভবিষ্যতের। মা বিশ্বাস করলেন না এসব, ঐটুকু ছেলের মুখে এ ধরনের কথা শুনলে বাজে কথা বলেই মনে হয়—যদিচ, মার ঠিক তিনটি ছেলে এটা তার জানবার কথা নয় কোনমতেই, একথাটা ভাবা উচিত ছিল, তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বাবা হয়েছে, তোমাকে আর পণ্ডিতি করতে হবে না, তুমি এসে এটা নিয়ে যাও।'

এইসব কথাবার্তা যখন হচ্ছে নিচেরতলায় মুখুজ্জে মশাইরা নিশ্চয় শুনে থাকবেন, তাঁদের যিনি ছোট বৌ, আমরা ছোট কাকীমা বলতুম, তিনি কৌতূহলী হয়ে দরজা খুলে সিঁড়ির মুখটায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটা উঠতে

উঠতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার স্বামীর কাল যে ব্যথা ধরেছিল ওটা আর ভাল হবে না, ঐতেই মারা যাবে।'

কাকীমা তো চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। সকলে হৈ হৈ ক'রে তেড়ে এল ছেলেটাকে, বিস্তর তিরস্কার করল, আমার মাও খুব বকলেন। ছেলেটা চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে কোনমতে হর্তুকীটা নিয়ে নেমে গেল তাড়াতাড়ি।

আর কোন দিনই তার দেখা পাইনি, বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেছে সবাই—বিশেষ কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তার।

সকলেই কাকীমাকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন, 'ঐ একটা ডেঁপো ছেলে কি বলে গেল তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' কিন্তু কাকীমা কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেলেন না। আসলে আগের দিনই রাত্রে বিষ্টু কাকার পেটে একটু ব্যথা ধরে, দাদা বুড়োমানুষ ঘুমোচ্ছেন বলে তিনি ডাকতে দেন নি, কাকীমাকে বলেছেন, হ্যারিকেনের ওপর কাপড় গরম ক'রে একটু সেঁক দিতে। অল্প পরেই ভাল হয়ে গিয়েছেন। আর সেই জন্তেই কথাটা তাঁদের কারও মনে ছিল না, কাউকে বলেনও নি। কাকীমার বক্তব্য 'কেউ সে কথা জানে না, ও ছেলেটা জানল কি ক'রে? তোমরা বলছ বাজে, আমি বলছি স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ এসেছিলেন।'

অবশ্য, তার মাস দুই পরে বিষ্টু কাকার আবার ব্যথা ধরল। তার দিন পনেরো পরে আবার। তার পর ঘন ঘন। কী সাব্যস্ত হয়েছিল তা আর মনে নেই আমার, তবে বছরখানেক পরে, কি বছর দেড়েক, তিনি মারা গেলেন এটা মনে আছে। আমাদের সম্বন্ধেও যা যা বলেছিল ছেলেটি—অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। তাতেই সকলের টনক নড়েছিল, খোঁজাও হয়েছিল, কিন্তু এই জনসমুদ্রে অপরিচিত সাধারণ চেহারার কালোপানা একটা হিন্দুস্থানী ছেলেকে কে খুঁজে বার করবে!

কেউ কেউ বললে 'হনুমান চরিত্র জানত ছেলেটা, ওরা মুখ দেখে বলতে পারে।' কিন্তু ঐটুকু ছেলে হনুমান চরিত্র শিখল কি ক'রে, তা কেউ ভাল রকম বোঝাতে পারল না। কেবল ছোট কাকীমাই বার বার বলতে লাগলেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না—ও সাক্ষাৎ বাবা বিশ্বনাথ।'

এর পর যা বলছি, তাও ছেলেবেলার ঘটনা। অকুস্থল বৃন্দাবন।

সেও ১৯২৩ সালের কথা। গরমকাল, আমরা বৃন্দাবনে থাকি গোবিন্দ

মন্দিরের কাছাকাছি একটা কুঞ্জে। তখন পিচের রাস্তা হয় নি, পাথরের বড় বড় গোল গোল নুড়ি দিয়ে বেশীর ভাগ রাস্তা বাঁধানো—কেবল গোবিন্দ মন্দিরের সামনের রাস্তাটা চুন সুরকী দিয়ে পাকা করা—যতদূর মনে পড়ছে। রাস্তায় আলোও নেই, কেরোসিনের আলোর ব্যবস্থা আছে, বেশির ভাগই জ্বলে না, কারণ সহজেই অনুমেয়। 'আগেও যেমন, পিছেও তেমন, মিছে মোরা করি গোল, চিরদিনই সেই একই লীলা গো, অনন্ত কলরোল।' কবির ভাষা স্মরণ করুন।

সে সময় গরমের দিনে, ঝারার পর ঠাকুরের ফুলকামরা করার রেওয়াজ ছিল, হয়ত এখনও আছে, অর্থাৎ ফুলের—বেল জুঁই চামেলির—পালকী কি চতুর্দোলা কি ঘর কিম্বা ময়ূর ইত্যাদি ক'রে তার মধ্যে ঠাকুরকে বসানো হয়, অথবা তাঁকে ঘিরেই সেগুলো তৈরী হয়। এসব করতে দেরি লাগে, শুধু গোবিন্দ প্রভৃতি ঠাকুররা সকাল সকাল আহার শেষ ক'রে শুয়ে পড়েন। সুতরাং যেমন তেমন ক'রেই হোক তাড়া করতে হয়। পুরনো শহরের দুই বিখ্যাত বিগ্রহ বঙ্কুবিহারী ও রাধাবল্লভ—এঁরা প্রধানত ব্রজবাসীদের ঠাকুর—বাঙালী পূজারী-দের মতো ওদের তাড়া নেই। সুতরাং এঁদের দর্শন পেতে বহু বিলম্ব হয়। 'রাধাবল্লভ দর্শন দুর্লভ' এ তো কথাই ছিল।

আমরা থাকতুম নতুন শহরে, গোবিন্দ মন্দির ও লালাবাবুর মন্দিরের মাঝামাঝি। লালাবাবুর মন্দির থেকে যে পথ এসে বিল্বমঙ্গলের সমাধিতে পড়েছে, সেই পথে। সেখান থেকে পুরনো শহর বহু দূর, সুতরাং অত রাত্রের দর্শন সেরে এ পাড়ায় আসা দুরূহ ব্যাপার ছিল তখন। বলা প্রয়োজন—সাইকেলরিক্সা হয় নি তখন, ওপথে কোন যানবাহনই যেত না।

তবু বাঁকেবেহারী প্রধান দর্শন একটা ওঁর ফুল-কামরাও খুব ভাল হয় কদিনই শুনেছি। সুতরাং একদিন তো যাওয়া দরকারই। গেলুম একদিন মরি-বাঁচি করে। দর্শন খুলতে খুলতে রাত এগোরাটা বেজে গেল। দেখে বেরিয়ে আসতে সাড়ে এগারোটারও বেশী।

অন্ধকার রাত, তায় 'উপলব্যথিতগতি'—মানে গোল বড় বড় পাথরের নুড়ি বসিয়ে জোড়া গুলোয় চুনবালি লাগানো হয়েছে। এবড়োখেবড়ো অথচ ওপরগুলো অত্যধিক মসৃণ এবং গোল। হরিদ্বারে যেমন জলে ভেসে আসা পাথরের বড় নুড়ি পাওয়া যায়—এক-একটা পনেরো সের থেকে আধমণ—

তেমনিই। সুতরাং পদে পদেই হোঁচট খেতে হচ্ছে, পা যাচ্ছে মচকে। আমরা আবার সেকালে ফিতে বাঁধা শু জুতো পরতুম কাপড়ের সঙ্গে, ও-ই অদ্বিতীয়। তাতে আরও পা হড়কে যাচ্ছে।

এইভাবে বার কতক হবার পর মা অর্ধকৌতুক-ছলে বললেন, 'বাবা বাঁকেবেহারে, তোমাকে দর্শন করতে এসেই তো আমাদের এই দুর্দশা. তা তুমি আমাদের একটু আলো দেখাতে পারছ না? এখন যদি এটুকুও না করো, পরলোকে যা পার করবে তা খুব বুঝছি!'

কথাগুলো শুধু বলা হয়েছে এই মাত্র—পাশের বাড়ির দরজা খুলে একটি উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে, কিম্বা হয়ত আর একটু বেশীও হতে পারে, কে আর অত কাছে গিয়ে দেখেছে—এক হাতে লাঠি আর এক হাতে লামটেন অর্থাৎ হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে বেরোল। ব্রজবাসী ছেলেদের মতোই বেশ-ভূষা, রঙ কালো। লাঠি না নিয়ে তখন কোন পুরুষও দেশে রাত্রে বেরোত না।

ছেলেটি বেরিয়ে ঠিক আমাদের আগে আগে চলতে লাগল। চার হাত আন্দাজ আগে—আর চলনটাও আমাদের গতিতেই, আস্তে আস্তে। তখন অত লক্ষ্য করি নি, আলোটা পেয়ে সুবিধে হয়েছে এটা অনুভব করছি, তার চেয়ে বেশী কিছু ভাবার আছে এর মধ্যে তা বুঝি নি। ছেলেটা বরাবর সেই-ভাবে আমাদের আগে আগে এল। রেঠিয়াবাজারে পড়ে আমাদের আলোর দরকার রইলো না! দোকানদাররা তখনও মশালের মতো তেলের আলো জ্বেলে হিসেবপত্র করছে, খাবারের দোকানে ভিয়েন হচ্ছে। ওখান দিয়ে এসে গোপীনাথের ঘেরায় পড়ে আমাদের বাড়ির পথ—সার সার বহু দোকান। কানাই হালুয়াই তো বোধ হয় রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত খুলে রাখে—এখানে পথও ভাল, দেখাও যাচ্ছে। ঠিক রেঠিয়াবাজারে পড়ার মুখে সেই ছেলেটা আর একটা বাড়ির দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে গেল।

এইবার আমাদের চমক লাগল! ঠিক প্রয়োজনের সময়টুকু কাছে কাছে রইল, অন্ধকার ফুরোতেই চলে গেল! তার চেয়েও বড় কথা, তখন বৃন্দাবনে অসম্ভব চোরের ভয়—গৃহস্থ দেখতে পাচ্ছে চোর তার বাড়ি ঢোকার চেষ্টা করছে, একটু গলার আওয়াজ দিতেই চলে গেল—এ অভিজ্ঞতা তখন বৃন্দাবনে আদৌ বিরল নয়। বিশেষ যে সময়টা এমন হয়েছে, সব গৃহস্থ

বাড়িতেই একজন ক'রে পালা ক'রে জেগে থাকে সারারাত, ভেতর থেকে দরজায় দরজায় কুলুপ লাগায় শুতে যাবার আগে। যেখান থেকে বেরোল সেখানে অনেক ব্যবস্থা থাকতে পারে, কেউ হয়ত পিছনে ছিল, আমরা লক্ষ্য করি নি, বেরিয়ে আসতে দরজা দিয়েছে, কিন্তু ঢোকার সময়? কে এই আতঙ্কের মধ্যে ওর জন্যে দোর খুলে রেখেছিল যে হাত দিয়ে ঠেলল আর নিঃশব্দে খুলে গেল? অভিসার? হতে পারে—তখনও বৃন্দাবনে বহু স্ত্রী-পুরুষেই অভিসারে বেরোত—কিন্তু তাই বা ওর প্রেমিকা কি ভরসায় দরজা খুলে রাখবে? অন্তত একটু ইঙ্গিত, একটু সঙ্কেত-টোকা দেওয়া—এরকম শব্দ করলে, কেউ খুলে দিল—এ সম্ভব। কিন্তু এমনভাবে নিঃশব্দে, বিনা বাধায়—? আর ঠিক মায়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল, আমাদের সমান চালে চলে বরাবর আলো দেখাল এবং প্রয়োজন ফুরোতেই মিলিয়ে গেল—এ কি রহস্য তা আমরা আজও বুঝতে পারি নি।

মনে হচ্ছে, ১৯৪২ সেটা। আমি আর সুমথবাবু পুরী গিয়ে স্বর্গদ্বারের ওপর 'সোনাস্মৃতি' বাড়ির একখানা ঘরে আছি। ঈগল লিথোগ্রাফিকের চণ্ডীবাবুর বাড়ি ওটা, তখন ঐ একখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হত। ভেতর দিকে আর এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক স্থায়ী ভাড়াটে ছিলেন।

আমরা যাওয়ার তিন চার দিন পরে আমাদের বড়দা, অর্থাৎ বিভূতি (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবু এবং ওঁর স্ত্রী কল্যাণী বৌদি গেলেন। ওঁরা উঠলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একটা ঘরে—বারো নম্বর ঘর, তিনতলায়। ওঁরই নির্দেশে ঐ ব্যবস্থা, হোটেলে উঠবেন না, প্রসাদ খেয়ে থাকবেন, কারুর বাড়িও থাকবেন না।* ঘরটা এতই ভাল লেগেছিল ওঁর যে, পরে আর একবার যখন সবাই মিলে পুরী যাওয়া হয়—উনি ইনসিস্ট করেছিলেন ঐ ঘরটা তাঁর চাই।

প্রথম দিন দর্শন প্রভৃতি সেরে সন্ধ্যার পর বীচ হোটেলের সামনে সমুদ্র-তীরে এসে বসেছি। আমি আমার অভ্যাসমতো, জগন্নাথদেবের পাবলিসিটি অফিসারের কাজ ক'রে যাচ্ছি, অর্থাৎ তাঁর মহিমা প্রচার করছি। ওঁকে বোঝাচ্ছি যে, কলিতে দারুভূতো মুরারি জগন্নাথই ভগবানের প্রকটিত রূপ;

---

* পাথুরেঘাটার বৃন্দাবন মল্লিক মশাই নিমন্ত্রণ করতে তার আগের দিন বিকেলে এক রকম পালিয়ে চলে এসেছিলেন।

ওঁকে দর্শন করলেই সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন হবে, খুব জাগ্রত ঠাকুর, সেই যে পুঁই-মাচা দর্শনের গল্প আছে—ঐ রকম ঘটনা আমার জ্ঞানতই ঘটেছে, ভক্তের জন্যে রথের চাকা আটকে যায়—ইত্যাদি ; যদি কিছু প্রার্থনা করার থাকে মনে বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করলে অবশ্যই তা পূর্ণ হবে ;—শুনতে শুনতে বড়দা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার এখন গরম গরম ছানার মালপো খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার জগন্নাথ খাওয়াবে ?

হাতের পাশা আর মুখের কথা—একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। বুঝতে তো পারছি এ বেয়াড়া শখ মিটবে না, কী গরজ জগন্নাথের এমন পরীক্ষা দিতে! তবু একেবারে ঝেড়ে তো জবাব দিতে পারি না। বলতে হল, একটু ক্ষীণ কণ্ঠেই বললাম, 'সে আপনি কেমন ক'রে তাঁকে জানাবেন, তার ওপর নির্ভর করছে!'

'এই আমি জানাচ্ছি' বলে বড়দা হাত জোড় ক'রে বললেন, কৌতুকের ভঙ্গীতেই অবশ্য—'বাবা জগন্নাথ, আমার বড্ড গরম, গরম ছানার মালপো খাবার ইচ্ছে, যদি দয়া ক'রে খাওয়াতে পারো তো ওব্‌লাইজড হবো।'

বুঝুন ব্যাপার! এমনি মালপো হয় না তায় ছানার মালপো। আবার গরম।

যাই হোক, রাত নটা নাগাদ আমাদের সভা ভঙ্গ হল, ওঁদের ভারত সেবাশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আমরা 'সোনাস্মৃতি'তে ফিরে এলাম।

রাত এগারোটা হবে, খাওয়া দাওয়া ক'রে শুয়ে পড়েছি—দ্বারে করাঘাত।

'কে ?' উঠে দরজা খুলে দেখি ছোকরা ছড়িদার ধ্রুব দাঁড়িয়ে। তার দুহাতে দুটো মাটির সরা, পাতা চাপা।

'কী ব্যাপার ধ্রুব ?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

ধ্রুব বলল, 'আজ এই সন্ধ্যাধূপে† ভাল ছানার মালপো ভোগ হয়েছিল, তাই পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, আপনাদের দিতে। আপনাদের আর ঐ যে নতুন বাবু এসেছেন তাঁদের—'

---

† জগন্নাথের সারা দিনে ভোগ হয় ছ'বার। বাল্য ভোগ, রাজভোগ, ছত্রভোগ (বিপুল পরিমাণ), মধ্যাহ্নধূপ, সন্ধ্যাধূপ, বড়কিঙ্কর ভোগ। এছাড়া পৌষমাসে একবার 'ভোরে, ও চন্দনযাত্রার সময় যাত্রাভোগ অতিরিক্ত।

সরা হাতে নিয়ে দেখি তখনও গরম। বলি, 'যাও বাবা যাও, আগে ঐ বাবুকে দিয়ে এসো। কাটা দরজা দিয়ে ঢুকে—ফটক যদি বন্ধ হয়ে থাকে—সটান তিনতলায় চলে যেয়ো—তিনতলায় বারো নম্বর ঘর !'

বড়দা পরের দিন ভোরবেলা ছুটে এসেছেন প্রায়, 'ও মশাই, এ কী ব্যাপার ! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে যে !

আমার তো তখন বুক দশ হাত। বললুম, 'কী, বলি নি ! আপনি তো বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না !'

পরের দিন গুরুধামে (ভূপেন সান্যাল মশাইয়ের বাড়ি) দুপুর বেলা নিমন্ত্রণে যাচ্ছি। সমুদ্রের ধার দিয়েই তো রাস্তা—যেতে যেতে বার বারই জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। আমি বললুম, 'কী বড়দা, দেখুন—কিছু প্রার্থনা থাকে তো জানান !'

বিভূতিবাবু বললেন, 'আমার গরম পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে, জগন্নাথ খাওয়াবে তো ?'

সুমথবাবু বললেন, 'আর সেই সঙ্গে একটা ক'রে ল্যাংড়া আম !'

আমি দেখলুম বড়দার প্রার্থনা পূরণে কোন অসুবিধে নেই—কারণ নিরামিষ খাওয়া ঠাকুরের প্রসাদ—মানুষকে নিমন্ত্রণ করেছেন যখন মধ্যাহ্ন ভোজনের—পায়েস তো একটা হবেই—এটা তো মিনিমাম ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ল্যাংড়া আমের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এখন একআধটা নাকি চালান যায়—তখন পুরীতে ল্যাংড়া বোম্বাই আমের চিহ্নও দেখা যেত না। 'নাইদার ফর লাভ, নর ফর মণি !'

খেতে গিয়ে দেখি মোটামুটি সবই সাজানো হয়েছে—কিন্তু পায়েস তো নেই ! জগন্নাথের আর কি, তাঁর এই সুযোগ্য উকীলের মুখ শুকিয়ে গেল। অবশ্য, বেশীক্ষণ সে জ্বালা ভোগ করতে হল না। সান্যাল মশাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'একটু দেরী হয়ে গেল আপনাদের, একটা বেজে গেল। এখনও পায়েসটা নামেনি। তা আমি বললাম বসিয়ে দিতে, খেতে খেতেই পায়েস নেমে যাবে।'

এল একেবারে গরম পায়েস—বড়দা যা চেয়েছিলেন। আর পাতে পড়ল সেই সঙ্গে—একটি ক'রে ল্যাংড়া আম। এটা কি ব্যাপার ? চমকে

জিজ্ঞাসা করি। শুনলুম সেই দিনই সান্যাল মশাইয়ের শিষ্য ভাগলপুরের বিখ্যাত উকীল দেবতাবাবু দু ঝুড়ি ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছেন।

বিভূতিবাবু তো চলে এলেন মল্লিকবাড়ি নেমন্তন্ন খাবার ভয়ে—আমরা আরও কয়েক দিন রইলাম।

একদিন ভোরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে সুমথবাবু বললেন, 'এমন সময় আসা গেল—ল্যাংড়া আমের সময়—কোথায় প্রাণভরে ল্যাংড়া আম খেয়ে ভীমনাগের সন্দেশ দিয়ে উপসংহার টানব, তা নয়। তোমার জগন্নাথ কি করছে হে!'

আমি বললুম, 'এতই যদি ল্যাংড়া আমের বিরহ বোধ হয়, তুমি বড়দার সঙ্গে চলে গেলে পারতে! এসময় আসাই উচিত হয় নি। অমন বেগুনফুলি পাচ্ছ—তাতে হচ্ছে না।'

ফিরে এসে দেখি—আগের দিন রাত্রেই টের পেয়েছি—প্যাসেঞ্জার বহু দেরি করে আসায় বাড়িওলারা কারা যেন অনেক রাত্রে এসে পৌঁচেছেন—মালপত্র নামানামি, ভাড়া নিয়ে বকাবকিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—সকালে বুঝলুম, সাক্ষাৎ মালেকা এসেছেন, চণ্ডীবাবুর স্ত্রী। বেঁটে ধরনের চেহারা, কিন্তু কী লক্ষ্মী শ্রী ছিল তাঁর চেহারায়, আর কি মিষ্টি কথাবার্তা।—সেই দুদিনের পরিচয়, তাঁর নিশ্চয়ই মনে নেই, কিন্তু আমি ভুলি নি। আমরা ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে সবে একটু 'নাস্তা' করার ব্যবস্থা করছি, 'আসতে পারি' বলে ভদ্রমহিলা ঘরে এসে ঢুকলেন। স্নান ক'রে একটি চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি পরেছেন। হাতে একটা পাথরের রেকাবিতে চারটি ল্যাংড়া আম এবং একটি ভীমনাগের বাক্সয়—চারটি সন্দেশ !! মানে ঐ বাক্স ক'রেই এসেছে, বাকীগুলো ও'রা নামিয়ে নিয়েছেন।

এর দিন-কতক পরে একদিন মন্দিরে ঢুকছি। স্নানযাত্রার সময় সেটা, খুবই ভীড়—সুমথবাবু বললেন, 'আশ্চর্য, এত মেয়েছেলের ভীড়, জগন্নাথকে দেখতে কি কোন সুন্দরী মেয়ে আসে না?' বলা শেষ হয়েছে কি না—দুটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে—একটির বয়স ১৬।১৭ হবে আর একটি ১৪।১৫। দুই বোন সম্ভবত—একেবারে সামনে, এসে পড়ল। বাঙ্গালীর ঘরে এ রূপ আজ পর্যন্ত দেখিনি, তার আগেও না, পরেও না।

এইদিনই মন্দিরে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল, এমনি হাতে তাতেই প্রায়—কিন্তু নানা কারণে সেটা বলতে বিরত থাকলুম।

এরপর, স্নানযাত্রার দিনই আমরা রওনা দিচ্ছি, তখন স্লিপারের বালাই ছিল না—পরের দু তিন দিন ভীড় বেশী হবে বলেই অত তাড়া—রিকশা-ওলাকে বললাম মন্দিরের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিতে। স্নানমণ্ডপেই ঠাকুর থাকবেন, বিকেলে গজবেশ হয়—রাস্তা থেকেই দেখা যাবে। চলে আসতে আসতে একটু ঠাট্টাছলেই বললুম, 'দ্যাখো, আর যদি কিছু চাইবার থাকে। তা এই বেলা—'। সুমথবাবুর একটি ছেলেদের গল্পের বই এক প্রকাশক নেবেন—এই কথা আছে। সুমথবাবু বললেন, 'তোমার ছোটবাবু পঞ্চাশ টাকা ফর্মা দেবেন? তবে বুঝি জগন্নাথের মহিমা।' তখনকার দিনে ছোট-দের টুকরো গল্পের বই, তাও পাঠ্য কিছু নয়—পঞ্চাশ টাকা ফর্মা, অবিশ্বাস্য রেট ছিল—কিন্তু ফিরে এসে সুমথবাবু সেই রেটই পেয়েছিলেন।

এর বহুদিন পরের কথা—১৯৫৫।৫৬ হবে কিম্বা আরও পরে—মনে নেই, পুরীতে যাচ্ছি। সঙ্গে মণীশ আছে। উঠব রামকৃষ্ণ মঠে। তখন পূজনীয় উত্তমানন্দজী মহারাজ ওখানের প্রেসিডেন্ট। যেদিন পৌঁচেছি সেদিন অক্ষয় তৃতীয়া। ঐ তিথি থেকে চন্দনযাত্রা শুরু হয় বলে সাধারণতঃ একটু তাড়াতাড়ি ভোগ হয়—মানে রাজভোগ। তবু—সাধারণত যা দুটো আড়াইটের আগে হয় না, তা আর কত সকালে হতে পারে? তাই প্রসাদের কথা কিছু লিখিনি। শুধু মণীশের কাছে দুঃখ করছি, 'আগে থাকতে বলে রাখলে অন্তত বিকেলে প্রসাদ খাওয়া যেত—আজকের দিনে।'·· ট্রেন পৌঁছল সাড়ে দশটা নাগাদ, রিকশা করে যাচ্ছি দেখি মুটের মাথায় প্রসাদ যাচ্ছে আগে আগে। এত সকালে প্রসাদ যাচ্ছে! আমি মণীশকে বললাম, 'ইস—এত সকালে ভোগ সরবে জানলে আমি মহারাজকে লিখে দিতাম একটু মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করে রাখতে। আজ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটা।'

কিন্তু দেখলাম মুটেটি—প্রসাদের হাঁড়িগুলি বেশ ডাগর সাইজের—মঠের দিকেই বাঁকল, আরও একটু পরে দেখলাম মঠেই ঢুকছে! গিয়ে শুনলাম ব্যারিস্টার দিলীপ মিত্র গেস্ট হাউসে আছেন। তিনিই সেদিন মহাপ্রসাদের ভাণ্ডারা দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, স্নান ক'রে একেবারে তৈরী পাতায় বসে গেলাম।

আর একটি ঘটনা—দু বছর আগের। গত জ্যৈষ্ঠের আগের আগের জ্যৈষ্ঠ। পুরী বৈশাখ মাসে খুবই আরামদায়ক—কিন্তু জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি থেকে দুঃসহ হয়ে ওঠে। সে উদ্দাম হাওয়া আর থাকে না, অথচ তাপ বাড়ে অতিরিক্ত। যেদিন পৌঁছলুম, সেদিন আবার একেবারেই হাওয়া নেই, পাতলা মেঘ আছে আকাশে, তাতে আরও গুমোট বেড়েছে। রৌদ্রের তাপ আছে যথেষ্ট অথচ মেঘটা না থাকলে কিছু বাতাস থাকত, সেটাও নেই।

সেই গরমে সেদ্ধ হচ্ছি আর ভাবছি যেদিন সকালে মণিকোঠা দর্শন করতে যেতে হবে—সেদিন কি অবস্থা। তার আগের বছরও দেখে গেছি "অবকাশ" হতে হতে নটা বেজে যায়—কড়া রোদ এবং অসহ্য গরম। অথচ এসেছি, একদিন একবার মণিকোঠা স্পর্শ করব না, তা কি ক'রে হয়। ভোরে দর্শন খোলা হলে—(এখন অনেকটা সকালে হয়েছে। সরকারের হাতে গিয়ে) ভাবনা ছিল না, কিন্তু ঐ কড়া রোদে—! কী আর করা যাবে।

এই ভাবতে ভাবতে বিকেলে মন্দিরে গিয়েছি, রিকশা থেকে নামছি আমাদের পাণ্ডার, এক ছড়িদার ছুটতে ছুটতে এল, 'আসুন আসুন, খুব ভাল সময়ে এসে পড়েছেন। আজ এখন মণিকোঠা দর্শন হচ্ছে!' এখন? সে কি কথা! কে বলল, 'হ্যাঁ, আজ বাধা পড়েছিল, সকালে একেবারেই 'সানমাঞ্জা' হয়নি—(অর্থাৎ মণিকোঠা দর্শন)—তাই এখন হচ্ছে!'

১৯৬৫ সালের ভাদ্র মাস, একটু কাজে দুদিনের জন্যে কাশী যেতে হয়েছিল। সঙ্গে সেবারও মণীশ ছিল। মুন্সীলালজীকে আর্জি জানিয়েছি বাবা বিশ্বনাথের ভোগের প্রসাদের জন্য। তিনি নিয়ে এলেন—যেদিন আসব সেদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ। তখন দুপুরের খাওয়া তো হয়েই গেছে, ওটাই টিফিন ক্যারিয়ারে গুছিয়ে নিলাম—রাত্রে ট্রেনে খাব বলে। অন্ন, রুটি, ডাল তরকারি।

ফেরার ব্যবস্থা বেনারস একসপ্রেসে—এখন সেটা লক্ষ্ণৌ একসপ্রেস। ফার্স্ট ক্লাসেরই টিকেট, 'কুপে'ও পেয়েছি—কিন্তু আগেকার ফার্স্ট ক্লাস বগি, ভাঙ্গা ঝরঝর করছে; আরও একটু পরে আবিষ্কার করলুম আলো নেই। অনেক বকাঝকা করলুম, কিন্তু কোন মিস্ত্রীও এল না, আলোরও ব্যবস্থা হল না। সঙ্গে টর্চ ছিল এই যা ভরসা।

তার ওপর রাজঘাটে (কাশী স্টেশন) এসে সেই যে ট্রেন দাঁড়াল, আর নড়ে না। আধঘন্টা হয়ে গেল—ছাড়বার কোন লক্ষণই নেই! আমাদের কামরাটা ভাগ্যক্রমে স্টেশনের একটা আলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই আলোটা পুরোপুরি আমাদের কামরায় এসে পড়েছে। হঠাৎই কথাটা আমার মাথায় এসে গেল, এইখানেই রাত্রের খাবার খেয়ে নিলে তো হ'ত। মণীশ একটু ক্ষীণ আপত্তি করল, 'অন্তত মোগলসরাই আসুক না।' কিন্তু তারপর সেও বুঝল যে, সেখানে এমন আলোর সুবিধা নাও মিলতে পারে। সুতরাং খবরের কাগজ বিছিয়ে খাওয়া শুরু হল!' খাবার অনেক। একগোছা বেঁটে মোটা রুটি, অর্থাৎ আকৃতিতে পুরীর মতো, কিন্তু যথেষ্ট ভারী। আমরা অন্ন প্রসাদ এবং একখানা ক'রে রুটি নিয়েছিলাম, তাতেই পর্যাপ্ত হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন উঠল, এই অবশিষ্ট প্রসাদটা নিয়ে কি করা যায়? ফেলে দিলে কুকুরে খাবে, বিশ্বনাথের প্রসাদ—তাও ঠিক মন সরছে না। অথচ ট্রেনটি এত দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে আছে রাজঘাটের মতো অকিঞ্চিৎকর স্টেশনে—এক ঘণ্টা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—ভিখিরী তো নেই-ই, কোন ফেরিওয়ালা, চা-ওলাও প্ল্যাটফর্মে নেই। সকলে নিজেদের কোটরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। খেতে বসবার আগেই হাত ধুতে প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম —সমস্ত প্ল্যাটফর্ম জনহীন। একটা চা কি পান-বিড়িওলাও নেই। ভিখিরীতো নেই-ই। কারণ যার যা বেসাতি করার এখানে প্রথম কয়েক মিনিটেই সেরে নিয়েছে, এখানে সাধারণত দু' তিন মিনিট দাঁড়ায়—সেই মতোই প্রস্তুত থাকে সকলে।

তবু মণীশকে বললুম—'একবার নেমে দেখি কোন ভিখিরী পাওয়া যায় কিনা। নইলে মোগলসরাইয়ে গিয়ে খুঁজব।'

এই বলে যেমন দরজা খুলেছি হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে, দেখি ঠিক আমাদের দরজার সামনে একটি জটাজুটসমন্বিত ভস্মাচ্ছাদিত-তনু সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, স্থির শান্ত উদাস, যেন আমাদের দোর খোলার জন্যই অপেক্ষা করছে! একটু চমকে উঠেছিলুম—কিন্তু তখনও তত নয়। প্রশ্ন করলুম যথাসম্ভব হিন্দীতে। 'বিশ্বনাথ-জী'কা থোড়া প্রসাদ হ্যায়, লেগা? ঝুটা নেহি হ্যায়।' সাধু কথা কইল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কাঁধের ঝোলাটা মেলে ধরল, আমরাও সেই রুটির গোছা এবং সামান্য কী একটু তরকারী ছিল, তার ঝোলায় দিয়ে দিলাম।

দিয়ে দরজা বন্ধ করে বাথরুমে হাত ধুতে যাব—প্রথম খটকা লাগল মনে—একটু আগেও দেখেছি প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণ জনহীন, এ সাধুটি হঠাৎ কোথা থেকে এল, আর ঠিক আমাদের কামরার সামনে!···হাত ধোওয়া হ'ল না। তখনই আবার দরজা খুললুম—দেখি সে সাধুর কোন চিহ্নও নেই কোথাও। নেমে দুজনে যতদূর সম্ভব দেখলুম। যতটা দৃষ্টি যায়, গাড়ির ও-পাশে, লাইনের দিকে টর্চ ফেলে ফেলে দেখলুম—কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্ন-মাত্রও কোথাও নেই, সাধু তো দূরের কথা। একটা বাচ্চা ছেলে, কিম্বা নিরাশ্রয় যারা প্ল্যাটফর্মেই রাত কাটায়—তেমনও কাউকে দেখলুম না।

তবে কি বাবা বিশ্বনাথই এসেছিলেন তাঁর প্রসাদের মর্যাদা রাখতে?

এটাও বছর কতক আগের কথা—ঠিক কোন্ বছর তা মনে নেই। একটা কি সংকটে পড়ে কালীঘাটের মার কাছে মানসিক করেছিলুম, সংকট কেটে গেলে রূপোর বেলপাতায় বুক চিরে রক্ত দিয়ে পূজো দেব। আমার মা একবার এইরকম মানসিক করেছিলেন, তা রক্ষাও করেছিলেন মনে আছে। সেই স্মৃতি থেকেই এই মানসিক।

ভালয় ভালয় সে সংকট তো কাটল। রূপোর বেলপাতাও গড়ালুম চুপিচুপি। বলা বাহুল্য এ খবর আর কেউই জানতেন না, বাড়িতেও না বাইরেও না। কিন্তু যত দিন এগিয়ে আসতে লাগল ততই যেন 'ফিজিক্যাল কারেজ ফেল করতে লাগল। নিজের হাতে নিজের বুক চেরা, কতটা কাটব, যদি রক্ত বন্ধ না হয়? কাটা দাগ থাকবে, বাড়িতেই বা কি বলব? এই সব ভেবে খুবই বিপন্ন বোধ করছি। কিন্তু মানসিক যখন করেছি, রাখতেই হবে। 'অহনে কি করা!' যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে এদিক-ওদিকে চেয়ে ডানহাতে বেলপাতাটা নিয়ে, একটা ব্লেড গঙ্গাজলে ধুয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, চেরবার চেষ্টাও করলুম—কিন্তু রক্ত বেরোল না, বোধহয় প্রচুর চর্বিতেই আটকে গিয়ে থাকবে। আরও একবার মায়ের নাম ক'রে চেষ্টা করব, এক ফোঁটাই যথেষ্ট—বেলপাতাটা ওখানে ধরে ব্লেড চালাবো, মুঠো খুলে দেখি বেলপাতা নেই।

কী সর্বনাশ! কোথায় গেল বেলপাতা, মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল, কিছু পূর্বেই তার পাতলা ধারগুলো অনুভব করেছি, এখন গেল কোথায়?

এ যে প্রতুল সরকারের ম্যাজিক হয়ে গেল। এই ভাবেই সে উড়িয়ে দেয় হাতের টাকা।

তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, ঘরের মেঝে, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, লোহার আলমারীর ওপর, বিছানার তলায় যেখানে টাকা-পয়সা থাকে (অনর্থক! সেখানে যাওয়ার কোনই কারণ নেই।) —স্থানে অস্থানে, মায় ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়েও দেখলুম, কোথাও সে বেলপাতা নেই! এদিকে তখন গাড়ি এসে গেছে, কখন যাব বলা ছিল, অগত্যা একটু অপরাধী ভাবেই ভারাক্রান্ত চিত্তে বেরিয়ে গেলুম, যথাসাধ্য ফুলমালা মিষ্টি দিয়েই পূজো সেরে বাড়িও ফিরলুম একসময়ে—মনে মনে বার বার মার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলুম।

কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে প্রসাদ নিয়ে ওপরের ঘরে ঢুকতেই প্রথমেই নজরে পড়ল, সেই আয়নার সামনা-সামনি মেঝের ওপর—একেবারে খোলা জায়গায় বেলপাতাটা পড়ে আছে। এখানটা খুব কম হলেও কুড়িবার দেখে গেছি, হাত বুলিয়ে ঝাঁটা দিয়ে দেখেছি—এবং খবর নিয়ে জানলুম, আমি ফেরবার অল্প কিছুক্ষণ আগেই ঝি ঘর মুছে গেছে, আমার স্ত্রী এবং আরও অনেকে সে ঘরে যাওয়া-আসা করেছেন, গৃহিনী শুয়েই ছিলেন সেখানে বিছানায়—কারও নজরে পড়েনি।

সকলের অলক্ষ্যে বেলপাতাটা তুলে নিয়ে বাক্সে রেখে দিলাম। কী আর করব?

ছোট্ট ঘটনা

ছোট্ট ঘটনা।

আর হ'লও অনেকদিন। কিন্তু তার জের যে এতদূর পর্যন্ত আর এতদিন পর্যন্ত গড়াবে তা কে জানত!

নিবারণ বাবু আর হরিশ যাচ্ছিলেন হৃষিকেশ থেকে লছমনঝোলা। হেঁটেই যেতে হ'ত তখন, এত যাত্রীবাহী বাসের উপদ্রব হয়নি। আগের দিন এসে ওঁরা কালী-কমলিওয়ালা বাবার ধর্মশালায় উঠে ছিলেন। ওখানে প্রত্যহ দুপুরবেলা

দূর দূরান্তর থেকে সাধুরা এসে থালার মতো রুটি খানকতক ক'রে, কয়েক হাতা ভাত আর তিনহাতা ক'রে ডাল মাথাপিছু নিয়ে যান। লছমনঝোলার দিক থেকেও নদী পার হয়ে বহু সাধু আসেন, কাউকে কাউকে তিন চার মাইল হেঁটে আসতে হয়। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে সবাই আসে না—একজন এসে বাকী কজনের নিয়ে যায়। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি প্রশ্ন করে, 'ক মূরৎ?' সে হয়ত বলে 'তিন মূরৎ' কিংবা 'ছয় মূরৎ'—সেই হিসেব ক'রে গুনে গুনে ডাল ভাত রুটি দেওয়া হয়। ছ'খানা করে ঐ রুটি কোন সাধারণ লোকের সাধ্য নেই যে খায়—যোগবল চাই।

নিবারণ বাবুর শালা হরিশ একটু ভাবপ্রবণ লোক, যদিও তার বয়স অল্প। সে চেয়ে চেয়ে দেখে ছলছল-চোখে বলেছিল, 'আহা সত্যি, এতগুলি সাধু ভোজন করাচ্ছে প্রত্যহ—এদেরই সার্থক জীবন।'

নিবারণ বাবু একটু বড় গোছের ইস্কুল মাস্টার, কিন্তু তিনি এসব ব্যাপারে একেবারে আধুনিক। তিনি জ্বলে উঠে বলেছিলেন, 'নন্‌সেন্স! কতকগুলো প্যারাসাইট্‌কে আলস্যে প্রশ্রয় দিচ্ছে এরা, আর দিচ্ছে হয়ত তোমার আমার মতো গেরস্ত লোকের কাছ থেকে পয়সা দোহন ক'রে নিয়ে। এরাই তো সোস্যাল এনিমি নম্বর ওয়ান!'

দুটি পুরুষ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—বৈচিত্র্যের অভাব ছিল বৈকি! এই সূত্রে তর্ক জমিয়ে কিছু আনন্দের স্বাদ পেলেন।

সেই তর্কেরই জের আজও চলছিল। পাহাড়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনেই গরম হয়ে উঠেছিলেন। আর তা হবার প্রয়োজনও ছিল, হাড় কাঁপানো বাতাস সোয়েটার ভেদ ক'রে মেরুদণ্ড পর্যন্ত ঝনঝনিয়ে দিচ্ছে। ফলে ভারতের প্রাচীন ঋষি-সমাজ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্যন্ত কেউই বাদ রইলেন না, সে তর্কের মধ্যে আসতে। হরিশ বলে, 'এরাই তো ভারতের গৌরব। এঁদের জন্যেই আজও ভারতবাসী মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।' আর নিবারণ বাবু বলেন, 'এরাই আমাদের লজ্জা। দেশের লোক যখন খেতে পাচ্ছে না, তখন এই এতগুলো শক্ত সমর্থ জোয়ান লোক স্রেফ পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বসে খাচ্ছে। আর খাওয়া বলে খাওয়া, সেদিন বড় আখড়ায় দেখলে তো, দুধে বাদাম গুলে শরবৎ আর ঘি-চপচপে হালুয়ার বহর! এই তো এতদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরছ—ভিক্ষা করা ছাড়া সাধুদের আর কিছু

করতে দেখেছ ? ভিক্ষে করছে আর খাচ্ছে আর ঝগড়া করছে। সাধুজীরা যখন গালাগাল দেন তখন তাঁদের ভাষাটা লক্ষ্য করেছ ? আমরা অমন ভাষা ব্যবহার করতে লজ্জা পাই ! · সন্ন্যাসী ! হুঁ ! সন্ন্যাসী তো ত্যাগ কৈ ?

হরিশ এর উত্তরে আরও ঝাঁঝালো কিছু বলতে যাবে, এমন সময় দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। খাড়া পাহাড় উঠে গেছে পথের একদিকে, আর একদিকে খাড়া পাড় নেমে গেছে গঙ্গায়। এরই মধ্যে একটি গুহা –গুহা না বলে খাঁজ বলাই উচিত তাকে, সামান্য-পরিসর—তারই মধ্যে একটি কৌপীনবস্ত্র নাগা সন্ন্যাসী বসে আছে। একটা বড় কাঠের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছে, এক পা আর এক পায়ের হাঁটুর ওপর তোলা। সামনে আর একটা গুঁড়ি ধোঁয়াচ্ছে—সামান্য আগুন তাতে। আর কিছু নেই কোথাও, সামান্য একটা জল খাবার পাত্র পর্যন্ত নয়। সর্বাঙ্গ নগ্ন, শুধু এক চিলতে কৌপীন আছে, তাতে লজ্জা ঠিকমতো নিবারণ হয় না—হয়ত আইনটা বাঁচে। এত যে শীত, হাড়কাঁপা বাতাস চারিদিকে—সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার—গায়ে কাঁটাও দিচ্ছে না লোকটার। বেশ খুশী খুশী মনে বসে আছে গঙ্গার দিকে চেয়ে।

দু'জনেই একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন সাধুটিকে দেখে। শেষে হরিশ একটু এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল—'নারায়ণ !'

এটা হরিশ এখানে এসেই শিখেছে।

সাধুটি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে হেসে বল্ল, 'নারায়ণ ভাই, নারায়ণ, নারায়ণ !'

হরিশের ভক্তি হ'ল। সে একটু ইতস্ততঃ করে পকেট থেকে একটা দু'আনি বের ক'রে দিতে গেল ; কিন্তু সন্ন্যাসী বাধা দিলে—'আরে নেই নেই ভাই, প্যায়িসা কেয়া হোগা ? উ রাখ্ দেও তুম্ !'

'থোড়া মিঠাই খায়েগা বাবা'—হরিশ বলে।

'মেঠাই হিঁয়া থোড়াই মিল্‌তা হ্যায়। মিঠাই দেও তো খায়েগা বহুৎ মৌজসে—লেকিন্ প্যায়সা কেয়া হোগা ?'

হরিশ দমে গিয়ে দু'আনিটি পকেটে পুরল। তারপর দু'জনেই আবার পথ ধরে চল্‌তে শুরু করল। কিন্তু কে জানে কেন তর্কটা আর জমল না। নিবারণ বাবু নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগলেন।

লছমনঝোলা-স্বর্গাশ্রম হয়ে ওঁরা যখন ফিরলেন, তখন সন্ধ্যের খুব বেশী দেরী নেই। ওঁরা একটু দ্রুতই হেঁটে আসছেন। কিন্তু সকালের সেই সাধুজির গুহার কাছাকাছি এসে অদ্ভুত এক দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল। সকালে যাবার সময়েই ওঁরা লক্ষ্য করেছিলেন—পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গরু চরে বেড়াচ্ছে। কা'দের গরু এখানে চরে—এ প্রশ্নও করেছিলেন তাঁরা পরস্পরকে। এখন দেখলেন, তারই একটি বোধ হয় নেমে রাস্তা থেকে একটু উঁচুতে এসে দাঁড়িয়েছে—স্থির হয়েই সে দাঁড়িয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে বাছুরকে ; কিন্তু শুধু বাছুরই নয়—একদিকের বাঁট থেকে বাছুর খাচ্ছে, আর একদিকের দুটি বাঁট এক হাতে ছু'য়ে আর একহাত লাগিয়ে পান করছেন সকালের সেই সাধুটি। গাভীটিও পরম স্নেহভরে একবার বাছুরের ল্যাজ আর একবার সাধুর জটা লেহন করছে!

অল্পক্ষণ মাত্র দু'জনে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর চলে এসেছিলেন নিঃশব্দেই। সে সময় দাঁড়িয়ে সাধুর সঙ্গে কথা কইতেও পারেন নি!

* * * *

এর পর নিবারণ বাবুর সব যেন ওলট পালট হয়ে গেল। ক্রমশঃ এমন হ'ল যে, সাধু দেখলেই আর তাঁর জ্ঞান থাকে না। যাকে তাকে ধরে আনেন বাড়িতে—আদর-যত্নে, দুধে-ঘিয়ে আচ্ছা ক'রে খাওয়ান—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নানা ছুতোয় কিছু নগদ টাকাতেও ঘা দিয়ে যায় যাবার আগে ; কিন্তু তবু ভক্তি কমে না ওঁর। ওঁর বাড়াবাড়িতে বাড়িসুদ্ধ লোক সাধুর সাড়া পেলেই ক্ষেপে উঠবার উপক্রম হ'ল, তবু ওঁর চৈতন্য হয় না। ওঁর স্ত্রী তাদের জন্য নানাবিধ রান্না ক'রে, সেবা ক'রে ক্লান্ত। টাকা পয়সার দিক থেকেও সর্বস্বান্ত হবার যোগাড়। ছেলেটিকে হরিশ কাছে রেখেছিল, তাই সে বি-এ পাশ ক'রে চাকরিতে ঢুকতে পেরেছে। গাছের মতো মেয়ে, তার বিয়ের ব্যবস্থা হয় না—বরং কোন কোন মাননীয় অতিথির সাধুদৃষ্টি থেকে আড়াল করতে করতে প্রাণান্ত!

নিবারণ বাবু নিজে তবু নির্বিকার! উনি বলেন—হরিদ্বারের গঙ্গায় যারা কাঁকর ঘেঁটে ঘেঁটে পয়সা খোঁজে, তাদের দেখেছ? কতবার ডুব্‌ড়ী ডুব্‌ড়ী কাঁকর তোলে—এমনি বে-ফায়দা! কিন্তু ঐ করতে করতেই একবার বরাতে

জুটে যায় তখন অনেক সময় শুধু আনি-তু'আনি নয়—টাকা, সিকি, এমন কি সোনা-রূপোও পাওয়া যায়। এক-আধবারে হতাশ হ'লে কি চলে? আমার এ যে সোনার তাল খোঁজা!

এমনি ক'রেই চলছিল, এমন সময় এই কাণ্ড!

কালীঘাটের কাছাকাছি এক ঠাকুরবাড়ী আছে। নিবারণ গিয়েছিলেন সেখানে কথকতা শুন্‌তে। ভাগবত পাঠ করছিলেন কোনও এক প্রবীণ প্রভুপাদ, যাঁর ভয়ঙ্কর আভিজাত্যের খ্যাতি—বলতে গেলে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-হেন প্রভুপাদকে কোথাকার কে এক আধপাগলা লোক কথকতার শেষে আক্রমণ ক'রে বস্‌ল; অবশ্য হাতে নয়, মুখে—অর্থাৎ বিষম তর্ক জুড়ে দিলে।

আধপাগলাই বল্‌তে হবে বৈ কি! এমনি একটা সাদা ধুতি কাছা খুলে পরা, গায়ে গেঞ্জির ওপর সেই কাপড়ের খুঁট জড়ানো, মাথায় সাদা কান-ঢাকা টুপি। ঐ টুপিটাই যা সাধুদের মতো—তবে গেরুয়া নয়। প্রথম প্রথম সবাই ওর এই স্পর্ধাকে অর্বাচীনতা মনে ক'রে রুষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিন্তু একটু পরেই প্রবীণরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কারণ লোকটির যুক্তি শুধু যে ক্ষুরধার, তাই নয়—তার পিছনে পাণ্ডিত্যও আছে যথেষ্ট। নিজের যুক্তির সমর্থনে শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে এমন সব শ্লোক উদ্ধার করতে লাগলেন, যাতে প্রভুপাদকেও অবশেষে থিতিয়ে পড়তে হলো।

অবশ্য প্রভুপাদের বিশেষ ভক্তরা শেষ পর্যন্ত চেঁচামেচি ক'রে লোকটিকে থামিয়ে দিলেন। সভা ভাঙ্গ্‌ল। প্রভুপাদ বিজ্ঞজনোচিত করুণার হাসি হেসে ভক্তদের অভয় দিলেন, সে লোকটিও আর কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু না, অন্ততঃ সে সভাস্থলে একটি ভক্ত ওর ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিলেন—তিনি আমাদের নিবারণবাবু।

ভীড়ের মধ্যে খেই হারিয়ে নিবারণবাবু ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগলেন লোকটিকে—শেষে দেখা পেলেন একেবারে সা'নগরের মোড়ে গিয়ে, নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

নিবারণ বাবু কাছে গিয়ে গলাটা বেশ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, 'এই যে, আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

'কেন বলুন তো?' লোকটি যেমন সপ্রতিভ, তেমনি স্পষ্টভাষী, 'মারধোর

দেবেন নাকি ?'

'না। না। কী যে বলেন। এমনি—।' তারপর একটু ঢোঁক গিলে নিবারণ বাবু বললেন, 'আপনি থাকেন কোথায় ?'

'বলা শক্ত। আপাতত এইখানে আছি, রাতটা কার ঘাড়ে চেপে কাটাব তা এখনও ঠিক করি নি। অর্থাৎ চাপবার মতো তেমন ঘাড় পাচ্ছিনে।' নিবারণ বাবুর চোখ দুটি আশা ও উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'তাহলে, যদি আপত্তি না থাকে তো আমার ওখানে চলুন না।'

'ও, সাধু ধরা বাই আছে বুঝি ?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লোকটি।

'না না—তেমন কিছু নয়, এমনিই—'

'উহুঁ! এমনি তো হবার জো নেই। বাই যার আছে তাকেই পাগল বলে লোক। আর পাগল না হলে কি আর লোক রাস্তা থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়? চোর কি ডাকাত কি খুনে—কিছুই জানেন না, সহজ মানুষ হ'লে ভেবে-চিন্তে দেখতেন।'

'ভেবে চিন্তে কি আর দেখি নি ভাবছেন ? কিছু কিছু মানুষ চিনি বৈকি। নিবারণ বাবু সবিনয়-গর্বে হাসলেন।

'ও, ঐ ওখানকার বাগাড়ম্বর দেখে ভক্তি হয়েছে বুঝি। খুব মানুষ চেনেন, তা বুঝেছি। ঠাকুরের কথা মনে নেই বুঝি, খালি গাড়ুই ভক্ ভক্ করে, ভরা গাড়ু সাড়া দেয় না। ··যাক্, আমার যখন কোথাও রাতকাটানো দরকার তখন আর আমি ভাংচি দিই কী ক'রে—চলুন যাই। কিন্তু একটা কথা—আহারাদি আমার স্বেচ্ছামতো চল্‌বে এই সর্তে। যেটুকু খাবার, যা খাবার—আমি বলব, আপনাদের মর্জিমতো হবে না। রাজী আছেন ?'

'নিশ্চয়ই। অবশ্য আমার সাধ্যের মধ্যে না কুলোলে—'

'মাভৈঃ। খুব কুলোবে।'

ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসল লোকটি। তখন রাত হয়ে এসেছে। গৃহিণী আজকাল আর অপ্রসন্নও হন না—এ সব সয়ে গেছে তাঁর। শুধু প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন—খাবার কি হবে ? লুচি না ভাত ? আমিষ না নিরামিষ ?

নিবারণ বাবু তাকালেন অতিথির দিকে।

অতিথি বললেন, 'একটি যে-কোন কলা—কাঁঠালী বা মর্তমান—আর এক গ্লাস শরবৎ। ঐ চিনি দিয়ে একটু জল গুলে দেওয়া। খাব রাত দশটায়।'

'সে কি ?' নিবারণ বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'অন্ততঃ কিছু মিষ্টি কিম্বা একটু দুধ—'

'শর্ত ! মনে আছে ?'

নিবারণ বাবু দমে গেলেন। গৃহিণীরও একটু কৌতূহল হ'ল এতদিন পরে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। শেষে নিবারণবাবু বললেন, 'সিগারেট চলবে ?'

'না, তা-ও না। ব্যস্ত হতে হবে না।'

একটু পরে আবার উশখুশ ক'রে উঠে নিবারণ বাবু বললেন, 'আপনি শাস্ত্রকথা কিছু বলুন—বড় ভাল লাগছিল তখন।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল।

'কেন ? ঘরের ভাড়া ? একটা কলার দাম তো তিন পয়সার বেশী নয় !'

'বা রে ! আমি কি সে কথা বলেছি—। ছি ছি, এতে বড় লজ্জা দেওয়া হয় !'

অতিথি তেমনি ভঙ্গীতেই প্রশ্ন করলেন, 'কতদিন এ কাজ চলছে ?'

ঘাবড়ে গেলেন নিবারণ বাবু, 'তার মানে ?'

'এই সাধু-ধরা ? আমাকে ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করবেন না—এক আঁচড়ে আপনাকে চিনেছি ! সাধুসঙ্গের জন্যে পাগল—না ? একবার তেমন কোন লোক পেলে হয়, ইহকাল পরকাল সবটা গুছিয়ে নিই—এই তো মনোভাব ?'

নিবারণ বাবু কেমন যেন হয়ে পড়লেন ওর সামনে, থতমত খেয়ে বললেন, 'না—ইহকাল, নয়, ঠিক পরকালও নয়। আসল কথা একটু জানতে ইচ্ছা হয়। সাধু-সন্ত লোক ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি বলুন জানবার ?'

'আচ্ছা, একটা কথা বলি। মিছিমিছি এত মেহনৎ ক'রে সাধু খুঁজে না বেড়িয়ে নিজেই সাধু হবার চেষ্টা করলে কি হয় ? তাহলে তো সব হ্যাঙ্গাম চুকে যায় ?'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে নিবারণ বাবু বলতে যান, 'আজ্ঞে সে সুকৃতি কি আছে ? সাধু হওয়া কি অতই সোজা ?'

'শক্তটা কি মশাই ? সাধু বলতে কি বোঝেন ? কারুর অনিষ্ট চিন্তা করবেন না, যতটা সম্ভব যে কাজটাকে মন্দ বলে জানেন তা থেকে নিবৃত্ত

থাকবেন এবং লোভকে বাসনাকে সংযত করবার চেষ্টা করবেন—এই তো। না কি আর কিছু ?

'এ তো সাধু গৃহস্থের আদর্শ আপনি বললেন। আসল যেটা—ব্রহ্মজ্ঞান ? ···ঈশ্বরকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন—।'

'ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা কি এতই সোজা ? আর আপনিও তো কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েছেন, দেখেন নি যে বার বার শাস্ত্রে সাধু-গৃহস্থকেই প্রাধান্য দিচ্ছে ? আগেকার মুনি ঋষি যাঁদের বলেন, তাঁরা গৃহস্থ ছিলেন না ? ওসব ছাড়ুন দিকি মশাই, মেয়েটার বিয়ে দেবার চেষ্টা করুন, স্ত্রীকে একটু রেহাই দিন—নিজে নিজের মধ্যে সমাহিত হয়ে সৎচিন্তা করার চেষ্টা করুন। যাঁকে খুঁজছেন তাঁকে কি বাইরে পাওয়া যায় ? না লোকের কাছে চেয়ে পাওয়া যায় ?···ঐ দেখুন, অভ্যাস খারাপ, বক্তৃতা দিতেই শুরু করেছি শেষ পর্যন্ত। আপনার ঘরের ভাড়া না দিয়ে যাবো না দেখছি !'

কিন্তু ততক্ষণ নিবারণ বাবু হুড়মুড়িয়ে পায়ে পড়েছেন একেবারে, প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, 'আর ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমার মেয়ের বিয়ের খবর তো আপনার জানবার কথা নয় ! মেয়ে যে আছে তাই জানলেন কি ক'রে ? এবার আসল মানুষ পেয়েছি।'

ভদ্রলোক বাধা দিলেন না, এমন কি তিরস্কারও করলেন না—শুধু কণ্ঠস্বরে ওঁর আরও ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল, 'এত সহজে চিনে ফেললেন, তাই তো ! এই-ভাবেই আসল নকল চেনেন বুঝি ? ··যে কোন হনুমান-চরিত্র জানা জ্যোতিষীই তো মুখ দেখে এসব খবর দেয়। সাইকলজি জানা অধ্যাপকরাও বলতে পারতেন।···কিন্তু তাও নয়, বাড়ী ঢোকবার সময়েই একটি বয়স্কা আইবুড়ো মেয়েকে আড়ালে সরে যেতে দেখেছি। তার সঙ্গে আপনার মুখের আদল স্পষ্ট।'

নিবারণ বাবু যেন একটু দমলেন।

কিন্তু এধারে আর এক কাণ্ড। ওঁর স্ত্রীর একটি কন্যার ফরমাশে কৌতূ-হলী হয়ে আড়াল থেকে দেখছিলেন। এবার তিনি ঘরে ঢুকেই অতিথিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, 'প্রভু', যখন দয়া ক'রে এসেছেন, মেয়েটার একটা বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে যান। ওঁর দ্বারা কিছুতেই কিছু হবে না, একেবারে সংসারের দিকে পিছন ফিরে আছে। আমার ভাবনায় ঘুম হয় না। এটুকু আদেশ

আপনাকে করতেই হবে !'

নিবারণ বাবু স্তম্ভিত। স্ত্রী এতদিন যত সাধু দেখেছেন তত বিরূপ হয়েছেন সমগ্রভাবে সন্ন্যাসী-সমাজের ওপর। আজ একি কাণ্ড! কিন্তু অতিথি তেমনি নির্বিকার! কণ্ঠে সেই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস। বললেন, 'কেবল আমার আদেশের ওয়াস্তা? এর জন্য আপনার মেয়ের বিয়ে আটকে আছে? বেশ, আমি হুকুম করছি—এই মাসেই বিয়ে হবে। দেখুন, হুকুমের জোরে কি হয়!'

এর পর নিবারণ বাবু তাঁর তত্ত্বকথা শোনবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু অতিথি অটল, বললেন, 'যদি সাধু বলেই আমাকে ধারণা হয়ে থাকে তো এই পরামর্শই শুনুন, আর সাধু-সঙ্গের চেষ্টা করবেন না। আসলকে ধরুন। মনিব হাতের কাছে থাকতে তার দারোয়ান চাপরাশীদের জন্যে অত ব্যস্ত কেন?'

তবু পীড়াপীড়ি হয় দেখে বললেন, 'আচ্ছা, এখন বিশ্রাম করতে দিন, কাল সকালে থাকি তো দেখা যাবে।' নিবারণ বাবুর স্ত্রী একটু মিষ্টি খাবার জন্য জিদ্ করতে লাগলেন, তাঁকেও ঐ আশ্বাস দিলেন, বললেন, 'রাত্রে আমি যে-কোন একটা ফল ছাড়া অন্য কিছুই খাই না। ওতে আমার শরীর বেশ ভাল থাকে···যদি থাকি তো কাল সকালে খাবো।

নিবারণ বাবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে রাখলেন, 'কাল সকালে উঠে যদি পায়ে আড় হয়ে পড়তে হয় তাও পড়ব। ছাড়ছি না অত সহজে।'

নিবারণ বাবু ওঠেন খুব ভোরে। কিন্তু দেখা গেল আরও ভোরে অতিথি সরে পড়েছেন। বিছানা খালি, দোর ভেজানো।

ছেলে খুব আস্তে আস্তে বললে, 'ছাখো, সাধুজী কি কি নিয়ে সরে পড়েছেন!'

সেটা ঠিক নয় দেখা গেল। সবই আছে। ছেলের মা বললেন, 'অমন কথা বলিস্ নি-জিভ খসে যাবে।'

দিন দুই পরে হরিশ মেয়ের একটি সম্বন্ধ আনলেন, ভাল পাত্র, দাবী দাওয়া নেই; সেই মাসের মধ্যেই বিয়ে চুকে গেল।

কিন্তু এতে ফল হ'ল বিপরীত। নিবারণ বাবু সাধারণ ভাবে সাধু খুঁজে বেড়ানো ছেড়েছেন বটে, এখনও একটি বিশেষ সাধুর আশা ছাড়তে পারেন

নি। প্রত্যহ রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কলকাতার পথে পথে সেই এক-রাত্রির অতিথিটিকে খুঁজে বেড়ান।

দেহাতীত

বৃন্দাবনে পুরোনো শহরের যে রাস্তাটা মদনমোহনের মন্দিরের দিকে বেঁকে গিয়েছে, সেই রাস্তার ওপরই অষ্ট-সখীর কুঞ্জ আর ঠিক পিছনে একটি ছোট্ট সেকেলে হিন্দুস্থানী ধরণের বাড়ীতে ততোধিক ছোট যে মন্দিরটি সেইটিই হল 'কিশোরী মোহনে'র কুঞ্জ।

কুঞ্জটি বহুকালের। কোন্ কিশোরীবাবু কবে সরকারী ওকালতি থেকে অবসর নিয়ে সংসার-বিরাগী হয়ে উঠেছিলেন এবং এই মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন সে ইতিহাস আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু বিগ্রহের নামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতার নামটি মাত্র টিকে আছে আজও। এই নাকি এখানের দস্তুর, প্রতিষ্ঠাতার নাম বিগ্রহের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়। যাই হোক সে কিশোরীবাবু নেই, মন্দিরেরও ভগ্নদশা। কতকাল মেরামত করানো হয়নি তার ঠিক নেই। এমন এখানকার বহু কুঞ্জই। কলকাতার দু'খানি বাড়ী দেবোত্তর করা ছিল তার ভাড়ার অধিকাংশই নানা ব্যয় হয়ে কোনমতে পুজারীর বেতন ও একটি লোকের খাওয়ার মতো খরচ—সেইটেই ভোগ দেওয়া হবে—মোট পনেরো-কুড়ি টাকা এসে পৌছত। এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ ঠাকুরের বরাত ফিরল। সেই বাড়ী দুটি পড়ল ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের রাস্তায় এবং ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের টাকাটা নানা হিসেব নিকেশ নেবার পর আর সেবাইৎ-নামধারী কিশোরীবাবুর বংশধরদের হাতে দিতে রাজী হলেন না। টাকাটা সরকারী হেফাজতে রইল—এবং সরকারী ভাবেই একজন কামদার বা ম্যানেজার নিযুক্ত করা হ'ল। সেই সময় এঁদেরই আত্মীয় শ্যামাপদবাবু উদ্যোগী হয়ে প্রায় বিনা বেতনে এই কাজের ভার নিতে স্বীকৃত হওয়ায় এবং অন্য কেউ ঐ সামান্য টাকার (তার মধ্যে থেকে খানিকটা খরচ তো করতেই হবে—তার হিসেবও নাকি রাখতে হবে) জন্য বৃন্দাবনে নির্বাসিত হতে না চাওয়ায়—তিনিই ঐ পদে নিযুক্ত হলেন।

শ্যামাপদবাবু বিপত্নীক। উপযুক্ত ছেলে বিবাহের পূর্বদিনে মারা গেছে। সংসারে আর কেউ নেই—আছে একটি মাত্র মেয়ে শুধু, রাধারাণী নাম। শ্যামাপদবাবু শিক্ষকতা করতেন সুতরাং টাকা কড়ি বিশেষ কিছুই জমাতে পারেন নি—প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অল্প কিছু টাকা মাত্র সম্বল, তিনি ব্যাকুল হয়ে একটা আশ্রয় খুঁজছিলেন এমন সময় এই সংবাদটা কানে এল। সংসারে থাকা মানে এই বয়সে উদয়-অস্ত টিউশ্যানী করা, সে আর ভাল লাগে না। তিনি বৈষ্ণব মানুষ—মনে মনে রাধারাণীকেই ডাকছিলেন ব্যাকুল হয়ে, তাই বুঝি রাধারাণী মুখ তুলে চাইলেন।

শ্যামাপদবাবু যেন বেঁচে গেলেন। কলকাতায় পৈত্রিক বাড়ী ভাগ হ'তে হ'তে একটিমাত্র ঘর তাঁর ভাগে এসে পড়েছিল, সেইটেই তিনি অন্য এক সরিককে দশ টাকায় ভাড়া দিলেন এবং আসবাব-পত্র বিক্রী ক'রে যা-কিছু নগদ টাকা পেলেন সব নিয়ে এখানের পাট চুকিয়ে চিরদিনের মতো বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। আত্মীয়রা জিজ্ঞাসা করলেন 'মেয়ের কী করবেন? না লেখাপড়া—না বিয়ের ব্যবস্থা—ওখানে কি হবে?'

শ্যামাপদবাবু অম্লানবদনে আকাশের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'সে রাধারাণী যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন!'

বৃন্দাবনে এসে শ্যামাপদবাবু যেন প্রথম নতুন করে বাঁচলেন। ঠিক এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। ঠাকুরকে একান্তভাবে পেতে, সেবা করতে পুত্রের মতো, প্রভুর মতো, দয়িতের মতো। এখানে তাঁর সে ইচ্ছা ষোল আনাই মিটেছে। এক পূজারী ছিল সে এখানে থাকত বটে, নিয়ম-রক্ষা মতো ভোগ ইত্যাদিও দিত কিন্তু তার বেতন মিলত মাত্র মাসিক পাঁচ টাকা সুতরাং আরও দুটো কুঞ্জে তাকে কাজ করতে হ'ত। শ্যামাপদবাবু এসে তাকে ছাড়িয়ে একটি নতুন পূজারী রাখলেন—বেতন বাড়িয়ে দশ টাকা ক'রে দিলেন। আহার, বাসস্থান ও বেশী মাইনে এই শর্তে দিলেন যে সে অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না।

কিন্তু তবু তাকে করতে হত অল্প কাজই—শ্যামাপদবাবু নিজেই অতন্দ্র থেকে নিরলস ভাবে সেবার কাজ করতেন। নিজে বিগ্রহ ছুঁতেন না—যদিও তার বাধাও ছিল না, তিনি ব্রাহ্মণ—কিন্তু এখানের রেওয়াজ

ব্রজবাসী পূজারী ছাড়া কেউ পূজা করে না, তাই—নইলে আর সবই করতেন। মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিয়ে—ঠাকুরের নতুন বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি তৈরী করিয়ে কুঞ্জ ও কুঞ্জেশ্বরের শ্রী ফিরিয়ে দিলেন। এ বিষয়ে তাঁর কিছু স্বাধীনতাও ছিল। তাছাড়া সরকার থেকে যতটা বরাদ্দ ছিল তাতে যখন কুলোল না তখন বাকীটা তিনি নিজেই দিলেন। মনের মতো ক'রে ঠাকুরকে সাজালেন তিনি। বহুকাল পরে আবার নিয়মিত কাঁসর ঘণ্টার শব্দ উঠল নির্জন প্রাঙ্গণে—উৎসবের সময় যাত্রী সাধারণ বাইরের আম্রপল্লব ও পুষ্পশয্যা দেখে আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ বড় রাস্তা থেকে বেঁকে এসে উঁকি মারতেও শুরু করল।

শ্যামাপদবাবুর আনন্দের পাত্র যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তা শুধু নিজে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেবার সুযোগ পাওয়াতেই নয়। আরও কারণ ছিল। তিনি তাঁর কিশোরী মেয়েকে ইস্কুল ছাড়িয়ে যেদিন নিজের সঙ্গে বৃন্দাবনে নিয়ে আসেন সেদিন মুখে আত্মীয়দের যতই কেন না রাধারাণীর মর্জি দেখান তাঁর নিজের মনেও একটা ভয় ছিল বৈ কি! এখানের এই কোলাহল, সমবয়সীদের মেলা—এই সহস্র বিলাসের ও ভোগ সম্ভারের আয়োজন ছেড়ে সে কি পারবে সেই নির্জন স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও গম্ভীর পরিবেশে গিয়ে থাকতে? হয়ত মুখে কিছু বলবে না কিন্তু মনে মনে শুকিয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে কী করবেন তিনি?

কিন্তু এখানে এসে তিনি সানন্দ-বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর রাধুও যেন এখানে এসে বেশি খুশী হয়েছে। বিগ্রহ যেন তারই খেলাঘরের ছেলেমেয়ে—এমনি ভাবেই সে তাদের সেবায় মেতে উঠল। হেমন্তের দিনে ভোরে উঠে অষ্টসখীর কুঞ্জ থেকে শিউলি ফুল কি কুন্দ সংগ্রহ ক'রে এনে মালা গাঁথে। বসন্তে যখন গাছে গাছে বেল জুঁই চামেলীর সমারোহ দেখা দেয় তখন তো কথাই নেই—নিত্য সকাল বিকালের মালা তৈরীর ভার তার ওপর বাঁধা। সকালে প্রসাধন, দুপুরে ঝারা, বিকেলে অন্য বেশ—মায় রাত্রে শয়ন পর্যন্ত প্রস্থ প্রস্থ মালা প্রস্তুতই থাকে। তার ওপর চাই অপরাহ্ণে নতুন নতুন পরিকল্পনায় ফুল-কামরা। জিনিসটি প্রথম বুঝে নিতে যেটুকু সময় লেগেছিল, তারপর আর পূজারীকে কিছু করতে হয়নি। কোনদিন ফুলের চতুর্দোলা, কোনদিন ময়ূরপঙ্খী, কোনদিন পুষ্পকরথ কোনদিন বা আবার

ফুলের কুটির তৈরী ক'রে দিত। এসময় তার হাত পেত না একদণ্ডেরও অবসর। তবু শ্রান্তি অনুভব করত না।

কিন্তু শুধু কি তাই? হাতও যেমন চলত, তেমনি চলত গলা। ওখানে থাকতেই স্বাভাবিক প্রবণতায় সে খুব শীঘ্র গান বাজনা আয়ত্ত করেছিল। বাবা ভালবাসেন বলে বেশীর ভাগ শিখেছিল কীর্তন—এখানে এসে শুনে শুনে বহু ভজনও আয়ত্ত ক'রে ফেলল। আর গান গাওয়ায় যেন তার ক্লান্তিও নেই—দিনরাতই কণ্ঠে তার যেন আপনা থেকেই উঠছে গুনগুনিয়ে ভজন আর কীর্তন। তার রূপসজ্জা ও তার কীর্তনের খ্যাতি একটু একটু ক'রে পাড়ায় যেমন ছড়িয়ে পড়তে লাগল—একটু একটু ক'রে তেমনি পুরোনো শহরের পুরোনো মন্দিরটিও জেঁকে উঠল। আজকাল বহুলোকই আসে সন্ধ্যার পর মদনমোহন থেকে দর্শন সেরে ফেরবার পথে একটু বেঁকে এই সঙ্কীর্ণ গলির অত্যন্ত সাধারণ কুঞ্জে ছোট্ট বিগ্রহটিকে দর্শন করতে। আরতির পরে বেশ জনসমাগম হয় আজকাল, কিন্তু রাধু এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন,—সে জানেও না, বোঝেও না যে তার জন্যই এতলোক আসছে। সে নির্বিকার ভাবে আপনার সেবার মধ্যে তন্ময় হয়ে থাকে ঠাকুরের দিকে চেয়ে বসে টানাপাখার দড়ি টানতে-টানতে নয়ত রাধারানীর নতুন ঘাগরায় সলমা-চুমকীর কাজ তুলতে তুলতে চলে গুন্ গুন্ করে ভজন। কে আসছে, কেন আসছে তা সে কোন দিন চেয়েও দেখত না।

বেশ ছিলেন শ্যামাপদবাবু—পরিপূর্ণ আনন্দে ডুবে ছিলেন। আত্মবৎ সেবা তাঁদের—দুই বাপবেটিতে এই সেবার মাধুর্যরসে তন্ময় হয়ে ছিলেন। বৈষ্ণবের যা কাম্য সেই নিবেদনই অহরহ শ্যামাপদবাবুর কণ্ঠে ধ্বনিত হত, 'ঠাকুর মোক্ষ চাই না, মুক্তি চাই না—চাই মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে এমনি জন্ম জন্ম তোমাকে সেবা করার সুযোগ ও অধিকার।'

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন কিশোরীমোহন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দেহ ধারণ করলে দেহের ধর্ম তাঁকে স্বীকার করতে হবে। এ দেহ নশ্বর ও ক্ষয়শীল। বঙ্কুবিহারী মন্দির থেকে দর্শন করে একদিন ফেরবার পথে বুকে এমন একটা ব্যথা ধরল যে আর চলতে পারলেন না, পথের পাশেই বসে পড়তে হ'ল। বহুক্ষণ বসে থেকে সামান্য একটু কম পড়তে আস্তে আস্তে পা

পা ক'রে কোনমতে এসে নিজেদের কুঞ্জে পৌছলেন বটে কিন্তু এইটুকু আসার পরিশ্রমেই এমন অবস্থা হল যে মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত এসেই শুয়ে পড়তে হ'ল তাঁকে—মুখ তাতেই বিবর্ণ হয়ে উঠল—সমস্ত দেহ ঘামে ভেসে যেতে লাগল।

রাধু ছুটে গেল ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার এসে বললেন হার্ট খারাপ। খুব সাবধানে থাকতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরোয়ানা এসে পৌছল।

সেই দিনই প্রথম শ্যামাপদবাবু সচেতন হলেন তাঁর কন্যা সম্বন্ধে। প্রায় যুবতী মেয়ে তাঁর। হঠাৎ যদি তাঁর দেহান্ত হয় তো একে কে দেখবে? তাছাড়া তাঁর মেয়ে এ ব্যাপারে যতই অনভিজ্ঞ হোক—অপরে তাকে অব্যাহতি দেবে কেন? বিশেষতঃ বয়স তার কাজ ঠিক ক'রে যাচ্ছে। তাঁর রূপসী মেয়েকে পূর্ণ যৌবন ধীরে ধীরে অধিকতর লোভনীয় ক'রে তুলেছে। সে সম্বন্ধে আরও যেন বেশী ব'রে সচকিত ক'রে তুলল আরও এক রূঢ় আঘাত—যখন প্রথম একটু সামলে নিয়ে চোখ খুলে দেখলেন যে মেয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে চেয়ে আছে, আর তরুণ ডাক্তার আছে তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে!

শ্যামাপদবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন, দেশে চিঠিও লিখলেন দু-একজনকে। আত্মীয়-স্বজনরা উত্তর দিলেন যে, এতদূর থেকে এভাবে সম্বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং দু-এক মাসের জন্য ওঁরা কলকাতা ফিরে আসুন, চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। কিন্তু সে প্রস্তাব রাধুর কাছে করবামাত্র রাধু তাঁর মুখে হাত চাপা দিলে, 'ওকথা আর কখনও বলো না বাবা।'

'সে কিরে—বিয়ে করবি না?'

'না বাবা।'

'তবে কি করবি?'

'এখন যা করছি—ওঁর সেবা।'

কিশোরীমোহনের দিকে দেখিয়ে দেয় সে।

'কিন্তু আমি যখন থাকব না?'

'তখন তো আরও কাজ বাড়বে বাবা।'

'তা তো বাড়বে বুঝলুম! তোকে দেখবে কে?'

'যার সেবা করব সে-ই দেখবে।'

মেয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শ্যামাপদ বললেন, 'তুই কি সন্ন্যাস নিতে চাস মা ?'

'না বাবা। কে বললে আমি সন্ন্যাস নিতে চাই ?' যেন চম্‌কে ওঠে রাধু, 'আমি যে ঘোরতর গৃহী। ঘর-সংসারের কাজই তো আমি চাই। দেখছ না, এক মুহূর্ত ফুরসত নেই! তবে মানুষকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধতে চাই না বাবা এটা ঠিক। আমি ওঁকে নিয়েই ঘর বাঁধব।'

আবারও বিগ্রহের দিক দেখিয়ে দেয় সে।

শ্যামাপদর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'ছিঃ মা! মানুষই কি অবহেলার বস্তু। তোর ঠাকুরই যে মানুষের দেহ ধারণ করেছিলেন। যে মূর্তি তুই সেবা করছিস, যার প্রেমে তুই বিভোর—সে মূর্তি যে মানুষেরই। স্বয়ং লীলাময় যে দেহ ধারণ করেছিলেন সে মানুষ তো ছোট নয় মা!'

লজ্জিত হয়ে ওঠে রাধু। বলে, 'না না ছোট কেন হবে বাবা, ছোট নয়। কিন্তু আমি যে ওঁকে ভালবেসেছি বাবা, ঐ পাথরের ঠাকুরকে। সে ভালবাসা কি ফিরিয়ে এনে মানুষকে দেওয়া সম্ভব ?'

শ্যামাপদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি একবার বিগ্রহের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন, 'মানুষকে ভাল না বাসলে কি পাথরের ঠাকুরকে ঠিক ভালবাসা যায় মা ? রাধারাণী তো ঠাকুর ভেবে ভালবাসেন নি, মানুষ জেনেই ভালবেসেছিলেন। এই দেহটা ছোট নয় মা—তেমন ভালবাসলে এই মানুষের মধ্য দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। ভাল না বাসলে ভালবাসা কি বোঝাও যে কঠিন! জয় রাধে! জয় রাধে!'

রাধু যেন শিউরে উঠে বলে, 'তুমি কি আমাকে তাহলে বিবাহ করতে আদেশ করছ বাবা ?'

'না মা। আমি কিছুই করব না। যে করবার সেই করবে। তবে ভাবছি কি জানিস্ মা—ঐ মজার ঠাকুরটি তামাশা পেলে আর কিছু চান না, তোকে নিয়ে না কোন নতুন তামাশা শুরু করে, তাই ভাবছি!'

এই ঘটনার দিন কয়েক পরেই একদিন সকালে একটি প্রিয়দর্শন তরুণ ছেলে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে শ্যামাপদর কুঞ্জের অঙ্গনে ঢুকে পড়ল। তেমনি উত্তেজিত ভাবেই চেঁচিয়ে ডাকল, 'দেখুন, কে আছেন এখানে—

শুনছেন !'

বেরিয়ে এলেন শ্যামাপদ। মালা গাঁথা ফেলে রাধুও উঠে এল।

'কী ব্যাপার বাবা ?' শ্যামাপদ প্রশ্ন করলেন।

'দেখুন, শুনলাম আপনারা বাঙ্গালী—তাই ছুটে আপনার কাছেই এলাম। আমরা মানে আমি আর আমার মা এখানে এসেছি আজ দুদিন হ'ল, মাকে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছিলুম ! পুষ্কর, জয়পুর সেরে এখানে এসেছি। জয়পুরেই মার জ্বর এসেছিল—এখানে এসে খুব বাড়ল। আজ সকালে দেখছি গুটি বেরিয়েছে—কী করি বলুন তো ? যেখানে আছি—পাশের এক যাত্রী-তোলা বাড়ীতে—তারা রাখতে চাইছে না, বলেছে এখুনি হাসপাতালে পাঠাও, এধারে মাও হাসপাতালের নাম শুনে কান্নাকাটি করছেন। আমি যে কী করব ভেবে পাচ্ছি না। আমাদের যিনি ব্রজবাসী তিনিও খবর শুনে আসছি বলে সরে পড়েছেন ! বিদেশ বিভুঁয়ে এই অসহায় অবস্থা—আমার যেন মাথাটাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।'

প্রায় কেঁদে ফেলল ছেলেটি।

শ্যামাপদ শান্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ভেবো না বাবা, ভয় কি ? রাধা-রাণীর রাজত্বে এসে পৌঁছেছ যখন, তখন উপায় হবেই। বিপদে ফেলতেও উনি, উদ্ধার করতেও যে উনি !'

তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'তাহ'লে মা—ওঁদের তো এখানেই আনতে হয় !···ও পাশের ঘরটা—?'

'ঘরটা পরিষ্কারই আছে বাবা।' রাধুও তেমনি সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলে, তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে বললে, 'চলুন তাকে নিয়ে আসি। তিনি কি এটুকু হেঁটে আসতে পারবেন ?'

'বোধ হয় পারবেন। কিন্তু আপনি আর ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমিই আনছি—'

'তাঁর বিছানাটা সঙ্গে সঙ্গেই আনতে হবে যে আপনাকে। আপনি কোন সঙ্কোচ করবেন না—চলুন আমিই তাঁকে ধরে আনছি।'

তাঁরা আশ্রয় পেলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ব্যাপারটা খুব গুরুতর নয়—পানিবসন্ত।

ছেলেটির নাম সুন্দর, রেলে চাকরী করে, পাস নিয়ে মাকে তীর্থ করাতে বেরিয়েছে। দেশ যশোরে—কলকাতায় শহরতলীতে নিজেদের বাড়ি আছে।

সুন্দরের মা লীলাবতী দেবী রাধুর ব্যবহারে ও সেবায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আহা, এই মেয়েটিকে যদি তাঁর পুত্রবধূ করা যেত! এমন ভক্তিমতী, এবং সেবাপরায়ণা অথচ এত সুশ্রী মেয়ে—এর তো স্বপ্ন দেখাও তাঁর পক্ষে দুরাশা।

এ ধারে রাধুর মনেও বিষম এক দ্বন্দ্ব চলছে।

কিশোর বয়সে পড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দেশছাড়া। খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই ছাড়া কোন তরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা, পরিচয়ও হয়নি। এতদিন পরে এক সুশ্রী, ভদ্র, শিক্ষিত তরুণ ছেলের সাহচর্য—কদিনের এই ঘনিষ্ঠতা—ওর মনোরাজ্যে যেন সব ওলট-পালট ঘটিয়ে দিলে। আজকাল ওর সেবার কাজে ভুল হয়, মালা গাঁথতে গাঁথতে পাঞ্জাবীর সাদা কাপড়ের ফ্রেম আঁটা একটি গৌরবর্ণ সুগোল কণ্ঠের ছবি কখনও কখনও ফুটে ওঠে মানসপটে, চন্দন ঘষতে গিয়ে মনে পড়ে যায় কালো পাথরের নয়—মাংসেরই একটি সুডৌল মসৃন-স্বেদসিক্ত ললাট। ও জানে যে এ অন্যায়, এ অপরাধ—যখনই সে সম্বন্ধে সচেতন হয় তখনই যেন শিউরে ওঠে। মনকে ফিরিয়ে আনে প্রাণপণে ওর সাধের ঠাকুরের দিকে, বিগ্রহের দিকে। কিন্তু তবু কিছুতেই কিছু হয় না। ঠাকুরের কাজ ফেলে লীলাবতীর সেবায় বার বার ছুটে আসে ও—আজকাল প্রায় অকারণেই, কারণ তিনি সুস্থই হয়ে উঠেছেন। একটি পরিচিত মিষ্ট কণ্ঠের মৃদু তামাশার জন্য কান খাড়া থাকে, গুণগুণিয়ে ওঠা ভজনের কলি ভুল হয়ে যায়। গান গাইতে গিয়ে বিশেষ একটি শ্রোতার সান্নিধ্যের জন্য মন লালায়িত হয়। ক্রমে আর নিজের কাছে লুকোচুরি চলল না। নিজের মনের চেহারাটা নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘৃণায় লজ্জায় যেন পাথরে মাথা কুটে মরে যেতে ইচ্ছা করে ওর। এ ওর কী হল?

অবশেষে একদিন বাবার কাছে ছুটে গিয়ে বলে, 'বাবা আমি সন্ন্যাস নেব।'

শ্যামাপদ নিজের ঘরের একান্তে বসে ভাগবৎ পড়ছিলেন। শান্ত স্নিগ্ধ

চোখ দুটি তুলে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাকে যে বিবাহ করতে হবে মা।'

প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে রাধু, 'তুমিও ঐ কথা বলছ বাবা!'

'আমি ঠিকই বলছি রাধু। তোমার ভক্তি আর সেবার অহঙ্কার হয়েছিল মা। ঐ কালো ঠাকুরটি যে কারুর কোন অহঙ্কার সইতে পারেন না।'

'কিন্তু আমি কি গিয়ে ঘর-সংসারে মন বসাতে পারব বাবা?'

'কি পারবে আর কি পারবে না মা—তা তো আমি জানি না। আমি শুধু জানি লীলাময়ের দিন কতক তোমাকে নিয়ে লীলা করার শখ হয়েছে। পারো ভালই—না পারো তাও ভাল—সব অবস্থাতেই জানবে তাঁর ইচ্ছাই সব। তুমি আমি কে মা? ভবিষ্যৎ ভেবে মিথ্যে হাঁকড় পাঁকড় ক'রেও কোন লাভ নেই—কতটুকু আমরা জানি, কতটুকু আমরা পারি। যা করবার উনিই করবেন, উনিই করাবেন—এই ভেবে শান্তিতে থাকবারই চেষ্টা করা ভাল। জয় রাধে! জয় রাধে!'

সত্যিই—শ্যামাপদবাবু নিজে কিছুই করেন না। পরম নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন।

কিন্তু লীলাবতীই একদিন কথাটা পাড়েন, আপনার মেয়েটিকে আমায় ভিক্ষা দেবেন দাদা?'

শ্যামাপদ হেসে বলেন, 'আমি কি ভিক্ষা দেবার মালিক দিদি। তিনি যে দিয়েই বসে আছেন!'

'তাহলে আপনি রাজী?'

কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না লীলাবতী।

'হ্যাঁ। তবে আমার টাকা-পয়সা কিছু নেই তা আগেই বলে রাখছি—'

'সে তো আমারও নেই বেয়াই মশাই—যে অমন মেয়ের দাম দেব! শুধু যদি মেয়েটি দান দয়া ক'রে সেই তো আমার সৌভাগ্য।'

ফাল্গুন মাসে তখন আর একটিই বিয়ের দিন ছিল। সেদিন না হলে বৈশাখ মাস। ততদিন সুন্দরের থাকা সম্ভব নয়। পরে আসাও ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ঐ দিনটিতেই তাড়াহুড়ো করে বিনাড়ম্বরে শ্যামাপদ সুন্দরের হাতে মেয়েকে সঁপে দিলেন। কাউকেই জানানো গেল না, কারুর আসার জন্যও

অপেক্ষা করা গেল না।

বিদায় নেবার আগে সুন্দর শ্বশুরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'আমায় কিছু কি বলবেন ?'

ভাগবৎ থেকে মুখ তুলে প্রশান্ত কণ্ঠেই শ্যামাপদ বলেন, 'না বাবা—বলবার কী আছে। যাকে নিয়ে যাচ্ছ তাকে তুমি তো দেখবেই। একটা কথা অবশ্য আছে—যে ভাবে ও মানুষ হয়েছে সম্পূর্ণ সংসারের বাইরে—তাতে করে সংসারে খাপ-খাওয়ানো ওর পক্ষে শক্ত, হয়ত একটা সঙ্কটও বাধবে, কিন্তু যিনি এই অঘটন ঘটিয়েছেন বাবা—তিনিই বুঝবেন। তুমি আমি কি করতে পারি ?'

বিয়ের কথা ওঠা থেকে বিয়ে এমন কি ফুলশয্যা পর্যন্ত রাধুর কাটল যেন একটা অভিভূত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। ঠাকুরের আদেশ হয়েছে তাকে বিয়ে করার—সুন্দর সুশ্রী, সুন্দর ভদ্র, সুন্দর শিক্ষিত—তাকে চোখে লেগেছে, মনে ধরেছে। তার সাহচর্যে প্রীতি পায় এইটুকুই শুধু জানে।

শ্বশুর-বাড়ী এসে অকস্মাৎ যেন সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল ওর। ঘুম ভেঙ্গে দেখলে বাস্তব বড় রূঢ়, বাস্তব বড় কুশ্রী।

কিশোরীমোহন ওর বুক জুড়ে ছিলেন, সে বিরহের পূর্ণ মূল্য সুন্দরে উশুল হয় না। বাবা তাকে আসবার আগে বলে দিয়েছেন, 'মেয়েমানুষের স্বামীই সব। ঐ তোমার গুরু, ইষ্ট, ঈশ্বর—ঐ তোমার কিশোরীমোহন, ওঁকে সেবা করলেই তিনি পাবেন সে সেবা।' তাই প্রাণপণে রাধু চেষ্টা করে স্বামী-সেবায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে—অন্তরের শূন্যতা সুন্দরকে দিয়ে পূর্ণ করতে। কিন্তু কিছুতেই যেন পারে না। মন হু-হু করে। নিজেকে রিক্ত, অসহায়, বন্দী মনে হয়! মনে হয় জীবনে আর কিছুই নেই।

এ যে ওকে নিয়ে কিশোরীমোহনের কী পরিহাস তা বোঝে না রাধু। যখন সে ছিল তাঁরই বাঁশীর দিকে কান পেতে, তখন সংসারের ডাক এসে সে বাঁশীর সুর দিলে ভুলিয়ে ; আজ সংসারের মধ্যে বসে বারবারই তাকে উতলা উন্মনা করে তুলছে তাঁর বাঁশী।

তার ওপর দীর্ঘদিন সে সংসার-ছাড়া। সংসার যে কী সে ধারণাও ছিল না ওর। ফলে প্রতিদিনই খিটিমিটি বাধে। কোন আচরণ গৃহস্থ ঘরের বধুর

করা উচিত আর কোন্‌টা উচিত নয়, এ জ্ঞান ওর তেমন পরিষ্কার নয়। ফলে বিরোধ বেড়েই যায়। সুন্দরের সংসারে ওর মার চেয়ে বড় এক বুড়ী পিসিমা আছেন—তিনিই এই ধিঙ্গি বৌয়ের বে-আক্কেলে ব্যবহারে বেশী জ্বলে যান। প্রথম প্রথম লীলাবতী স্নেহই করতেন কিন্তু তিনিও এখন ননদের কথায় সচেতন হয়ে ওঠেন। দুদিনের সেবায় ভুলে এ কাকে তিনি আনলেন, একে নিয়ে তাঁর খোকা সংসার করবে কী ক'রে?

অথচ, বাইরের বিরোধ কোলাহল যত তীব্র হয়ে ওঠে রাধুর মন তত অন্তর্মুখী হয়।

'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।'

কিশোরীমোহনের বাঁশী যেন মনের মধ্যে বেশী করে শুনতে পায় আজ-কাল, তাই কাজে আরও যেন ভুল হয়—আচরণ হয়ে ওঠে আরও দুর্বোধ্য।

নতুন উপসর্গও দেখা দিয়েছে বৈ কি!

গান গাওয়া শ্বশুর বাড়ীতে এসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে—তাই কান পড়ে থাকে ভজন-কীর্তনের দিকে।

পাড়ার এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে কীর্তন বসেছে, রান্না করতে করতে তন্ময় হয়ে শোনে রাধু। মাথুরের পালা—রাধারাণীর বিরহ আর ওর বিরহ যেন এক হয়ে গিয়েছে—দুই চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, রান্নাঘরের জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তন্ময় হয়ে—তাই কখন যে হাঁড়ির ভাত পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে তা লক্ষ্যই করেনি। চমক ভাঙ্গল যখন তখন পিসশাশুড়ীর চিৎকারে সাত-পাড়ার লোক এসে জড়ো হয়েছে। সেদিন আর লীলাবতী সামলাতে পারেননি নিজেকে, মেরেছিলেন টেনে এক চড়।

আর একদিন এক ভিখারী এসে বাইরে কীর্তন গাইছে—ওর জ্ঞান নেই, ছুটে চলে এসেছে বাইরে। খেয়ালই নেই যে সেখানে রাজ্যের পুরুষ আছে—খেয়ালই নেই যে রান্না চড়ানো।

আর একদিন নিশীথ রাত্রে পাশের বাড়ীর রেডিওতে কীর্তন গান হচ্ছে—তন্ময় হয়ে দিশেহারা হয়ে শুনছে রাধু। শুনছে আর নাচছে দু'হাত তুলে—দুই চোখে ওর দরবিগলিত-ধারা। রাত্রে ক্লাব থেকে থিয়েটারের রিহার্স্যাল দিয়ে বাড়ী ফিরে তা দেখে সুন্দর অবাক!

সেও ভৎ´সনা করে ওকে। এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? এটা গেরস্ত বাড়ী তা ভুললে চলবে কেন?

মাঘের প্রথম দিকে পিসশাশুড়ীর গুরুপুত্র কন্দর্প গোসাঁই এলেন। তিনি এখানে এলে বরাবর এ বাড়ীতেই থাকেন—এইখানে থেকে অন্য অন্য শিষ্য বাড়ী খবরাখবর দেন, এই তাঁর নিয়ম। এবারেও ক'দিন থাকবেন বলেই জেঁকে এসে বসলেন। বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স, সুশ্রী চেহারা—সুকণ্ঠ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসর বসে, কীর্তন হয়, ভাগবত পাঠ হয়—আলোচনা হয়, শিষ্য-শিষ্যা আসে বিস্তর। এরই ফাঁকে কন্দর্প টের পান রাধুর গুণের কথা। তাঁর গান ও পাঠ শুনতে শুনতে ওর চোখ দুটি যে ভক্তিতে ভাবে তদ্গত হয়ে ওঠে তা তিনি লক্ষ্যও করেছেন। তিনি অনুরোধ করেন ওকে গাইতে। গান গাইতে পেয়ে রাধু বেঁচে যায়। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পেয়ে যেন বহুদিনের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস পড়ে। কন্দর্প যত সাধুবাদ দেন শাশুড়ীদের মুখ ততই কালি হয়ে ওঠে।

ক্রমশ এদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এই একটু মুক্তির স্বাদ পেয়ে রাধুও ভুলে যায় সব। দিনরাতই দুজনে কথা কয়—দুজনে গান গায়। সবাই কানাকানি করে। সন্দিগ্ধ হয়—কিছু বলতে পারে না।

সুন্দর সংশয়ে সন্দেহে জ্বলে মরে—অবশেষে একদিন থাকতে না পেরে অপমান করে স্ত্রীকে—কটু কথা বলে বসে গোসাঁইকেও। গোসাঁই ম্লান মুখে তল্পিতল্পা নিয়ে বিদায় নেন।

আঘাত পায় রাধু।

'তুমিও আমাকে সন্দেহ করো?'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুন্দর বলে, 'না আমি বিশ্বাস করি। তুমি ব্যভিচারিণী, তুমি বেশ্যা!

দুহাতে কান ঢাকে রাধু। গরম সিসে যেন কে ঢেলে দেয় ওর দু-কানে।

নিশীথে দুর্যোগময়ী রাত্রে পাগলের মত বেরিয়ে পড়ে রাধু—অন্য কোথাও, অন্য কোথাও!

আশ্রয় ওর আজ এখানে আর নেই। দুর্বিষহ বন্দীদশায় একমাত্র যে

ছিল অবলম্বন, সেও আজ তাকে ত্যাগ করল ! আর কেন ? ঠাকুরই বোধ হয় ঘুচিয়ে দিয়েছেন তার বন্ধন।

কোথায় যাবে ? কেন, মা গঙ্গা তো আছেন !

পাগলের মতো গিয়ে গঙ্গাতেই ঝাঁপ দিল সে।

কিন্তু এর আগেও তো ঝাঁপ দিয়েছে অনেকে। ভক্তকে রাখবার জন্যে বুঝি ভগবান সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক।

গঙ্গা ওর মূর্ছিত দেহ এনে ফিরিয়ে দিয়ে গেল উত্তরপাড়ার এক ঘাটে। ভোর বেলা স্নান করতে এসে দেখল বেজা নাপতিনী। বেজার প্রধান পেশা আলতা পরানো—। আজকাল প্রায় বন্ধ। তাই সে প্রকাশ্যে করে ঘটকালী, গোপনে করে কুটনী-গিরি। রূপের ডালি রাধুকে পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে ভেবেছিল মরা তারপর কাছে এসে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বুক উঠছে দেখে বুঝতেই পারলে যে আত্মহত্যার চেষ্টা। একটা রিক্সা ডেকে এনে কোনমতে তুলে বাড়ী নিয়ে গেল। রিক্সাওয়লাকে বললে, 'আমার বোনঝি। মুচ্ছোর ব্যয়রাম আছে কি না ! নাইতে নেমে মুচ্ছো গেছে।'

বাড়ী গিয়ে জ্ঞান হ'ল। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দুদিন রাখলে। রাধু বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, বৃন্দাবনে যাবো।'

'ওমা, একা কী ক'রে যাবে ? তা বেশতো, যাবে যাও—পাড়ার বনোয়ারী-বাবু যাচ্ছেন—তাঁর সঙ্গে যাও। তোমাকে তো একা ছাড়তে পারিনি—তাহলে পুলিশে খবর দিতে হয় একটা।'

ঠিক ভয় নয়—হাঙ্গামের ভয়ে রাধু চুপ করে গেল। বেশ তো বনোয়ারী বাবুরা যখন যাবেনই—সেই সঙ্গে যাওয়া যাবে।

বনোয়ারী বাবু এক প্রৌঢ় মারোয়াড়ী—মোটা টাকার বিনিময়ে রাধুকে ভুলিয়ে ওর বাগান বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এল বেজা।

নির্জন বাগান বাড়ীর রুদ্ধ শয়ন ঘরে কামাতুর পুরুষের সামনে এসেও কিন্তু বিচলিত হল না রাধু। সব ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললে, 'দাঁড়ান, বসুন স্থির হয়ে—আমিই আপনার কাছে যাচ্ছি।'

তারপর কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'আচ্ছা ঠিক ক'রে বলুনতো—আমিই ত' প্রথম নই। এমন ঢের ভোগ করেছেন কিন্তু আশা

মিটেছে কি তবে? কিছুতেই যখন তৃপ্তি পান না, তৃষ্ণা যখন মেটে না তখন এই উঞ্ছবৃত্তি কেন করেন? কী ভোগ করতে চান—এই দেহটা? এমন তো বহু দেহই ভোগ করেছেন—বিশেষ তফাৎ আছে কি? অথচ কত নিচে নামছেন ভেবে দেখুন। এর জন্য কিছু দুশ্চিন্তা, কিছু উদ্বেগ—এতো ভোগ করতেই হয়। অথচ এমন জিনিস আছে যাতে সত্যিই তৃপ্তি পাবেন। তৃষ্ণা মিটবে—বুক জুড়িয়ে যাবে। বসুন—আজ আপনাকে আমি গান শোনাবো।'

পয়সা দিয়ে গান বহু শুনেছেন বনোয়ারীবাবু, কিন্তু এমন গান তো কখনও শোনেন নি! ও'র বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল, দু' চোখে জল ভরে এল, যখন শুনলেন—

'মীরা দাসী জনম জনম কী
মম অঙ্গসু অঙ্গ লাগাও, প্রভুজী,
মেরে চিত্তসু চিত্ত লাগাও!'

সমস্ত রাত ধরে চলল এই লীলা। গানের পর গান গায় রাধু—তন্ময় হয়ে—আর তন্ময় হয়ে শোনে বনোয়ারী।

ভোর হতে বনোয়ারী দুহাত জোড় ক'রে বললে, 'তুমি আমার নবজন্ম দিলে, আজ থেকে তুমি আমার মা-জননী। চলো মা, তোমাকে আমি নিজে বৃন্দাবনে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না বাবা। আমি একাই যাবো। তুমি শুধু আমায় একটা টিকিট কিনে দিও—'

হাওড়া স্টেশনে গাড়ীর জন্যে বসে অপেক্ষা করছে—হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কন্দর্প গোসাঁইর সঙ্গে।

গোসাঁই বললে, একবার আমার আশ্রম হয়ে যেতে হবে, কুঞ্জবিহারীকে তোমার গান শোনাবে না ভাই রাধারাণী?'

'চলুন।' বলে সহজেই ওর সঙ্গে যায় রাধু।

বীরভূমের এক গ্রামে ওদের আখড়া। পরিপাটি ঠাকুর-বাড়ী। অনেক-দিন পরে পরিচিত পরিবেশে প্রাণ জুড়িয়ে যায় রাধুর—সে মেতে ওঠে সেবায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, ঘুম ভাঙ্গানো থেকে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত—বিশ্রাম

নেই'।

কিন্তু তবু—একমন হ'তে পারছে কৈ? এ কী করলে ঠাকুর—তবু কেন থেকে থেকে সেই নিষ্ঠুর, সেই মধুর মুখই চোখে ভেসে ওঠে? কেন মনে হয় লোকটা বড় অসহায়—তার দিকটাও ওর ভাবা উচিত ছিল! মালা গাঁথতে কেন মনে ভেসে ওঠে সুঠাম একটি গলা—সাদা পাঞ্জাবী জামার ফ্রেমে আঁটা, ঈষৎ রৌদ্রদগ্ধ অথচ গৌর। চন্দন ঘষতে গেলে সেই স্বেদসিক্ত প্রশস্ত ললাটের স্বপ্নই দেখে কেন?

আজও কি পরীক্ষার বাকী আছে ঠাকুর?

অবশেষে একদিন কন্দর্পকে বলে, 'না দাদা, আমাকে ছুটি দিন, আমি বৃন্দাবনেই যাবো।'

অনিচ্ছাতেও ছুটি দিতে রাজী হয় কন্দর্প।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওর ভেতরের পশু তার ক্লেদাক্ত লালায়িত রসনা বার করে।

ওলে সবলে বুকে টেনে নিয়ে কন্দর্প বলে, আমি তোমাকে ভালবাসি রাধু—তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না।'

রাধু বিচলিত হয় না, টানাটানি করে না—শুধু শান্ত কণ্ঠে বলে, 'তুমি কি আমাকে তেমনি ভালবাসো যেমন আমার প্রাণের ঠাকুর বেসেছিলেন শ্রীমতীকে, যে প্রেমে তিনি গৌর হয়ে হা-কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ করে সারা জন্ম কেঁদে কেঁদে বেড়ালেন? তা যদি বেসে থাকো তা হলে আমার দেহটাকে ধরে রাখতে চেও না। প্রেমই তো সব, প্রেমেই তো প্রেমের তৃপ্তি। আর যদি তা না বাসতে পেরে থাকো তাহলে ভালবাসার কথা বলবার তোমার অধিকার নেই। আর তাহলে আজ এখন যা করতে যাচ্ছ সেটা হবে ব্যভিচার। তুমি গুরু, তুমি গোসাঁই—তুমি কুঞ্জবিহারীর সেবক,—তুমি এত নিচে নেমো না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত কন্দর্প গোসাঁই ছেড়ে দেয় ওকে, মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকে সে।

স্মিত প্রসন্ন হাস্যে ওর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ ক'রে গান গায় রাধু।

একটু পরে হাত জোড় করে কন্দর্প বললে, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো দিদি।'

ওর হাত দুটো ধরে ফেলে রাধু বলে, 'ছি! আমরা যে দুজনেই এক পথের

পথিক, একই লোকের সেবক !'

'তবে আর হুটো দিন থেকে যাও। আমার কুঞ্জবিহারীকে সেবা দিয়ে যাও তোমার। তোমার সঙ্গে, তোমার সাহচর্য পেয়ে ভালবাসতে শিখি আমার প্রাণের ঠাকুরকে। বলো যাবে না ?'

'বেশ ত। তুমি বলো তো থাকব। তিনি যেখানে আছেন সেই তো বৃন্দাবন। বোঝা গেল কিশোরীমোহন এই কুঞ্জবিহারী রূপেই সেবা চান !'

রাধুর সেবার আর তার মধুকণ্ঠের খ্যাতি ক্রমে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কন্দর্প গোসাঁইয়ের আশ্রমেও লোকের ভীড় হতে শুরু হ'ল। বহু দিন পরে এই আখড়া ভক্তের পদরেণুতে আবার তীর্থ হয়ে উঠল।

রাধু সেই ঝড় জলের রাত্রে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করার পর সুন্দরের আর শান্তি রইল না। সেও একটু পরেই বেরিয়ে পড়েছিল স্ত্রীকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু বোধহয় হুর্যোগের জন্মই দেখতে পায় নি। সেদিন সেই রাত্রে কোন জেলে নৌকো থেকে বিহ্যতের আলোয় দেখেছিল এক ভদ্র ঘরের মেয়েকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে—কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে সুন্দরের কানেও উঠল—সে খোঁজা বন্ধ করলে। তার আর সন্দেহ রইল না যে ঐ মেয়েলোকটিই রাধু।

কিন্তু যমের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেও শান্ত হতে পারল না। দিনরাত বুকের মধ্যে হু-হু করে ওর—অন্নজল বিষ হয়ে ওঠে মুখে। অফিসে যাওয়া ছেড়ে দিলে, বাড়ীতে থাকাও অসহ্য—তাই ছুটে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে থাকে। ওর মুখের চেহারা দেখে মা পিসিমার বুক শুকিয়ে যায়, কিন্তু কী করবেন ভেবে পান না।

এইভাবে দিন কাটতে কাটতে হঠাৎ একদিন সুন্দরের হাতে একটা হারানো কাগজ এসে পড়ল। বৈষ্ণবতন্ত্রের সাপ্তাহিক কাগজ, তাতে বড় বড় করে খবর দেওয়া হয়েছে যে বীরভূম জেলার কীর্ণাহার থানার অন্তর্গত রাসপুর. গ্রামের আখড়ায় এবার ফুলদোল উপলক্ষে প্রায় দশ হাজার লোক এসেছিল—মণ মণ চিঁড়া ও মুড়কির মালসা ভোগ দেওয়া হয়েছে—এ ছাড়াও ভক্তরা যে সব জিনিস এনেছেন পূজার জন্য—আজও তা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। এবার এখানে এত লোক সমাগম হওয়ার কারণ প্রধানত রাধারাণীমার মধু

কণ্ঠের কীর্তন ভজন। এই ভক্তিমতী তরুণী মহিলার সেবা ও সঙ্গীতের খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়েছে যে, বহু দূর দূরান্তর থেকে অনেক বৃদ্ধ ভক্তও ছুটে আসছেন এঁকে দর্শন করতে। ইত্যাদি—

রাসপুরের আখড়া! কন্দর্প গোসাঁইয়ের আখড়া! রাধারাণী মা! কীর্তন ও ভজন!

তবে—তবে কি ওদের সন্দেহই ঠিক! ব্যভিচারিণী রাধু গঙ্গায় ডোবে নি—কালামুখ নিয়ে গিয়ে কন্দর্প গোসাঁইয়ের ওখানেই উঠেছে?

তীব্র ঈর্ষার বিষে নীল হয়ে ওঠে সুন্দর। জ্বালায় ছটফট ক'রে পাগলের মতো ব্যর্থ ছুটোছুটি করে শুধু খানিকটা।

কিন্তু প্রথম আঘাতের তীব্রতা কমতে ঈর্ষার চেয়ে ভালবাসাই তার বড় হয়ে ওঠে। গঙ্গার তীরে বসে ভাবতে ভাবতে গঙ্গার ধারার বুকে ফুটে ওঠে ভক্তিমতী এক কুমারীর মূর্তি, ফুটে ওঠে তদ্‌গত-প্রাণা কল্যাণী স্ত্রীর ছবি। নির্মল, উজ্জ্বল মুখ, সহজ দৃষ্টি—এই মুখে পাপ?

না না। তা সম্ভব নয়।

আরও যখন বেলা যায় তখন মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, যে পাপই সে করুক বা না করুক—স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারবে না সুন্দর। রাধুকে তার চাই-ই, নইলে এ জীবনের কোন মূল্য নেই।

সে সেই দিনই ছোটে কীর্ণাহারের দিকে।

এধারে রাধুর দ্বন্দ্ব চলেছে অবিরত নিজের মনের সঙ্গে। যত সে বেশী ক'রে সেবায় মন দেয় ততই দেখে যে সুন্দর আছে সে মন জুড়ে। পাথরের দেবতাকে যা দিতে চায় তা মানুষ দেবতাকে দিলে বেশী খুশী হত।

সে কাঁদে আর মাথা কোটে দেবতার কাছে—

'তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়িয়াঁ
অব্ মোহে কেঁও তরসাও, প্রভুজী!'

এমন সময় একদিন সত্যিই সুন্দর এল, 'চলো রাধু, তোমাকে নিতে এসেছি।'

যদিও এই কণ্ঠস্বরের জন্য, এই শব্দ-কটির জন্যই সমস্ত মন ওর লালায়িত হয়েছিল, তবু এতদিনের নিরুদ্ধ অভিমানই বুক ফেটে বেরোল—

'তুমি ফিরে যাও। আমি যাবো না।'

মিনতি করে সুন্দর।

শেষে বলে, 'স্বামীকে ত্যাগ করবে ?'

রাধু উত্তরে গেয়ে ওঠে,

'মেরে ত গিরধারী গোপাল'

দুসরা না কোই !'

সুন্দর হতাশ হয়ে অপেক্ষা করে। স্নান আহারের আয়োজন ক'রে দেয় আখড়ার লোক। রাধুও বসিয়ে খাওয়ায় কিন্তু তবু যেতে রাজী হয় না। সুন্দর ক্লান্ত মন্থর পায়ে এক সময় গিয়ে গোরুর গাড়ীতে ওঠে।

সুন্দর চলে যাবার পরই রাধু ঠাকুর ঘরে ঢোকে। সে চোখ বুজে কুঞ্জবিহারীকে ধ্যান করতে যায়, দেখে সুন্দরকে। চোখ চেয়ে তাকায় দেখে বিগ্রহ নেই-সে জায়গায় সুন্দর বসে।

চিৎকার করে ওঠে, 'এ আমার কী হল।'

বৃদ্ধ বাউল গায়ক শ্রীদাম বাবাজী কদিন আখড়ায় এসে আছেন, তিনি হেসে উঠলেন 'বেটি ভালবাসতে চাস আমার ঠাকুরকে, অভিমান ত্যাগ করতে প্যারিস নি। আমার রাধারাণী কি সব কিছু বিলিয়ে দেন্ নি তাঁর কাছে—লজ্জা, মান, অহঙ্কার, অভিমান সব ? তুই ভালওবাসবি আবার এইগুলোও পুষে রাখবি। ছ্যাখ দিকি মা, ও তো সব ভুলে ছুটে এসেছে তোর দোরে ভিখিরি হয়ে !'

ওঁরই পায়ে আছড়ে পড়ে রাধু, 'কী করব তুমিই বলে দাও বাবাজী।'

'মানুষকেই ভাল করে ভালবাসতে পারলিনা মা, কোন্ অহঙ্কারে ভগবানকে ভালবাসতে যাস ! ও অসমাপ্ত ভালবাসা ত ভগবান নেবেন না। যা মা, তুই স্বামীর কাছেই ফিরে যা, তাকেই যদি ভালবাসতে পারিস শ্রীরাধা যেমন বেসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে—তাহলে দেখবি সেই ভালবাসাই ওঁর কাছেও পৌঁছে গেছে। স্বামীকে ভালবেসে চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকার প্রেম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।'

রাধুর মনে পড়ে যায় ওর বাবার কথাগুলোও ! যে মালা গেঁথেছিল কুঞ্জবিহারীর জন্য, সেই মালা নিয়েই উঠে পড়ে সে।

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠে, 'কোথায় চললে ?'

মাঠ ভেঙ্গে আল ডিঙ্গিয়ে ছোটে রাধু, 'এই মালা আমার কুঞ্জবিহারীকে

পরাতে যাচ্ছি।'

গোরুর গাড়ী আর কত দূর যাবে, ছুটে গিয়েই ধরতে পারবে সে

জনমত

একে অসহ্য ভীড় তায় দুঃসহ গরম। কামরার প্রত্যেকটি লোকই ভেতরে ভেতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। দু-একটা ছোটখাট ঝগড়া তো প্রতি মুহূর্তেই বেধে উঠ্‌ছে—কিন্তু সেই গরমের মধ্যে চেঁচামেচিও ভাল লাগছিল না বলে ভাল রকম বাধবার আগেই সকলে মিলে থামিয়ে দিচ্ছিলাম—যাকে বলে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

গত বছর পূজোর সময় সেটা। পূজো কনশেসনের ভীড়। আজকাল অর্ধেক কামরাই থাকে 'সংরক্ষিত', সীট রিজার্ভ না করলে ওঠবার উপায় নেই। ভুল বলছি—অর্ধেক নয়, বেশির ভাগই। ভাল ভাল ট্রেনগুলোর একটি মাত্র ক'রে বগী থাকে থার্ড ক্লাসের জন্যে—যাতে যে খুশি উঠতে পারে। আর সেকেণ্ড ক্লাসের মাত্র একটি কামরা। সীট রিজার্ভ করতে গিয়ে দেখেছি পরের দিন যে টিকিট দেবে সে টিকিটের জন্যে আগের দিন সন্ধ্যাতেই লম্বা লাইন পড়ে গেছে! অত সময় আর ধৈর্য আমাদের নেই—সুতরাং এই একটি বগীতেই উঠতে হয়েছে। বলং বলং বাহুবলং—সেই সনাতন ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি ভরসা।

ছোট কামরা, 'ষোলজন বসিবেক'—সে জায়গায় উঠেছি আমরা ষেটের জন পঁচিশ। একেবারে যাকে বলে সর্দি-গর্মির দাখিল। মালে ও মানুষে চাল পর্যন্ত ভরে উঠেছে গাড়ির ভেতরটা। তবু আমরা তো ভাল আছি, খবর পেলাম পাশের কামরাতে এইমাত্র রক্তারক্তি হয়ে গেল। এমন অবস্থা যে এমন মজার দৃশ্যটাও মুখ বাড়িয়ে দেখে উপভোগ করতে পারলুম না। যারা দোরের কাছে বা দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল তাদের-কাছ-থেকে-পাওয়া বাসি খবরে খুশী থাকতে হ'ল।

এই অবস্থা. বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, কখন ট্রেন ছাড়বে। জানি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লোক আসবে—অথচ এর ভেতর আরও লোক উঠবে ভাবতেই

মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঠাকুর ঠাকুর করছি—কোনমতে ছাড়লে হয়!

কিন্তু ঠাকুর আমাদের কথা শুনলেন না। একেবারে ছাড়ার ঠিক আগে একটি লোককে ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দিলেন। ওঁদেরই চেলাচামুণ্ডা দলের—অর্থাৎ গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী!

তা লোকটির বাহাদুরী আছে মানতেই হবে। দরজার কাছে সেই নিরেট নিরন্ধ্র ভীড়— বাইরে হ্যাণ্ডেল ধরেই ঝুলছে অন্ততঃ জনা আষ্টেক লোক, তার মধ্যে কী করে যে তিনি এক সময় ভেতরে এসে দাঁড়ালেন তা বোধ করি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। অথবা সন্ন্যাসীটিরই কোন অলৌকিক ক্ষমতা।

প্রতিবাদ কিছু কম হয় নি। ঠেলাঠেলির অবশ্যম্ভাবী ফল গালাগালিও বর্ষিত হয়েছিল প্রচুর। চেঁচামেচির একটা তুফান উঠেছিল বলতে গেলে কিন্তু স্বামীজী নির্বিকার। তিনি কারুর কথার প্রতিবাদ করলেন না, গালি গালাজের উত্তর দিলেন না—তেমনি কারুর বাধাকেও গ্রাহ্য করলেন না। যে কোন এক ঐশী শক্তির বলে অথবা জাদু প্রভাবেই অবলীলাক্রমে এগিয়ে এসে একটা পাখার নিচে দাঁড়ালেন।

বলা বাহুল্য তাঁর এই ঔদ্ধত্য ও অবিবেচনায় আমরা সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। অথবা অনেকক্ষণ ধরে অনেক কারণেই বিরক্ত হয়ে ছিলাম—এখন সেই বিষ উদ্গীরণ করবার মতো একটা লাগসই আধার পেয়ে বাঁচলাম। হঠাৎ যেন এক মুহূর্তে এই কামরার পঁচিশ ছাব্বিশ জন লোক এককাঠ্‌টা ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। সকলের মনের চাপা বিষ গল্‌গল্‌ ক'রে বেরিয়ে আসতে লাগল। গালিগালাজ বিদ্রূপ বক্রোক্তি; যার তূণে যা ছিল সবাই ঐ একটিমাত্র লোককে লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ করতে লাগল।

কিন্তু সেই লোকটি—সকলকার 'সাধারণ শত্রু', ইংরেজীতে যাকে বলে 'কমন এনিমি'—সেই সন্ন্যাসী কিন্তু অবিচল। তাঁর কোন ভাব-ভঙ্গীতে একবারও মনে হ'ল না যে এর একটি বর্ণও তিনি বুঝতে পারছেন বা তাঁর কানে যাচ্ছে। এক সময় এমনও সন্দেহ হ'ল যে তিনি হয়ত জন্ম-বধির এবং সেই কারণেই বোবা। কিন্তু হঠাৎ ডাউন লাইন দিয়ে একটা ট্রেন যাবার আকস্মিক শব্দে চমকে উঠে সেদিকে তাকাতে বুঝলুম আর যাই হোক—তিনি কালা নন।

কিন্তু তাহলে এমন নির্বিকার আছেন কেমন ক'রে?—এমন প্রসন্ন

উদাসীন ? এমন নিরাসক্তি কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

এতক্ষণে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। লম্বা চওড়া গৌরবর্ণের মানুষ। জটাধারী ছাইমাখা সন্ন্যাসী নয় তা বলাই বাহুল্য। মাথা ও দাঁড়ি-গোঁফ চাঁচা আধুনিক স্বামীজী। অর্থাৎ গেরুয়া বহির্বাস ও গেরুয়া রঙের কাঁধ ঝোলাটি না থাকলে সন্ন্যাসী বলে চেনবার উপায় নেই। গেরুয়া জামাও আছে একটা অবশ্য —তা সে তো আজকাল অনেক গৃহীও পরে। তবে রংটা ঠিক পুরো-পুরি গেরুয়া নয়—কমলালেবু রঙ, ঈষৎ রক্তাভ। অর্থাৎ পরিচিত কোন মঠ-মিশন-সঙ্ঘের সাধু নন—কিছু স্বতন্ত্র। হয়ত স্ব-সঙ্ঘেরই।

কিন্তু বেশভূষা যাই হোক—রিপু যে তিনি জয় করতে পেরেছেন—অন্তত দ্বিতীয় রিপু—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমরা এতগুলি লোক মিলে যে সম্মিলিত 'সাঁড়াশি আক্রমণ' চালালুম, তাতে বোধ হয় হিমালয়েরও মাথা গরম হয়ে উঠত। কিন্তু তিনি সেই প্রথম যখন গাড়িতে উঠলেন তখনও যেমন দেখেছিলাম, প্রশান্ত ললাট কোথাও কোন উষ্মা বা বিরক্তির কুঞ্চন নেই সেখানে—সুন্দর সুঠাম অধরে স্মিতপ্রসন্ন একটি হাসির ভঙ্গী—এখনও ঠিক তেমনি। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। যেন মনে হ'ল তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এতগুলি লোকের কটূক্তি সহ্য করছেন না—কোন সম্বর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে লেখা মানপত্র পাঠ শুনছেন !

এমন লোককে আর কত গালাগালি করা যায়—ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল সবাই। তবে একেবারে বন্ধ হল না। কটূক্তিটা বক্রোক্তির পথ ধরল মাত্র।

এক ভদ্রলোক বললেন, 'সাধে কি নেহরু ওদের দু'চোখে দেখতে পারে না। সোস্যাল প্যারাসাইট্ বলে ঘেন্না করে। শুধু পরের পয়সায় বসে বসে খাবে এই লোভে ওদের গেরুয়া নেওয়া, ছ্যাঃ !

আর একজন বললেন, 'প্যারাসাইট কি বলছেন। সোস্যাল পেস্ট ! ...গ্যাংগ্রীনের মত সমাজ দেহটাকে পচিয়ে তুলেছে একটু একটু ক'রে।'

আর একজন বললেন, 'ঠিক বলেছেন, ক্যান্সার ! কুরে কুরে খাচ্ছে। অলিগলিতে দেখি সন্ন্যাসী—আর মহাপুরুষ। আজকাল আবার এটা হয়েছে একটা বড়মানুষির অঙ্গ—এই সন্ন্যিসী দেখে গুরু করা। তার ফলে আমাদের হয়েছে মশাই প্রাণান্ত ! পাড়ার সব বড়লোকদের বাড়ি একজন ক'রে গুরু

আসবেন .মধ্যে মধ্যে—আর আমাদের বাড়ির মেয়েরা ছুটবেন মহাপুরুষ দেখতে। ফুলের মালা আছে, সন্দেশ আছে, প্রণামী আছে—একগাদা খরচাস্ত। তারা তো ওসব ছোটখাটো জিনিস গ্রাহ্যই করে না—দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলিয়ে দিয়ে নির্লোভ নাম কেনে—আসল চীজ, রূপচাঁদ ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না—সে যাই হোক আমাদের মতো গরীব গুর্বোর পক্ষে ঐ খরচাই কি কম! এ কী ঘোড়ারোগ বলুন তো! আবার বলে মন্তর্ নেব। আমার বাড়ির ইনি তো বাতাসের আগে ছোটেন, সন্ন্যাসী দেখলে হয় একবার!'

আর একজন মৃদুকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলেন, 'তা মিশনের ওঁরা কিন্তু অনেক কাজও করেন—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে পূর্বের বক্তা বলে উঠলেন, তাঁরা তেমনি শিষ্য-ত্রাণ করতে আর পয়সা কুড়োতে শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি মাইফেল খেয়ে বেড়ান না। সে সময় তাঁদের নেই। এই সব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সন্নিসীদেরই ভয়!'

এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এর মধ্যেই তাঁর ছোট কল্‌কেটি ম্যানেজ করেছিলেন, তিনি জানালার দিকে মুখ ক'রে ধোঁয়াটা ছেড়ে নিয়ে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'সাধু মহাত্‌মা কভি এয়সা হোতা হ্যায়? উ লোক পাহাড়মে তীরথমে রহতা হ্যায়। এয়াসে শহরমে বাজার মে থোড়াই আয়গা কোই আচ্ছা মহাত্‌মা!' ···এই ইসব ভ্রস্ট্‌ হ্যায় বাবুজী। বিলকুল ভ্রস্ট্!'

কিন্তু, এই সব উক্তির লক্ষ্য যিনি—হিন্দী বা বাংলা কোন আক্রমণই তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল বলে মনে হল না। তিনি যেমন সহজভাবে সামনের নোটিশটির দিকে তাকিয়েছিলেন তেমনই রইলেন, মুখের শান্ত প্রসন্নতা এতটুকু নষ্ট হ'ল না।

ক্রমশ সকলেই শ্রান্ত হয়ে চুপ করল এক সময়। যথাসাধ্য গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল সবাই। কষ্ট হচ্ছে সকলকারই—তার ওপর অনর্থক কত বকা যায়? একটু একটু ক'রে কামরার ভেতরটা থিতিয়ে এল।

এক্সপ্রেস ট্রেন। বড় বড় কটা স্টেশন পার হয়ে গেল। দুএকজন

যে আরও ওঠবার চেষ্টা করল না তা নয়, নেহাৎ অসম্ভব বলেই পারল না হয়ত। কে যেন বললে এসব স্টেশনে টিকিট বিক্রী বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তা হবে। আসল কথা আমরা সকলেই একান্ত ক্লিষ্ট—কিছুতেই যেন আমাদের আর কোন কৌতূহল নেই। শুধু এই কষ্টকর পথ কখন শেষ হবে—এই একমাত্র চিন্তা।

ক্রমে রাত গভীর হ'ল। যে যেখানে ছিল সকলেই ঢুলতে শুরু করল! মায় যাঁরা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত। খাওয়ার চেষ্টাও করলে দু'একজন। স্টেশনের খাবারওলারা এদিকে এসে পৌঁছতে পারছে না। যা দু'একটা জিনিস আসছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না। শুধু 'চা' শব্দটা কানে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে, কোন কোন জানলার-ধার-রূপ স্বর্গের অধিবাসী দয়া ক'রে দু'এক ভাঁড় এগিয়ে দিচ্ছেন—যাকে বলে ডাক বসিয়ে দেওয়া—সেই উপায়ে, আবার সেইভাবেই পয়সাও পৌঁচচ্ছে চাও'লার কাছে। মাড়োয়ারী দুজন বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলেন। আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল কিন্তু সে ঝুড়িটা যে এখন কোথায় তা খুঁজে বার করা আমাদের সাধ্যাতীত—অগত্যা আহারের ইচ্ছা সম্বরণ করলুম। একটা রাত না খেলে মানুষ মরে যায় না।

ঢুলছি সবাই। মধ্যে মধ্যে চমক ভেঙ্গে ঘড়ি দেখছি রাত আর কত বাকী।

কোমর কন কন করছে, হাঁটু দুটো খসে যাচ্ছে দু'টো য়্যাসপিরিন খেয়েছি—আর খেতে ভরসা হচ্ছে না। সকাল হ'ল দু'চারজন নামবে—এই যা আশা। পা দুটো হয়ত তখন কিছু মেলতে পারব।

এমনি এক চমক ভাঙ্গার অবসরে তাকিয়ে দেখি সাধুজী কখন দিব্যি জেঁকে বসেছেন। একটু উচ্চাসন অবশ্য—মানে একটা ট্রাঙ্কের ওপর পর পর দুটো হোল্ড-অল-এ বাঁধা বিছানা, তার ওপর উঠে বসতে হয়েছে—তবু আমাদের চেয়ে ঢের ভাল আছেন। কখন এটা 'ম্যানেজ' করলেন কে জানে, চেয়ে দেখলুম আর কেউই এ ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারেন নি। যাঁরা যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা এখনও দাঁড়িয়েই আছেন। তবে স্বামীজী ঢুলছেন না একটুও, ঠিক যেমন ঐ নোটিশটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তেমনিই আছেন। মুখেরও যে প্রসন্নতা এতটুকু ম্লান হয় নি—শুধু তখন দাঁড়িয়েছিলেন, এখন বসেছেন এই মাত্র।...

কী একটা বড় গোছের স্টেশন এল। 'চা' 'চা'—রব পড়ে গেল চারিদিকে। 'এই চা—এ গরম চা, ইধার আও। ইধার। জলদি!' ইত্যাদি। সকলেই দেখলাম একটু সোজা হয়ে বসবার বৃথা চেষ্টা করলেন একবার ক'রে। আগের মতোই ডাক বসানো চা এদিকে আসতে লাগল। হঠাৎ আমাদের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি এক কাণ্ড ক'রে বসলেন, এক ভাঁড় চা স্বামীজীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পিজিয়ে গা, মহারাজ?'

স্বামীজী তাঁর শান্ত নিরুদ্বিগ্ন চোখদুটি দেওয়ালের নোটিশ থেকে নামিয়ে এনে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন একবার, তার পর মুখের আর একটু প্রসন্ন ভঙ্গী ক'রে বললেন, 'দিজিয়ে!'

ভাঁড়টা নিয়ে দু-হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বোধকরি বা ধন্যবাদই দিলেন ভদ্রলোককে তারপর মুহূর্তকাল চোখ বুজে—সম্ভবতঃ চা-টাও ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করে বেশ সহজেই খেতে লাগলেন।

একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিই 'বিলকুল ভ্রস্ট্' বলেছিলেন না?

অবশ্য আরও অবাক হলাম আর একটু পরে—যখন তাঁর চা-পান শেষ হ'তে 'সোস্যাল প্যারাসাইট' আখ্যাদাতা ভদ্রলোকটি শশব্যস্তে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দিন স্বামীজী' আমি ফেলে দিচ্ছি—'

এতক্ষণে সেই ভাবলেশহীন পাথরের মুখে একটু ভাবান্তর দেখা দিল। ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আপনাকে আবার এটা—।'

'তাতে কি হয়েছে? আপনি নামবেনই বা কি ক'রে। ও কোন সঙ্কোচ করবেন না—সামান্য ব্যাপার!'

আর কথা বাড়ালেন না স্বামীজী। নিঃশব্দে শূন্য ভাঁড়টা এগিয়ে দিলেন।

এ স্টেশন থেকেও ট্রেন ছাড়ল। আবার শুরু হ'ল দুলুনি ও ঢুলুনি। আমরা যে যার ভাগ্যের কাছে আবার আত্মসমর্পন করলাম কিছুক্ষণের জন্য। গাড়ির মধ্যেটা আবার স্তব্ধ হয়ে এল।

একেবারে সচকিত হয়ে উঠলাম আবার ভোরের দিকে। কী-একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কিন্তু তার জন্যে নয়—এমন তো থামছেই—

এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে সেই সাধুটি নেমে গেলেন। এবার অবশ্য আর তাঁকে কিছু কসরৎ করতে হ'ল না, যোগবিভূতিরও শরণ নিতে হল না—এবার সবাই যেন সযত্নে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। তিনি তাঁর কাঁধ-ঝোলা ও স্যুটকেসটি নিয়ে অনায়াসে নেমে গেলেন।

তখনও তাঁর তেমনি শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাব, স্মিত প্রসন্ন মুখ।

সারারাত্রি জাগরণেও এতটুকু কালিমা লাগতে পারেনি সে মুখে।

এবার ট্রেন ছাড়লে আবার ঢুলুনি শুরু হল বটে কিন্তু তন্দ্রার ভাব আর এল না। ওদিক থেকে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে কে একজন এগিয়ে এসে সাধুজীর পরিত্যক্ত আসনে বসলেন। আমাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তনই হ'ল না। সমস্ত শরীরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। যদি একটু দাঁড়াতেও পারতাম!

সুতরাং ঢুলুনির বদলে আবার শুরু হ'ল বকুনি। অর্থাৎ আমাদের কামরার ঘুম ভাঙল।

'সোস্যাল প্যারাসাইট'ই প্রথম কথাটা পাড়লেন। বললেন, 'আমাদের বোধহয় কাল একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল—কী বল হে শঙ্কর? অতটা বলা—লোকটা একটা কথারও জবাব দিল না, বিন্দুমাত্র অফেন্স নিলে না—তা' লক্ষ্য করলে? খুব কিন্তু সহ্যগুণ।'

শঙ্কর অর্থাৎ 'গ্যাংগ্রীণ' মুখটা কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, 'হুঁ, তাই ভাবছিলাম—কিছু বোধহয় আছে লোকটির মধ্যে। একটু উর্ধ্বে না উঠলে ঠিক অতটা উদাসীন হওয়া যায় না। বোঝা তো মুস্কিল—কার ভেতর কি আছে? আমাদেরই একটু সংযম অভ্যাস করা দরকার দেখছি। অত টপ ক'রে কারুর সম্বন্ধে ওপিনিয়ন পাস করা—'

বাক্যটা অসমাপ্ত রেখে শঙ্করবাবু চুপ করলেন, অর্থাৎ আত্মচিন্তায় ডুবে গেলেন। অনুশোচনাও বলা যেতে পারে।

তাঁর পাশ থেকে 'ক্যানসার' বলে উঠলেন, 'ঘৃণা লজ্জা, ভয়—তিন থাকতে নয়। মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিকে জয় করতে না পারলে তো, তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার জো নেই। পরমহংস অবস্থা না তুরীয় অবস্থা কি বলে—তারই ফার্স্ট স্টেজ যে ওটা!'

প্রথম ভদ্রলোকটির কণ্ঠে এবার রীতিমতো অনুতাপের সুর।

'না' আমাদের বোধ হচ্ছে একটু অন্যায়ই হয়ে গেল। লোকটার মধ্যে কিছু আছে। আমরা একহাত নিতে গিছলুম—উনিই একহাত নিয়ে গেলেন আমাদের ওপর। ছি-ছি—না জানি কি মনে করলেন!'

শঙ্করবাবু বললেন, 'উহু-উহু—মনে করবার লোক নয় ওসব। আমাদের ছেলেমানুষি দেখে একটু হেসেছেন বড়জোর। মানুষের দুর্বলতা তো ওদের জানতে বাকী নেই। আমি বাজী রেখে বলতে পারি—উনি ক্ষমাই ক'রে গেছেন আমাদের!'

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি এবার বেশ একটু গর্বের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হাম সমঝ লিয়া কি ইয়ে সাধু ভ্রষ্ট নেহি হ্যায়—ইয়ে সচ্চা মহাত্মা হ্যায়। ঐ জন্যে তো হামি আগে ভাগে ওঁকে চায় অফার করলাম। কী কুছু দয়া রাখবেন হামার উপর। বাস্‌রে বাস্—এৎনা গালি দিয়া হামলোক, পাত্থর হোনেসে ভি উস্‌কা খুন গরম হো জানা চাহিয়ে। লেকিন উ পাত্থর ভি নেহি হ্যায়—উ দেওতা!' হাত তুলে তিনি উদ্দেশে একটা প্রণামও করলেন।

আবারও দেখতে দেখতে আমরা এ গাড়ির প্রায় তাবৎ আরোহী এক কাট্টা হয়ে উঠলাম। আবারও সেই সাধুর আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল সমগ্র কামরা। শুধু যা রংটা বদলেছে সে আলোচনার। হাওয়া এবার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

দেখতে দেখতে সেই ভণ্ড জোচ্চোর পরাশ্রয়ী পরান্নভোজী মতলববাজ ঠক প্রতারক, গেরুয়ার অমর্যাদাকারী লোকটি—সাধু ব্রহ্মজ্ঞ পরমহংসে পরিণত হলেন। লোকটা যে একটু 'উর্ধ্বে' উঠেছে, 'তাঁর' দিকে যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে—এবিষয়ে আর আমাদের কারুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। আমরা সকলেই আমাদের হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত। সত্যি, কোন মানুষের ওপরই—অন্তত একটু না বাজিয়ে বা তার সম্বন্ধে কিছুটা না জেনে—এমন ভাবে মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়। আমাদের সকলকারই শিক্ষা হয়ে গেল খুব। ভবিষ্যতে সকলেই সাবধান হয়ে চলব। আর লাভটাই বা কি হ'ল? মাঝখান থেকে নিজেদের কালি নিজেদের কাছেই ফিরে এল। আর লোকটি শুধু চুপ ক'রে থেকে অনায়াসে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন। নীরব ধিক্কারে আমাদের প্রগল্‌ভতাকে লজ্জা দিয়ে গেলেন।

আকাশের দিকে থুতু ফেলতে গেলে যে এমনি ক'রেই নিজের দিকে ফিরে

আসে।

এর মধ্যেই আর একটা বড় স্টেশনে গাড়ি এসে থামল সম্ভবত বাঁকিপুর বা পাটনা জংশন। আমাদের কামরাতেও একটা চাঞ্চল্য জাগল। দুতিন জন এখানে নামবেন। একটু নিঃশ্বাস ফেলা যাবে হয়ত।

একটি লোক হাওড়াতেই কখন একটা বাক্সের ওপর মালপত্র সরিয়ে সামান্য একটু বসবার মতো জায়গা করে নিয়ে ঠেলে-ঠুলে উঠে বসেছিলেন এবং তারপর অবিরাম অধ্যবসায়ের ফলে বহুক্ষণ ধরে মালগুলো ঠেলতে ঠেলতে তিল তিল ক'রে সরিয়ে একটু কাৎ হতেও পেরেছিলেন। ব্যস্—তারপর আর তাঁর ঐ দুর্লভ সুখস্বর্গ থেকে একবারও নামেন নি তিনি। সেই থেকেই ঘুমোচ্ছেন সমানে। এর মধ্যে একবারও চোখ মেলেন নি, চা খান নি, বাথরুমে যাবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এবার তাঁরও ঘুম ভাঙ্গল। ভদ্রলোকটি বাঙ্গালী। 'কোথায় এল মশাই' বলে শূন্যে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে যেমন শুনলেন—'পাটনা জংশন' অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। সম্ভবতঃ তাঁকেও এখানে নামতে হবে।

তারপরই সবাইকে ঠেলে-ঠুলে ধাক্কা দিয়ে—মুখে 'একটু দেখি সার, কাইগুলি, থোড়া মেহেরবাণী করকে' বলতে বলতে একরকম নীচের লোকগুলোর ঘাড়ের ওপর দিয়েই নেমে পড়লেন। তারপরই কাছাটা আঁটতে আঁটতে সামনের র‍্যাকটার দিকে হাত বাড়িয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'আমার স্যুটকেস?'

সে আর্তনাদে নিমেষের মধ্যে আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তবু কেউই খুব চিন্তিত কি উদ্বিগ্ন হই নি। এইটুকু জায়গার মধ্যে এতগুলো লোক আর তাদের মাল—শরৎবাবুর ভাষায় 'সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতোই' মিশে গিয়েছে। সুতরাং একটা স্যুটকেস যদি চাওয়া মাত্র খুঁজে পাওয়া না যায় তো এত উদ্বেগের কি আছে?

'দেখুন না ঐ দিকটায়—'

'কোথায় রেখেছিলেন মনে নেই?'

'কি রকম স্যুটকেস? চামড়ার না টিনের?

'এই যে, এটা কার? এই ঢাকা দেওয়া?'

'হাঁ হাঁ—ওকি ওযে আমার স্যুটকেস মশাই।'

ইত্যাদি সম্মিলিত শব্দের কোলাহলের মধ্যে থেকে ভদ্রলোকটির আর্তনাদ আবারও প্রবল হয়ে উঠল, 'না-না—আমি যে এই র‍্যাকটার ওপর রেখেছিলুম ঠিক চোখের সামনে হবে বলে। রাত্তিরে দু-তিনবার চোখ খুলে খুলে দেখেওছি। মিশে যাবার তো কথা নয়। কী সর্বনাশ—একরাশ টাকা ছিল যে তার মধ্যে।'

শুনলুম সামান্য মাল রাখবার জন্য যে স্টীলরডের ছোট র‍্যাক থাকে—আগেকার টুপি রাখা র‍্যাকের মতো, সেই র‍্যাকেই ছিল স্যুটকেসটা। ঠিক যেখানটা সেই মহারাজা বসেছিলেন, তাঁর মাথার কাছে—

একই সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের মতো কথাটা আমাদের অনেকের মাথাতেই খেলে গেল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম আমরা।

সেই স্বামীজীই তো নামবার সময় স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে গেলেন। এতক্ষণ কারুরই খেয়াল হয় নি কিন্তু এবার মনে হচ্ছে—ওঠবার সময়, যখন সকলকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তো কাঁধ-ঝোলাটা ছাড়া তাঁর সঙ্গে কিছু ছিল বলে মনে হচ্ছে না।

মূঢ়ের মতো পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম আমরা—। এবার কামরার ভেতরটা পুনরায় মুখর হয়ে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

সভাপর্ব

বিনোদবাবু যখন থেকে কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন তখন থেকেই বোধ হয় সাধটা মনে ছিল, কিম্বা তারও আগে থেকে—

ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই তো সভা-সমিতির উদ্যোগ আয়োজন ক'রে আসছেন; তোষামোদ ক'রে সভাপতি ঠিক করা, গাড়ি ক'রে তাঁকে আনতে যাওয়া, ফুলের মালা দেওয়া, ভাল ভাল মিষ্টি এনে খাওয়ানো আবার গাড়ি ক'রে তাঁকে পৌছে দিতে যাওয়া—এই রাজকীয় সমাদরের পর্বে পর্বে জড়িত থাকতেন তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও আয়োজনে তখন মনে হ'ত যে, এই সভাপতি হওয়ার চেয়ে সৌভাগ্য মানুষের আর কিছু নেই। অথচ এর জন্য বিশেষ যে গুণ দরকার সেটা তো হ'ল ঈষৎ সাহিত্য রচনার অভ্যাস।

বিনোদবাবু ছেলেবেলায় যে সব সভার উদ্যোক্ত-দলে থাকতেন বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই সাহিত্য বা সাহিত্য ঘেঁষা সভা, সুতরাং সেখানে সভাপতিত্ব করার জন্য সাহিত্যিকদেরই প্রয়োজন হ'ত। তা সাহিত্য রচনাটা তখন এমন কিছু কঠিন বলে বোধ হয় নি। বিনোদবাবু তাই স্থির করেছিলেন—কাজ-কর্ম যাই করুন না কেন, ও অভ্যাসটা রাখবেন। কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লেখাটা সেই সংকল্পেরই ফল বলা চলে।

পরবর্তী কালে লেখাটা অবশ্য হয় নি—কিন্তু লেখাপড়াটা হয়েছিল। আর সেই জোরেই, বেশ নামকরা এক কলেজে অধ্যাপনার চাকরিও পেয়েছিলেন। সাহিত্যেরই অধ্যাপক অবশ্য, তবু তাঁকে যে কেউ অচিরে সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করার জন্য ডাকবে, এ আশা তাঁর মনে ছিল না। সাহিত্যিক যেমনই হোক, সভার জন্য তার ডাক পড়ে কিন্তু অধ্যাপকদের সেজন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। অবশ্য যাঁরা সাহিত্যিক অধ্যাপক তাঁদের কথা আলাদা।

সুতরাং প্রস্তাবটা যখন এল তখন বিনোদবাবু খুশীই হলেন। কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী উৎসব—বিনোদবাবুকে তাঁরা পেতে চায়। কলকাতার কাছে, খুবই কাছে তাদের গ্রাম, হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র আট মাইল—যাওয়া-আসার কোন অসুবিধা নেই; যেতেই হবে বিনোদবাবুকে। তারা ওঁর কোন আপত্তিই শুনবে না।

বলা বাহুল্য—দু-একবার যথাদস্তুর, 'না-না, আবার অত দূরে যাওয়া' ইত্যাদি ক্ষীণ আপত্তি তোলবাব পরই বিনোদবাবু রাজী হয়ে গেলেন। স্থির হল যে, ওরা অতঃপব চিঠি ছাপিয়ে, ছাপা চিঠি এনে ওঁকে দিয়ে যাবে এবং যাওয়ার কী ব্যবস্থা জানিয়ে যাবে।

এর পর বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হ'ল বিনোদবাবুকে। শেষের দিকে একটু উদ্বিগ্নচিত্তেই। উদ্যোক্তারা আবার দেখা দিল, সভার নির্দিষ্ট তারিখের ঠিক আগের দিন—যখন ওদের আশা প্রায় ছাড়তেই বসেছেন বিনোদবাবু। যাই হোক, ছাপা চিঠি হাতে ক'রেই এসেছে ওরা। দস্তুরমতো ওঁর নাম ছাপা তাতে। কমদামী কার্ড, ছাপাও তত ভাল নয়, অসংখ্য ছাপার ভুলে ভর্তি এমন কি ওঁব নামটাও ভুল—বিনোদলালের জায়গায় বিনোদবিহারী ছাপা হয়েছে—তবু খুশীই হলেন বিনোদবাবু। কার্ডখানা বার কতক নাড়াচাড়া

করে ঈষৎ লোক-দেখানো উপেক্ষা ভরে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'তারপর, কাল নিতে আসছেন কখন ?'

একটি বেশ বলিষ্ঠ গোছের ছোকরা এদের মুখপাত্র হয়ে কথা কইছিল, বঙ্কা বলে ডাকছিল তাকে সবাই, সে বললে, সেইটেই তো স্যার বলতে আসা আরও। একটু যদি আপনি কষ্ট করতে পারেন তো বড় ভাল হয়। আমাদের ওখানের বলাইবাবু উকীল, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই—একেবারে এ ক্লাস ল-ইয়ার স্যার—তিনি ব্যাঁটরায় থাকেন কিনা, হাওড়া স্টেশন হয়েই যেতে হয়। তিনিই আপনাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। তবে স্যার—বড্ড বিজী ল-ইয়ার কিনা স্যার—তিনি, মানে, আপনি যদি একটু পা-পা করে আলিপুর কোর্ট পর্যন্ত এগিয়ে যান—মানে আপনার কলেজের কাছেই তো—তাহ'লে স্যার বড্ড ভাল হয়। এটুকু যদি আমাদের মুখ চেয়ে করেন—না হয় তো একখানা রিক্সাই নেবেন বরং, কতই বা পড়বে, ফাইভ কি সিক্স য়্যানাস্—বড় জোর।'

একটু ক্ষুণ্ণই হলেন বিনোদবাবু। সভাপতির সমাদর সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, তার সঙ্গে একটা বড় রকমের গোলমাল হচ্ছে কোথায়। কিন্তু তবু চক্ষুলজ্জাবশত কিছু বলতেও পারলেন না, শুধু ক্ষীণকণ্ঠে একবার বললেন, 'কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি না, গাড়িও—

'কিছু না কিছু না স্যার, কোন অসুবিধাই হবে না। গাড়ির নম্বর দিয়ে দিচ্ছি, বিরাট গাড়ি, খুঁজে নিতে এতটুকু দেরি হবে না। গিয়ে গাড়ির দরজাটি খুলে শুধু উঠে বসা। তার পর সবই বলাই দা জানেন, সারা জগৎটা স্যার ওঁর নখদর্পণে বলতে গেলে—নইলে কী আর এই বয়সে একান্ন টাকা ফী করতে পেরেছেন—মোদ্দা উনি আপনাকে ঠিক হাওড়ায় পৌঁছে দেবেন। তারপর স্যার আমাদের চার্জ, আপার ক্লাস বুকিং-এর সামনে বড় ঘড়িটার নিচেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকব স্যার, অন ডিউটি !·· আচ্ছা স্যার আসি আজ —নমস্কার !'

পরের দিন যথাসময়ে, বরং কিছু আগেই, আলিপুর জজ কোর্টের দিকে রওনা হলেন বিনোদবাবু। এটুকু পথের জন্যে আর রিক্সা নিতে ইচ্ছা হ'ল না, বিশেষ সে 'সিক্স য়্যানাস্' যখন তারা দিয়ে যায়নি—তিনি আস্তে আস্তে হেঁটেই চললেন। তবু শেষ পর্যন্ত যখন আদালতে পৌঁছলেন তখন তাঁর

খোপদস্ত মটকার পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে উঠেছে, কাঁধের ওপরে সাদা গরদের চাদরটা অসহ্য লাগছে।

সাড়ে তিনটের পৌঁছবার কথা, তিনটের মধ্যেই পৌঁছলেন বিনোদবাবু কিন্তু গাড়িটা ঠিক কোথায় থাকবে জানা ছিল না বলে বেশ একটু ঘুরতে হ'ল তাঁকে।

বিস্তর খোঁজা-খুঁজির পর অবশেষে যখন সেই গাড়ির অরণ্যের মধ্য থেকে বিশেষ গাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল তখন তাঁর গোটা জামাটাই বলতে গেলে ভিজে ন্যাতা হয়ে উঠেছে। সে অবস্থায় আর যা-ই হোক সভাপতিত্ব করতে যাওয়া উচিত নয়। অথচ তখন উপায়ই বা কি, বিনোদবাবু অসহায়ভাবে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে এসে গাড়ির কাছে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রচণ্ড ধমক এল গাড়ির মধ্যে থেকে, 'নিন না, উঠে পড়ুন না, হাওয়াটা না হয় যেতে যেতেই খাবেন! ঝাড়া কুড়িটি মিনিট বসে আছি এই হাপরের মধ্যে!'

থতমত খেয়ে বিনোদবাবু নিজেই গাড়ির দরজাটা খুলে উঠে পড়লেন। বেশ একটু কাঁচ-মাচু মুখেই বললেন, 'কিন্তু এখনও তো নির্দিষ্ট সময়ের— মানে এইতো সবে তিনটে কুড়ি—'

'তাতে কী হয়েছে। আমাদের কি অত একেবারে সময় বাঁধা থাকে নাকি? সে থাকে চাকুরেদের। আমাদের কাজ আগেও মিটতে পারে, এক ঘণ্টা দেরিও হ'তে পারে। আপনি না হয় একটু আগেই আসতেন। আপনার সময়ের দাম কি? আমার আধ ঘণ্টা মানে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা!'

বিনোদবাবুর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল, তবু কথা বাড়াতে আর প্রবৃত্ত হ'ল না তাঁর, চুপ ক'রেই রইলেন।...

হাওড়ার পুল পেরিয়ে স্টেশানের দিকে বাঁক ঘোরবার জায়গাটায় এসে ঘ্যাঁচ ক'রে থেমে গেল গাড়িটা। গাড়ির মালিক সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নিন নিন, নেমে পড়ুন চটপট! এখানে আবার বাঁধতে দেয় না—

বিনোদবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু স্টেশান তো এখনও দূর—'

'হ্যাঁ, একেবারে আড়াই শো মাইল! ঐ তো স্টেশান, দেখতে পাচ্ছেন না? এই দু'কদম হেঁটেই বেশ যেতে পারবেন। তার জন্যে আমি এখন

পনেরো মিনিটের ধাক্কায় পড়তে রাজী নই। জ্যালা এক আপদ হয়েছে, যত ঝামেলা দেখতে পারি না, তত আমার ঘাড়ে এসেই জোটে। ননসেন্স!'

অগত্যা বিনোদবাবুকে সেখানেই নামতে হ'ল। একবার ভাবলেন ফিরে যাবেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়ে পায়ে এগিয়েই গেলেন। তিনি ওদের কথা দিয়েছেন যখন—কথার খেলাপ করলে তাঁর তরফেই অভদ্রতা হবে।

বঙ্কা আর একটি ছেলে যথাস্থানেই দাঁড়িয়ে ছিল অবশ্য। কিন্তু তখনও তাদের ট্রেনের অনেক দেরি। বিনোদবাবুকে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে 'আপনি পাখার নিচে বসে ঘামটা একটু জুড়িয়ে নিন্ স্যার, আমরা ততক্ষণ একটু চা খেয়ে আসি!' বলে দ্রুত সরে পড়ল সেখান থেকে।

চায়ের প্রয়োজন বিনোদবাবুরই তখন সর্বাধিক কিন্তু তিনি লজ্জাতে সে কথাটা কিছুতে বলতে পারলেন না। চুপ ক'রে বসেই রইলেন আর আরও বেশী ঘামতে লাগলেন, কারণ মাথার ওপর পাখাটা ওদের কল্পনা, পাখার ধারে কাছে একটি আসনও খালি ছিল না।

যথাসময়ে ওঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে বঙ্কা বললে, 'আমরা এই পাশেই রইলুম স্যার!'

'কিন্তু টিকিটটা—'

'আমরা তো সঙ্গেই যাচ্ছি স্যার, ভয় কি?'

'মাঝের কোনো স্টেশনে যদি চেকার থাকে?' তবু কুণ্ঠিতভাবে বলেন বিনোদবাবু।

'বলবেন পাশের সেকেণ্ড ক্লাসে টিকিট আছে।' আপনি বসে পড়ুন। বলতে বলতেই চলে গেল বঙ্কা, বোঝা গেল যে প্রসঙ্গটা আর বাড়ানো তার ইচ্ছা নয়।

বসলেন বটে, কিন্তু একটা অস্বস্তি থেকেই গেল বিনোদবাবুর মনে। কেমন একটা সন্দেহ হ'তে লাগল তাঁর যে এরা আদৌ কোন টিকিট কেনে নি, তিনি বিনা মাশুলেই চলেছেন। এবং সেটা তাঁর পক্ষে বড় লজ্জার কথা। আশঙ্কার কথাও বটে।

অবশ্য স্টেশন পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই পৌঁছলেন, স্টেশনের নির্গমন পথে যে ব্যক্তিটি টিকিট নিচ্ছিলেন, তিনি এদের পরিচিত, কারণ চুপি চুপি (বিনোদবাবুর শ্রুতি সীমার মধ্যেই) একবার জিজ্ঞেস করে নিলেন,

'প্রেসিডেন্ট না কি রে বক্তা ? রাইটার, না প্রোফেসর ?

স্মুতরাং টিকিটের প্রশ্নটা আর উঠল না।

অতঃপর মোটর পর্ব।

'কার' নামধারী যে যানে ওঁকে তুললে বক্তারা, সেটা যে ঠিক কি বস্তু তা বিনোদবাবুর ঠাওর হ'ল না। এ ধরণের মোটর গাড়ি তিনি কখনও দেখেন নি, মিউজিয়ম থেকে বার ক'রে আনা কিনা তাও ভাল বুঝলেন না। মোদ্দা উঠে দেখলেন যে পা রাখবার জায়গায় মেঝের অনেকখানি উড়ে গেছে—ফলে পথও যেমন দেখার স্মুবিধা, হাওয়া খাবারও তেমনি। অবশ্যই হাওয়ার সঙ্গে চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিও বেশ কিছুটা আসছে—কিন্তু সব সুখ যে পাওয়া সম্ভব নয়, তা কে না জানে।

যাই হোক, এইভাবেই কোনমতে সভামণ্ডপে পৌছলেন তাঁরা। তখন ছটা বেজে গিয়েছে। সাড়ে পাঁচটায় সভা আরম্ভ হবার কথা কিন্তু তখন পর্যন্ত লোক এসেছে জনা-সাত আট। বক্তা অভয় দিয়ে বললে, 'কিছু ভাববেন না স্যার, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব এসে যাবে। আমাদের এখানে ঘণ্টাখানেক মার্জিন ধরে ওরা। ততক্ষণে একটু জলটল খেয়ে জিরিয়ে নিন—'

জলটা বিনোদবাবুর দরকারই। আকণ্ঠ শুকিয়ে উঠেছে তখন পিপাসায়। স্মুতরাং তিনি সৌজন্য ক'রেও 'না' বললেন না। কিন্তু ধূলি মলিন গুটি চারেক সন্দেশের সঙ্গে যখন জল এসে পৌছল তখন তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। জলটা শরবৎ না ডাবের জল বুঝতে না পেরে তিনি বললেন, 'একটু সাদা জল যে দরকার—'

'এতো স্যার সাদা জলই। ঘোলা দেখে বলছেন ? এখানকার জল একটু এই রকম কলার হবে, তবে আমাদের এ বেনেপুকুরের জল খুব মিষ্টি, আর খুব হজমীও। আমরা সবাই এই জল খাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে খান, কিছু ভাববেন না।'

অগত্যা বিনোদবাবুকে জল পানের ইচ্ছা দমন করতে হ'ল। মুখের বাইরে একটু দিলেন—কিন্তু পান করতে আর সাহসে কুলোল না। শুকনো গলায় অতিকষ্টে শুকনো সন্দেশ উদরস্থ করে জলপানের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।......

বক্তার হিসাবে কোন গোলমাল ছিল না, সাড়ে ছটা নাগাদ আসরে বেশ

জনসমাগম হল। সভা আরম্ভ করা চলে। কিন্তু বিনোদবাবু দেখলেন উদ্যোক্তাদের তরফে কোন তাড়া নেই। আরও মিনিট দশেক দেখে অগত্যা তাঁকেই কথাটা মনে করাতে হল।

'অনর্থক রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাকে আবার ফিরতে হবে তো এতটা পথ—'

'এই যে স্যার আমাদের ড্রয়িং মাস্টার এলেই হয়—তিনিই 'ওপ্‌নিং সং' গাইবেন কিনা?'

'তা তাঁকে একটু আগে থাকতে আনবার ব্যবস্থা করেন নি কেন?' এবার আর অপ্রসন্নতা চাপতে পারেন না বিনোদবাবু।

'আজ্ঞে স্যার আনব কি, তাঁর আবার আজ সকাল থেকে কলেরা-মতো হয়েছে! একটু সামলে না নিলে—

'সর্বনাশ! তা তাঁর যদি সামলে নিতে রাত পুইয়ে যায়? অন্য কেউ নেই?

'আজ্ঞে না। রবিঠাকুরের গান আর কেউ জানে না। কিছু ভাববেন না স্যার। তিনি ঠিক আসবেন। মরে-মরেও আসবেন।'

এলেনও তিনি অবশ্য। মরে মরেই এলেন বলতে গেলে। দু'তিন জনে ধরে ধরে নিয়ে এল। কোনমতে এসে অর্ধমূর্ছিতের মত বসে পড়লেন মঞ্চের ওপর। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হতে লাগল সেখানেই হার্টফেল করবেন তিনি, সেই মুহূর্তে।

অবশ্য তা তিনি করলেন না। বরং হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে যথাসাধ্য গানই একটা ধরলেন শেষ পর্যন্ত। তবে তাঁর অবসন্ন অবস্থা দেখে মূল ভয়টা রয়েই গেল বিনোদবাবুর মনে। আর কতকটা সেই ভয়েই তিনি ওদিক থেকে একটা পাখা টেনে নিয়ে প্রাণপণ ড্রয়িং মাস্টার মহাশয়ের মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। অর্থাৎ তাঁর সামনেই না কোন দুর্ঘটনা ঘটে।

অতঃপর সভাপতির পালা। ইলেকট্রিক নেই, সুতরাং পাখাও নেই। তালপাতার পাখা যেটি এসেছিল সেটি পড়েই রইল একপাশে। বাতাস করবে কে? নিজের হাতেই—বক্তৃতা করতে করতে—এক আধবার পাখা নাড়বার চেষ্টা করলেন, সুবিধে হল না। পিপাসাতেও স্বরনালী শুকিয়ে রয়েছে, জল অবশ্য এক গ্লাস সামনে ছিল কিন্তু পান করতে সাহস হল না। কারণ সেও সেই বিশুদ্ধ বেনেপুকুরের জল বলেই মনে হল তাঁর। চা

এক কাপ পেলে ভরসা ক'রে খাওয়া চলত কিন্তু সে কথা কেউ মুখে একবার উচ্চারণও করল না। বিনোদবাবুও লজ্জায় চাইতে পারলেন না।

তবু, সেই গলদঘর্ম অবস্থাতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বক্তৃতা করলেন তিনি। হয়ত আরও করতেন কিন্তু ততক্ষণে প্রেক্ষাগৃহে প্রায় দক্ষযজ্ঞের পালা শুরু হয়ে গেছে। বক্তৃতার শেষে এক নাটক অভিনয় হবার কথা, সেই লোভে বিস্তর ছেলে মেয়ে এসে জুটেছে—তারা এই এত রাত পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। তারা গোলমাল করছে, শিশ দিচ্ছে—তাদের থামাতে কর্মকর্তারা চিৎকার করছেন, সবটা জড়িয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলছে।

অতএব এক সময় বাধ্য হয়েই থামতে হল সভাপতিকে।

তারপর যথারীতি ধন্যবাদান্তে পুনর্যাত্রার পালা। শোনা গেল সেই অদ্বিতীয় ট্যাক্সিখানি—অগ্রিম বায়না দিয়ে রাখা সত্ত্বেও অন্তর্ধান করেছে। অবশ্য তার জন্য চিন্তা নেই—এই মাইল দুই পথ বেড়াতে বেড়াতে হেঁটে গেলেই চলবে—চিন্তা হচ্ছে কে সভাপতিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে হাওড়া পর্যন্ত। কেউই যেতে রাজী নয়—কারণ যে যাবে সে 'ফাংস্যান' থেকে বঞ্চিত হবে।

বিনোদবাবু বলতে গেলেন, সঙ্গে লোক যাবার আর দরকার কি—টিকিট কেটে আমাকে গাড়িতে চড়িয়ে দিলেই তো হবে। কিন্তু বক্তা প্রায় ধমক দিয়ে উঠল সে সব আপনি বুঝবেন না, অনেক ব্যাপার আছে, সঙ্গে কেউ না গেলে চলবে না।'

'অনেক ব্যাপারটা' না বোঝবার মতো বোকা বিনোদবাবু নন। বিনা টিকিটে নিয়ে যেতে হ'লে চেনা লোক কেউ থাকা চাই বৈ কি।

শেষ পর্যন্ত বক্তাকেই যেতে হলো। গজ গজ করতে করতে সঙ্গে চলল সে। রাত দশটার গাড়ি, হাওড়া থেকে তখনই যদি ফেরে তাহ'লেও রাত সাড়ে এগারোটা হয়ে যাবে। ততক্ষণে ফাংস্যান শেষ। চাঁদা দাও, চাঁদা তোল, প্রেসিডেন্ট আনো, পৌঁছে দাও—সব এই বক্তা। ফের যদি সে একাজে যায় তো তার নামে যেন কুকুর পোষে লোকেরা।

রাত্রের ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে লোক ছিল না, বিনোদবাবুকে তুলে দিয়ে কী ভেবে বক্তাও উঠে পড়ল সেখানে এবং পাখার নিচে ভাল জায়গাটি বেছে

বেছে নিয়ে বসে তৎক্ষণাৎ চোখ বুজল। একটু পরেই তার নাক ডাকতে শুরু হলো।

কিন্তু দৈব বিরূপ, হাওড়ার ঠিক আগের স্টেশনে এক চেকার উঠলেন, 'টিকিট?'

প্রথমত তন্দ্রা কাটতেই খানিকটা সময় লাগল বঙ্কার। তার পরও সে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'গা-গাঙ্গুলী কোথায়? আপনি কেন? এ ট্রেনে তো গাঙ্গুলীই থাকে।'

'সে কথা তো বলতে পারব না। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এখন টিকিটটা বার করুন তো দয়া করে।

'টিকিট ফিকিট নেই। এ কী রকম ভদ্রতা আপনাদের তাও জানি না। গাঙ্গুলীটা আমাকে কথা দিয়েছিল থাকবে—নইলে কি এ দায় আমি ঘাড়ে নিই!'

এর পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। আগের জংশন থেকে দুখানি ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের ডবল ভাড়া গুণে দিতে হল বিনোদবাবুকেই। ভাগ্যে সঙ্গে দুখানা দশ টাকার নোট ছিল। কিন্তু ভাড়া শোধ ক'রে ট্যাক্সী ভাড়া দেবার মত অবস্থা আর রইল না।

তিনি অপ্রসন্ন এবং কিছুটা অসহায় ভাবে বঙ্কার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তা আমি ফিরব কী ক'রে এখন, আমার ট্যাক্সী ভাড়াটা তো আপনার কাছে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তাঁদের।'

'আসবার সময় নিজের ব্যাগটা সুদ্ধ ফেলে এলুম তা আপনার টাকা! আপনি তো তবু বাস না পান রেস্কা ক'রে ফিরতে পারবেন, আমার অবস্থাটা ভাবুন দিকি। পকেটে একটা আধলা নেই, ও লোকটা যদি টিপে দেয়—গাড়িতে উঠলেই আবার ধরবে!...আপনি বরং এক কাজ করুন, গণ্ডা চারেক পয়সা আমাকে দিয়ে যান, একখানা টিকিট কেটেই নিই।

বিনোদবাবু নিঃশব্দে একটি সিকি বার ক'রে দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে হাঁটাপথ ধরলেন। আর ট্যাক্সী বা রিক্সা খরচ করার ইচ্ছা নেই তাঁর। এটুকু হেঁটেই যাবেন!

বাতায়ন

জায়গাটার নাম না-ই বললুম, যা হয় আপনারা ভেবে নিন। মধুপুর, সিমুলতলা, দেওঘর—এই ধরণের একটা স্বাস্থ্যকর আধা শহর, পুজো থেকে বড়দিন পর্যন্ত যা জমজমাট থাকে—তার পরই ঝিমিয়ে পড়ে, রূপকথার সেই রূপোর কাঠির ছোঁয়া লাগার মতো ; মালীদের রাজত্ব শুরু হয়ে যায়।

আমরা গিয়েছিলুম পুজোর সময়ই অবশ্য। তখন সব বাড়ি ভর্তি। বাঙ্গালী কিল কিল করছে (কল কল বলাই সঙ্গত, কারণ এত বেশী বকতে মারোয়াড়ী ছাড়া আর কাউকে দেখি নি), মনে হচ্ছে বাংলাদেশেরই কোন শহরে এসেছি।

আমাদের আরও বিপদ। এখন যিনি বাড়িও'লা তাঁর পূর্বপুরুষ এককালে অনেকখানি জমি নিয়ে বিশাল বাগানের মাঝখানে বাংলো-প্যাটার্ণ বাড়ী করেছিলেন। বর্তমান গৃহস্বামীর সে রুচিও নেই, তত অর্থও নেই। তাই তিনি এটিকে পয়সা খরচ করার যন্ত্র থেকে পয়সা আমদানীর যন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছেন। বাগানেরই কটি মূল্যবান গাছ কেটে বেশ কয়েকটি ভাড়া বাড়ি করে দিয়েছেন। বাড়িগুলি আলাদা হলেও গায়ে গায়ে লাগা তাই, স্থানাভাবে পরস্পরের মধ্যে মাত্র চার পাঁচ ফুট ব্যবধান। কলকাতার বাড়ির মতোই—সদা সর্বদা সাবধানে কথা কইতে হয়, পাছে পাশের বাড়ির ভাড়াটে আমাদের ঘরের কেচ্ছা শুনে ফেলে!

তবু এই ক্ষুদে—আসল বাড়ির বাচ্ছা—বাংলোগুলোর চাহিদা অসম্ভব, খালি প্রায় থাকেই না। তার কারণ বাড়িও'লা—এই অপরিসর বাড়িতেই শহুরে লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের ও অভ্যাসের সব রকম আয়োজন রেখেছিলেন, এবং সব চেয়ে 'কলকাত্তাই বাবুদের' যা প্রয়োজন—নিরাপত্তা—সে ব্যবস্থা ছিল নিখুঁত। ঘেরা দালানের মধ্যে দিয়েই রান্নাঘর বাথরুম ইত্যাদিতে যাবার ব্যবস্থা, জানলার শিকের সঙ্গে মোটা জাল দেওয়া—বাইরের বারান্দাতে কোল্যাপসিব্‌ল্ গেট। ঘর ছোট ছোট, গুন্‌তিতেও দু তিন খানার বেশি নয়—তবে তাতে কি আসে যায়—কলকাতার কটা লোক এর চেয়ে ভাল

ঘরে আর থাকে ?

আমরাও এই নিরাপত্তার আকর্ষণেই বার বার অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে এই খাঁচার মতো বাড়িগুলিতে গিয়েছি। রাত আটটাতেই যখন চারিদিক নিষুতি হয়ে আসে—কোথাও কোন গাড়ি ঘোড়ার শব্দ কি মানুষ জনের সজাগ থাকার চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায় না—তখন একটু ভয় ভয় ভাব সব শহুরে লোকেরই হয়,—কল্পনায় ঘরের বাইরে চোর-ডাকাত-খুনে-বাটপাড় এবং বাঘ ভালুক দেখতে শুরু করে। রাত্রে শুয়ে কেবলই মনে হয় ঐ বুঝি কে জানালা দিয়ে হাত বাড়াচ্ছে। সে সব সময়ে এই বাড়িগুলির মূল্য বোঝা যায়। একবার সন্ধ্যার সময় এসে কোনমতে বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে পারলে আর পায় কে ? আলোর ব্যবস্থা ভাল থাকে, তাস খেলো—নইলে গল্প গুজব করো, গান গাও কিম্বা গ্রামাফোন বাজাও।

এমনই একবার ঐ সরকার বাংলোয় থাকার কালে পাশের বাংলোয় এসেছিলেন যতীনবাবুরা।

এলেন ওঁরা আমরা যাওয়ার বেশ কয়েকদিন পরে। ওরই মধ্যে বড় বাংলো যেটা তিন কামরার—সেইটেতেই এলেন যথেষ্ট হাঁক-ডাক সহকারে। বিস্তর মাল এল সঙ্গে—রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার, ক্যারমবোর্ড—অবসর বিনোদনের কোন জিনিসটারই ত্রুটি নেই। বড় দুই ছেলের দুটি ট্র্যানজিস্টার, যদিও বড়টিরই বয়স বছর বারোর বেশী হবে না। বাপ ও বড় ছেলের দুটি পৃথক ক্যামেরা ; সকালে বেড়াতে যাওয়ার সময় ছেলেটি যখন একদিকে ক্যামেরা ও আর একদিকে দূরবীণ ঝুলিয়ে বেরোত—তখন মনে হ'ত কোথায় কোন্ দুরারোহ পর্বত-অভিযান চলেছে কিংবা অন্য কিছু আবিষ্কারের। সঙ্গে একটি ঠাকুর ও ঝি। তবু এখানে এসেই ভজুয়া মালীকে বলে একটি ঠিকে ঝি রাখার ব্যবস্থা করলেন। সেটা কাজের জন্য প্রয়োজন বলে ততটা নয়, যতটা সম্ভ্রমবোধ বৃদ্ধির প্রয়োজনে।

অর্থাৎ রীতিমতো পয়সাও'লা লোক।

প্রথম শ্রেণীর ধনী অবশ্য নয়—হয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীরও নয়—তবু আমাদের থেকে যথেষ্ট বিত্তশালী তাতে সন্দেহ নেই। এবং এ পয়সাটাও বোধহয় বেশীদিন হয়নি, তাই এত বেশী করে দেখাবার চেষ্টা।

স্বভাবতই কৌতূহল হয়—কি করেন ভদ্রলোক।

কিন্তু সেটা জানার সুযোগ হয় না। কারণ ওরা আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে তেমন আগ্রহী বলে মনে হয় না। আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যেন অবহিত নন—এমন ভাবে থাকেন। শুধু আমরাই নই—ওদিকের নিকটতম প্রতিবেশী যিনি, বিজনবাবু, একেবারে পাশের বাংলোর লোক, তাঁরও ঐ অবস্থা। মনে হত যতীনবাবুরা নিজেদের নিয়েই থাকতে চান—মেলামেশা, গায়ে পড়া, মাখামাখি, এসবগুলো পছন্দ করেন না। কলকাতার অনেক তথাকথিত ধনী পরিবারের মধ্যেই এ রেওয়াজ দেখেছি—'ইত্তিক' লোকের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না।

যতীনবাবুর নামটা জেনেছিলাম দৈবাৎ, পিওন ভুল ক'রে চিঠিটা আমাদের বাংলোয় দিয়ে গিয়েছিল তাই। তবে সে উপলক্ষেও পরিচয় ঘটে নি, আমার চাকরকে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

আলাপটা হ'ল দৈবাৎই—ওঁদের প্রয়োজনে।

একটি ছেলে একদিন পড়ে গিয়ে পা কাটতে দেখা গেল যে—বহু জিনিস এসেছে, প্রায় অকারণেই একটা হার্মোনিয়াম পর্যন্ত এসেছে—আসেনি কেবল একটু টিঞ্চার আইডিন বা ডেটল একশিশি।

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে—অন্ধকার তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে (আজীবন শহুরে লালিতদের কাছে ভয়াবহ) ঘিরেছে চারিদিক, এ অবস্থায় ঘরে হ্যাজাগ জ্বেলে বসে থাকা যায়, বড় জোর হ্যারিকেন ঝুলিয়ে পাঁচ ফুট পাশের বাংলোতে যাওয়া যায়—মাঠ পেরিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে বাজারের ডাক্তারখানায় যাওয়ার কথা ভাবাও যায় না। শহুরে বাস করা ঝি-চাকরও ভয় পায় যেতে।

সুতরাং—

আমাদের কাছেই আসতে হ'ল। এল অবশ্য ঝিটিই—সে-ই শিশিটা নিয়ে গেল এবং ফিরিয়ে দিয়ে গেল—তবু, তার পরের দিন আর আমাদের সম্বন্ধে অনবহিত থাকা গেল না। বাজার যাওয়ার পথে চোখোচোখি হ'তে একটু অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতেও হ'ল, দু একটি পরিচয়-সূচক আলাপও করতে হ'ল।

তবু—ভাল ক'রে কিছুই জানা গেল না। ভদ্রলোক দেখলুম নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বলতে খুব নারাজ। এর পরে অবশ্যই দেখা হ'লে কুশল বিনিময়

হ'ত—আর দেখা হওয়ায় কোন অসুবিধাও তো ছিল না,—কারণ দুই বারান্দার মধ্যে মাত্র পাঁচ ছ ফুটের ব্যবধান, এবং দিনের অধিকাংশ সময়ই বারান্দায় কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না কারও ; ওঁদের তিনটে ঘর আমাদের দুই—তবু সেই অনুপাতেই জিনিসপত্র দুজনেরই যথেষ্ট—সুতরাং অবকাশ বলতে তো এই বারান্দাটুকুই ভরসা। তবে ওঁরা কথাবার্তা যা বলতেন—খুব সাবধানে যেন সর্বদা সতর্ক থাকতেন বেশী মাখামাখি না হয়ে যায়। বিশেষ যতীনবাবু, ধরি মাছ না ছুঁই পানি—এই ভাবেই বলতেন সব সময়।

এইটুকু শুধু জানা গিয়েছিল যে ভদ্রলোকের একটা কারখানা আছে দমদমের দিকে। উনি আর ওঁর ভগ্নীপতি—বোধহয় এই দুজন মালিক, এর বেশী আছে কিনা তা হলফ ক'রে বলা শক্ত—সেই চিঠিটার খামে দেখেছিলুম এক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর নাম ঠিকানা, নামের পাশে প্রাইভেট লিমিটেড, ছাপা—তাতেই জানা গিয়েছিল মালিক একজন নয়। অবশ্যি নিজের স্ত্রীকে নিয়েও প্রাইভেট লিমিটেড হয়—তবু 'আর কে আছেন আপনার সঙ্গে' এই প্রশ্ন করতে সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল, 'আমার এক ভগ্নীপতি।' এই পর্যন্ত।

এর বেশী কিছু নয়।

কিসের কারখানা, কি তৈরী করেন, কোথায় সরবরাহ করেন, কত লোক খাটে—এসব কিছুই জানতে পারি নি। কারও যদি বলার অনিচ্ছা থাকে, তাকে কত প্রশ্ন করা যায়? ছেলেমেয়েগুলোকে সুদ্ধ ভদ্রলোক এমনই তৈরী করেছেন—তারাও নিজে থেকে কোন তথ্য প্রকাশ করে না, যথেষ্ট সাবধানে হিসেব ক'রে কথা কয়।

কোথায় থাকেন—এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক এবং প্রাথমিক। এর উত্তর পাওয়া গিয়েছিল 'বালিগঞ্জ'। আর একদিন একটু বেশী জানতে চাইলে মুখটা ব্যাজার ক'রে বললেন, 'গোল পার্কে'র কাছে।' তার পরই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন, প্রশ্ন করলেন', আজ বাজারে গিছলেন নাকি? মাছ পেলেন কিছু?'

যতীনবাবু তো এই রকম, তাঁর গৃহিণী আবার এক কাঠি সরেশ। এই সাত আট দিন এসেছেন, একদিনও আমাদের বাড়ি কি বিজনবাবুদের বাড়ি আসেন নি, পথে দেখা হ'লেও হাসি হাসি মুখে চেয়েছেন এইমাত্র, কথা

বলা কি আলাপ জমানোর চেষ্টা মাত্র করেন নি। এবং সম্ভবত পাছে বেশী চোখাচোখি হ'লে আমরা গায়ে পড়ি—এই ভয়ে—বারান্দায় পর্যন্ত বসতেন না ভদ্রমহিলা। অবশ্য ব্যস্তও থাকতেন, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে—তাদের কারও না কারও অসুখ লেগে থাকবে এটা স্বাভাবিক। তাছাড়াও তাদের খাওয়ানো নাওয়ানো সাজানো গোছানো, কুটনো কোটা জলখাবার তৈরী এতেই প্রায় সাতদিন কেটে যেত তাঁর। বিকেলে বেড়াতে বের হতেন সবার শেষে—আমরা সকলে বেরিয়ে পড়ার পর—ফিরে আসতেনও আমাদের কিছু আগেই। আমার স্ত্রী বলতেন 'রূপের দেমাক'। কর্তার নাকি পয়সার অহঙ্কার, গৃহিণীর রূপের। খুব একটা আহামরি কিছু দেখতে নয়। তবে রঙটা সত্যিই ফরসা, এটা স্বীকার করতেই হবে। আমার 'ইনি'র এদিকটা কমতি বলেই তিনি ফর্সা মেয়ে মাত্রেই রূপের অহঙ্কার দেখে থাকেন।

যাইহোক, এদিকের তুষার যতই কঠিন হয়ে জমে থাক—আর এক জায়গায় বরফ একটু একটু করে গলতে শুরু হয়েছিল।

ওঁদের সঙ্গে যে ঝি এসেছিল, বিশ্বেশ্বরী—ওঁরা বিশু বলে ডাকতেন পুরুষের মতো—সে কথা বলার জন্যে, মনিবের নিন্দে করার জন্যে উশখুশ করবে—এটা স্বাভাবিক। মনিবের সতর্কতার কারণ যা-ই থাক ওর থাকবে কেন? নেহাৎ বোধ করি কড়া শাসনেই চুপ করে থাকে—এড়িয়ে যায় আমাদের। শাসন এবং কড়া নজর। কোন কারণে, এটা ওটা নেওয়া-দেওয়ার ফাঁকে আমাদের এখানে এলে কিম্বা সকলের কাজ সারা হ'লে কর্মহীন অবসর মুহূর্তে—দুপুরের আগে যে একটা অবসর মেলে ঝি-চাকরের—আমাদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গল্প ফাঁদলেই ভেতর থেকে হাঁক আসে, 'বিশু, এদিকে এসো। কাজের সময় আড্ডা দেওয়া কি?'

কিন্তু একদিন অবসর মিলল। বাচ্চা মেয়েটার জ্বর তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া যায় না, অথচ এমন কিছু বেশী জ্বরও নয় যে, তার জন্যে মা-বাবাকে আটকে থাকতে হবে। তাই বিশ্বেশ্বরীর ওপরই ভার পড়ল তাকে পাহারা দেওয়ার। ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। গেলেন সেদিন একটু সকাল সকালই, বোধকরি সকাল করে ফেরার উদ্দেশ্যেই। আমার স্ত্রী বেড়াতে যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, ব্যাপারটার আভাস পাওয়া মাত্র সে ইচ্ছা সম্বরণ

করলেন। বাকী সকলকে বলে দিলেন এগিয়ে যেতে—তাঁর নাকি মাথা ধরেছে। তিনি এখন বেরোবেন না।

গেলাম না আমিও। স্ত্রীকে একা রেখে যাব? এমন অবিবেচক আমি নই।...আসলে হয়ত আমারও কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠেছে, তবে নারী জাতির সামনে এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই।

যা আশা করেছিলেন ইনি, তাই ঘটল। ঘুমন্ত মেয়েটাকে নিয়ে বেড়াবার ছলে বিশু আমাদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আপনারাও যাওনি বুঝি কাঁকায়?' এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু, 'কেন শরীল খারাপ?'

হ্যাঁ, মাথাটা ধরেছে। ভাল লাগল না তাই। তা তুমি গেলে না আজ? মেয়ের কি অসুখ?'

'হ্যাঁ, একটু গা গরম হয়েছে। তা আমিই তো ট্যাঁকে ক'রে টেনে বেড়াই, আমিই নে যেতুম। এমন কিছু হিম পড়ে না এখন, তাছাড়া এ তো আষ্টে পিষ্টে জামা পরানো—ঝেন মনে হয় সিলুই ক'রে থুয়েছে।... তা ঝা হুকুম। আমরা দাসী চাকর নোক,—ঝা হুকুম হবে তাই তামিল করব। বড়নোকের বড় কথা, মেজাদ বোঝা তো দায়!'

'খুব বড়লোক বুঝি?'

'কে জানে বাবু। মেজাদ তো খুব, বড় বড় কথা। য়্যালবা-পোশাকে তো এততি টাকা খরচ—খাওয়া দাওয়ার বেলা দেখি ঢুঁ ঢু। এই এখানে দেখতেছ এত এত মাছ মাংস আসছে—কলকাতায় সব গুনে গুনে। তাও শেষ পজ্জন্ত দাসী চাকরের জন্যে কিছু থাকে না। এখানে যে এই মিষ্টি আসছে—আমাদের পাতে পড়েছে একটা টুকরো? আম বলো। জাম বলো। ঠাকুর বেটা মাছ কাটার সময় গোঁজামিল দিয়ে নিজের জন্যে একখানা বাড়তি সরিয়ে আকে—আমার বেলা সেই গোনাগুন্‌তি একখানা। তা ইদিকে ঝ্যাতই কেন না আসুক, দু সের পাঁচ সের। ইঁদুরে খাবে সে ভাল, তবু গরীব দুঃখীর পাতে পেরানে ধরে একখানা দেবে না!'

'তা বামুন ঠাকুরের সঙ্গে তুমিও একটা বন্দোবস্ত ক'রে নাও না কেন। তোমার জন্যেও একখানা রেখে দেবে।'

আমার স্ত্রী মুখ টিপে হেসে, চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গী ক'রে বলেন।

'সে কেন দেবে মা। পরনোক। এ তো আর বারমেসে ঠাকুর নয়। এখেনে আসবার আগে কোথা থেকে যোগাড় ক'রে এনেছে, এই একমাসের জন্য।'

'ও, বাঁধা ঠাকুর নয় ?'

'পোড়া কপাল! বাঁধা ঠাকুর আকবে! তবেই হয়েছে! ত্যাত পয়সা নি, মুখেই যা নপর চপর! কথাবাত্তারা তো কানে যায় কিছু কিছু—কর্তা গিন্নীতে গুজুর গুজুর হয়—কারবারের আবস্তা নাকি ত্যাত ভাল না। নোকসান যাচ্ছে নাকি। কী সব আবার সরকারের টাকা বাকী আছে, সে নিয়েও ভাবনা খুব।'

'তা তাহ'লে এত পয়সা খরচ ক'রে বেড়াতে আসা—'

'কী করবে! আজ তিন বছর ধরে কথা দে একেচে মেয়ে মানুষটাকে, সে এখন ঝগড়া কোঁদল করবে না? তার শরীর খারাপ, পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ের ধকল সামলাতে হয়—একবার তাকে না নে এলে চলবে কেন বাপু! খাটনি তো কম নয়!'

'সেখানে রান্নাবান্না কে করে? অন্য লোক আছে?' উনি প্রশ্ন করেন।

'ঐ লাও! সপ্তকাণ্ড আমায়ণ—সীতে কার পিসো!·· শুনছ কি তবে মা আপনি। আন্না করি যেখেনে আমি, উনিও করে অবিশ্যি—এটা ওটা। তবে বেশিটা আমিই করি। একটা ঠিকে ঝি আছে, সে তোলা কাজ ক'রে দে যায়।'

'গোল পার্কের কাছে কোথায় থাক তোমরা?' এবার আমি, এতক্ষণে একটু ফাঁকা পেয়ে প্রশ্ন করি।

'সে তিনি থাকে। মানে বাবু আমাদের। বাবু আর তেনার পরিবার। এ থাকে—মানে আমরা থাকি দর্জিপাড়া। গুলু ওস্তাগরের গলিতে।'

'তবে যে উনি ঠিকানা দিলেন—'

'হ্যাঁ. হ্যাঁ, তাই তো বলতিছি। ঐটেই ওনার ঠিকানা। বাপুতি বাড়ি। ···সে ঠিকানা দেবে না তো কি এই ঠিকানা দেবে? নোকে বলবে কি তা না হ'লে। যেদি ধরো তোমরা তেনার সাতগুষ্টির খবর টেনে বার করো— ত্যাখন?'

'তা বাবুর পরিবার বলছ—ইনি কে তাহ'লে? পরিবার না?'

'মুয়ে আগুন। কিসের পরিবার ? এ তো আঁড়, অবিদ্যে যাকে বলে।... কীত্তি কি কম— ঐ ছ্যাখো মা কতায় কতায় অনেক বিত্তান্ত বলে ফেলনু, জানতে পারলে আমায় জ্যান্ত পুঁতবে। ভারি গোঁয়ার। হেই মা, বলো নি যেন কারুক্কে, খবদ্দার। গরিব নোকটা ধনে-পেরানে মরব। চার মাসের মাইনে বাকী ফেলে একেচে—একটা ছুতো পেলে আর দেবে না।'

'না, না, কাউকে বলব না। তুমি পাগল!' আমার গৃহিণী আশ্বাস দেন, 'আর কাকেই বা বলব। ওঁরা তো কথা কন না, যে গপ্পে গপ্পে বলে ফেলব, তাছাড়া এখানে যে কদিন—কলকেতায় গেলে দেখাই বা হচ্ছে কি ক'রে! ঠিকানা জানি না যে গিয়ে গায়ে পড়ে আলাপ করব। ঠিকানা জানতে চাইলে তো ঐ ভাসাভাসা একটা বলে দেন।'

'বলবে কি মা। বলার কি মুখ আছে! এ ঠিকেনা কোন্ নজ্জায় দেবে। বলে তাই আসল ঠিকেনা...তাও ভাল ক'রে দেয় না—ঝেদি কেউ গিয়ে পড়ে, সেখেনে তো দেখবে অন্য মূত্তি, অন্য পরিবার। এ ঝাকে দেখবে তাকেই তো নোকে খুঁজবে। তাই নুকোচুরি খেলতে হয়।'

তারপর একটু দম নিয়ে নিজেই বলে, 'একি কম বজ্জাত! কারবার ঐ বোনের শ্বশুরের, সে ফুটফুটে ছেলে দেখে—নিজের ছেলে বোকা মতো ঘোর-প্যাঁচ বোঝে না—ছেলের শালাকে এনে কারবারে বসিয়ে চার আনার ভাগ দে পাকাপাকি বেঁধে দে গেল! বুড়ো মরতে ভাল মানুষ বোনাইকে দে আরও চার আনা নিকিয়ে নিলে। তারপর তাকে তো এক কোণে হটিয়ে দে বলতে গেলে ষোল আনার মালিক হয়ে বসেচে। তার ওপর মা কি বলব, এই যে দেখচ এই মেয়েছেলেটা, দিদিরই ছোট ননদ, য্যাৎটুকু থেকে দেখেছে, বিওলো মেয়ে, একটা বাচ্ছাও পেটে এসেছেল, সে অবস্থায় তাকে ফুশ্‌লে বার ক'রে এনে—তুললি তু লি একেবারে খান্‌কি পাড়ায়, খান্‌কি বাড়িতে। এহকাল পরকাল সব নষ্ট ক'রে দিলি। বে করতে পারতিস—তাও করলি না, ভদ্দরনোকের ঘরে মুখ তুলে মাথা তুলে দাঁড়াবার আবস্তা আকলি না। এ কি মানুষের কাজ! ঝ্যাঁটা মারো, ঝ্যাঁটা মারো!'

'তা বাবুর সে পরিবার। মানে আসল যিনি—তিনি জানেন তো এসব খবর!'

'ওমা, তা জানবে না। সোয়ামী হেন জিনিস! বর অন্য মেয়েছেলের

দিকে চেয়ে দেখলে আঁতের টনক নড়ে। জানে সব—এবাড়ির হাঁড়ির খবর রাখে।'

'তা কিছু বলে না? কাঁদাকাটা করে ফেরাবার চেষ্টা করে নি?'

কাঁদাকাটা করার পাত্তর সে নয় মা। জাঁহাবাজ মেয়েছেলে যাকে বলে। তাকে যমের মত ভয় করে ইনি। কী মুখ—সে মুখের সামনে গোরাসায়ের দাঁড়াতে ভয় পাবে। তেমনি আশ-ভারি। ইদিকে তো এত বজ্জাত—তেনার সামনে দাঁড়ালে একেবারে অন্য মানুষ। কেঁচোটি।···নটা বাজলে আর এক মিনিট এখানে থাকবার জো নি, আত নটা পর্যন্ত যা খুশি করো কিচ্ছু বলবে না তিনি, নটার পর বাইরে থাকা বরদাস্ত করবে না। এখেনে, কত শখ বাবুর বন্ধু বান্ধব এনে তুলবে ফুত্তি করবে তা সে রুপায় নি। একদিন একটুন দেরি হয়েছিল—এক্কেবারে ট্যাক্‌সি গাড়ি ভাড়া করে এসে হাজির সশরীরে, টর্‌টর্‌ করে ওপরে চলে গে ইয়ারবগ্‌গর সামনে সে কি ফৈজৎ! সুড় সুড় করে বাপের সুপুত্তুর হয়ে ওঠে যেতে আস্তা পায় না। আসলে সে যে বড়নোকের মেয়ে, হাতে পয়সা আছে, এর তো এস্তাজারি নয়!'

এর বেশী সেদিন আর কথা বলার ফুরসুৎ হ'ল না।

ঠাকুর গিছল স্টেশনে বোধহয় বিড়ি দেশলাই কিনতে, দূর থেকে মাঠের পথে তার চেহারা চোখে পড়তেই বিশ্বেশ্বরী চলে গেল তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে, যাবার সময় ফিসফিস ক'রে বলে গেল, 'যাই মা, মুখপোড়া দেখতে পেলেই নাগাবে ওগা মেয়ে কোলে ক'রে বাইরে দাঁড়িয়ে ছেল। অমনি নভূতো নচ্ছুতো করবে—বলবে হিমে দাঁড়িয়ে তুমি আমার মেয়ের জ্বর বাইড়ে দেছ! ভারি হারামজাদা ঠাকুরটা!'

কৌতূহল সবটা মেটেনি আমার স্ত্রীর।

যার স্ত্রী এত রাশভারী, এমন যাকে ভয় করে সে এই 'বার-দোষ' কেন খায়াতে পারে নি, কেন এতদিন ধরে এই জিনিসটা সহ্য ক'রে এসেছে—সেটা না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তাঁর। এতগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছে, বড় ছেলেটার বয়েস অন্তত বারো তেরো সুতরাং কম দিন ঘর করছেনা এই মেয়েটির সঙ্গে; আত্মীয়ের ব্যাপারে, সবই জানাশোনা—গোড়া থেকেই জানে নিশ্চয়—তবু কেন বাধা দেয় নি, এ রহস্যটা জানার জন্য ছটফট করতে লাগলেন তিনি।

তবে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হ'ল না।

একদিন গোরুর গাড়ি ক'রে পিকনিক করতে গেলেন যতীনবাবুরা। ঠিক হয়েছিল আগে রান্নার জিনিস পত্র নিয়ে ঠাকুর আর ঝি চলে যাবে—এঁরা যাবেন পরে। কার্য কালে ছেলেমেয়েরা বায়না ধরল তারা আগে যাবেই। তারা পড়ে থাকবে বিশুদি চলে যাবে—সে তারা শুনবে না। সুতরাং দুই গাড়ি বোঝাই হয়ে ওঁরাই গেলেন, ঠাকুর গেল সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। সে হেঁটে গেল। কথা রইল বাকী বাসন-কোষন আর বিশ্বেশ্বরীকে নিতে একখানা গাড়ি ফিরে আসবে আবার।

কে জানে এ ব্যবস্থায় বিশ্বেশ্বরীরই হাত ছিল কিনা।

ঐ দুই গাড়ি দৃষ্টির আড়াল হ'তেই সে দরজায় তালা লাগিয়ে আমাদের বাড়ি এল 'মা একটুকু চা হবে নাকি গো। কে জানে কত বেলায় গাড়ি আসবে তবে যাব—এতটা পথ, পৌছুতে হয়ত তিনপ'র বেলা হয়ে যাবে। তখন আর কে আমার জন্য চা করতে বসবে বলো। খাই খাই করতে থাকবে আকসগুলো—চার হাত পা তুলে। তখন সে খাওয়া যোগাবে না আমাকে চা ক'রে দেবে? ক'রে আমিও খেতে পারি—তবে উনুন তো গেছে ঐ ক্যারাসিন তেলের একটি এতটুকু, আর কাঠ গেছে মুড়ি বসিয়ে তাতে আন্না হবে, চা করব কোথায়?'

এত ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না, আমার স্ত্রী যত্ন করে বসিয়ে চা তো দিলেনই এক গেলাস—শিবুর বিখ্যাত হ্যাংচাও একটা খরচ ক'রে ফেললেন ঐ সঙ্গে।

সুতরাং তারপর আর বাকী কথা বেরিয়ে আসতে দেরি হ'ল না।

যতীনবাবুর স্ত্রী—রেবা বুঝি নাম, সঠিক জানে না বিশু—নাকি এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ। পর পর দুটি সন্তান হয়ে নষ্ট হয়ে যেতেই একটা কেমন 'শ্যক্' পায়—তার পর থেকেই তার প্রতিজ্ঞা, বৃথা এ কষ্ট আর সে করবে না। সন্তান সম্ভাবনা আর হ'তে দেবে না সে। সেই সঙ্গেই কিন্তু স্বামীর জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আগে চেষ্টা করে—যতীনবাবু যাতে বেশ্যাবাড়ি যায় বা রক্ষিতা রাখে। যতীনবাবুর যে সে দোষ একেবারে ছিল না তাও নয়। লুকিয়ে

ঘুরিয়ে একটু এদিক ওদিক করতেনই—এখন স্ত্রীর কাছ থেকে নীরব উৎসাহ পেয়ে আরও বাড়াচ্ছিলেন, এমন সময় এই মেয়েটি এসে গেল তাঁর জীবনে।

বিশ্বেশ্বরীর ধারণা, সে এদের কথাবার্তা থেকে—ওবাড়ির পুরণো চাকরের কাছ থেকে—সে চাকর নিয়মিতই আসে, ছেলেমেয়েদের জন্যে এটা ওটা খাবার দাবার নিয়ে—যা শুনেছে (আড়ি পাতে নি সে, ছিঃ, অমন পিরবিত্তি মা কালী যেন কখনও না দেন !), রেবাই এই মেয়েটি—করুণার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছে স্বামীকে। বেশ্যাবাড়ি পাকাপাকি ধরলে হয়ত একাদিন সর্বস্বান্ত হবে—এ ভয় ছিলই, এ অনেকটা বিয়ে করা স্ত্রীর মতো, এ দেখবে যতীনবাবুকে ছুয়ে নিয়ে পথে বসাতে চাইবে না, এই ভরসাতেই—এই ব্যাপারটা যাতে এগোয় সে জন্যে রেবা অনেক তদ্বির করেছে।

'জুইটে দিয়েছে মা, নিজে জুইটে দিয়েছে। এমন কেউ দেয় ? মাগীটা পাগল। ছেলেছুটো যেতে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছল। তখন থেকে চাইবে সোয়ামী কোথাও একটা নট-ঘট বাধাক। আবার বলে কি জানো মা, বলে ঘরে যেমন জানলা না থাকলে মানুষ হাঁইপে মরে যায়—তেমনি পুরুষ মানুষ বেটাছেলের মনেরও জানলা থাকা দরকার। এ সেই জানলা। নইলে এত খাটবে খুটবে—ভাবনাচিন্তে অষ্ট প্রহর—কিসেব জোরে করবে, একটু শান্তি চাই না ? ছেলেপিলে হাসিঠাট্টা—ইয়ারবগ্‌গ আসা যাওয়া করবে—এটুকু চাই বৈকি। বাড়িতে তো ওসব হবে না, বাইরে গিয়ে ছু দণ্ড হাঁপ ছাড়ুক।

তারপর একটু দম নিয়ে বলে, 'হাঁপ ছাড়ার জন্যে পয়সা খরচও কি কম করে! এই যে এসেছে এখানে, এতটি টাকা দিয়েছে সেই তিনি—বড় গিন্নী, তেনার নিজের টাকা, বাপুতি। তা খুব। তবে ঐ, বলে দিয়েছে, এক মাসের বেশী নয়, যদি একদিনও দেরি হয় গিয়ে অনথ করব, চেঁচিয়ে গাল দিয়ে লোক জড়ো ক'রে মাথা হেঁট করাব। সেই ভয়েই তো কাঁটা হয়ে থাকে। যেখানেই যা করুক—আত নটায় পরিবারের কাছে ফিরবেই। একো একো দিন আপিসেই আত হয়, তা সে টেলিফুন করবে, গিন্নী আবার পাল্‌টা টেলিফুন ক'রে জানাবে যে ঠিক আপিস থেকে করে'ছে কি না—তবে শান্তি।...সে সব দিনে আপিস থেকে বেরিয়ে একবার হয়ত আসে আমাদের এখেনে—সে ঐ পাঁচ মিনিটের জন্যে, তার বেশী থাকবার

জো নি, সে এমন একটা ঘাড়ে পাঁচটা মাথা নি বাবুর যে—বিনা হুকুমে দেরি করবে। নিছাৎ বাবুর কারখানা আমাদের ইদিকে, দমদমে —তাই। ফেরার পথে পড়ে—নইলে চোকের দেখাও হ'ত না। নিজে ঝ্যাত্‌টুকু ছেড়ে দেবে দেবে—তার খুশীমতো। তার বেশী নয়। গত বছরে মুশুরী পাহাড়ে গেল বাবু, বড় গিন্নী সঙ্গে গেল না, বললে যে, না আমি যাব নি। তুমি ইয়ারবক্সী যে যাচ্ছ যাও, আমোদ ফুর্ত্তি ক'রে এসো, আমি গেলেই হ্যাঙ্গার।…কী বলব মা, পাগল। সোয়ামীকে ভালবাসে খুব—তার সুখের জন্যে সতীন-কাঁটা নিজে পুঁতেছে নিজের জীবনে। তবে আজও টেনে রাখতে জানে মেয়ে মানুষটা। দড়ি ছেড়েছে—খুঁটি ধরে আছে শক্ত হাতে।'

বিশ্বেশ্বরী হাত ঘুরিয়ে ঠোঁটের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে বিস্ময় জানায়।

সত্য ভাষণের ফল

ষোল টাকা চার আনা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল পুলক—এক সর্বাধিক-প্রচারিত বাংলা দৈনিকে, মাত্র তিনখানি চিঠি এসেছে। সে ভেবেছিল বোধ হয় তিন চারশ চিঠি আসবে এবং তার সঙ্গে অন্তত শ' দেড়েক ফোটো। কিন্তু পনেরো দিন অপেক্ষা করার পরও যখন আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না—তখন বুঝল যে এ-বিজ্ঞাপনের এই-ই মোট ফলশ্রুতি। চটে আগুন হয়ে উঠল সে—যদিও এ উষ্মাটা কার ওপর—তা তার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয়। দোষটা তার ভাগ্যের না ঐ দৈনিকপত্রের না বাংলা দেশের—তা অত তলিয়ে ভাবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না তার, শুধু ব্যর্থ ক্ষোভে বারবার আপন মনেই বলতে লাগল, 'তবু বলে বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই, তবু বলে মেয়ে দু'পায়ে জড়ো করা যায়। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না বলে অনবরত নাকে কাঁদে সবাই। ছোঃ!'

বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনটা বিবাহের। দিয়েছিল পুলক—অর্থাৎ পাত্র স্বয়ং।

নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন নিজেই দেওয়া খুব রুচিকর নয়—কিন্তু পুলকেরও উপায় ছিল না। মা থাকেন সুদূর এলাহাবাদে। ছোট ভাই চুর্কের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। সেইখানেই কোয়ার্টার পেয়েছে, বিয়ে-থাও করেছে,

ঘোর সংসারী। কাছে থাকে বলেও বটে, তার দ্বারাই আগে নাতি নাতনী হয়েছে বলেও বটে, মা তাদের নিয়েই ব্যস্ত, তাঁর যে নিজস্ব টাকা আছে এবং নিজস্ব আয় (বাড়িভাড়া পান একটা) সবই ছোট ছেলের সংসারে চলে যায়। ইদানীং বড়ছেলের বিশেষ খোঁজখবরও করেন না, কতকটা খরচের খাতায় নাম লিখে দিয়েছেন। কখনও-সখনও দৈবাৎ দু-একটা চিঠি লেখেন। তাও শুধু কুশলের জন্য লেখেন কদাচিৎ—পুলকের দেয় মাসিক খরচের টাকাটা পাঠাতে দেরি হলে জননীর প্রতি পুত্রের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে উপদেশ দিয়েই বেশির ভাগ চিঠি দেন।

ইতিমধ্যে পুলকের বয়স হয়ে গেছে ঢের। বাইরে যা-ই বলুক, বিয়াল্লি-শের কম নয়। দীর্ঘকাল কোথাও কোন স্থিতি হয় নি—সংসার না পাতাবার সেইটেই বড় কারণ। গ্র্যাজুয়েট নয়, কোন হাতের কাজও শেখে নি। লেখাপড়া ভাল লাগে নি তখন, তাই আই-এ পাস ক'রে আর কলেজে যায় নি, রোজগারের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়েছিল। অবশ্য বেরিয়ে পড়ে বুঝেছিল যে এ-কাজটা লেখাপড়া করার চেয়েও শক্ত, কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় ছিল না। তাই অনেক কিছু করে নানা ঘাটের জল খেয়ে কোন মতে শরীর-টাকেই টিকিয়ে রেখেছিল, তার বেশি কিছু করে উঠতে পারে নি। না সঞ্চয়, না ভাল কোন কাজকর্ম বা চাকরি আর না বাসা বাধার কোন ব্যবস্থা। আর অহরহ এইভাবে জীবন-সংগ্রাম করতে হয়েছে বলে বয়স বা সময় সম্বন্ধেও অতটা সচেতন ছিল না, কোথা দিয়ে পরমায়ুর চল্লিশটা বছর কেটে গেছে টের পায় নি।

এর মধ্যে ঘুরেছে ঢের। দিল্লী বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাটনা—কোথায় নয়। কাজও করেছে হরেক রকম, ছোট-খাটো চাকরি তো অজস্র, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ, দালালি এসব তো আছেই। ভাগ্যে এর মধ্যে ইনসিওরেন্সের এজেন্সীটা নেওয়া ছিল তাই এক-এক সময় সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়লেও নিঃস্ব হতে হয় নি, ছোট ভাইয়ের কাছে বা মায়ের কাছে হাত পাততেও হয় নি। বরং যেমন করে হোক মাকে কিছু কিছু খরচের টাকা সে দিয়ে গেছে—প্রায় প্রতি মাসেই।

এইবার, এতদিন পরে একটু স্থিতি এসেছে। এখানকার একটা পাঞ্জাবী

কার্মে একটা চাকরি পেয়েছে, এদের ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম, বেশ কিছুদিনের কার-বার, হঠাৎ উঠে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। মাইনে খুব বেশি নয় অবশ্য, কারণ, চাকরিও নতুন, ওর যোগ্যতাও খুব সীমিত। সে না জানে ইঞ্জিনীয়ারিং, না জানে হিসাব-নিকাশের জটিল তত্ত্ব। জীবনবীমা সম্পর্কে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয়, সদালাপী ও সচ্চরিত্র দেখে তাঁর নজর পড়ে—তিনিই একরকম ডেকে কাজ দিয়েছেন। সেল্‌স ডিপার্টমেণ্টে কাজ, কাজ যা তা না করলেও কোম্পানীর কোন ক্ষতি হবে না, এ পদটা ওর জন্যেই একরকম তৈরি ক'রে নিয়েছেন তিনি। সুতরাং বেশি মাইনে আশা করাই অন্যায়, যা পাচ্ছে পুলকের কাছে তাই আশাতীত। মাইনে ভাতা ও বাড়ি ভাড়া নিয়ে পৌনে তিনশ' টাকার মতো পাচ্ছে, ভরসা আছে যে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু ক'রে বাড়বে।

জীবতে স্থিতি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের একটু স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ হয়। এতদিন কোনমতে মেসের খরচা দিয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট মনে হত। এখন একটা মাঝারি হোটেলে থাকে, ছোট হলেও পৃথক ঘর, খাওয়া-দাওয়াও মোটামুটি ভাল, তবু মনে হচ্ছে যে, এই খাওয়ায় শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এ-বয়সে বাড়ির খাওয়া না খেলে শরীর টিকবে না। আর তা খেতে গেলে একটা বাসা করা দরকার।

বর্তমানে কলকাতায় বাসা পাওয়া কঠিন—তবু চেষ্টা করলে হয়ত পাওয়া যায়। ভাল ঘর একখানা পাওয়া অন্তত অসম্ভব নয়—কিন্তু ঘর হলেই ঘরওয়ালীর প্রশ্ন ওঠে। যা দিনকাল, ঝি-চাকরের ওপর বরাত দিয়ে থাকা ঠিক নয়। সবসুদ্ধ ফাঁসিয়ে চলে যাবে কোনদিন।

ঘরওয়ালী—মানে স্ত্রী। অর্থাৎ বিয়ে করা।···

এখন এই বয়সেই? তাও কি সম্ভব! ছিঃ···

এই-ই হ'ল প্রথম প্রতিক্রিয়া, তবে নাকি কবি বলেছেন,—'ধন্য আশা কুহকিনী'—মনের মধ্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন বলে ওঠে, কেন, অসম্ভবই বা কিসে? কী এমন বয়স হয়েছে তার? যা বয়স তার থেকে ঢের ছোট দেখায় তাকে, চুলে পাক ধরে নি, মাংসপেশী কোথাও শিথিল হয় নি, একটা ছাড়া সব দাঁত এখনও অটুট। আর চিরকালই কি এমনি মেসে হোটেলে খেয়ে একা-একা দিন কাটাবে? সেও তো মানুষ, তার সাধ-আহ্লাদ নেই?

তা ছাড়া, এই চাকরির আয়ই একমাত্র নয়। জীবন-বীমার কাজটাও এখনো বজায় আছে, তা থেকেও শ' তুইয়ের মতো আয় হয় মাসে। সে নিজে একটা বীমা করিয়েছিল সম্প্রতি হাজার-পাঁচেক টাকা পেয়েছে, আরও একটা করেছে, চার বছর পরে সে টাকাটা পাকবে। একটু যদি চেপে ঘোরে তাহলে এ আয় আরও বাড়ানো যায়। অফিসেও কি আর কিছু উন্নতি হবে না? তবে, একটা ছোট-খাটো সংসার চালানো অসম্ভব কিসে? আর তেমন দেখলে, মা'র টাকাটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারে, তাঁর বাড়িভাড়ার আয়েই তাঁর চলবার কথা, তিনি ছোট ভাইয়ের সংসারে ঘুষ দেবেন কি না, সেটা পুলকের দেখার কথা নয় তো!

অনেক ভেবেচিন্তে পুলক মাকে চিঠি লিখল। এবার তার বিয়ে করার ইচ্ছা এবং অবস্থা তুই-ই হয়েছে, মা যেন পাত্রীর খোঁজ করেন।

মা এর আগে বহুবারই অনুযোগ করেছেন বিয়ে না করার জন্য, তু-একটি পাত্রীর খোঁজ ক'রে চিঠিও দিয়েছেন কথাবার্তা চালাবেন কি না জানতে চেয়ে—কিন্তু এবারের এই চিঠির উত্তরে ছেলের সুমতির জন্য কিছু শুষ্ক আনন্দ প্রকাশ করে লিখলেন,—

'আমি একে বৃদ্ধা হইয়াছি, তাহাতে প্রায়ই অসুস্থ থাকি, এমতাবস্থায় আমি কোথায় পাত্রী খোঁজ করিব? তাহার চেয়ে বরং খোকাকে একটা চিঠি দাও, সে যদি তাহার শ্বশুরবাড়ি মারফৎ কিছু খোঁজ-খবর করিতে পারে তো করুক।

খোকা অর্থাৎ পুলকের ছোট ভাই পলাশ।

চিঠি পেয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে উঠল পুলকের। মা এখনও প্রতিমাসে তিনবার ক'রে ছোট ছেলের কাছে যান, তা সে জানে। সারা এলাহাবাদ চষে ফেলেন প্রত্যহ ওখানে থাকলে। বাঁধা রিক্সাওলাই আছে এ জন্যে। যত অসুস্থতা তার বেলাতেই। অর্থাৎ সে এখন বিয়ে করলে পাছে খোকার বিষয়ে হাত পড়ে, এই তাঁর তুর্ভাবনা। তিনি চান পুলক আর বিয়ে-থা না করুক, বাবা ও মায়ের সব সম্পত্তি এবং পুলকেরও যা সারা জীবনের সঞ্চয়—সব তাঁর খোকার ছেলে-মেয়েরা পাক্।···

হয়ত কথাটা সত্য নয়, পরে পুলকই হয়ত লজ্জিত হবে এমনটা অনুমান করার জন্য, কিন্তু তখনকার মতো এছাড়া কিছু মনে পড়ল না এবং মাকে ঘোর

স্বার্থপর ও হিংসুটে বলে বোধ হতে লাগল।

এরপর নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজে করা ছাড়া উপায় রইল না।

আছেন, দূর-সম্পর্কের মামা-টামা দু-একজন কলকাতা, পাটনা বা অন্যত্র আছেন, কিন্তু মা থাকতে এঁদের শরণাপন্ন হওয়া বড় লজ্জার কথা। তার চেয়ে সোজাসুজি বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই ভাল। মেয়ে দেখে পছন্দ করে কথাবার্তা ঠিক হলে মাকে অভিভাবক দেখালেই হবে। তখন আর তাঁর সরে দাঁড়াবার কোন অজুহাত থাকবে না। তাও যদি না হয়, একটা মামা-কাকা কাউকে খুঁজে বার করলেই হবে।

অতঃপর অনেক ভেবেচিন্তে, বিস্তর বিজ্ঞাপন ঘেঁটে, কয়েকটি মুসাবিদা নষ্ট ক'রে একটা বিজ্ঞাপন খাড়াও করল :

'জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সুদর্শন ব্রাহ্মণ পাত্র সদ্বংশজাতা, শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী চান। পাত্রী ব্রাহ্মণ না হইলেও ক্ষতি নাই। কলিকাতার বাহিরে কোন শহরে পাত্রের পৈতৃক বাড়ি আছে, নিজেও ভাল উপার্জন করেন। বয়স্কা পাত্রীতে আপত্তি নাই। ফটোসহ চিঠি দিন।' ইত্যাদি—

নিজে গিয়ে কোন এক বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের অফিসে নগদ ষোল টাকা বার আনা খরচ ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এল এবং বিপুল আশা বুকে নিয়ে কোন এক পরমাশ্চর্য নারীরত্ন, তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনীর অতর্কিত আবির্ভাবের প্রহর গুণতে লাগল।...

কিন্তু এল ঐ তিনখানি চিঠি মোটমাট। তাও পনেরো দিন ধরে। আশা যখন ছেড়েই দিয়েছে প্রায়—তখন এক-একখানা করে আসতে শুরু করল। তাও ছবি এল মাত্র একটি। সেইটেই যা একটু ভদ্র চিঠি, বাকী একখানা পোস্টকার্ডে এবং একখানা ইন্‌ল্যাণ্ডে।

সেসব পাত্রীও তেমন। মেয়ের বাবাই বলছেন শ্যামবর্ণ (একজন লিখছেন ময়লা), একজন ম্যাট্রিক ফেল আর একজন ম্যাট্রিক মান (অর্থাৎ ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়া)। গৃহকর্মনিপুণা তো কথার মাত্রা, সব বিজ্ঞাপনেই থাকে। দুজনেই নাকে কেঁদেছেন যে, তাঁরা খরচপত্র কিছুই করতে পারবেন না। ছবি পাঠান নি—একেবারে মেয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

খামের চিঠিটি কিন্তু কিছু স্বতন্ত্র।

মেয়েটি বি-এ পাস, গৌরবর্ণা, ব্রাহ্মণ। বংশপরিচয়ও যা দিয়েছে—

পুলকের জানা ঘর। বয়স লিখেছে চব্বিশ। গান-বাজনাও কিছু কিছু জানে। পাত্রীর কাকা চিঠি দিয়েছেন, তিনি নিজেই লিখেছেন, 'সম্ভবমতো খরচপত্র করিব।'

এ চিঠির সঙ্গে একটি ফটোও আছে। মন্দ নয়, বেশ কাটাকাটা মুখ-চোখ, একটু রোগা ধরণ হয়ত—তবে বাঙালীর মেয়ে বিয়ের আগে রোগা থাকাই ভাল, বিয়ের পরেই তো টিপসী মোটা হয়ে যাবে। সে বড় বিশ্রী।

অর্থাৎ সবদিক দিয়েই ঈপ্সিত পাত্রী। এর চেয়ে ভাল আর তার এ বয়সে জুটবে না। এ-ই ঢের। মনে হচ্ছে ভগবান তাকে এতকাল পরে অযথা নাকাল করবেন না বলেই কম চিঠির ব্যবস্থা করেছেন, একেবারে যেটি তার উপযুক্ত তাকেই এনে দিয়েছেন। পরমায়ু বেশির ভাগই তো বিগত—এখন প্রতিটি দিনেরই মূল্য যে অনেক। ভগবানের বিবেচনায় মনে মনে সে কৃতজ্ঞবোধ করল।

এবার তার উত্তর দেবার পালা।

পাত্রীর কাকা পত্রের শেষে পাত্রের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানতে চেয়েছেন। লিখেছেন উত্তর পেলে দেখা করবেন। কার সঙ্গে দেখা করতে হবে বিজ্ঞাপন-দাতা যেন দয়া করে তাও জানান।

খুবই ন্যায্য অনুরোধ। পুলক উত্তর দেবার জন্য তোড়জোড় ক'রে লিখতে বসল। কে জানে কেন—এ বিবাহে যে কোন বাধার সৃষ্টি হতে পারে পুলকের তা একবারও মনে হল না। কেমন ক'রে যেন তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এ-ই তার বিধাতৃনির্দিষ্ট পাত্রী। সুতরাং যে দুদিন পরে তার চিরদিনের সঙ্গিনী হবে, তার 'গৃহিণী সচিব সখী'—তার কাছে কোন মিথ্যা সে বলবে না। জীবনের ভিত্তিকে মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না সে। তাই সে বহু মুসাবিদা ছিঁড়ে ফেললেও তথ্য একটাও ভুল লিখল না। বদল যা করল ভাষায়, প্রকাশের মুন্সিয়ানায়।

বয়সটা সম্বন্ধেই সবচেয়ে দ্বিধায় পড়েছিল। মেয়েটির বয়স লিখেছে ওরা চব্বিশ, মেয়েদের বয়স সাধারণত কমিয়েই বলে সকলে—সুতরাং ধরে নেওয়া যাক ছাব্বিশ-সাতাশ। তার বয়সটা সে-ক্ষেত্রে সাঁইত্রিশ হলেই ভাল শোনাত। তাই লিখবে নাকি? আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল পুলক, পাঁয়ত্রিশ বললেও লোকে অবিশ্বাস করবে না—এমনই চমৎকার তার স্বাস্থ্য।

না কি—আটত্রিশ-উনচল্লিশ লিখবে—? একটা মিথ্যা কথায় দোষ কি?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটুকু দুর্বলতাও জয় করল।

মিথ্যা মিথ্যাই। যখন মিথ্যা লিখবে না স্থির করেছে তখন আর কেন!

সে লিখল, 'পাত্রর বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু দেখায় তেত্রিশ-চৌত্রিশের মতো। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমনি স্থির যৌবন। মাসিক আয় বর্তমানে সাড়ে চারশ টাকার মতো—তবে ভবিষ্যতে আয় বাড়িবে। পাত্র দেশী পাঞ্জাবী ফার্মে কাজ করেন, আড়াই শো টাকার মতো মাহিনা। বাকীটা জীবন-বীমার দালালি করিয়া উপার্জন করেন। গৃহসুখ লাভ করিলে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া অধিকতর উপার্জন করিতে পারিবেন। কলিকাতায় কোন বাসা নাই, পাত্র হোটেলে থাকেন, বিবাহ স্থির করিলে বাসা ভাড়া করিবেন। পাত্রের মা আছেন, বাবা নাই। পৈতৃকবাড়ি এলাহাবাদে। মা'রও কিছু সম্পত্তি আছে, তাহার অর্ধেক পাইবার কথা। ছোট ভাই বিবাহিত, তাহার সন্তানাদি আছে, তবে সেও ভাল কাজ করে। যদি মত হয় তো নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাত্রের সহিতই সাক্ষাৎ করিবেন।'

চিঠি ডাকে দিয়ে যাকে বলে দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল পুলক।

উত্তরও ঠিক নয়—মানুষটার আশাই বেশি। একদিন সে অফিসের ফেরৎ সোজা হোটেলে চলে আসে, যদিই সেই 'কাকা' এসে ফিরে যান এই ভয়ে। ইতিমধ্যে সে পাঁজি কিনেছে, মোটামুটি দু-তিনটে দিনও দেখে রেখেছে। এ মাসে আর হবে না,—মাত্র দশ দিন আছে, এ মাসের পরের মাসে বিয়ে নেই—তার পরের মাসের প্রথম দিকে হ'তে পারে। তা তারও কিছু সময় লাগবে, বাসা ঠিক করতে হবে একটা। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট, শ'খানেক টাকার মধ্যে পেলে ভাল হয়।

সে অফিসের দু-তিনটি বন্ধুকে বলে দালাল লাগিয়ে দিলে। এদিকে কসবা, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, ওদিকে সিঁথি দমদম বরানগর—যেখানে হোক একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট চাই। ভাড়াটা একশ থেকে একশ' কুড়ির মধ্যে হলেই ভাল হয়। একটা ঘর পেলেও আপত্তি নেই। যদি পৃথক কল-পাইখানা থাকে।

এইসব আয়োজনের সঙ্গে মনে মনে মেয়েটিকেও কল্পনা করার চেষ্টা করে—দুদিন পরে যে তার বধূ হবে। 'মনে তার নিত্য যাওয়া-আসা' রবীন্দ্রনাথের সেই পংক্তি সত্য হয়ে ওঠে। বারবার ফটোখানা বার ক'রে দেখে। দেখতে দেখতে ইদানীং বেশ পছন্দ হয়ে গেছে তার, এখন তো রীতিমতো সুন্দরীই মনে হয়। কী ধরণের শাড়ি তাকে মানাবে, সে কী রঙ ভালবাসে, আরও কি-কি তার পছন্দ, কেমন রুচি হবে তার—এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। খরচ ওরা করবে বলেছে, তা সে যা হয় করুক, দরদস্তুর ক'রে বিড়ম্বিত করবে না—পাত্রীপক্ষকে। পাত্রীর না মনে মনে তার সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দেয়, খরচ সে-ই করবে বরং। নগদ একটি পয়সাও চাইবে না। তার যা হাতে আছে তাতে না কুলোয় না হয় আপিস থেকে কিছু ধার করবে। কৃপণতাও করবে না, তাই বলে। এতকাল পরে যেমন বিয়ে করছে, বিয়ের মতোই বিয়ে করবে।...

সবই ঠিক, এখন শুধু ওদের চিঠি বা কারুর আসার অপেক্ষা।

কিছু সময় লাগবে তা পুলক জানে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ করবে অবশ্যই। খরচ-পত্রের কথাটাও হিসাব ক'রে দেখতে হবে। বিয়ে এক কথায় ঠিক করা যায় না। হয়ত তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরও করছে কিছু কিছু।

সুতরাং প্রথম সাত আট দিনে তত বিচলিত হয় নি পুলক। কতকটা নিজের চিন্তায় নিজে মশগুল ছিল। কিন্তু আটদিন কেটে যেতে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠল, সেইসঙ্গে কিছু বিস্মিতও। তার মতো পাত্র বিবাহে সম্মত হয়েছে জেনেও পাত্রীপক্ষ চুপ ক'রে ব'সে থাকে—এ একটু বিস্ময়কর ঘটনা বৈকি! আবার এমনও মনে হ'তে লাগল—তার চিঠিটা পেয়েছে তো? যা আজকালকার ডাকের ব্যবস্থা, মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। আর চিঠি না পেলে তো সবই মাটি, তার ঠিকানাও তো পাবে না। হয়ত মনে করছে পাত্রেরই মত নেই এ পাত্রীতে।...

আরও তিনদিন দেখে পুলক আর একটি চিঠি দিল।

এবার উত্তরও পেল। তবে ডাকে নয়—দৈবাৎ।

এ চিঠি দেওয়ার পরের দিনই বোধ হয়, অফিসের ফেরৎ কী একটা বীমার 'কেস'-এর তদ্বিরে শ্যামবাজারে যাচ্ছিল দোতলা বাসে চেপে। অন্যমনস্ক হয়েই বসে ছিল, ফ্ল্যাটের এখনও কোন কিনারা হ'ল না সে-ই ছিল

দুর্ভাবনা—হঠাৎ বিয়ে শব্দটা কানে যেতে ঈষৎ সচেতন হয়ে উঠল। দেখল ঠিক তার সামনের সীটেই দুটি ভদ্রলোকে কথা হচ্ছে। তারই বয়সী দুটি ভদ্রলোক, যদিও দুজনেরই চুলে পাক ধরেছে বেশ—একজন আর একজনকে বলছে, 'হ্যাঁ—বিয়ের কথাই বলছি, তুই যে আকাশ থেকে পড়ছিস একেবারে। এবার লাগা যা হয় ক'রে, আর কবে করবি? এর পর যে আর কেউ বে দেবে না।'

'দাঁড়া—ভাইঝিটার একটা গতি না ক'রে কিছুই করতে পারছি না যে। কী যে অভদ্রা লেগেছে, কোথাও একটা সম্বন্ধ দানা বাঁধছে না। অতবড় ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মেয়ে বাড়িতে বসে—নিজে তার সামনে কী আক্কেলে বিয়ে ক'রে বসি বল! দাদা যে এ কী বিপদে ফেলে গেল আমাকে। তাও যদি বাবা বেঁচে থাকতেন তো একটা কথা ছিল, এখন তো আমার ঘাড়েই সব।'

'সত্যি, গ্র্যাজুয়েট মেয়ে—কিছু খরচও করবি তোরা, মেয়েও কিছু কালো-কুচ্ছিত নয়—তবু কেন যে সম্বন্ধ লাগছে না একটাও! আশ্চর্য!··· এই জন্তেই বোধহয় বলে ভবিতব্য।'

তারপরই বুঝি মনে পড়ে যায়। বলে, 'ভাল কথা, সেদিন যে সেই বিজ্ঞাপনটা দেখে চিঠি দিলি তার কী হ'ল? উত্তর এল কিছু?'

'ধ্যেৎ! সে আর বলিস নি। একখানা ফটোই মাটি শুধু শুধু। ও কি আর ফেরৎ পাওয়া যাবে? সে নিছাৎই বাজে সম্বন্ধ। বয়সের গাছ-পাথর নেই, নিজে লিখেছে এক চল্লিশ। কোন না তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হবে, আবার লিখেছে—দেখায় তেত্রিশ-চৌত্রিশের মতো, যেমন অটুট স্বাস্থ্য তেমনি স্থির যৌবন।···আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট পাত্র। না চাল না চুলো—বিয়ে ঠিক হলে তিনি দয়া ক'রে বাসা ভাড়া করবেন। এতখানি বয়সে আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরি করে ত'ও দিশী ফার্মে—তার আশা সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে মাগছেলে নিয়ে সংসার চালাবে। বোঝ একবার আস্পর্দাটা।'

'তাই নাকি। সাহস তো কম নয়। রীতিমতো ধাষ্টামো।'

'তা নয়। পাগল। নইলে আর ঐ কথা লেখে—যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমনি অটুট যৌবন। আবার লিখেছে গৃহ সুখলাভ করিলে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া আরও বেশি উপার্জন করিতে পারিব।'

'তাই নাকি। মরেছে। বদ্ধ পাগল বল্‌!...কত রকমের বিচিত্র জীব যে আছে পৃথিবীতে। পাগলা গারদের বাইরেই পাগল বেশি। তা 'আর কোথাও খোঁজখবর পাচ্ছিস না?'

আর শোনার দরকার ছিল না। শুনলও না পুলক। মধ্যপথে নেমে পড়ল। নেমে পড়ে দেখল হেঁদোর সামনা-সামনি নেমেছে। ধীর মন্থর পায়ে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।

তখন কিছু ভাববার মতো অবস্থা ছিল না। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল অপমানে। শুধু ভগবানকে ডাকছিল একটা স্ট্রোক-টোক না হয়ে যায় এই অপরিচিতদের মধ্যে।...

ভাবতে শুরু করল অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে। সে-রাত্রে খেল না কিছু, খাবার মতো অবস্থা ছিল না। পর পর কাপ দুই কফি আনিয়ে খেল শুধু। তারপর মাথায় জল দিয়ে সুস্থ হয়ে এসে বসল চেয়ারে।

প্রথমটা মনে হ'ল কড়া ক'রে চিঠি লেখে একখানা। খানিকটা মুসাবিদাও করে ফেলল বসে বসে। লিখল যে 'আপনারাই বাধ্য করেন মানুষকে মিথ্যা বলতে। সরলতাকে বলেন পাগলামি।' কিন্তু খানিকটা লেখার পর নিজেরই লজ্জা হ'ল। ছিঃ। আরও পাগল ভাববে হয়ত, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে।

সে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে একটুকরো কাগজে শুধু লিখল, 'জবাব পেয়ে গেছি, ধন্যবাদ। আপনাদের মহামূল্যবান ফোটো ফেরৎ পাঠালাম।' তারপর সেই কাগজসুদ্ধ ছবিখানা খামে পুরে সেই রাত্রেই হোটেলের চাকরকে ডাকবাক্সে ফেলিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

তারপরও দিন দুই-তিন শুধু ভেবেছে। আকাশ-পাতাল ভেবেছে। আদৌ বিয়ে করবে কি না। করলেও ঐ 'স্কুল ফাইন্যাল ফেল' ও ম্যাট্রিক মান' দুটি মেয়েকে দেখবে কি না তাও ভাবল ক'দিন। কিন্তু সেটাও ঠিক মনঃপূত হ'ল না।

এখনও কিছু ঠিক হয়ও নি। তবে মোটামুটি মন স্থির করে ফেলেছে বাসা একটা পেলে ভাড়া ক'রে গৃহস্থালী সাজিয়ে ফেলবে, তারপর আর একটা

বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখবে। এবার একটাও সত্য কথা বলবে না, 'গ্র্যাজুয়েট পাত্র, বড় ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে চাকুরি করেন, মাসিক ৭০০৲ উপার্জন। বয়স ৩৩।৩৪, প্রচুর পৈতৃক ভূসম্পত্তি আছে। নির্দায় নির্ঝঞ্ঝাট।' খুব ভাল শোনাবে। অনেক চিঠি আসবে এবার—সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। নিজে না করলেও অনেক বিয়ে দেখেছে সে, কেউ সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি খুলে দেখতে চায় না। মাইনেও সঠিক গিয়ে অফিসে জানতে চায় না কেউ। ফার্ম তো নাম করা—তাতেই বিশ্বাস হবে যে অনেক টাকা মাইনে পায়। · ভাল কোন প্রস্তাব এলে মা'র জবানীতে চিঠি দেবে, মা'র সঙ্গেই দেখা করতে বলবে, তারপর যেদিন আসবে তারা সেদিন বলবে 'আমার ছোট ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে মা কাল রাত্রেই মির্জাপুর চলে গেছেন, আমাকেই কথাবার্তা কইতে বলেছেন, তিনি এসে পাকা করবেন।'

না, সত্য কথা আর একটাও বলবে না সে। এবার চালাক হয়ে গিয়েছে। জ্ঞাননেত্র খুলে গেছে তার।

এখনও ভাবছে অবশ্য। সময় আছে ঢের, ফ্ল্যাটটা না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কিছু করবেও না, আটঘাট বেঁধে কাজে নামবে, কোথাও কোন ফাঁকি না থাকে মিথ্যার মধ্যে।

এখন মনে পড়ছে তার, ছেলেবেলায় তার এক শিক্ষক কেষ্টবাবু মহাভারত থেকে একটি শ্লোক শুনিয়েছিলেন যে, কি কি পাঁচটা অবস্থায় মিথ্যা বলতে দোষ নেই—তার মধ্যে তুটো কথা মনে আছে, স্ত্রীর কাছে বা বিবাহকালে মিথ্যা বলতে দোষ নেই।

হাজাব হোক ব্যাসদেব সত্যদ্রষ্টা, ঋষি। ঠিকই বলে গেছেন।

কিম্বা, তিনিও পুলকের মতো কোনদিন ঠেকে শিখেছেন কি না কে জানে।

কাছে আছে যারা

চিঠিখানা বার তিন-চার পড়েছিল হেমন্ত, এখন আরও একবার পড়ল ভাল করে। আদ্যোপান্তই পড়ল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

বিশ্বাস হয়না। এখনও বিশ্বাস হ'ল না। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হ'তে

চায় না যে এ চিঠি ঐ মেয়েটিই লিখেছে, পাশের বাড়ির একান্ত শ্রীহীন চেহারার অবিরাম কর্মরত ঐ মেয়েটি—বনলতা। ওর যে এরকম কোন অনুভূতি আছে, ও যে এরকম কোন চিঠি কাউকে লিখতে পারে, বিশেষত সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত পুরুষকে—সেইটেই যে বিশ্বাস করা কঠিন।

গত কুড়ি বছর ধরেই দেখছে হেমন্ত মেয়েটিকে। এবাড়িতে এসেছে ওরা—হ্যাঁ কুড়ি বছরই। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে—বোমাপড়ার বছরে। ওরা যেদিন উঠে আসে ওদের নতুন বাড়িতে, সেই দিনই ঝড় উঠেছিল, প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সবই মনে আছে হেমন্তর। তার তখন উনিশ বছর বয়স। এখন উনচল্লিশ পূর্ণ হয়ে গেছে, চল্লিশে পড়েছে সে গত সপ্তাহেই। মধ্যবয়সীও বলা চলে না হয়ত আর, প্রৌঢ়ত্বেই পদার্পণ করেছে সে—ঠিক-মতো বলতে গেলে।

বনলতারও বয়স কম হয় নি। তারা যখন এবাড়ি আসে তখনই ওর বোধ হয় বারো তেরো বছর বয়স। নতুন ইলেক্ট্রিকের লাইন—ঝড় উঠার ফলে হঠাৎ নিভে গিয়েছিল দপ ক'রে। হ্যারিকেন বা লণ্ঠনের বালাই ওদের বাড়িতে কোন কালে ছিল না। সে ঝড়ে মোমবাতি জ্বলাও সম্ভব নয়। অন্ধকারেই বসেছিল সবাই. বনলতার মা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওদের বারান্দা থেকে ডেকে বলেছিলেন, তাঁদের বাড়িতে হ্যারিকেন আছে বাড়তি, দরকার হলে হেমন্তরা নিয়ে যেতে পারে। হেমন্তই গিয়েছিল সে হ্যারিকেন আনতে—অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওদের দরজায়, আর বনলতাই সে জ্বালানো হ্যারিকেন এনে দিয়েছিল ওকে।

রোম্যান্স জমতে পারত বৈকি। আবহাওয়া যথেষ্ট অনুকূল ছিল। আধুনিক উপন্যাসের মতো সাজানো ছিল যেন পর পর—নাটকীয় পরিবেশ-গুলো। ওর তখন তরুণ বয়স, পাশের বাড়ির কিশোরী কন্যা ঘোর দুর্যোগের রাতে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আলো নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে—সেই মুহূর্তেই রোম্যান্স জমে ওঠার কথা। কিন্তু কে জানে কেন—সেইদিন তো নয়ই কোনদিনই জমেনি সেটা। দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকা—আসা-যাওয়ায় বিরাম নেই, আত্মীয়ের মতোই হয়ে গেছেন দুই পরিবার. হেমন্তর মনেও যে কোন দিন কোন রঙ ছিলনা তাও নয়—তবু ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র ক'রে কখনও কোন কাব্য জমে ওঠেনি তার জীবনে।

অথচ বনলতা যে খুব কুশ্রী কুরূপ ছিল—তাও নয়। সাধারণ, নিতান্তই সাধারণ—এই মাত্র। সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মতো মাজামাজা শ্যামলা রঙ, সাধারণ মুখ চোখ, চাল-চলন কথাবার্তাও নিতান্ত সাধারণ। কোথাও কোন অসাধারণত্ব নেই বলেই বোধ হয় কোনদিন চোখও পড়েনি হেমন্তর তার ওপর। খানিকটা লেখাপড়াও শিখেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষাও দিয়েছিল একবার কিন্তু পাস করতে পারে নি। অবশ্য তার পর আর সে চেষ্টা করে নি, কেউ করতে বলেওনি। সামান্য কেরাণী ছিলেন বনলতার বাবা, সেই সময়ই তিনি মারা যান। বনলতাই বড় মেয়ে, জ্যেষ্ঠ সন্তান। সংসারের কাজে লেগে যেতে হয়েছিল অবিলম্বে। রান্নাবান্না ধোয়ামোছা বাসনমাজা—সবই করতে হ'ত মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। মার শরীর খারাপ হয়ে পড়ায়, সবটাই করতে হ'ত তাকে। ভায়েরা তখনও ছোট ছোট, আয় বলতে কিছু নেই—ঝি রাখার বিলাস তখন কল্পনাতীত।

তারপর অবশ্য বনলতার পরের দুটি ভাইই চাকরিতে ঢুকেছে—কিন্তু সেও বেশ কিছুদিন পরে—সুতরাং তখনও ঝি রাখা যায়নি এই সাত আটজনের সংসারে। কারণ মাথায় তখনও বিপুল ঋণ, ওদের মাইনে কম। একেবারে এই সম্প্রতি একটা বাসন মাজার ঝি রাখা হয়েছে, তাও বোধ হয় বনলতার পরের ভাই প্রাণেশের আসন্ন বিবাহের সম্ভাবনাতেই। কুটুমরা যদি এসে দেখে যে বাড়িতে একটা ঝি পর্যন্ত নেই—তাহলে মেয়ে দিতে চাইবে না হয়ত, সেই আশঙ্কায়।

কাজেই—এই দীর্ঘদিন ধরে বনলতার একটা চেহারাই দেখে আসছে হেমন্ত—তার কর্মরত মূর্তি। কাজ, কাজ আর কাজ। ঠাকুর ঘর থেকে রান্নাঘর—রান্নাঘর থেকে কলতলা। ঘর মোছা, সিঁড়ি মোছা, সাবান কাচা, বাসন মাজা এবং রান্না করা—নিরন্ধ্র নিরবসর অন্তহীন কর্মব্যস্ততা—এই দেখতেই অভ্যস্ত সে। কখনও স্থির হয়ে বসে গল্প করতে দেখেনি বনলতাকে। হেমন্তদের বাড়িতে এসেছে হয়ত—কিন্তু সেও কোন প্রয়োজনে, কিছু একটা চাইতে কিংবা ফেরত দিতে. আবার তখনই চলে গেছে। এক এ-বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার প্রশ্ন থাকলে হয়ত বসত, বাধ্য হয়ে।

এই ভাবে কাজ করতে করতেই সে মাজামাজা রঙের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য চলে গেছে. এখন যা দাঁড়িয়েছে তাকে কালো বলাই উচিত. হাতের কোমল

কমনীয়তা ঘুচে গিয়ে বড় বড় শিরা বেরিয়ে গেছে, আঙ্গুলগুলো কর্কশ কঠিন হয়ে উঠেছে, মাথার চুল গেছে পাৎলা হয়ে—অর্থাৎ বয়সের ছাপ পড়েছে সর্বাঙ্গে। এক এক সময় ওকে দেখে সেই অরক্ষণীয়ার জ্বালানোর কথা মনে পড়ে যায় হেমন্তর। হয়ত ঠিক অতটা এখনও হয় নি—তবে হ'তে বেশী দেরিও নেই।

না, তার বিয়ের কথা কেউ ভাবে নি। তার বিয়ে যে সম্ভব, তা-ই বোধহয় কারও মনে পড়ে নি। ভাইরা সকলেই তার ছোট, তারা দিদিকে ঐ একভাবেই দেখতে দেখতে বড় হয়েছে—তাকে সলজ্জ বধূ বেশে এখন আর কল্পনা করতে পারে না ; তাছাড়া ছোট ভাই দিদির বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে তদ্বির ক'রে বেড়াচ্ছে—এমনটা তাদের বিশেষ চোখে পড়ে না। সুতরাং, সে সম্বন্ধে তাদের যে কোন দায়িত্ব আছে সেটাও বুঝতে পারে না। বনলতার মা বেঁচে থাকলেও বা কথা ছিল, হয়ত ছেলেদের সে সম্বন্ধে সচেতন করাতে পারতেন তিনি—কিন্তু তিনিও বছর পাঁচেক আগে গত হয়েছেন। বনলতাই এখন ও বাড়ির গিন্নী, গিন্নীর আবার বিয়ে কি ?

অবশ্য হেমন্তর, শুধু হেমন্তই বা কেন, আশে পাশে সামনে পিছনে প্রতিবেশী তো কম নেই—কারুরই কথাটা মনে হয় নি। বনলতার বিবাহ দেবার আগে প্রাণেশের বিবাহ করা যে অশোভন এ তারা কেউই ভাবে নি। আসলে বনলতার বিবাহ হয়েছে বা হয়নি—তাই কারও খেয়াল ছিল না যেন, এক বনলতা ছাড়া।

*　　　*　　　*　　　*

—এক বনলতা ছাড়া।

সেইটেই এতদিনে টের পেল হেমন্ত। তার এই অশোভন ও দুর্বহ কুমারীত্ব সম্বন্ধে কেউই সচেতন ছিল না—এক বনলতা নিজে ছাড়া।

সে সচেতন তাও কেউ টের পেত না, হেমন্তও টের পেত না, যদি না একটা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এই বিজ্ঞাপনটা দিয়ে বসত সে।

হেমন্তও এতদিন বিবাহ করে নি। সে বিবাহ করে নি—প্রকৃত পক্ষে কেউ উদ্যোগী হয়ে দেয় নি বলে। তারা দুভাই, ছোট ভাই বোম্বেতে চাকরী করতে গিয়ে একটি গুজরাটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে বসেছে, দাদা বা মার অনুমতি না নিয়েই। সে এখানে আসেও না বিশেষ। একেবারেই পর হয়ে গেছে।

এ বাড়ীতে মা আর হেমন্ত থাকে শুধু। হেমন্তর বিয়ের কথা মা আগে আগে ঢের তুলেছেন কিন্তু তখন হেমন্ত সাহস করে নি। তার মাইনে খুব বেশী ছিল না, মাথার ওপর দায়িত্ব ছিল বোন এবং ভায়ের। তাই নিজের পথ বেছে নিয়েছে, বোনের বিয়ে হয়ে গেছে—এখন বিয়ে করলে অনায়াসেই করতে পারে সে। তাছাড়া তার মাইনেও গত তিনচার বছরে অনেকখানি বেড়ে গেছে, কোম্পানীর একটা বিভাগের মোট আয়ের ওপর শতকরা আট আনা কমিশন পায় সে, মাস গেলে সে টাকাটাও বড় সামান্য নয়। অর্থাৎ সবদিক দিয়েই তার পথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই—এখন আত্মীয়রা আর কেউ তার বিবাহের কথা তোলেন না। কেমন ক'রে যেন তাদের ধারণা হয়ে গেছে যে হেমন্ত আর কোন দিন বিয়ে করবে না, সে সত্যসত্যই দাম্পত্য জীবনে বীতস্পৃহ। এমন কি তার মা বোনও বোধহয় তাই মনে করেন। মা-ও ইদানীং আর ছেলের বিয়ের কথা তোলেন না। তিনি বুড়োও হয়ে পড়েছেন খুব—আগে যখন সংসারের কাজ কিছুটা করতে হ'ত, অন্তত নিজের রান্নাটা, তখন তবু দু একবার বলতেন, এখন অবস্থার একটু উন্নতি হ'তে একজন বামুনের মেয়েকে তাঁর রান্নার জন্য বাহাল করায় আর একবারও সে কথা মুখে আনেন না। 'আমি আর পারি না, আমায় একটা লোক এনে দে', একথা বলার আর প্রয়োজন হয় না। এই বামনী রাখাতেই আরও তিনি ধরে নিয়েছেন যে ছেলে ঘোর বিবাহ-বিদ্বেষী, ওপথে সে যাবে না।

কথাটা তোলে বন্ধু বান্ধবরা, কিন্তু মা কি বোন কেউ না তুললে হেমন্ত কেমন করে মুখ ফুটে বলে তাদের যে 'এইবার সম্বন্ধ দেখ একটা তোমরা—আমি বিয়ে করব।' বিষম লজ্জা করে তার এতকাল পরে নিজে থেকে প্রসঙ্গটা তুলতে। তাও, যদি প্রথম যৌবনের সে আগ্রহ সে আসক্তি থাকত তাহলে হয়ত সামান্য চক্ষু লজ্জার বাধাটা দুর্লঙ্ঘ্য মনে হত না। এক সময় বিয়ের জন্যে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এটা ঠিক—একটি তরুণী নারীর সাহচার্যের জন্য মন উৎসুক লোভাতুর হয়ে উঠেছিল—কিন্তু সে সময় সে লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় নি। কোন উপায় ছিল না। সে উন্মত্ত আবেগকে সে আকুল সর্বনাশা ইচ্ছাকে দৃঢ় বলে দমন করতে হয়েছে, পীড়ন ক'রে ক'রে অসাড় ক'রে দিতে হয়েছে মনের একটা বড় দিককে।

আজ আর সে আগ্রহ, সে আকুলতা নেই। বরং সে জায়গায় একটা দ্বিধা একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আজ মনে হয় যে, এই এত বয়সে অবিবাহিত জীবনের অভ্যাসগুলো যখন স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে প্রায়—তখন সেকি পারবে আর একটি বেশী বয়সের মেয়ের জীবন-অভ্যাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে? শেষে দাম্পত্য জীবন অসহ্য হয়ে উঠবে না তো? জীবনসঙ্গিনী একটা বোঝায় পরিণত হবে না তো?···আর কী দরকারই বা, মিছিমিছি এই এতকাল পরে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলে? জীবনের বেশীর ভাগ অংশই তো কেটে গেল, বাকী আর কটা দিনের জন্য এত হাঙ্গামা করা কি পোষাবে?

···তার ওপর—এই বয়সে যদি আবার ছেলেমেয়ে হয়, তাদেরই বা মানুষ করবে কি করে?···যাক, দরকার নেই আর ওসব চিন্তা করে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। বিধাতা তার অদৃষ্টে গৃহসুখ দাম্পত্যসুখ লেখেন নি—নইলে সব থাকতেও তার জীবনটাই বা এমন সৃষ্টিছাড়া ছন্নছাড়া হয়ে উঠবে কেন? আর কিছু না হোক, একটা মাথা গোঁজার নিজস্ব জায়গাও ছিল, চাকুরিতেও ঢুকেছে সে বহুকাল, মা কি পারতেন না জোর করে তার বিয়ে দিতে? · তা যখন হয়ই নি, মা বোনও যখন তার অদৃষ্টে এমন নিরাসক্ত নির্বিকার হয়ে উঠেছে তখন এই কথাই বুঝতে হবে যে, ভগবানের ইচ্ছা নয় সে এপথে পা বাড়ায়!···

এ সবও ভাবে যেমন, তেমনি আশাটাও একেবারে ছাড়তে পারে না। হিসাব যুক্তি অভিজ্ঞতা—এসমস্তর মধ্যেও কোথায় একটা অবোধ ক্ষীণ আশা মনকে আঁকড়ে ধরে থাকে। একেবারে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতেও পারে না মন থেকে। বিশেষ ক'রে যখন নববিবাহিত বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যায়—তখন যেন কোথায় একটা কোন্ সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে হতাশা ব্যর্থতার ঘা পড়ে। সারা অন্তরটা অব্যক্ত মূক বেদনায় টনটন ক'রে ওঠে।···তাদের দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ ও সুখের আভাস মাত্র পায়—পরিপূর্ণ আস্বাদটা পায় না, মনে হয় বিশাল রাজপুরীর সিংহদ্বারেই তার দিনটা কাটল, সে রাজবাড়ির অন্দরমহলের সুখৈশ্বর্যের কোন পরিচয়ই মিলল না তার কপালে।

এই যুক্তি ও উন্মত্ততা, অভিজ্ঞতা ও আবেগে দোলা খেতে খেতে প্রায়

যখন তথ্য যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকেই মেনে নিতে চলেছে তখনই আকস্মিক আঘাতটা পেল হেমন্ত।

সে-ও এক বন্ধুর বাড়িতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। রজতের বাড়ি গিয়েছিল সেদিন। রজত তার ছেলেবেলাকার বন্ধু। সেও বেশ বেশী বয়সে বিয়ে করেছে। এই মাত্র বছর তিনেক আগে বিয়ে করেছে সে। ছত্রিশের কম নয় সে তখন। যতই বয়স কমাক এখন রজত—হেমন্ত ভাল করেই জানে হিসাবটা। কিন্তু বিয়ে করেছে সে তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি প্রায়-কচি মেয়েকে। অবশ্য তাতে তারা অসুখী নয়। আসলে সে মেয়ে এখনও বয়স বা দুর্ভাগ্যের চাপে স্তিমিত হয়ে যায় নি, এখনও সে যথেষ্ট দীপ্তিমতী, যথেষ্ট প্রাণ চঞ্চল—রোমান্টিক। সে নিজের যৌবন সুরভিতে নিজেই মশগুল—আনন্দ পাবার জন্য তাকে বাইরের কোন কারণের ওপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু সে আনন্দ সে স্বার্থপর কৃপণের মতো সঞ্চয় করে না কিংবা সুদ্ধমাত্র স্বামীর জন্য সঞ্চিত রাখে না—আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সঞ্জীবিত ক'রে রাখে তার যৌবনের সে সহজ প্রসন্নতায়। নিজেও ভাসে, অপরকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেন সঙ্গে সঙ্গে।

এ মেয়ের প্রতি অকৃতদার পুরুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই যতটুকু শোভন, যতটুকু সুরুচিসম্পন্ন—তার সীমারেখার মধ্যে নিজের আচরণকে বেঁধে রাখতে পারে নি হেমন্ত, হয়ত একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল। একটু হয়ত ঘনঘনই যেত সে রজতের বাড়িতে—বাল্য বন্ধু সম্পর্কের দাবিতে বুঝি একটু বাচালতা ও প্রগল্‌ভতাও প্রকাশ করে ফেলত মধ্যে মধ্যে। রজতের বোধ হয় অতটা ভাল লাগেনি। সে একদিন ঠাট্টার ছলেই বলে ফেলল কথাটা—কিন্তু কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় ঠাট্টার ছদ্মবেশটা অনাবৃত হয়ে পড়ল—সে বলল, 'আর কতকাল এমন পরের বাড়ি বাড়ি ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াবে? এবার নিজের একটা কিছু ব্যবস্থা ছাখো—আর কেন? আর নয়ত দীক্ষা টিক্ষা নিয়ে ভগবানে মন দাও, মনটা পরিষ্কার হয়ে যাক।...এমন ক'রে দুনৌকোয় পা দিয়ে থাকা ঠিক নয়। বয়সের শখ বয়সে না মেটালে মানুষ হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে ক্রমশ। এর পর পাড়ার ছোট ছোট ঝি বৌকে নিয়ে যে টানাটানি করবে শেষ পর্যন্ত—লোকে গায়ে ধুলো দেবে!'

তখনই, সেই মুহূর্তে চলে এসেছিল হেমন্ত, আর যায় নি কোনদিন। কারও

বাড়িতেই যায় নি আর। কোন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক রাখে নি। আঘাতটা মর্মান্তিক বেজেছিল। কারও কথা যে এমন চর্ম ভেদ করে সত্যিই মর্মে গিয়ে বিঁধতে পারে, কথায় যে এমন বাস্তব ধার আছে তা এর আগে কোনদিন অনুভব করেনি হেমন্ত। সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারেনি। অপমানের জ্বালাই শুধু নয়—মর্মান্তিক নিষ্ঠুর সত্যের জ্বালাই বেশী বোধ করেছে যেন। রজত মিছে কথা বলেনি, তার মনের কদর্য দিকটার নগ্নরূপে তুলে ধরেছে মাত্র। সত্যিই, এমন করে চললে একদিন হয়ত আরও কি নির্লজ্জ কাণ্ড ক'রে বসবে—আরও কি অনাবরণ লোলুপতা প্রকাশ ক'রে ফেলবে।

সারারাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভোর নাগাদ মন স্থির ক'রে ফেলল সে। তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল। তার পর চলল সারা সকাল ধরে বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা। অনেকবার কাটল, অনেকবার লিখল। শেষে মোটামুটি বয়ানটা পছন্দ হ'তে একটা ভাল কাগজে পরিষ্কার করে লিখে, দুপুর বেলা অফিস থেকে কোন ছুতোয় বেরিয়ে নিজে গিয়ে এক বিখ্যাত দৈনিকের অফিসে দিয়ে এল। 'পাত্র পাত্রী' কলমের রেট কম তবু কুড়ি টাকার ওপর পড়ল ঐটুকু বিজ্ঞাপন। তা হোক, এখরচা গায়ে লাগবে না। কিন্তু ঠিক কী রকম পাত্রী চায় সে—সে সম্বন্ধে কারও কোন সংশয় না থাকে। মিছি মিছি একগাদা চিঠি চাপাটি চালাতে রাজী নয় সে।

হয়ত একটু বিচিত্রই লাগবে কারও কারও কাছে বিজ্ঞাপনটা, হয়ত বিজ্ঞাপনদাতার মস্তিষ্কের সুস্থতাতেও সন্দেহ করবে কেউ কেউ—কিন্তু উপায় কি?

হেমন্ত বিজ্ঞাপনে লিখেছিল:

"জনৈক মধ্যবয়সী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ গ্র্যাজুয়েট পাত্রের জন্য অন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়স্কা একটি পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের নিজ বাটি আছে, মাসিক হাজার টাকার মতো আয় এবং মোটামুটি সচ্চরিত্র। ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য কোন উচ্চবর্ণের কন্যা চলিতে পারে। বিধবাতে আপত্তি নাই—কুমারী বাঞ্ছনীয়। তবে পাত্রী অবশ্যই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সদ্বংশজাতা হইবেন এবং সংসারের সমস্ত ভার বহন করার মতো যোগ্যতা তাঁহার থাকিবে। তিনি মনে রাখিবেন যে এই বয়সের বিবাহে পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষকেই অনেকটা

মানাইয়া চলিতে হয়—তিনি যেন পাত্রের নিকট হইতে বিবাহিত জীবনে খুব বেশী মনোযোগ আশা না করেন।”

বলা বাহুল্য এ বিজ্ঞাপনের কথা কাউকে বলে নি সে। মাকে তো নয়ই। তার বিশ্বাস এই বয়সে তার এই ঘরবাসী হওয়ার প্রস্তাবে তাঁরা কেউ সুখী হবেন না। তার স্ত্রীকে অনধিকার প্রবেশকারিণী বলে মনে করবে। একেবারে বিবাহ স্থির ক'রে তাঁদের জানাবে সে। তাই সে বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এবং ঠিকানা দিয়েছিল অফিসের—যাতে চিঠি সব সেখানে আসে।

চিঠি এসেওছে অনেক। খান-আষ্টেক-নয়। এত সে আশা করে নি। কিন্তু চিঠি চাপাটি ক'রে মেয়ে দেখতে গিয়ে সে হতাশ হয়েছে। এত কুৎসিত এত বয়স্কা মেয়ের জন্য তার মন প্রস্তুত ছিল না—যা সে দেখলে। মেয়েগুলি এবং তাদের অভিভাবকদের দেখে হেমন্তর মনে হ'ল যে পয়সাওলা একটা প্রায়-বৃদ্ধকে ঠকিয়ে বেশ একটু মজা দেখবার জন্যই তারা ব্যগ্র।…হয়ত তারই ভুল—তবু যে চার পাঁচটি মেয়েকে সে দেখল এবং যাদের সঙ্গে কথা বলল—তারা কেউই তার জীবনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত বলে মনে হ'ল না তার। মনে হ'ল এদের কারও সঙ্গেই সে দুদিনের বেশী ঘর করতে পারবে না।

প্রায় যখন হতাশ হয়ে উঠেছে—তখন এই চিঠি। এই-ই সর্বশেষ চিঠি বোধহয় সে বিজ্ঞাপনের। শেষ যে দুখানা চিঠি এসেছিল, তার পরে পুরো একসপ্তাহ চলে গেছে—হঠাৎ এই চিঠিখানা এসেছে আজ। একখানা চিঠি একটা বড় খামের মধ্যে করে পাঠিয়ে দিয়েছে কাগজের অফিস থেকে। সম্ভবত কাগজখানা অনেক দিন পরে নজরে পড়েছে বেচারীর, অথবা দীর্ঘকাল ধরে মনের সঙ্গে, স্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে লড়াই করেছে এ চিঠি দেবার আগে।

চিঠি দিয়েছে বনলতা। তার পাশের বাড়ির বনলতা, তার দীর্ঘ কুড়ি বছরের প্রতিবেশিনী। নিজেই দিয়েছে—অপর কাউকে দিয়ে লেখায় নি, অপর কারও উদ্যোগ বা বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করতে পারে নি। সমস্ত শোভনতাবোধ পরিত্যাগ ক'রে নির্লজ্জ উপযাচিকার মতো এই চিঠি দিয়েছে সে।

আবারও পড়ল সে চিঠিখানা।

হাতের লেখা চলনসই, তবে বানান-টানান মোটামুটি নির্ভুল—একেবারে গ্রাম্য মেয়ের মতো নয়। বনলতা লিখেছে :—

"নমস্কার পূর্বক নিবেদন এই যে, মহাশয় গত বুধবারের পত্রিকাতে আপনার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে এই পত্র লিখিতেছি। আমি নিজে পাত্রী হইয়া নিজেই লিখিতেছি, সেজন্য হয়ত আমাকে যৎপরোনাস্তি নির্লজ্জ বা বেহায়া ভাবিতেছেন কিন্তু উপায়ান্তরবিহীন হইয়াই আমাকে আজ একাজ করিতে হইতেছে, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার বাবা কি মা বাঁচিয়া থাকিলে এমন বিসদৃশ কাজ আমাকে করিতে হইত না—কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য বশত তাঁরা কেহই আর জীবিত নাই। বাবা আমার বালিকা বয়সেই গত হইয়াছেন। আমার বয়স এখন পূর্ণ একত্রিশ। ইহা মিথ্যা নয়, কারণ আজ এ চিঠিতে এক বর্ণও মিথ্যা বলিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াই লিখিতে বসিয়াছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিলাম, পাস করিতে পারি নাই। আর একবার পরীক্ষা দিবারও অবসর মেলে নাই কারণ সেই সময় একটা বড় সংসারের যাবতীয় কাজ আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আজও সেই সংসারে সেইসব কাজই করিয়া যাইতে হইতেছে। তবে সংবাদপত্র নিয়মিত পড়িয়া থাকি, বাংলা বইও অবসর পাইলেই পড়ি। গায়ের রং এককালে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছিল এক্ষণে তামাটে ময়লা হইয়া গিয়াছে। চেহারা সুশ্রীও নয়—তবে আমার যতদূর মনে হয়, একেবারে কুশ্রীও নয়। শরীরে কোন রোগ নাই, দৈনিক প্রত্যহ আঠারো উনিশ ঘন্টা খাটিতে পারি খাটিয়াও থাকি। যদি আমাকে দয়া করিয়া গ্রহণ করেন তবে আমি আপনার সংসারের সমস্ত কর্ম একা করিয়া নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি স্ত্রী বা গৃহিণীর মর্যাদা চাহিনা—কোন সৎ ভদ্রলোকের আশ্রয়ে দাসীর মতো থাকিতে পাইলেই বাঁচিয়া যাই। সেইটুকুতেই কৃতার্থ বোধ করিব। কোনদিন স্ত্রীর অধিকার দাবী করিব না ইহা যে কোন ঠাকুর দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিতে রাজী আছি—অথবা যে কোন প্রকার দলিল করাইয়াও লইতে পারেন। এমন কি যদি আপনি অপর কোন যোগ্যা পাত্রীর প্রতি আসক্তি বোধ করেন—আমি তদ্বির করিয়া সে বিবাহ দেওয়াইব, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আমার খাটিতে আপত্তি নাই। হাসিমুখে দাসীত্ব করিতে পারি—শুধু যদি সেটা সম্মানের দাসীত্ব হয়। দয়া করিয়া যদি কেহ আমাকে এই বাপের বাড়ির

ছোট ভাইদের দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন, আমি তাঁহার ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব। ছোট ভাইয়েরা বিবাহ করিবে, তাহাদের বধূ আসিবে—সেই সংসারে চিরকাল এমনি দাসীগিরি করিতে পারিব না কিছুতেই। যদি এই কদিনের মধ্যে কোন উপায় না হয়—তাহা হইলে বোধ হয় রেলে গলা দেওয়া ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর থাকিবে না। নিজের বিবাহের তদ্বির আমাদের মতো অবস্থায় করা সম্ভব নয়—করিতে পারিতামও না যদি না আপনার এই বিজ্ঞাপন নজরে পড়িত। আপনি আমাকে বেহায়া ভাবিতেছেন কিম্বা পাগল ভাবিতেছেন—কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যই আমি এ দুটার কোনটা নই। আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার লইবেন। ইতি

লেখিকা বনলতা মল্লিক।"

বনলতা!···বনলতা?

চিঠিখানা নামিয়ে বনলতার চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করল হেমন্ত কিন্তু এতকাল পরে ঠিক যেন মনে পড়লনা! নিত্যই দেখছে, কালও নিজেদের বারান্দা দিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে নজর পড়েছে ওদের উঠোনের দিকে, বাইরের কলতলায় বসে দ্রুত হস্তে চায়ের বাসন ধুচ্ছিল; মেজ ভাইয়ের স্নানের আগে তৃতীয় কাপ চা চাই—ঠিক সময় না পেলে অফিস যেতে দেরি হয়ে যাবে—সেই জন্যে এত তাড়া। কিন্তু সে যাক গে—গত কুড়ি বছর ধরে প্রায় প্রত্যহ যাকে দেখছে, তার চেহারাটা কেন কিছুতেই মনে পড়ছে না! একটা আব্‌ছা আদল আসছে—মনের পর্দায় ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে না কিছুতেই।

তার মানে, কোনদিনই ওর দিকে তাকিয়ে দেখা হয়নি ভাল ক'রে। দেখবার মতো কিছু, বা দেখবার কোন প্রয়োজন আছে—তাও মনে হয়নি। সেই জন্যেই ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেনি কোন দিন, মুখের চেহারাটা মনে ক'রে রাখেনি।

তবু, কতবারই তো কাছাকাছি এসেছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আসা-যাওয়া খাওয়া দাওয়ার অনেক উপলক্ষ্য ঘটেছে। সামনাসামনিই দেখেছে গল্পও করেছে। দেখার মতো ক'রে, মনোযোগ দিয়ে দেখেনি হয়ত—তবু দেখেছে বৈকি! এখন সেই স্মৃতিরই ক্ষীণ সুতো ধরে বনলতার অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া ছবিটাকে কাছে টানবার চেষ্টা করল, ভাল করে মনে করবার চেষ্টা

করল। মনে পড়লও একরকম। আবছা হ'লেও মোটামুটি বনলতারই ছবি সেটা।

না, বনলতা কুশ্রী কুরূপ ছিল না কোনকালেই। তার দিকে তাকালে দৃষ্টি কোন আঘাত পেতনা অন্তত। মুখ চোখ গঠন কোনটাই দৃষ্টিকটু ছিলনা তার। না তার আচারে আচরণে আর না তার চেহারায়—কোথাও কোন রূঢ়তা, পরুষতা ছিল না—একটা স্নিগ্ধতাই বোধ হ'ত তার সান্নিধ্যে এলে।

সত্য বটে বনলতার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে ইতিমধ্যে, অনেক বেশী শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। অবিরাম কঠোর পরিশ্রম তার কাঠিন্যের রূঢ় স্পর্শ দিয়ে গেছে ওর সর্বাঙ্গে—তবু এখনও ভয়াবহ হয়ে ওঠেনি একেবারে, এমন কি অরুচিকরও না। লেখাপড়া? না, লেখাপড়ার মোহ আর তার নেই। তার অফিসে অনেকগুলি গ্র্যাজুয়েট মেয়েকেই তো সে দেখেছে—এই চিঠিখানা লিখতে তাদের অনেক বেশী ভুল হ'ত—ব্যাকরণ ভুল, বানান ভুল, শব্দের অর্থ-গত ভুল। ইংরেজীও তারা বোধহয় দুটো লাইন নির্ভুল শুদ্ধ লিখতে পারেনা।··· তার যখন চাকরি ক'রে খাওয়াবার সমস্যা নেই—তখন গ্র্যাজুয়েট স্ত্রী দিয়ে প্রয়োজনই বা কি? আজও যদি হেমন্ত কোন কারণে পঙ্গু অকর্মণ্য হয়ে যায়, তাহলে বাকী জীবন সে বসে খেতে পারবে। সুখে না হোক, স্বচ্ছন্দে। আর লেখাপড়া সে তো চায়ও নি। এই কদিনে অনেক কটি মেয়েই সে তো দেখল। চার পাঁচটি অন্তত। তাদের অনেকের চেয়েই বনলতা ভাল। হয় হাতীর মতো মোটা, নয় কাঠির মতো রোগা, একান্ত শ্রীহীন—পছন্দ করার মতো একটু কিছু নেই তাদের মধ্যে। শ্রীময়ী মেয়ে এই বয়সে আশা করাই হয়ত ভুল। যাদের কেউ পছন্দ করেনি তারাই বসে আছে এত বয়স অবধি। তবু—সে সব মেয়েকে দেখে মনের অবচেতনে একটা 'থাক্'ই অনুভব করেছে হেমন্ত। নিজেই বয়সটার সম্বন্ধেও রূঢ় ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে সবটাই ভুল, সবটাই ধাষ্টামো। এই বয়সে বিজ্ঞাপন দেওয়া, বিয়ে করতে চাওয়া সবটাই। ভাগ্যে আর কেউ জানে না! এ নির্বুদ্ধিতার কথা অপর কেউ টের পেলে লজ্জার সীমা থাকত না। গোপনে বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো বুদ্ধিও যে তার হয়েছিল শেষ মুহূর্তে—সে জন্যই সে মনে মনে ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে।

*   *   *   *

অকস্মাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল হেমন্ত, ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি সুরু করল।

আশ্চর্য। ভারী আশ্চর্য লাগছে আজ তার—নিজের মনের চেহারাটা দেখতে পেয়ে।

বুড়ো মার জন্যেই পারে নি। ক্লান্ত সে চাকরদের ঠাকুরদের রান্না খেয়ে খেয়েও। এ সমস্ত সমস্যারই সমাধান হতে পারে বনলতাকে ঘরে আনলে। তাকে বিশ বছর ধরে দেখছে—দোষগুণ সব জড়িয়েই তাকে চেনে। অজানা অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার চেয়ে এই পরিচিত মেয়েটিকে ঘরে আনা ঢের বেশী নিরাপদ।

ভাবতে ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। আশ্চর্য এই পাশাপাশিই ছিল তারা এতকাল ধরে, অথচ কথাটা কারও একবার মনে পড়েনি কেন! তার মা কেন ভাবেন নি, কিম্বা তার বোন তরু? বনলতারাই বা কেন এ সম্ভাবনাটা ভেবে দেখে নি! হয়ত তাকে আয়ত্তের বাইরে মনে করেছে। কিন্তু মা-ও তো চিন্তা করতে পারতেন ওকে বধূ করে ঘরে আনার কথাটা! তাঁর এত কষ্ট কিছুই করতে হত না, সত্যিসত্যিই সেবা যাকে বলে তা তিনি পেতে পারতেন: তিনিও কি বনলতাকে ছেলের যোগ্য ভাবেন নি? অথবা পর হওয়ার ভয়ে আদৌ বিয়েই দিতে চান নি ছেলের?

কিন্তু বনলতা সম্পর্কে এসব কোন প্রশ্নই ওঠে না। দুজনেই দুজনকে দেখেছে দীর্ঘকাল, কোন 'থাক' লাগার কারণ ঘটবে না কোন পক্ষেই। এখনও সে অসহায় নয়। তার স্বভাবটাও ঠাণ্ডা, ইদানীং কোন কোনদিন তাকে কিছু চেঁচামেচি করতে শুনেছে বটে, ভাইদের সঙ্গে কলহও বেধে উঠতে দেখেছে কিন্তু সে এমন কিছু নয়। এ অবস্থায় অন্য মেয়ে পড়লে অনেক বেশী তিক্ততা সৃষ্টি করত, অনেক বেশী অশান্তি করত। এই বয়সে বিয়ে করার মধ্যে সবচেয়ে যে বড় কথাটা থাকে—সাংসারিক শান্তি, সেটা সম্বন্ধে অন্তত নিশ্চিন্ত থাকবে বনলতাকে ঘরে আনলে।

নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে অনেক দিক দিয়েই। সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে খবরদারি করতে করতে সে উত্যক্ত, ক্লান্ত। অনেক বারই তার মনে হয়েছে গত কয়েক বছরে—সংসারের ঠাট ভেঙ্গে কোন হোটেলে গিয়ে ওঠে সে।

এই দীর্ঘদিন ধরেই বনলতাকে পছন্দ করে এসেছে সে—ভদ্র মেয়ে, শান্ত স্বভাবের মেয়ে, কর্মনিপুণা মেয়ে বলে। জীবনে সুখশান্তি দেবার পক্ষে আদর্শ মেয়ে বলে।···তবু কেন কথাটা মনে আসে নি তার? সেকি শুধু গৃহিণী নয়—জীবনসঙ্গিনীকে প্রিয়তমা রূপেও দেখতে চেয়েছিল বলে? বর্ষা নয়—বসন্তকেই কামনা করে এসেছিল বলে? বিয়ে মনে করাতেই একটি রূপসী তরুণীকে কল্পনা করেছিল বরাবর?···হয়ত তাই—সেই জন্যেই এই নিতান্ত সাধারণ মেয়েটির কথা মাথাতে যায় নি তার—যে এই দীর্ঘকাল ধরে তার কাছেই ছিল!

কিন্তু সে কামনার লগ্ন যে পেরিয়ে গেছে দীর্ঘকাল।

বহুদিন পিছনে ফেলে এসেছে সে সম্ভাবনাময় দিনগুলিকে,—যখন এটা চাওয়া অশোভন বা অসম্ভব হ'ত না। আজ সে রূপসী তরুণীকে কামনা করবে কোন্ মুখে? আয়নায় যে প্রায় রোজই নিজের মুখটা নজরে পড়ে।···

যে রজতকে সে সবচেয়ে ঈর্ষা করে এসেছে মনে মনে—আজ মনে পড়ছে—সেও তো সম্পূর্ণ সুখী নয়। তরুণী স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা স্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সে আজ ক্লান্ত। তার সঙ্গে সবদিক দিয়ে মানিয়ে চলবার মতো শক্তি আর নেই, বয়সের অমোঘ নিষ্ঠুর শোষণে তার প্রাণরস এসেছে শুকিয়ে —অথচ সে কথাটা স্বীকার করবার মতো সাহসও তার নেই। এখন সে শুধু অবসন্নই নয়—উদ্বিগ্নও। পরাজয়ের কথাটা পাছে কোন দিন স্ত্রী বুঝতে পারে সে জন্যে উদ্বিগ্ন। তাছাড়াও হয়ত কোন কুটিল কারণ আছে উদ্বেগের। অসুখী হবার সবচেয়ে যে বড় কারণ ঘটে দাম্পত্য জীবনে সেটাও ঘটেছে। আজ রজত ঈর্ষিতও। কারণে অকারণেই ঈর্ষা বোধ করে। তার চিন্তা কল্পনা ভাবনা সমস্ত বোধ করি ঈর্ষা-কণ্টকিত।···

তবু একথাটা আজ যেমন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—এতদিন তেমন পায়নি কেন? এটা কি বনলতার চিঠিটা পেয়েই সম্ভব হ'ল? মনের সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল জ্যোতির্ময় সত্যের প্রকাশে?···

না। তার বনলতাই ভাল। সেই তার জীবনে ধ্রুব হোক, অক্ষয় হোক। অবশিষ্ট জীবনটা সে শান্তিতে কাটাতে চায়, দু'খানি সেবাপরায়ণ হাতের স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ে। "উৎকণ্ঠ আমার লাগি যদি কেহ প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে", কবির এ বাণী তার জীবনে সত্য হোক।···

সে দ্রুত নেমে গেল তরতর করে একতলায়, মায়ের ঘরে।

'মা, আমি ঠিক করেছি বিয়ে করব। দিনটিন ছাখো একটা তাড়াতাড়ি। তুমি না দেখতে পারো ভট্টাচার্য মশাইকে দিয়ে দেখিয়ে নাও।'

মা চমকে উঠলেন। প্রথমটা তাঁর বিশ্বাসই হ'ল না, ছানি কাটানো চোখের পুরু চশমাটার মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে। ছেলে তামাসা করছে কিংবা তার মাথায় কোন ছিটের লক্ষণ দেখা দিয়েছে কিনা সেটাই ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেন মুখের দিকে চেয়ে।

তারপর একটু শুষ্ক যেন অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, 'ওমা তা বেশ তো। সে তো ভাল কথাই। এতদিনে যদি সুবুদ্ধি হয়ে থাকে সে তো ভালই। তা মেয়েটেয়ে খোঁজ করি আগে—আগেই দিন দেখিয়ে কী হবে?'

'মেয়ে আমি ঠিক করেছি। ভয় নেই, তোমার ছোটছেলের মতো উৎকট কিছু ঠিক করিনি। স্বজাতি, স্বঘরের মেয়েই ঠিক করেছি!'

ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে উঠল মায়ের মুখ?

তিনি সংশয় চেপেও রাখতে পারলেন না 'ওমা, এর ভেতর মেয়ে আবার কোথায় ঠিক করলি রে? কে দেখালে মেয়ে? কই, আমাকে কিছু বলিস নি তো!'

'বলা তোমারই উচিত ছিল মা, তোমারও দেখা মেয়ে। কুড়ি বছর ধরেই দেখেছ।···আমি পাশের বাড়ির লতুর কথা বলছি!'

'লতু? মল্লিকদের বাড়ির! সে কি রে? এদ্দিন পরে ঐ কেল্‌টি মেয়েটাকে পছন্দ হ'ল শেষ পর্যন্ত? কী আছে ওর, কাঠ হয়ে গেছে তো খেটে খেটে! বিয়ে করার এত ইচ্ছে হয়েছিল তা একবার দয়া ক'রে জানালেই তো হ'ত—কত ভাল মেয়ে এনে জড়ো করতাম দুপায়ে।'

বিরস কণ্ঠ ক্রমশ বুঝি তিক্তই হয়ে ওঠে মায়ের।

জানতে তো চাও নি তুমিও কখনও। যে এই দীর্ঘকাল ধরে খেটে তোমাদের সুখে রাখছে তার সুখের ব্যবস্থা কি তোমারই করা উচিত ছিল না? আর কাঠ হয়ে যাওয়া? আমিও এতকাল খেটে খেটে, বাইরে না হোক ভিতরে, কাঠ হয়ে উঠেছি, তোমরা সেটা দেখতে পাওনা।'

'বেশ! এখন আমাকে তো দোষ দেবেই। বিয়ের কথা কি তুলিনি আমি? সত্যি ক'রে বল্‌ দিকি!'

'তুলেছ। কিন্তু যখন তুলেছিলে তখন করার মতো অবস্থা হয়নি। যেদিন সে অবস্থা হয়েছে সেদিন আর তোল নি!'

অন্তরের বিষ হেমন্তরও চাপা থাকে না।

'তা কে একথা তুললে? পরেশ না গোকুল? পরেশের বে আট্‌কাচ্ছে বুঝি, অতবড় আইবুড়ো ননদের ওপর মেয়ে দিতে চাইছেনা তারা?

'না, ওরা কেউ তোলেনি। তোলার ইচ্ছেও বোধ হয় নেই। বিনা মাইনের অমন ভাল ঝি কে হাত ছাড়া করতে চায় বলো!...কথা কেউই তোলেনি। আমিই তুলব। আমি গিয়ে ভিক্ষা চাইব ওকে, প্রার্থনা করে সেধে নিয়ে আসব। আমি এখন যাচ্ছি ওদের বাড়ি। তুমি দিন-দেখার ব্যবস্থা করো!'

ঠিকুজী রহস্য

এতখানি বয়স পর্যন্ত অবিনাশবাবু এমন কথা শোনেননি। এ রকম যে হতে পারে—তা ভাবতেও পারেননি কখনও। মেয়েদের অনেক কারণে বিয়ে হয় না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল পছন্দের। লেখাপড়াই শেখাও আর যা-ই করো—মেয়ে যদি নিজে থেকে কোন পাত্র জুটিয়ে না নিতে পারে, তা সে 'অগা'ই হোক আর 'জুয়েল'ই হোক—তার চেহারার যোগ্যতাটাই সর্বাগ্রগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। 'দেখতে কেমন আপনার মেয়ে তাই আগে বলুন দিকি!' 'রঙ ফরসা তো? না মশাই এমনি যেমন-তেমন হোক—আমার গিন্নীর পণ গোরা মেয়ে চাই তাঁর।' 'কী বললেন, উজ্জ্বল-শ্যাম? তার মানে তো কালো। সত্যিকারের উজ্জ্বল-শ্যাম হলে চলতে পারে—মোদ্দা তা তো হয় না, উজ্জ্বল-শ্যাম শুনে যেখানেই দেখতে যাই গিয়ে দেখি ভুতুড়ে কালো।'...রঙ ছাড়াও আর একটা প্রশ্ন উঠছে ইদানীং, 'মেয়ের হাইট কত? আমার ছেলে কিন্তু পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি, পাঁচ চারের কম আমার চলবে না' ইত্যাদি—

তাও যদি বা রূপের বাধা পার হলেন—আরও অনেকগুলি বাধা সামনে এসে দাঁড়াবে। লেখাপড়া কী এবং কতদূর; লেখাপড়ারও রকমফের আছে—

বরের বাবা প্রোফেসার হ'লে চাইবেন এম. এ. পাশ কিম্বা নিদেন পক্ষে অনার্স পাওয়া মেয়ে—যাতে এম. এ. পাশ করিয়ে কোন কলেজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। হেডমাস্টাররা খোঁজ করেন বি. টি. পাশ করেছে কি না—অথবা বি. এ-তে এডুকেশন ছিল কি না। লেখাপড়া যদি বা গেল—কন্যার পিতা কত খরচ করবেন, পাত্রী নিজে চাকরি-বাকরি করে কি না, করলে কত বেতন। এছাড়া ঠিকুজি-কুষ্ঠি তো আছেই। আজকাল আবার ঘর ঘর জ্যোতিষী, ছেলের বাবারা পর্যন্ত অনেকে আজকাল বিদ্যেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। পেশাদার জ্যোতিষীর হাত থেকে যদি বা ছাড় পাওয়া যায় এঁদের খপ্পর থেকে ছাড় পাওয়া খুব কঠিন। সূর্যের তাপ সহ্য হয়—কিন্তু বালির তাপ অসহ্য—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

তবে এসব যা কিছু বাধা—মেয়েদের ক্ষেত্রেই। অবিনাশবাবুর ধারণা ছিল, চিন্তা যতকিছু মেয়ের বিয়ের জন্যে, মেয়ের বাপের। ছেলে যদি উপযুক্ত হয়—তার পাত্রী খুঁজতে বেরোতে হয় না—পাত্রীর বাবারাই খুঁজে খুঁজে আসে। আর এই এক মওকা ছেলের বাবার—বিয়ের পর বৌমার থ্যাতলানি ও ছেলের অবহেলা তো আছেই—কিন্তু বিয়ের আগে বরের বাবাও যা ঈশ্বরও তাই। 'পাত্রেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'। এই সময়টা—অর্থাৎ বিয়ের আগে তিনি যত কিছু মেজাজ দেখাতে পারেন—পারেন যত কিছু দাঁও প্রকাশ করতে। তিনি যা বলবেন সবই শোভা পাবে—পাত্রীপক্ষ মাথা হেঁট করে তা শুনতে ও মানতে বাধ্য। 'বাঙলা দেশে কনে দুপায়ে জড়ো করা যায়' 'বেঁচে থাক আমার মোহন বাঁশী, কত শত মিলবে দাসী'—এমনিধারা কিম্বদন্তী ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন, পঞ্চান্ন বছরের তেজবরে পাত্রের হাতে আঠারো বছরের সোনার প্রতিমা মেয়ে সম্প্রদান করতে চোখেও দেখেছেন।

কিন্তু নিজের ছেলের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে সে ধারণা একেবারেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। বিষম একটা ধাক্কা খেলেন অবিনাশবাবু মনে মনে। রীতিমতো 'শ্যক্' যাকে বলে। তবে কি দুনিয়াটা ওলট্-পালট্ হয়ে গেল একেবারে? একেই কি কলি পূর্ণ হওয়া বলে? তিনি কি রিপ্‌ভ্যান-উইঙ্কল্-এর মতো—কয়েক বছর নয়—কয়েক শতাব্দী ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন—তাই কোথা দিয়ে কাল বদল হয়ে গেছে টের পান নি?

অবিনাশবাবুর ছেলে যাকে বলে কন্যার বাপের দুরাশার ধন, তাই।

যথার্থই সুপাত্র। খুব একটা রূপবান না হলেও সুশ্রী, চমৎকার স্বাস্থ্য, ইঞ্জীনিয়ারিং-এ মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বড় একটা ইণ্ডো-জার্মান ফার্মে ঢুকেছিল, তাদের পয়সায় দীর্ঘদিন জার্মানী আর গ্রেটব্রিটেনে কাটিয়ে এসেছে—অথচ সেখানকার পাপ-উপসর্গ অর্থাৎ মদ আর মেয়েমানুষে আসক্তি—এগুলো সঙ্গে নিয়ে আসে নি। অবিনাশবাবু তা অনেক রকম করেই বাজিয়ে দেখেছেন। বর্তমানে হাজার দুই টাকা মাইনে পায়। কোম্পানী থেকে গাড়ি দিয়ে রেখেছে। আরও কি সব ভাতা-টাতা দেয়। ছেলের বাবা মানে অবিনাশবাবু যদিও সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন—তবু এখনও পাঁচশোর মতো পেনশ্যন্ পান, কলকাতা শহরে তাঁর দুখানা বাড়ি, হাতেও বেশ কিছু আছে—ছেলে বলতে, সন্তান বলতে—ঐ একটিই, অসীম।

সুতরাং সেই ছেলের বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র পাত্রী পাবেন—অবিনাশবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর এমনি একটা ধারণা ছিল। তাই অসীমের মুখের কথাটি খসার সঙ্গে সঙ্গেই তার মা বেনারসী শাড়ি প্রভৃতি কিছু কিছু বাজার শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! সে শাড়ি আলমারীতে পড়ে থেকে থেকে বিবর্ণ হয়ে গেল—শাড়ি পরার লোক ঘরে এল না আজ পর্যন্ত।

কারণ?

কারণ বিস্তর। প্রাথমিক কারণ অবশ্য সুশ্রী মেয়ের অভাব। প্রথম প্রথম প্রায় তাবৎ পাত্রেরই বাবা-মা আশা করেন তাঁরা সুন্দরী বধূ ঘরে আনবেন। পাত্রের নিজের তো সে আশা থাকেই। যদি না বাবা-মার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে ইতিমধ্যে নিজে থেকেই কোন কুরূপা মেয়ের খপ্পরে পড়ে থাকে।

কিন্তু কার্যকালে—ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে এঁরা দেখেন যে বাংলাদেশে সুন্দরী পাত্রী খুঁজে বার করার থেকে বরং একটি সূচী-ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে একটা উট গলানো সহজ। কিছুদিন হয়রান হবার পর সকলেই সুন্দরী থেকে সুশ্রীতে নামেন, তাতে যাঁদের 'নিধি' মিলে যায় তাঁরা মহাভাগ্যবান—যাঁদের মেলে না তাঁরা বলতে শুরু করেন, রঙটা একটু পরিষ্কার—আর চলনসই চেহারা পেলেই, তাঁদের চলবে। তাও অনেকের ভাগ্যে জোটে না, যাঁদের জোটে তাঁদের ভাগ্য ওরই মধ্যে ভাল বলে বুঝতে হবে।

অবশ্য অবিনাশবাবুরা পেয়েছিলেন কয়েকটি মেয়ে। দুমাস তিনমাস অন্তর এক-আধটি সুশ্রী বা চলনসই মেয়ে তাঁদের চোখে পড়েছিল। রঙটা হয়ত মাজা, চোখ দুটি টানা, একটু রোগা—তা হোক, কী আর করা যাবে। ওঁরা খাইয়ে পরিয়ে মোটা ক'রে নিতে পারবেন। কিম্বা, রঙটা শাম্‌লা হলেও মুখশ্রী ভাল, মিষ্টি মিষ্টি। গড়নপেটন বেশ গোলালো—কলাগাছের ভাব। তাও যেখানে না মিলেছে হয়ত লেখাপড়ায় খুব ভালো, ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়া মেয়ে, স্মার্ট, বলিয়ে-কইয়ে—সেই দেখেই ওঁরা ঝুঁকেছেন।

তবু, এতটা মানিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও, নিজেদের উচ্চাশাকে অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় নামিয়ে আনার পরও—বিয়ে হয় নি। না, টাকার কোন প্রশ্নই নেই এখানে। অসীম গোড়াতেই মাকে শাসিয়ে দিয়েছে। 'মেয়েদের কাছে কিছু চাইতে পারবে না—তাহলে আমি ও কাজে নেই। লাগে—চার পাঁচ হাজার আমিই দিতে পারব।' অবশ্য অবিনাশবাবুরও সে ইচ্ছা ছিল না। তিনিও নিঃস্ব নন। একমাত্র ছেলের বিয়েতে চার পাঁচ কেন—আট দশ হাজারও খরচ করতে পারেন অনায়াসে। শুধু তাই নয়, বালিগঞ্জের যে একরকম, 'কিছু না-চাওয়া' আছে, 'আপনার মেয়ে জামাইকে আপনি যা খুশি দেবেন' কিম্বা 'আপনার মেয়েকে আপনি দেবেন—আমার কিছু বলবার নেই'—সে রকম মতলবপূর্ণ ঔদাসীন্যও নেই অবিনাশবাবুর। এই ধরনের ভণ্ডামিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি বরং। এর চেয়ে সোজাসুজি ফর্দ ফেলে দিলে মেয়ের বাপ এত বিপন্ন বোধ করে না—এই শ্রেণীর ছদ্ম-ঔদার্যের পিছনে ঠিক কতটা আশা করেন তাঁরা—আঁচ করতে গিয়ে অথৈ চিন্তায় পড়েন। ফ্রীজ, রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ডচেঞ্জার, ওয়াশিং মেশিন, খাট বিছানা, ড্রয়িংরুম সেট, ডাইনিং টেব্‌ল্ ও চেয়ার, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল—এসব ত বটেই, আরও কি মনে মনে ওঁরা ধরে রেখেছেন কে জানে—না পেলে অসন্তুষ্ট হবেন। তা ছাড়াও আছে, আলমারীটা কিসের ও কাদের—টেবিলের ওপর সানমাইকা চাই কিনা, খাট একটা বড় না দুটো সিঙ্গল—এসব ছোটখাটো চিন্তার তো শেষ নেই-ই, বরপক্ষ তাঁদের আপাত-ঔদাসীন্যের মধ্যে এয়ার কণ্ডিশনিং যন্ত্রটা ধরে রেখেছেন কিনা, অথবা একটা গাড়ি—সেইটে আন্দাজ করতে গিয়ে প্রেসার বাড়িয়ে বসেন মেয়ের বাপরা।

অবিনাশবাবু এ দলে নন। তিনি স্পষ্টই বলে দেন, 'ফ্রীজ রেডিও

আমার ঘরে ঘরে, ছেলে ওসবের কোন অভাবই রাখে নি, ফার্নিচারেও ঠাসা আমার প্রতিটি ঘর—ওসব কিছু দিলেও রাখতে পারব না। যদি দিতেই হয় তো বরং মেয়েকে খাট বিছানা দেবেন—মেয়ের মতো একটা নিচু ড্রেসিং টেব্‌ল্‌ বড়জোর—কারণ ছেলের নিজস্ব একটি আছে। দয়া করে এর বেশী কেউ দেবার চেষ্টা করবেন না। মেয়েকে শাড়ি গয়না যা দেবেন—সেও আপনাদের সামর্থ্য ও অভিরুচি-মতো; আমি দেখতেও যাব না কি দিয়েছেন—না দিয়েছেন। এখান থেকেও প্রচুর পাবে; ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি মশাই একটি ভদ্দরলোকের মেয়ে ঘরে আনতে পারলেই খুশি। আমার ঘরের লক্ষ্মী আমি ঘরে আনব—এমনিই তিনি ওয়েলকাম—তার সঙ্গে মা লক্ষীর ল্যাচ-কী না থাকলেও চলবে।'

তবু বিয়ে হয় না কেন?

হয় না এক বিচিত্র কারণে।

সব মিলে গিয়েও ঠিকুজিতে আটকায়।

পাত্রের ঠিকুজিতে।

কেউ শুনেছেন কখনও—এমন কাণ্ড?

অন্তত অবিনাশবাবু তো শোনেন নি। তাঁর নিজের বিয়ের সময় এ প্রশ্নই তোলে নি কেউ। তাছাড়াও, তাঁর খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই-বোন মিলিয়ে বিস্তর বিয়েতে মাথা দিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে—এক-আধ ক্ষেত্রে হয়ত ঠিকুজি-কুষ্ঠির কথা উঠেছে—কিন্তু সেটা যে অপরিহার্য এমন কথা কেউ বলে নি। এখনকার মতো এ বাতিক সেকালে ছিলও না কারও। এখন তো, অবিনাশবাবুর মনে হয়, দেশটা ক্ষেপে গেছে একেবারে। সকলেই জ্যোতিষী। লগ্নাধিপতি ধনাধিপতির ঘরে, শনি চতুর্থে, রাহু অষ্টমে, অমুক তারিখে বৃহস্পতি বক্রী ত্যাগ করছেন—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল তাঁর। ট্রামেবাসে চড়তে হয় না অবশ্য, কিন্তু লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে, অথবা বাজারে কি বাজার যাবার পথে রাস্তায়—অনবরতই এই ধরনের কথা কানে আসে তাঁর। আর এই বাতিকেই তাঁর ছেলের বিয়েতেও এত অভদ্রা লেগেছে। ছেলের জন্মকুণ্ডলী খুবই ভাল। কর্মে প্রভূত উন্নতি, প্রচুর বিত্ত, উচ্চশিক্ষা—এ সবই উত্তম—কেবল নাকি কী এক সাংঘাতিক যোগ আছে—বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী মারা যাবে, অন্তত যাওয়ার সম্ভাবনা।

সেইটি দেখেন আর কন্যাকর্তারা পিছিয়ে যান। আর আশ্চর্য এই, আজ পর্যন্ত যতগুলি পাত্রী পছন্দ করলেন তাঁরা, অথবা, নিম্‌পছন্দ ;—তারা মানে তাদের অভিভাবকরা ঠিকুজি না দেখে কথা কইতে রাজী হলেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যাকর্তা নিজেই ওয়াকিবহাল, কোথাও কোথাও বা আত্মীয়ের মধ্যে কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বড় জ্যোতিষী বেরিয়ে পড়ে—তাঁদের সকলেরই কিন্তু ঐ এক 'রা', যোগটা নাকি এতই স্পষ্ট।

কেবল যেসব ক্ষেত্রে মেয়ে পছন্দ হবার কোন কারণ নেই, সেই সব ক্ষেত্রেই মেয়ের বাবারা বলেছেন, 'আমরা ওসব মানি-টানি না, বলে কত জ্যোতিষী দেখলুম মশাই, সব বোগাস্। সকলেই খানিকটা জানে—সবটা কেউ বলতে পারে না। আর মেয়ের ভাগ্যে যা লেখা আছে তা তো হবেই—সে যতই কেন না গুনে-গেঁথে-বাচিয়ে দিন আপনি!'

কিন্তু সে সব জায়গায় যে কাজ হওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

•

অবশেষে অসীমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এবার সে তার মাকে ডেকে স্পষ্টই বলে দিল, 'আর আমার বিয়ের কথা বাড়িতে না আলোচনা হতে শুনি। এই একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে শুধু শুধু ঘোঁট করা আমার ভাল লাগে না। এর পর—যদি কখনও সুবিধে হয়—আমি নিজেই করে নেব। তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

তাকে দোষও দেওয়া যায় না অবশ্য। এক মাস, দু মাস এমন কি ছ মাস ন মাসও নয়—পুরো দুটি বছর ধরে এই কথাবার্তা দেখাদেখি আলোচনা চলছে। বরং বলা যায় যে, সে—নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই—অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অনেক আগেই তার বিরক্তি বোধ করার কথা।

ছেলের ধমকে মা চোখে অন্ধকার দেখলেন। স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার আর বাছাবাছিতে দরকার নেই বাপু, যে মেয়ের বাবা রাজী হবে তার সঙ্গেই ঠিক ক'রে ফ্যালো, কালা বা বোবা না হ'লেই হ'ল!'

অবিনাশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই বলে একটা কালপেঁচা পেত্নী ধরে ঘরে নিয়ে আসি আর কি—যেহেতু তার বাবা দয়া ক'রে ঠিকুজী দেখতে চাইবেন না! কেন, আমার ছেলে কি ফেল্‌না?...তার চেয়ে সত্যিই

তো,—বিয়ে না-ই দিলাম। ছেলে নিজে দেখে করে করুক, সে ক্ষেত্রে আমাদের কেউ দোষ দিতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, তারপর ঐ আপিস থেকে যদি একটা চলানী শাঁকচুন্নীকে ধরে আনে?'

'আনে আনবে, কী করব আর?'

আসলে অবিনাশবাবুও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। শুধু বিরক্ত নয়, নিজেকে কোথায় যেন অপমানিতও বোধ করছেন একটা। এত ভাল ছেলে তাঁর। কোথায় 'তু' ক'রে ডাক দিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাত্রী এসে পায়ে পড়বে—না তিনিই পথের কুকুরের মতো দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, একটা চলনসই পাত্রীর খোঁজে! তাও তিনি এতটি টাকা কিম্বা চারটে পাস—কিছুই চাইছেন না, তাতেও এই অবস্থা!···

দিনকতক গুম খেয়ে বসে রইলেন অবিনাশবাবু। কোন আত্মীয় বন্ধু কারও বাড়ি তো নয়ই—সকালে বেড়াতে যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। পরিচিত লোকের সঙ্গে অকারণ বকুনি—মনে করলেই যেন অসহ্য লাগছে। কথা কইতেই ভাল লাগছে না তাঁর, কিছুই ভাল লাগছে না। সবচেয়ে রাগ তাঁর জ্যোতিষীগুলোর ওপর। কারও কোন উপকার করতে পারে না—ভাল কথা যতগুলো বলে, উজ্জ্বল আশার ভবিষ্যদ্বাণী, একটাও ফলে না। তাঁকেই তো এতখানি জীবনে কত লোক কত কথা বলেছে—শতকরা নব্বুইটিই খাটেনি তার মধ্যে—কিন্তু অনিষ্ট করবার অসাধারণ ক্ষমতা ওদের। সেই যে বলে না, 'ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি—কি দিবি তা বল্।' জ্যোতিষীরাও তাই। শুভকাজে বাগড়া দেবার বেলায় এদের উৎসাহ অপরিসীম। ছোঃ!

প্রথম ক'দিন মনে মনে ওদের গাল দিয়েই কাটল। তারপর ভাবতে শুরু করলেন, এদের দিয়েই কোন কাজ করানো যায় কিনা—কণ্টকে নৈব কণ্টকম্। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। একটা সহজ উপায় তো আছেই—নকল ঠিকুজি করানো, অনেক মেয়ের বাবাই তো এই কাজ করেন—কিন্তু নিজের ছেলের বেলায় তা করতে ঠিক মন সরে না অবিনাশবাবুর। তাছাড়া তার মধ্যেও একটা অপমানের প্রশ্ন আছে। অরক্ষণীয়া মেয়ের বাবাকে যা করতে হয়—উপযুক্ত ছেলের বাবাও যদি তা করে—তবে তো দুজনেই

সমপর্যায়ে পৌঁছল।

না, অন্য একটা কিছু করতে হবে। অন্য কোন ব্যবস্থা।

কিন্তু সেটা যে কী সেইটেই মাথায় আসছে না। কেবলই ভাবছেন, তবু যেন কূলকিনারা পাচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, মনকে আঁখি ঠেরে কাজ নেই। তিনি যে পুত্রদায়গ্রস্ত পিতা—সোজাসুজি স্বীকার করাই ভালো। কোন একটি জ্যোতিষীকে ধরে একটা জাল ঠিকুজীই করিয়ে নেবেন তিনি, এমন ঠিকুজি—যা যে কোন মেয়ের জন্মচক্রের সঙ্গেই মিলে যায়। তারপর? সে মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তা হবে। ফাঁড়া কেটেও যেতে পারে ভগবানের ইচ্ছা হ'লে। আপাতত তো সম্মান রক্ষা হোক। সেই সঙ্গে জীবনও। ছেলের যে মনে মনে বিষম একটা ধাক্কা লেগেছে—তা তার গর্ভধারিণী না বুঝলেও তিনি বুঝেছেন। এর ফলে তার কোন শক্ত ব্যায়রাম দাঁড়ানোও বিচিত্র নয়।

মনস্থির করার পর আর বিলম্ব করলেন না। বাগবাজারে তাঁর পরিচিত এক জ্যোতিষী আছেন দীনেশবাবু, বন্ধুর মতোই, ভদ্রলোকের নামডাকও আছে একটু, দুখানা কাগজে সাপ্তাহিক রাশিফল লেখেন আর দু হাজার চিঠির জবাব দেন। মানুষটিও অমায়িক। পরের দিন সকালে তাঁর কাছেই চলে গেলেন। একটু নিরিবিলি হ'তে আগমনের উদ্দেশ্যও খুলে বললেন ; ছেলের জন্যে একটা নকল ঠিকুজি চাই—নিদেন একটা জন্মকুণ্ডলী, আর সেটি অবশ্যই হওয়া চাই সর্বরোগহর, অর্থাৎ যে কোন মেয়ের ঠিকুজির সঙ্গেই যাতে খাপ খায়।

দীনেশবাবু তো অবাক।

'সে কি মশাই, ছেলের নকল ঠিকুজি! কী ব্যাপার, এ তো আমরা মেয়ের ব্যাপারেই ক'রে দিই। কন্যাদায় উদ্ধারে মিথ্যাভাষণে দোষ নেই—শাস্ত্রে আছে তাই।'

'ন চ বিবাহকালে' সংশোধন করে দেন অবিনাশবাবু, 'বিয়ে মাত্রেই, ছেলে-মেয়ে বলে মহাভারতে কোন উল্লেখ নেই।...আরে সাধ করে কি এই নকল মিথ্যে কুষ্ঠি করাতে এসেছি, আসতে হয়েছে এই আপনাদের উৎপাতেই।...আপনারা ভাল করতে পারেন না—কিন্তু মন্দ করতে ওস্তাদ যে!'

'কেন, কেন—ব্যাপার কি ? আমাদের ওপর এত চটলেন কেন ? কী হয়েছে ছেলের ঠিকুজিতে—?'

'কি হয়েছে এই দেখুন।'

দেখলেন দীনেশবাবু। প্রথমটা একটু কৌতুক ভরেই খুলেছিলেন, কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁরও মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল! একটা কাগজে ছক্ পেতে কি সব কষলেনও কয়েক মিনিট ধরে! তারপর বললেন, 'তাই তো। গোল-মাল তো রয়েছেই! খুবই গোলমাল।···না মশাই, এ অবস্থায় জাল ঠিকুজি করে বিয়ে দেওয়া উচিত না। বিপদ উভয়পক্ষেরই—ছেলেরও কিছু কম নয়।'

'তাহলে এখন উপায় ? আমার ছেলের বিয়ে হবে না ?' করুণ কণ্ঠে বলে ওঠেন অবিনাশবাবু।

'হবে না কেন—! দাঁড়ান দাঁড়ান—দেখছি।'

মিনিট কতক ভ্রূকুটি ক'রে বসে থাকেন দীনেশবাবু। যেন কী একটা মনে করার চেষ্টা করছেন অথচ করতে পারছেন না। তার পরই, আর্কি-মিডিসের ভঙ্গীতে শুধু নয়, ভাষাতেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা! ইউরেকা! পেয়ে গেছি। এখন শুধু পাত্তাটা খুঁজে পেলেই হয়।'

'তার মানে ?' অবিনাশবাবু বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করেন। দীনেশবাবুর ভাবভঙ্গীর কোন খেই ধরতে পারছেন না তিনি।

'আরে, এই দিনসাতেক আগেই এক ভদ্রলোক একটি মেয়ের জন্মকুণ্ডলী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরও ছেলের বিয়ে—একটি পাত্রী পছন্দ করেছেন—পাত্রীর ঠিকুজি নিয়ে দেখাতে গিয়ে শুনেছেন ভৌম দোষ, বিবাহের পরই বিধবা হবে কন্যা, অনেকটা পতিঘাতিনী যোগের মতো। মেয়েটি নাকি খুবই ভাল—তাই আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন মেয়ের জন্মের সন তারিখ নিয়ে—ছকটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখাতে।'

'তারপর ?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন ক'রে ওঠেন অবিনাশবাবু।

'দেখলাম আমি এফিমেরিসের সঙ্গে মিলিয়ে। যে দিনক্ষণ দিয়েছে ওরা, তাতে যদি ভুল না থাকে তো ছকেও ভুল নেই। ভৌম দোষ আছে মেয়ের। সে ভদ্রলোক খুব দুঃখিত হয়েই চলে গেলেন।···মেয়েটি নাকি বেশ সুশ্রী, এম. এ. পাশ, সদ্বংশের মেয়ে—গাইতেও জানে, সব দিক দিয়েই

বাঞ্ছিত পাত্রী। কিন্তু ঐ দোষ দেখে আমিও বলতে পারলুম না যে এর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারো।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন দীনেশবাবু। অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। এটাও তাঁর চিন্তার লক্ষণ বোধহয়। কিন্তু অবিনাশবাবু এই বক্তব্যের যোগাযোগটা তখনও ধরতে পারছেন না—তিনি মনে মনে কেমন যেন হাঁকড়-পাঁকড় করতে লাগলেন।

দীনেশবাবুই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন একটু পরে। 'বুঝলেন না—ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি আপনার ছেলের বিয়ে হয় তাহলে দুজনেই বেঁচে গেল। সেই মেয়েই আপনার ছেলের আইডিয়াল পাত্রী। তারাও ব্রাহ্মণ, যতদুর মনে পড়ছে ভরদ্বাজ গোত্র—আপনাদের তো বাৎস্য ?—ঠিক মিলে যাবে।'

'তা সে মেয়ে কোথায়? বাপ কি করে? ঠিকানা কি?' 'সাগ্রহে প্রশ্ন করেন অবিনাশবাবু।

'দাঁড়ান দাঁড়ান, সেইখানেই তো গোলমাল। মেয়ের পক্ষের তো কোন পরিচয়ই জানি না,—জন্মকুণ্ডলীতে নামটা লেখা ছিল তাই গোত্রটা জেনেছি, বাপের নামও ছিল না তাতে। ভরসা এক—যে ভদ্রলোক ছকটা এনেছিলো—তিনি। মুশকিল এই যে তিনিও ঠিক আমার পরিচিত নন। তারও নাম ঠিকানা জানি না।'

'তবে?' যে আশার শিখাটা জ্বলে উঠেছিল তা এক নিমেষেই নিভে যায়। অবিনাশবাবু হতাশ হয়ে প্রশ্ন করেন, 'তবে?'

'দেখছি, দেখছি। ব্যস্ত হবেন না। ট্রেড সিক্রেট ভাঙব কেন? দেখি না যোগাযোগটা করিয়ে দিতে পারি কিনা। জ্যোতিষীদের দুর্নাম দিলেন—তারা খালি বিয়েতে বাগড়াই দিতে পারে, এখন যদি ঘটকালি করে বিয়েটা দিইয়ে দিতে পারি—কথাটা ফিরিয়ে নেবেন তো?···দেখা যাক না, কত দূর কী হয়। হাত গুনে এত বলছি—একটা লোককে খুঁজে বার করতে পারব না?'

হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন দীনেশবাবু।

করেনও তিনি অসাধ্য সাধন। কোন্ সূত্রে খুঁজে বার করলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভদ্রলোককে, অবিনাশবাবু তা আজও জানেন না। কিন্তু

দীনেশবাবু পাকা জ্যোতিষী, তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা বৃথা যাবার নয়। তিনি জানেন যে সেই ছেলের বাবা আরও দু-চার জন জ্যোতিষীর কাছে নিশ্চয় গেছেন। অন্তত একজনের কাছে ওঁর আগে তো গেছেনই—নইলে ভৌমদোষের কথাটা জানলেন কি করে?

সেই সূত্রেই তিনি খোঁজ শুরু করলেন। বেশী কিছু করতেও হল না। এ শহরের অল্পবিস্তর সব বড় জ্যোতিষীর সঙ্গেই তাঁর মুখচেনা বা নামচেনা আছে। একধার থেকে তাঁদের ফোন করতে শুরু করলেন। এবং মাত্র গোটা তিনেক টেলিফোন করার পরই খবর পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছিলেন বটে এক ভদ্রলোক এই রকম একটা ঠিকুজি নিয়ে। না চেনা নয়, তবে খবর দিতে পারব। আমার এক বন্ধুর রেফারেন্স নিয়ে এসেছিলেন, মস্ত অফিসার তিনি—এখনই ফোন ক'রে জেনে আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।'

এই ভাবেই খুঁজে বার করলেন দীনেশবাবু। দেখা গেল তিনি ঠিকই বলেছিলেন, মেয়েটি সব দিক দিয়েই অসীমের উপযুক্ত। এতদিনের প্রতীক্ষা ও খোঁজাখুঁজি অপ্রত্যাশিতভাবে সার্থক হ'ল অবিনাশবাবুর।

দীনেশবাবুর মন্দ লাভ হল না। উভয় পক্ষের কাছ থেকেই সকৃতজ্ঞ সমাদর লাভ করলেন তিনি। সেই সঙ্গে মোটা প্রণামীও। পাত্রীপক্ষ একটি রেডিও কিনে দিলেন তাঁকে। অবিনাশবাবু দিলেন একটা ফ্রীজ। একালে বিয়ে না করেও জিনিস দুটি বিবাহ-সূত্রেই পেয়ে গেলেন।

তবে অবিনাশবাবু সমগ্রভাবে জ্যোতিষী সমাজের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

ক্রস কনেক্‌শ্যন্‌স্‌

গল্পটা নাটক দিয়েই শুরু। অথবা বলা উচিত—শুরু থেকেই নাটকীয়।

এত নাটকীয় যে, যদি বলি এর সবটাই সত্যি, আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না। হলপ করে বললেও না। সুতরাং, সে চেষ্টাও করব না। গল্প হিসেবেই শুনুন বরং। তবে মুশকিল হচ্ছে আপনারা গল্পকে সত্যির মতই

মনে করেন, তাই গতানুগতিক ছাড়া এতটুকু নতুন ধরনের কোন ঘটনা কি পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গেলেই বলে উঠবেন, 'ধ্যুস্! যত গাঁজাখুরী।' কিংবা বলবেন, 'গাঁজায় দম দিয়েছে বেটা!'—নয়তো—'গাঁজায় দোক্তা কম পড়েছিল বুঝি!' অথচ এঁরা যদি একটু জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, এঁদের আশেপাশে যে জীবনধারা নিত্য বহমান তার তরঙ্গগুলো লক্ষ্য করেন মন দিয়ে, আর তার সঙ্গে মানুষের রচিত গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে পড়েন তো দেখবেন—সংসারে সত্যি যা ঘটে সেগুলো যত বিচিত্র, যত অদ্ভুত, যত অবিশ্বাস্য—লেখকের সাধ্য নেই সেখানে তার কল্পনাকে পাঠাতে পারে। 'গল্পের চেয়ে সত্য অদ্ভুত' এই ইংরেজী প্রবচনটির যিনি প্রথম প্রবর্তন করেন তিনি নিশ্চিত সত্যদ্রষ্টা ঋষি একজন—তাতে সন্দেহ নেই।

যাক গে, এসব বাগাড়ম্বর থাক। আমি যা করতে বসেছি তাই করি, অর্থাৎ গল্পটা বলি।

এ আখ্যায়িকা বা নাটকের শুরু টেলিফোনের একটা ক্রস্ কনেক্‌শান্ থেকে।

ক্রস্ কনেক্‌শান্ ব্যাপারটা প্রায়ই হয়, অন্তত কলকাতায় তো এটা টেলিফোন কল্-এর অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষ আজকাল, আপনি যদি পর-পর পাঁচটা ফোন করেন—তার মধ্যে গড়ে একটা ক্রস্ কনেক্‌শান্ হবেই। টেলিফোনের কনেক্‌শান যত বাড়ছে—এ উপদ্রবও ততই বেড়ে চলেছে।

সেদিনও এমনিই একটা সাধারণ ক্রস্-কনেক্‌শন হয়ে গিয়েছিল।

বিপাশা বলে একটি মেয়ে ফোন করছিল তার এক দূর-সম্পর্কের ননদ এবং বন্ধু বন্দনাকে—অথবা বন্দনাই ডেকেছিল বিপাশাকে—তাতে কিছু এসে যায় না, কবিগুরুর ভাষায় 'এসব তথ্য, তুচ্ছ!' আসল কথা—এই কথোপকথনের কিছুটা অত্যন্ত অনিচ্ছা এমন কি প্রথম দিকে ঘোর বিরক্তির সঙ্গেই শুনতে হয়েছিল বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পূর্ণেন্দু মিত্রকে।

'ক্রস্' বুঝতে পেরে ডাঃ মিত্র প্রথমটায় খুব অসহিষ্ণু ভাবেই খট-খট করে রিসিভারের স্প্রিং দুটো টিপছিলেন—যাতে বিরক্ত হয়ে ও-পক্ষ তাড়াতাড়ি লাইন ছেড়ে দেয়—'আঃ! কে আবার ডিস্টার্ব করতে শুরু করল! মহা মুশকিল তো, কোন সময়েই আজকাল শান্তিতে কথা বলার যো নেই ফোনে', ইত্যাদি বিরক্তি-প্রকাশ গ্রাহ্যও করেন নি—কিন্তু দুটো-চারটে কথা

শোনার পরই স্থির হয়ে গেলেন, শুধু তাই নয়, কোন বাধা দেবারও চেষ্টা করলেন না! উল্টে রিসিভার কানে লাগিয়ে রেখে ভদ্রতাবহির্ভূত ভাবে মনোযোগের সঙ্গেই শুনতে লাগলেন ওদের কথাগুলো।

বিপাশাকে সম্ভবত ইতিপূর্বে বন্দনা তার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করে থাকবে—বোন বলেই মনে হল কথার ভাবে ও ভাষাতে—কবে বিয়ে হবে এই ধরনের কোন প্রশ্ন, নিতান্তই কর্মহীন অবকাশের প্রশ্ন, সৌজন্যসূচক অলসং নৈষ্কর্মের জন্যেই, মেয়েরা টেলিফোন ধরে বহুক্ষণ যন্ত্রটা জোড়া করে রাখার জন্যে যে-সব অকারণ প্রশ্ন খুঁজে খুঁজে বার করে, সেই ধরনেরই প্রশ্ন করছিল বন্দনাও—উত্তরের-জন্য-ঔৎসুক্য-হীন মন্থর প্রশ্ন, বিপাশা বাপের বাড়িতে আছে অতএব বন্দনার চিন্তাটা প্রশ্ন খুঁজতে সেই পারি-পার্শ্বিকে যাবে সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু দেখা গেল উত্তর দিতে গিয়ে বিপাশার কণ্ঠস্বর বিষাদ-গম্ভীর হয়ে উঠেছে, 'আর বিয়ে! লুলুর বিয়ের কথা বাদ দাও।···কী অদৃষ্ট নিয়ে যে জন্মেছিল মেয়েটা!' এবার বন্দনার কণ্ঠের আলস্য মন্থরতাও দূর হতে দেরি হল না।

'কেন রে? কী হয়েছে ললিতার? বি. এ. পাস করে বসে আছে, টাকারও অভাব নেই, ওর জন্যে তো ভাল পাত্রদের লাইন দেবার কথা!'

'আরে পাত্র তো আসছেই। ঠিকও হয়ে গিয়েছিল। খুব ভাল পাত্রই তো ঠিক হয়েছিল। জার্মানী-ফেরত এঞ্জিনিয়ার, তিন-চারটে ডিগ্রী, এদিকেও তিন-চারটে বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু গোলমাল তো ওকে নিয়েই। ওর চোখ দুটো যে যেতে বসেছে। ও অন্ধ মেয়ে কে নেবে বল!'

'সে কি রে! কী বলছিস! যাঃ!—এই তো সেদিন দেখা হল—তোর সেই মাসতুতো বোনের বিয়েতে। আমি বরযাত্রী গিয়েছিলুম, রজত যে আবার আমার আপন পিসতুতো ভাই।···তা তখন তো কই—'

'সে-ই তো সূত্রপাত। তোর মনে নেই—বরণের সময় দু-দুবার আগুনের ধারে গিয়ে পড়ল? দুবারই বড়দি ধরে টেনে নিলে—?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে আছে বৈকি। তোর বড়দি খুব বকলেন।'

'বকবেই তো। চারদিকে বেনারসী আর সিল্কের মেলা—তার মধ্যে যদি অমন করে আগুনের ওপর গিয়ে পড়ে রাগ হয় না! শুভকাজে একটা য়্যাকসিডেণ্ট হলে কী রকম লাগে বল দিকি!···তা তখনও যদি পোড়ারমুখী

মেয়েটা বলে যে পাশের দিকে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না—তাহলেও হয়। হয়তো তখনও উপায় ছিল কিছু, একেবারে হাতের বার হয়ে যায় নি। শুধু তাই? দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে, ছাপা অক্ষর পড়তে পারছে না—উনি তখনও চোখ রগড়ে, চোখে জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে যত ক্ষুদী ক্ষুদী হরপের বই পড়ার চেষ্টা করছেন! একটা কথাও কাউকে বলে নি!'

'তারপর?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে বন্দনা।

'তারপর আর কি! একেবারে যখন চোখের সামনে ধরেও খবরের কাগজ পড়তে পারছে না, তারিখ দেখা তো দূরের কথা সামনের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারটা কোথায় টাঙানো আছে তাই বুঝতে পারছে না তিন-চার হাত দূরে বসেও—তখন আর না বলে উপায় রইল না। তার পর থেকেই তো এই ছুটোছুটি চলছে, আমি, বৌদি, বড়দি—সেই জন্যেই তো এখানে আসা আমার, বড়দিরও তো শরীর ভাল না, অপারেশনটার পর থেকে আর একদম দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না, বৌদির মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস—তাই আমাকেই ম্যাক্সিমাম বোঝাটা বইতে হচ্ছে, brunt যাকে বলে!...তা অবশ্য বাকীও রাখি নি কিছু, তিন-চারজন বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি, নাম-করা মাথা মাথা ডাক্তার, সায়েব ডাক্তার সমারসেটের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলুম—সকলেরই ঐ এক কথা, বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে। আর কিছু দিন আগে এলেও তাঁরা চেষ্টা করে দেখতেন—এখন নাকি কিছুই আর করার নেই। রেটিনার ওপর একটা কি ফ্লুইড থাকে সেটা নাকি শুকিয়ে গেছে—তার ওপর এক রকমের কি ইনফেক্‌শান্ হয়ে রেটিনা নষ্ট করে দিয়েছে অনেকখানি।'

'বলিস কি! কী এমন ইনফেকশান্ হল—আর এরই মধ্যে!'

'সেই জন্যেই তো বলছি! এ-রকম আর কারও শুনেছিস? তবে আর অদৃষ্টের কথা বলছি কেন! এ আরও বেশী দুর্ভাগ্য, সব থাকতেও সবেতে বঞ্চিত হওয়া।'...

'ও বুঝেছে সে আর কোন আশা নেই?' বন্দনা প্রশ্ন করে।

'আমরা এখনও পরিষ্কার কিছু বলিনি—কিন্তু এই এত ডাক্তার দেখানো, এত ছুটোছুটি কি আর ও বুঝতে পারছে না! তার ফল হয়েছে এই—যাও বা পদার্থ ছিল, ক'দিন কেঁদে কেঁদে একেবারেই বোধহয় নষ্ট হয়ে গেল

চোখ ছুটো!...এমনি এখনই তো হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়, মাছ বেছে খাইয়ে দিতে হয়। এখন ঐ শুধু একটু ঝাপসা ঝাপসা দেখতে পায় যে দিন হয়েছে, কি ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালে টের পায় যে মানুষ এল!...মনে হচ্ছে এটুকুও আর বেশীদিন থাকবে না।'

'ইস! কী বলছিস রে! শুনেই আমারই যে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, বুকের মধ্যে কাঁপছে। এমনও হয় মানুষের! তাহলে তো আমাদেরও যে কোন দিন এমন হতে পারে।...সত্যি—এমন বরাত যেন কারও না হয়। ওর সৌভাগ্যের কথা মনে করে অনেকেই অল্পবিস্তর হিংসে করত ওকে। দেখতে ভাল, লেখাপড়ায় ভাল—আর এত টাকা!...ওর জন্যে তোর বাবা যেন কত রেখে গেছেন? ছু'লাখ, না?'

'বেশী। ঢের বেশী। ছোট মেয়ে, মা-মরা—বিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি, তাই আমাদের যা দিয়ে গেছেন তার প্রায় ডবল দিয়েছেন ওকে। তবে কি জানিস, এদিকে টাকা দিলে কি হবে, ভগবান ঐ একটাতে চিরদিনই বঞ্চিত করে রেখেছেন। লুলুর স্বাস্থ্য কিন্তু কোনদিনই খুব ভাল না। মেয়েলি রোগ তো আছেই. লিভারের গোলমাল—ছোটবেলায় তো বারোমাসই ভুগত, ওষুধের শিশির একজিবিশন ছিল ওর মাথার গোড়ায়, একটা বড় হোয়াট-নট লাগত সব ওষুধ সাজিয়ে রাখতে। বরং স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর থেকে—ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকে তবু একটু ভাল। মানে অদ্দিন পর্যন্ত ঐ সব হয় নি, খুব কষ্ট পাচ্ছিল দেখে ডাঃ সেন একটা মাইনর অপারেশন করে দিয়েছিলেন—তারপর থেকেই মেয়েলি অসুখগুলো একটু কম আর তাতেই চেহারাটা তবু এখন মেয়ে মেয়ে মনে হয়। আগে তো দেখেছিস, একহারা একটা লাঠির মত চেহারা ছিল।'

'সে কথা বলিস নি, অমন অস্বাস্থ্য তো আরও অনেক মেয়েরই আছে। রোগা কাঠির মত. কিছু হজম হয় না। চোখে পুরু লেন্স—কত তো দেখছি। তাই বলে এমন হবে! এ ভগবানের মার ছাড়া কিছু নয়। একদিকে যেমন ছুহাত ভরে দিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি কেড়েও নিলেন একেবারে মোক্ষম জিনিস। তবে, টাকা যখন আছে—বিয়ে হয়তো একেবারে আটকাবে না। গরীবের ঘরের অনেক এমন ভাল ভাল ছেলে মিলবে—

যারা জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় রাজী হবে বিয়ে করতে।'

'কিন্তু সে আর এক পক্ষ রাজী হলে তো। সে মেয়েই নয় লুলু। রাম না হতে রামায়ণ বলে দিয়েছে সে। বলে, এখন যে আসবে সে আমার টাকার জন্যে আসবে, সে ভালবাসতে পারে না। আমি চিরদিন তার বোঝা গলগ্রহ হয়ে থাকব, বিদ্বেষের পাত্র। সে বন্ধনের মধ্যে যেতে রাজী নই আমি। সইতেও পারব না খুলতেও পারব না, গলায় ফাঁসের মত চেপে বসবে যত দিন যাবে!·· সামান্য একটু দৈহিক সুখের জন্যে এত হীনতা আমার পোষাবে না। তাও হয়তো অপরপক্ষ ঘেন্না করবে, টাকার জন্যে তাকে এই অবাঞ্ছিত জীবন সহ্য করতে হচ্ছে ভাববে—সে না ভাবুক আমি মনে করব সে ভাবছে—সে বড় অশান্তি, এর চেয়েও মর্মান্তিক সে কষ্ট।···ভগবান মেরেছেন সইতেই হবে, তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আরও মার খেতে রাজী নই।'

'তাই তো।' বন্দনা বিমূঢ় ভাবে বলে, 'আসলে ওর খুব একটা সাইকো-লজিক্যাল সেট-ব্যাক হয়েছে। অবশ্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা তাহলে কি কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না এখন আর?'

'হচ্ছে বৈকি। চিকিৎসা পুরোদমেই চলছে, ড্রপ্‌স্‌, ক্যাপসুল, ইনজেকশন —ত্রুটি নেই কিছুরই। তবে ডাক্তারদেরই কোন ভরসা নেই সে চিকিৎসায়, ও একটা সান্ত্বনার মত।'

এতক্ষণ স্থির ভাবে শুনছিলেন ডাঃ পূর্ণেন্দু মিত্র।

এইবার তিনি ওদের কথার মধ্যে কথা কইলেন!

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'মাপ করবেন দয়া করে—দেখুন, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেই আপনাদের কথাবার্তার মধ্যে এসে পড়েছিলাম, টেলিফোনের তারের চক্রান্তে—সেটা অপরাধ নয়, হয়তো এখন একটু করতে যাচ্ছি—একটু অনধিকার-চর্চা। আমিও একজন চোখের ডাক্তার, একেবারে টপর‍্যাঙ্কিং হয়তো নই, তবে আমারও কিছু নাম-ডাক আছে। আমি এ চর্চাটাকে শুধু পেটের দায়েই নিই নি, এখনও যা চিকিৎসা করি নিতান্তই টাকা রোজগারের জন্যে নয়—এই জিনিসটাতেই আমার অপরিসীম কৌতূহল, আগ্রহ। মানব দেহের এই অর্গানটির মধ্যে যে বিপুল রহস্য আছে, আমার বিশ্বাস, মানুষ

এখনও তার আধা-আধিও জানতে পারেনি, এখনও অনেক কিছু তার জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে গেছে। যাঁরা মাথা মাথা চিকিৎসক আছেন এই বিষয়ের, তাঁরা চিকিৎসা করেই সময় পান না, এ বিষয়ে গবেষণা বা অনুশীলন করার সময় নেই তাঁদের। ঐ যে সব বিলিতি বই মাসিকপত্র প্যামফ্লেট আনে ওষুধওলাদের কাছ থেকে—বড়জোর সেই পর্যন্ত দৌড়, দৃষ্টি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, পরের গবেষণার ফলাফল কাগজে বইয়ে পড়ে যতটুকু হয়। অন্য যে সব কম পসারের ডাক্তার আছেন—তাঁরা সেটুকু কষ্টও করতে চান না, কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় করে যান, মাসে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আটশো হাজার রোজগার হলেই খুশী। আমি কিন্তু চিকিৎসা করি গবেষণা হিসেবেই। সেই জন্যেই আরও এত মাথাব্যথা। আপনাদের দুজনের মধ্যে যাঁর বোনের অসুখ হয়েছে—তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, পেশেণ্টকে একবারটি আমার চেম্বারে নিয়ে আসুন।'

'কিন্তু—' একবার ক্ষীণ কণ্ঠে যেন কি বলার চেষ্টা করে বিপাশা। কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবু ওদের কাউকেই কথা বলার সুযোগ দেন না। তিনি বলেই চলেন, 'এমনিই তো বলছেন ভাল হবার বিশেষ আশা নেই সে ক্ষেত্রে একবার চেষ্টা করতে দিতে আপত্তি কি? বেশী খারাপ আর কি করব?...শুনুন, প্লীজ একবার নিয়ে আসুন। টেলিফোন গাইডে আমার বাড়ি ও চেম্বার দুটোরই নম্বর আছে, সময়ও দেওয়া আছে—কখন কোথায় দেখি। বাড়িতে ওপর-তলায় আমি একটা ছোট নার্সিংহোমও রেখেছি এক্স্পেরিমেণ্ট ও রিসার্চের জন্যে—আপনারা যে সব ডাক্তার দেখিয়েছেন এ পর্যন্ত, তাঁদের কাছেও আমার কথা জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন—মনে হয় একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। আনবেন একটিবার?'

দীর্ঘ প্রশ্ন, শুনে বুঝে উত্তর দিতে দেরি হল বিপাশার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'আমার নাম বিপাশা, বিপাশা দত্ত। পেশেণ্ট আমারই ছোটবোন—ললিতা বোস। আমার বাবার নাম হয়তো আপনার অজানা নয়—খুব বড় সার্জন ছিলেন তাঁর আমলের—এস. সি. বোস। আমার স্বামী অবশ্য সরকারী চাকরি করেন—তবে তিনিও স্বাস্থ্য-দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। ঐ বিভাগেরই আণ্ডার সেক্রেটারী।'

বাধা দিয়ে পূর্ণেন্দুবাবু বলে উঠলেন, 'বিলক্ষণ। তবে তো আপনারা

আমার পরমাত্মীয়। ডাক্তারের ফ্যামিলি—ডাক্তারের মেয়ে, এ আমার জেদ তো আরও বাড়িয়ে দিলেন আপনি, এখন তো এটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে উঠল। আমি বলছি আমার যতটুকু সাধ্য আমি করব—আর ঈশ্বরের দয়ায় ভালও করতে পারব হয়তো।...অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখার সুযোগ দিন।'

'ঠিক আছে। কে জানে, এ হয়তো দৈবেরই যোগাযোগ। আমার আরও এক বড়বোন আছেন, বৌদি আছেন—তাঁদের সঙ্গে কথা বলি, তারপর আপনার সঙ্গে এনগেজমেন্ট করব।'

'তা বলুন, তবে প্লীজ দেরি করবেন না। এ সব ব্যাপারে বুঝতেই তো পারছেন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত মূল্যবান। একদিনের দেরিতে অনেক অনিষ্ট ঘটে যেতে পারে।'

'না, দেরি করব না। আপনার ঠিকানাটা বলুন তো—'

পরের দিন সকালেই বিপাশা বোনকে নিয়ে ডাঃ মিত্রের চেম্বারে এল।

পূর্ণেন্দুবাবু অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

দেখলেন মেয়েটিকেও। রোগা-রোগা শান্ত স্বভাবের মেয়ে ললিতা, আসন্ন অন্ধত্বের আশঙ্কায় আরও যেন শীর্ণ হয়ে উঠেছে। এমন করুণ মুখের ভাব —দেখলেই মায়া হয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নানারকম পরীক্ষা করলেন পূর্ণেন্দুবাবু। তারপর বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সুরেই বললেন, 'কঠিন অসুখ এটা সত্যি, অনেকটা অনিষ্ট হয়ে গেছে তাতেও সন্দেহ নেই, তবু আমার বিশ্বাস এ অসুখ আমি সারাতে পারব। তবে আপনাদের বাড়িতে রেখে হবে না। অনেক রেসট্রিক্‌শানে রাখতে হবে। আমি একে আমার নার্সিংহোমে রাখতে চাই। মনে করবেন না আমার ব্যবসার জন্যে বলছি।, আমি কোন চার্জই নেব না। এতে আমার নিজেরও স্বার্থ আছে একটু—এ পেশেন্ট এ পর্যন্ত কোনদিন পাই নি। এ একটা নতুন এক্‌সপেরিমেন্টের সুযোগ আমার কাছে, একটা জেদের ব্যাপারও। যদি ভাল করে তুলতে পারি, তখন আপনারা চার্জ দেবেন, যা ইউজুয়াল চার্জ—নইলে এক পয়সাও নেব না।'

'না না, তা কেন—' বিপাশা বলার চেষ্টা করে, 'নার্সিংহোমের খরচা নেবেন না কেন? বিশেষ নার্স তো দুজন রাখতেই হবে, তার খরচ আছে—। অন্তত সেটা—'

'না। আমি বাইরের নার্স আসতে দিই না। আমার স্পেশ্যাল ট্রেন্‌ড নার্স আছে, সবাই এখানের স্টাফ, মাইনে করা। চার্জ যা ধরি—সব সুদ্ধু, অল-ইনক্লুসিভ। খাওয়া, থাকা, য়্যাটেণ্ডেন্স-সব। কেবল ওষুধ ইন্‌জেকশনের দাম আলাদা। আমি এখন কোনটাই নেব না, হিসেব থাকবে, যদি পেশেন্ট ভাল হয়ে ওঠে, আপনারা খুশী হন—তখন যা পাওনা সব দেবেন, অবশ্য আমার ফী ছাড়া, এ কেসে ফী আমি নেব না কোন কারণেই।··· আপনারা দেখতে আসবেন—কিন্তু সেও আমার ইনস্ট্রাক্‌শান মত। কোন বাঁধা সময় নয়—যখন তখন, এক একদিন এক এক সময় আসবেন। ব্যাপারটা বুঝেছেন? একটা বাঁধা সময় থাকলে—সেই আশায় সকাল থেকে সময় গুণবে—সমস্ত নার্ভস্ টেন্‌স্ হয়ে থাকবে সেই সময়টির প্রতীক্ষায়। আমি কোনরকম উত্তেজনাই হতে দিতে চাই না।'

'তাই হবে। তাহলে কখন আসবে?' বিপাশা বলতে চায়।

'কখন কি, এখনই। এই মুহূর্তে। আর একদম সময় নষ্ট করা চলবে না। ওর যা যা দরকার হয়, আপনারা এক সময় এসে দিয়ে যাবেন। চলুন, আপনিও—ওকে সেফ্‌লি রেখে যাবেন। কোথায় কী ভাবে থাকছে —দেখে যান।'

বিপাশা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চলুন। অমনি ঐ সুযোগে মিসেস মিত্রের সঙ্গেও একটু আলাপ—'

পূর্ণেন্দুবাবু হেসে উত্তর দেন, 'সে চেষ্টাটা আর এই বয়সে করে দরকার নেই। পরে হবে।'

তারপর ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মিসেস মিত্র অনেকদিনই আমাকে ত্যাগ করে গেছেন, বিয়ের আটবছর পরেই। একটি ছেলে রেখে—মানে আমাকে আরও বিপন্ন করে গেলেন আর কি।'

'তারপর আর—'

'না। বিয়ের কথা বলছেন তো? করিনি—তার কারণ ছেলেটা তাহলে পর হয়ে যেত, মানুষ করতে পারতুম না। এ যাই হোক, ভগবানের

দয়ায় ছেলেটা মানুষ হয়ে উঠেছে, এইটুকুই সান্ত্বনা, আমার কর্তব্য পালন করতে পেরেছি, আমি তৃপ্ত। বেশ ভালভাবেই ডাক্তারী পাস করেছে। সম্প্রতি বিলেত থেকেও একটা ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। ভাল চাকরি পেয়ে গেছে একটা—ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। আমার অবশ্য ইচ্ছে ছিল না চাকরি করতে দেওয়ার, কিন্তু আজকালকার ছেলেরা বড্ড আরামপ্রিয়, বুঝলেন না! মোটা মাইনের চাকরিটাই ভাল বোঝে, খাটতে চায় না। তবে আমি এখানে একটু একটু খাটিয়ে নিই—যদি ইন্টারেস্ট এসে যায় কোনদিন—এই আশায়। চলুন, ওপরে যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সত্যিই ডাঃ মিত্র অসাধ্য-সাধন করলেন।

একমাসের মধ্যেই অনেকটা উন্নতি হল, ললিতা নিজেই বুঝতে পারল।

দুমাস পরে বিছানায় শুয়ে দেওয়ালে টাঙানো বড় হরফের ক্যালেণ্ডারে তারিখ পড়তে পারল। আরও পনেরো দিন পরে ডাক্তার অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরের বই পড়তে দিলেন। পড়তে পারলও বেশ। তবে পুর্ণেন্দুবাবু সাবধান করে দিলেন, দিনে রাতে সব মিলিয়ে মোট দু ঘণ্টার বেশি পড়া লেখা না, একসঙ্গে পনেরো মিনিটের বেশি নয়, আর খবরের কাগজ—ছাপাটা পরিষ্কার হয়েছে দেখে যেন পড়ে—অন্যথায় পড়ার চেষ্টাই না করে।

আরও কিছু কিছু ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিলেন। চোখে সাবান না লাগে, কড়া রোদের দিকে কিংবা জোর আলোর দিকে চেয়ে না থাকে—ইত্যাদি। আরও পনেরো দিন পরে বিদায়ের সময় এল।

বিপাশা এসে নার্সিংহোমের য়্যাকাউন্ট্যান্ট শুভাশিস বাবুকে অনুরোধ জানাল বিল তৈরি করার।

ডাঃ মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, 'এটা না দিলেই হয় না মিসেস দত্ত? লুলুর ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে এই তিনমাসে। এত শান্ত সার্বর্গিসভ মেয়ে, এমন সরল ও ভদ্র—কদাচিত দেখা যায়। ওর খরচটা নিতে ইচ্ছে করছে না—'

বিপাশা হাতজোড় করে বলল, 'আপনার যা প্রাপ্য তা আমাদের যথা-সর্বস্ব দিলেও শোধ হয় না—এমন কি আপনার কায়িক পরিশ্রমের মুল্যটুকুও দেবার সাধ্য নেই—সে চেষ্টাও করব না। কিন্তু এই তুচ্ছ খরচগুলো, যা

আপনাকে ঘর থেকে টাকা বার করে করতে হয়েছে—ধরুন সীটের ভাড়া, খাওয়ার খরচ, নার্সদের টাকা—এগুলো নেবেন না কেন? আমি তো আপনার ফীয়ের কথা উচ্চারণও করিনি, বেয়ার এক্স্‌পেন্সগুলোর কথাই শুধু বলছি। আর ওর যখন ভগবানের দয়ায় কোনো অভাব নেই—'

'দিন যা খুশি। কী আর বলব। তবে এটা না পেলেই আমি বেশি খুশি হতুম। ওর—'

কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ বেরিয়ে যান পূর্ণেন্দুবাবু সেখান থেকে।

খানিকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই করিডরে ঘোরাঘুরি করে এক সময় যেন ক্লান্ত ভাবে ললিতার কেবিনে গিয়ে ঢোকেন।

'তোমার দিদি আর বৌদিরা আজ বিকেলে তোমাকে নিতে আসবেন। তৈরি হয়ে থেকো।'

তারপর ঈষৎ—কেমন একটু ইচ্ছাতুর কণ্ঠে বলেন, 'খুব আনন্দ হচ্ছে শুনে, না?'

ললিতা মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে অল্প অল্প ধরা গলায় বলল, 'না, খুব আনন্দ হচ্ছে না। যেদিন এসেছিলুম সেদিন আর আজকের মধ্যে অনেক তফাৎ। সেদিন আসতে ইচ্ছে করছিল না, আজ যেতে ইচ্ছে করছে না।'

সহসা যেন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন ডাঃ মিত্র, 'তুমি এখানে থাকতে চাও? থাকবে? এ বাড়িতে? চিরদিনের মত?···কথাটা ক'দিন ধরেই ভাবছি, বলতে সাহস হয় নি। আমার ছেলে—তাকে তো দেখেছ, ভাল ছেলে, শার্প; নিজের ছেলে বলে বলছি না, সত্যিই ভাল ছেলে, ডাক্তারিটাও ভাল করেই শিখেছে—তোমাদের পালটি ঘরও বটে—ওকে বিয়ে করবে? তাহলে আর এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও কেউ নিয়ে যেতে পারবে না ···তবে একটা শর্ত —তোমার বাবা নাকি তোমার নামে অনেক টাকা রেখে গেছেন—সে টাকা নিয়ে আসতে পারবে না। বোন বা আর কাউকে কি কোন চ্যারিটিতে দিয়ে আসতে হবে। শুধু তুমি আসবে। তোমার জন্যেই তোমাকে আনছি ঘরে—এটা প্রমাণ হওয়া তো তোমার পক্ষেও গৌরবের কথা।'

ললিতা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর পূর্ণেন্দুবাবুর দয়াতেই পাওয়া দুটি চোখের দৃষ্টি ওঁর মুখের ওপর স্থিরনিবদ্ধ করে বলল, 'আপনি জানেন

আমার স্বাস্থ্য ভাল নয়, শরীর খারাপ—জেনে-শুনে আপনার অমন ছেলের জীবনটা নষ্ট করতে চাইছেন কেন আমাকে তাঁর ওপর থার্স্ট করে? এতখানি অবিচার তাঁর ওপর কিসের জন্যে করবেন? কী অধিকারে? টাকার জন্যে হলেও তবু সান্ত্বনা থাকত একটা। এ শুধু অন্যায় নয়—নির্বুদ্ধিতাও!'

একটু থতমত খেয়ে যান কি ডাঃ মিত্র? তবুও বলেন, 'না, তোমার টাকা নিতে পারব না! দরকারও নেই। এমনি স্বচ্ছন্দে থাকার মত টাকা ছেলেও রোজগার করে, আমিও নিঃস্ব নই। মাঝখান থেকে—টাকার জন্যে তোমাকে ভুলিয়েছি—এ অপবাদ শুনতে রাজী নই। আর স্বাস্থ্য তোমার কেমন—সে তো তোমার চেয়ে আমারই ভাল জানার কথা লুলু।'

এবার ললিতার শান্ত দৃষ্টিও যেন শানিত হয়ে ওঠে। বলে, 'দেখুন, আপনি সেই গোড়া থেকে—প্রথম দিন থেকেই অনেক শর্ত আরোপ করে আসছেন, এ করতে পারবেন না ও করতে পারবেন না—খরচ নেবেন না, ফী নেবেন না—কত কী। আজও তার বিরাম নেই। এত অহঙ্কার কিসের আপনার? পৃথিবীতে যাবতীয় শর্ত করিয়ে নেবার অধিকার ভগবান আপনাকেই শুধু দিয়েছেন এ ধারণা আপনার হল কেন? শর্ত আমাদের দিক থেকে, আমার দিক থেকেও দু'একটা থাকতে পারে—সেটা ভুলে যাবেন না। আমি আপনার ঘরে আসতে রাজী আছি—নিঃস্ব হয়ে নিরাভরণেই আসতে প্রস্তুত—কিন্তু এক শর্তে, আপনার পুত্রবধূ নয়, আপনার স্ত্রী হয়ে যদি আসতে পারি তবেই আসব।'

হঠাৎ কি একটা বাজ পড়ল ঘরে? নাকি পৃথিবীটাই দুলে কেঁপে উঠল? এতদিনের দৃঢ় অনমনীয়তাও যেন সেই বিরাট ভূমিকম্পে নড়ে উঠল ডাঃ মিত্রের। এরকম বিস্মিত ও বিব্রত তিনি জীবনে হন নি কখনও। তাঁর এত কালের অভ্যস্ত অবিচল স্থৈর্য কোথায় যেন চলে গেল, সেই সঙ্গে তাঁর উপস্থিত-বুদ্ধিও। তিনি একেবারে নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে ললিতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সত্যি সত্যিই হাঁ করে চেয়ে রইলেন তিনি, মুখটা অনেকক্ষণ বুজল না। কথাটা তিনি ঠিক শুনছেন কি না, ঠিক শুনলেন কি না—সেটা বুঝতেও বেশ খানিকটা সময় লাগল তাঁর।

তারপর—অন্তত পাঁচ সাত মিনিট পরে—যখন কথা বলার শক্তি আবার ফিরে পেলেন, তখনও তোতলার মত, খাপছাড়া খাপছাড়া ভাবে বললেন, 'এ

—এ তুমি কি বলছ লুলু ?···এ—আমি—আমার যে তিপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে, ফিফ্‌টিফোর্থ ইয়ার চলছে এটা—সেটা জান ? তোমার—তোমার বোধহয় ডবলেরও বেশী। তোমার বড়জোর—কত হবে ? পঁচিশ ? তোমার সঙ্গে—না না, সে কি সম্ভব ?'

'সম্ভব মনে না হয় করবেন না।' ললিতা এবারও দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'আমি তো জোর করছি না, জোর করে নিজেকে চাপাতে চাইছি না আপনার ওপর। তেমনি আপনিও আমাকে জোর করে অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না। আমাকে যদি এ-বাড়ি আসতে হয়—এই শর্তেই আসব, নইলে নয়। আমার—' এই প্রথম একটু গলাটা কেঁপে গেল ললিতার, 'আমার পক্ষে আর কাউকেই বিয়ে করা সম্ভব হবে না, এ জীবনেই নয়। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, প্রথম দৃষ্টি ফিরে পেয়ে আপনাকেই দেখেছি, ভালবাসা কি না বলতে পারব না—তবে আপনার চেয়ে সুন্দর, আপনার চেয়ে তরুণ, আমার কাছে আর কেউ নয়।···আর—' আরও একবার গলা কেঁপে যায় ললিতার, চোখ নীচু করে বলে, 'আর আপনিও—মনের আগোচর পাপ নেই, আপনিও যে জেনে-শুনে একটা রুগ্ন অসুস্থ মেয়েকে ঘরে এনে একমাত্র ছেলের জীবনটা নষ্ট বিড়ম্বিত করে দিতে চাইছেন—সে কেবল অন্য কোন উপায়ে আমাকে কাছে রাখা যায় না বলেই—তাই নয় কি ? আপনিও ভেবে দেখুন কথাটা—নিজেকে ঠকাবেন না, নিজের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করবেন না।'

'কিন্তু—এ কী বলছ লুলু ! এ কখনও হয় ? না না,—এ পাগলামি ছাড়।'

'আমি তো ছেড়েই দিয়েছিলুম। নিজে তো কিছু বলতে যাই নি। তবে আপনারও যেমন বিয়ে না করার স্বাধীনতা আছে, আমারও তেমনি। বিয়ে যদি করতে হয়—একজনকেই করতে পারি, আমার ইচ্ছামত পাত্রকে। নইলে করব না, এটুকু জোর তো আছে ! নইলে—নইলে হয়তো আবারও এ চোখ দুটো নষ্ট করে আপনার এই কেবিনেই ফিরে আসতে হবে। এ ছাড়া আপনার কাছাকাছি থাকার আর তো কোন উপায় দেখছি না।

দৃষ্টিকে সুস্থ করে তোলাই যাঁর কাজ—তাঁরও দৃষ্টি অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে যায় বৈকি। যিনি ভাল কথা বলতে পারেন, তাঁরও মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত

বাক্যের অভাব ঘটে।

এ ছুটো অভিনব অভিজ্ঞতা ডাঃ মিত্রের।

তিনি কোনমতে, হাতড়ে হাতড়েই বলতে গেলে, ললিতার হাত ছুটো খুঁজে নিয়ে চেপে ধরলেন শুধু। একটা কথাও বলতে পারলেন না আর।

ঋণ শোধ

শ্বশুর দাদাশ্বশুর জ্যাঠশ্বশুর—পর পর তিনখানা ছবি টাঙানো দেওয়ালে। দাদাশ্বশুর আর জ্যাঠশ্বশুরের অয়েলপেন্টিং, তখনকার রেওয়াজ-মতো করানো, কিছুটা বিবর্ণ হয়ে এলেও গিল্টিকরা বিরাট ফ্রেমের কল্যাণে সেইগুলোই আগে নজরে পড়ে। কিন্তু তাই বলে শ্বশুর গুরুদাস মল্লিকের এন্‌লার্জ করা ফোটোখানাও কম বড় নয়। নিজেই শখ করে করিয়েছিলেন চারু গুহকে দিয়ে—বেশ বড় আকারের, যেমন এবং যতখানি তাঁর মুখের আকৃতি ছিল প্রায় ততখানিই বড় করা।

মাধবী নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে একেবারে দোতলার বৈঠকখানায় এই দেওয়ালটার সামনে এসে দাঁড়াল। সেকালের জমিদার বাড়ি, বড় বড় দাঁড়া আয়নাতে, ছবিতে, আলোরঝাড়ে সমস্ত দেওয়ালগুলো জোড়া ; মেঝেটা জোড়া বড় বড় সোফাসেটি-কৌচে এবং ফরাসপাতা বড় চৌকিতে। মধ্যে মধ্যে পাথরের টেবিলে বিচিত্র আকার ও বিবিধ মূল্যের অসংখ্য ঘড়ি—সিকি ঘণ্টা-আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর নানান স্বরে বাজে সেগুলো। সবগুলো মিলিয়ে ঘরটা অনধিগম্য, এইসব আসবাব বাঁচিয়ে এদের মধ্যে দিয়ে আনাগোনা করা প্রায় তুঃসাধ্য, প্রতিপদে বাধা, প্রতি হাত ঠোকর লাগার সম্ভাবনা। এই কারণেই মাধবী এ ঘরটাতে বড় একটা ঢুকতে চায় না, পনেরো-কুড়ি দিন অন্তর সাফাই করার প্রয়োজনে ঝি-চাকরের কাজ তদারক করতে দোরের বাইরে এসে দাঁড়ায় হয়ত। কিন্তু আজকে সোজা এই ঘরেই এল এবং আসবাবের গোলকধাঁধা ভেদ করে এঁকেবেঁকে শ্বশুরের ছবিখানার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ঠিক মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে ছবিখানা। বড় ফোটোপ্রাকারের

তোলা ছবি—জীবন্তই মনে হচ্ছে। মাথাজোড়া টাকের নীচে মোটা ভুরু, তার নীচে প্রসন্ন উজ্জ্বল দুটি চোখ—যেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তোমার মনের অন্তস্থল পর্যন্ত তাকিয়ে দেখছে। যেন কোন কিছুই ওঁর চোখ এড়ায় নি—শুধু মানুষ কত দুর্বল তা জানেন বলেই চুপ করে আছেন। সেই চুপ করে থাকাটা আরও প্রকট তাঁর দৃঢ়সম্বদ্ধ দুটি ওষ্ঠের ভঙ্গীতে। জানেন অনেক কিছুই, পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর অনেক রহস্য—তেমনি তা চেপে রাখতেও জানেন।

অনেকক্ষণ ধরে সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল মাধবী ছবিখানার দিকে। বুক পর্যন্ত ছবি, মুখখানাই প্রধান—কিন্তু ডান হাতটার একটা আঙুল একদিকের গালে দিয়ে রাখার জন্য হাতটাও উঠে গেছে ছবিতে। হাত আর তার সঙ্গে বাকী আঙুলগুলোও। সেই সঙ্গে অনামিকার গোমেদের আংটিটাও।

শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিল মাধবী। আংটিটা ওর পরিচিত, বড় বেশী পরিচিত।

যেন সেই পরিচয়ের স্মৃতি এড়াতেই এদিকে মুখ ফেরাল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে এ দেওয়ালের বড় বিলিতি দাঁড়া আয়নাটায় ফুটে উঠল নিজের চেহারার পরিপূর্ণ ছবিটা—

চওড়া লালপাড় শাড়িখানাই চোখে পড়ে সর্বপ্রথম। কিন্তু আর একটু চেয়ে থাকলে বাম মণিবন্ধে গোছাভর্তি চুড়ির মধ্যে বাঁধা (সোনা ও রূপো দুইই) এবং আবাঁধা গাছতিনেক লোহাও ; এমন কি বয়সের-জন্য-ঈষৎ-বিস্তৃত সীমন্তে চওড়া সিঁদূরের রেখাটাও!

স্পষ্ট আয়তির চিহ্ন।

ললাটের দুই প্রান্তে কয়েকগাছি ক'রে পাকা চুল দেখা দিলেও মাধবী এখনও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছয় নি ; মধ্যবয়সীও হয়ত বলা চলে না তাকে—এখনও যৌবনের সীমানাতেই পা আছে তার। হয়ত সর্বশেষ সীমা, তবু যৌবনই!

যৌবনও যেমন যায় নি, তেমনি রূপও না। তবে এই রূপ এবং যৌবনই বিধবার বেশে কেমন দেখাত কে জানে। এ শ্রীর একদশমাংশও থাকত কি ? এই রাজেন্দ্রাণীর মতো চেহারার ?

আরও একবার শিউরে উঠল মাধবী।

অসহায়ভাবে চেয়ে দেখল চারিদিকে। যেদিকে মুখ ফেরাতে যায় চারিদিকের অসংখ্য আয়নায় প্রতিবিম্বিত সেই একই ছবি, সেই সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতী গৃহলক্ষ্মীর রূপটাই নজরে পড়ে শুধু। চেয়ে দেখবার মতো রূপ আর তার উপযুক্ত বেশভূষা তাতে সন্দেহ নেই—চোখ পড়লে যে-কোন লোকেরই দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে ওঠবার কথা, মুগ্ধ না হোক প্রসন্ন তো বটেই—কিন্তু মাধবী নিজে যেন সেই মুহূর্তে নিজের এই প্রতিচ্ছায়াটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করে উঠল! মনে হ'ল সৌভাগ্যের এই মিথ্যা চেহারাটা তাকে চারিদিক থেকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জরিত করছে। কতকটা দিশাহারা হয়ে সে একটা কৌচে বসে পড়ে চোখ বুজল—

মিথ্যা, মিথ্যা। সে জানে কতদূর মিথ্যা এ। কিন্তু এ মিথ্যার প্রাসাদ সে নিজে গড়ে নি। গড়ে গেছেন তার স্বর্গগত শ্বশুর। মিথ্যা জেনেও তাই সে ভিত্তিহীন সৌধ ভাঙতে পারে নি মাধবী, ভাঙবার অধিকার ছিল না তার। সেজন্যে ঘরে-বাইরে বহু টিটকিরি ও উপহাস, স্বগতোক্তি ও চাপাহাস্য, বহু প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে হয়েছে তাকে। কিন্তু পাছে তার বাপের মতো, দেবতার মতো শ্বশুরের সুনামে এতটুকু দাগ লাগে, পাছে সে আঘাতের কণামাত্রও তাঁকে স্পর্শ করে—সেই ভয়ে সবকিছুই সহ্য করেছে সে হাসিমুখে, ছদ্ম উপেক্ষার বর্মে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিয়েছে বিদ্রূপের নিশিত বাণ।

শুধুই কি গুরুজন বলে সহ্য করেছে এতটা? না, তা নয়। ওঁর কাছে যে মাধবীর অপরিসীম ঋণ। কৃতজ্ঞতার ঋণ! অপরিশোধ্য, অবিস্মরণীয়। তিনি যা করেছেন, ওর মুখ চেয়েই করেছেন, আর সেজন্যে তাঁকেও কিছু কম সইতে হয় নি।

দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করেছেন ভদ্রলোক। মাধবী জানে সে সহ্যের পরিমাণ। বুক ভেঙে গেছে, পিষে গুঁড়িয়ে গেছে তাঁর মর্মস্থল মিথ্যার এই জগদ্দল শিলায়—তবু সহ্য করেছেন। করেছেন শুধু মাধবীর মুখ চেয়ে। তিনি যদি এতটা পেরে থাকেন, মাধবী বাইরের লোকের পরোক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রূপ সইতে পারবে না? না, সেটুকুতে তাঁর ঋণ শোধ হয় নি। হয়ত আজ—আজ হল কিছুটা!······

চোখ চেয়ে মাধবী আর একবার শ্বশুরের ছবির দিকে তাকাল। উঠে কাছে এসে দাঁড়াল আবার।

বাবার মতো শ্বশুর বলে লোকে। কিন্তু গুরুদাস মল্লিক বাবার চেয়েও বেশী ছিলেন। অনেক বেশী আত্মত্যাগ করেছেন পুত্রবধূর মুখ চেয়ে। পক্ষীমাতা যেমন দুই ডানা দিয়ে তার ভীরু দুর্বল শিশুদের ঢেকে আগলে রাখে, তেমনিই রেখেছিলেন চিরকাল! যতটা পেরেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় থেকে ঢেকে রেখেছেন, আত্মীয়দের রসনার বিষ নিজে মাথা পেতে নিয়েছেন।

সেই অপরিশোধ্য ঋণের কি কিছু শোধ হল আজ?

কে জানে, ঋণ শোধ করল, না—কৃতঘ্নতাই প্রকাশ করে এল সে এই মাত্র।

অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা ওরই দোষে শেষ শান্তিটুকু থেকেও বঞ্চিত হল না তো? চিরদুঃখী বুভুক্ষ তৃষ্ণার্ত মানুষটা এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো?……

কিছুতেই কেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মাধবী?

অথচ এই ঘণ্টাখানেক আগে যখন সে রওনা হয়, তখন সিঁড়ির মুখে শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীর উদ্বিগ্ন অশ্রুব্যাকুল চেহারাটা দেখে মনে হয়েছিল শ্বশুরের সুস্পষ্ট নির্দেশই দেখতে পেল সে।

প্রায় এক বিঘৎ চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি। পুজো থেকে উঠে এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, সিঁথিতে ও ললাটে সদ্যসিন্দুর-চিহ্ন, দুই হাতে যোলগাছা চুড়ির প্রান্তে সাদা শাঁখা জলজল করছে। বিশেষ করে সিঁদুর, বেশিরভাগ পাকা, সাদা চুলের মধ্যে ডগডগে লাল সিঁদুরে কী অপরূপই না মানিয়েছে তাঁকে, যেন কোন দেবী এসে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হল, মনে হল সাক্ষাৎ দেব-মাতা অদিতি।

নামতে গিয়ে পা দুটির দিকেও নজর পড়েছিল। সুশুভ্র রক্তাভ দুটি পায়ে অলক্তক-রেখা—কালই সন্ধ্যায় নাপতিনী এসে পরিয়ে দিয়ে গেছে বোধহয়।

এর পর আর ইতস্তত করার প্রশ্ন ওঠে নি।

করেও নি সে। ঈশ্বরের নির্দেশ, মৃত শ্বশুরের নির্দেশই যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল।

গলিত, স্ফীত, বিকৃত অর্ধভক্ষিত শব দেহটার অনামিকায় গোমেদের আংটিটা দেখেও দেখে নি, স্থির শান্ত অচঞ্চল কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, 'না, এ আমার শ্বশুরের মৃতদেহ নয়। না, এ আংটিও তাঁর নয়।'

কিন্তু তবু, ফিরে এসে বা ফেরার পর থেকেই এ একটা কিসের সংশয় কিসের দ্বিধা তার মনে দেখা দিচ্ছে।

কিছুতেই কেন মনে জোর আনতে পারছে না সে—যেমন তার শ্বশুর পেরেছিলেন।···কৈ, তিনি কোন অনুশোচনায় কোনদিন দগ্ধ হয়েছিলেন বলে তো মনে হয় নি মাধবীর।···

অকস্মাৎ, যেন দুই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে আঁচলটা পুরে দিল সে। এ কান্নার এতটুকু শব্দ বাইরে না যায়, কেউ না টের পায় তার এই চোখের জলের কথা।

কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা কুণ্ঠা না প্রকাশ পায় তার আচরণে।

'বলে দিন বাবা, শুধু একটি বার বলে দিন—আমি ঠিক করেছি, কিছু মাত্র অন্যায় করি নি!' চুপি চুপি যেন কার কানে কানে বলে মাধবী।

স্থির হয়ে থাকে ছবি অচঞ্চল থাকে ছবির স্থির দৃষ্টি।

না মেলে উত্তর, না মেলে সান্ত্বনা বা শান্তি।

আবারও বলে মাধবী, তেমনি স্বগতোক্তির মতোই ফিসফিস করে বলে, 'আপনার ঋণই খানিকটা শোধ করার চেষ্টা করেছি বাবা, বলুন—আমাকে ভুল বোঝেন নি তো?'

এইবার, এই প্রথম মনে হ'ল—ছবির স্থির দুটি চোখের অপলক দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ। মনে হল আশীর্বাদেরই ভঙ্গী সেটা, যেমন ভাবে তার দিকে চেয়ে আশীর্বাদ করতেন, তেমনি ভাবেই চাইলেন।

অন্তত মাধবীর তাই মনে হয়।

চোখের ভুল? মায়া? নিজের ইচ্ছাতুর চিন্তা?

এসব কথা ভাবলে তার চলবে না।

গুরুদাস মল্লিক স্বর্গ থেকে প্রসন্ন অন্তরে তাকে আশীর্বাদ করছেন, এটা বিশ্বাস করা মাধবীর একান্ত প্রয়োজন। নইলে—নইলে আজ আর তার আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য পথ থাকে না।

এ মিথ্যার সৌধ রচিত হতে শুরু করেছে অনেক দিন, অনেক বছর আগে থেকে। আজ তা সমাপ্ত হল বুঝি।

ষোল কি সতেরো বছর হবে, কিম্বা আরো বেশী। মাধবী আর হিসেবও রাখে না! হিসেব রাখা ছেড়ে দিয়েছে সে। বড়ই ক্লান্তিকর মনে হয় তার—আর অর্থহীন। কী হবে শুধু কাল-সমুদ্রের জল মেপে তার ঢেউ-এর হিসেব রেখে, যখন সে জানে কোনদিনই তার নেয়ে ঐ সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ফিরবে না।

শুধু এইটে মনে আছে, তার বিয়ের বছর-খানেক পরেরই ঘটনা সেটা।

হয়ত এক বছর পুরোও হয় নি। কিম্বা সবে হয়েছে।

তার স্বামী অজিতের তখন মাত্র বোধহয় সাতাশ-আটাশ বছর বয়স! ভোরে উঠে ব্যায়াম করা আর তার কিছু পরে গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া তার নিত্য-অভ্যাস ছিল। গঙ্গার কাছেই বাড়ি, হয়ত সেই জন্যেই এই অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল। এতে আপত্তিরও কেউ কোন কারণ পায় নি। বরং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস বলে বাহবা দিয়েছে। ভাল সাঁতার জানত অজিত, গঙ্গা পারাপার তার কাছে খেলার মতোই সহজ ছিল। প্রতিদিন সাঁতার কেটে প্রায় একঘণ্টা ধরে স্নান করত সে, তারপর গঙ্গা থেকে ফিরে মোটা জলখাবার খেয়ে কলকাতায় ওদের নিজস্ব অফিসে চলে যেত। সব সেরেও ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ত, কোন দিন তার ব্যতিক্রম হয় নি! গুরুদাসবাবুর এসব ব্যাপারে কতকটা সাহেবী মেজাজ ছিল—ঘড়িধরা কাজ, ছেলে অজিতও সেই মেজাজ পেয়েছিল। বেলা একটায় ওঁরা দুজনে কোন বিলিতী হোটেলে লাঞ্চ খেতে যেতেন—যতই জরুরী কাজ হাতে থাক আর যতই গণ্য-মান্য লোক এসে পড়ুন—কোনদিনই সেটা দেড়টা হত না।

কিন্তু এক দিন হঠাৎ এরই মধ্যে অনিয়ম ঘটে গেল।

আটটা তো নয়ই—নটা-দশটা-এগারোটা বেজে গেল—অজিত স্নান করে ফিরল না।

আগে চাকর গিয়েছিল খোঁজ করতে, তারপর অন্যান্য পরিজন ও কর্মচারী, শেষে গুরুদাসবাবু নিজে গেলেন ছুটে। মুঠো মুঠো টাকা দিলেন মাঝি-মাল্লাদের। দু-তিন শো লোক জলে নামল, বেড়াজালও নামানো হল শেষ

পর্যন্ত—কিন্তু কোন ফলই হল না। জীবিত বা মৃত কোন দেহই উঠল না। মানুষটা যেন সম্পূর্ণরূপে উবে গেল এ জগৎ থেকে।

যে ঘাটিয়ালের কাছে জামা-কাপড় রাখত অজিত, সেও সঠিক কিছু বলতে পারল না। স্নানের হাফ-প্যাণ্ট পরে ঘাটে যেত অজিত, পাণ্ডার কাছে কাচা ধুতি গেঞ্জি রেখে ঘাটে বসে তেল মাখত। সেদিনও কাপড় রেখে তেলের শিশি নিয়ে ঘাটে নেমে গেছে—তার পর কি হয়েছে পাণ্ডা তা জানে না। কতক্ষণ ধরে তেল মেখেছে কখন জলে নেমেছে—বা আদৌ তেল মেখেছে কি জলে নেমেছে কিনা—কিছুই সে জানে না।

দিন তিনেক পরে এই ঘাটের ঠিক ওপারে একটা গলিত শবের খবর মিলল। চেনবার কোন উপায় নেই, পচে ফুলে উঠেছে মড়া, মাছে ঠুকরে খেয়ে মাঝে মাঝে গর্ত ক'রে দিয়েছে তার ওপরে। শুধু পরনের খাকি হাফ প্যাণ্টটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নি তখনও আর আশ্চর্য উপায়ে হাতের আংটিটাও থেকে গিয়েছে।

দামী পোখরাজের আংটি একটা।

এই রকমই এজাহার দিয়েছিলেন এঁরা, বেশ এবং ভূষার। সুতরাং পুলিশ সর্বাগ্রে এঁদেরই খবর দিল। যদি একবার দয়া ক'রে যান—বিশেষ করে অজিত বাবুর স্ত্রী।

পুলিস আসামাত্র গুরুদাসবাবু চোখ বুজেছিলেন, ওদের বক্তব্য শেষ হতে একেবারে চোখ খুললেন। আর চোখ খুলতেই প্রথম নজর পড়ল ওর দিকেই—ব্যাকুল চোখে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী, পাংশু বিবর্ণ তার মুখ, থর থর করে কাঁপছে সে,—

সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী পুত্রবধূ তাঁর। অনেক খুঁজে অনেক দেখে লক্ষণ মিলিয়ে নিয়ে এসেছেন। সব দিক দিয়েই মনের মতো, এতবড় সংসারের হাল ধরবার মতো ক্ষমতা লাভ করবে সে—তাতে অন্তত গুরুদাসবাবুর কোন সন্দেহ নেই। রূপে-গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বিশেষ রূপ, বাংলাদেশে এমন কি তাঁদের ব্রাহ্মণদের ঘরেও দুর্লভ তা উনি জানেন। মাত্র দু-তিন দিনে সেই রূপ আর সেই স্বাস্থ্যের এই হাল হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় যেন আধখানা হয়ে গেছে, সোনার মুখে কে কালি লেপে দিয়েছে।

তবু—তবু তো এখনও আয়তির সমস্ত চিহ্ন বর্তমান। শাঁখা-সিঁদুর, হাত ভর্তি সোনার চুড়ি, বালা—আগুনের মতো লাল রঙের শাড়িটাও। বৈধব্য বেশ ধারণ করলে আরও না জানি কী শ্রীহীন হয়ে পড়ত—

গুরুদাসবাবু একেবারে উঠে দাঁড়ালেন, 'চলুন, আমিই যাচ্ছি—'

তবুও সসঙ্কোচে একবার বলতে গিয়েছিলেন পুলিশ অফিসারটি, 'ওঁর স্ত্রী—'

তাঁকে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠলেন গুরুদাসবাবু, 'জন্মাবধি এই আটাশ বছর আমি দেখছি তাকে, এক দিনের জন্যেও কাছছাড়া করি নি—আমি যদি সনাক্ত করতে না পারি, তার স্ত্রী পারবে? মাত্র বছর খানেক বছর দেড়েকের তো পরিচয় ওদের—তাও দিনের বেলায় আর কতটুকু দেখেছে! চলুন, চলুন—আর দেরি করবেন না।'

যুক্তি অকাট্য, তা পুলিশকেও মানতে হয়েছে।

সঙ্গে যায় নি মাধবী কিন্তু সবই শুনেছে সে।

পুঙ্খানুপুঙ্খই খবর পেয়েছে।

গুরুদাসবাবু বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন সেই গলিত শবটার দিকে। নাকে কাপড় দেন নি, কোন রকম দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি, কাছে গিয়ে হেঁট হয়েই দেখেছেন তাকিয়ে। খাকি হাফ প্যান্ট আর হাতের দামী পোখরাজের আংটি দুটোই দেখেছেন বহুক্ষণ ধরে। তারপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্থির অকম্পিত স্বরে বলেছেন, 'না, এ আমার ছেলে নয়।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে থানাসুদ্ধ সবাই।

বর্ণনার সঙ্গে মাল দুটোর এত মিল যে তারা নিশ্চিন্তই ছিল একরকম।

ও সি তবু মাথা চুলকে বলেছেন, 'প্যান্টটার ধোপার মার্কাটা দেখবেন একবার? খুলে দিতে বলব?'

'না, যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি।'

'কিন্তু আপনার দুজন চাকর বলছিল—আংটিটা নাকি অজিতবাবুরই—তারা ভাল ক'রে দেখেছে—'

'আমার থেকে আমার চাকরদের ওপর যদি বেশী বিশ্বাস থাকে আপনাদের, সে আপনারা বুঝুন। তারা দেখেছে, আমি গড়িয়ে দিয়েছি আংটি

তার পৈতের সময়। আমারই বেশী চেনার কথা। যাই হোক—আমি এ শব আমার ছেলের শব বলে য়্যাক্সেপ্ট করতে রাজী নই।'

করেনও নি।

বাড়িতে এসে স্ত্রী ও পুত্রবধূকেও সেই কথা বলেছেন।

তিনি ভাল ক'রেই দেখেছেন—ও শব আর যারই হোক, অজিতের নয়।

কিছুদিন পরে আরও রটনা করেছেন—অজিত নাকি ইদানীং গোপনে সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনী নিয়ে খুব আলোচনা করত, কার কাছে নাকি বলেছিল হিমালয়ে গিয়ে আসল সন্ন্যাসী দেখবার তার খুব ইচ্ছা।...

কিন্তু মাধবী জানে, সেই প্রথম দিনই বুঝেছিল যে, এ সমস্ত মিথ্যা। শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে এতবড় মিথ্যে কথা বলেছেন তার সত্যনিষ্ঠ শ্বশুর, বুকের মধ্যে এতবড় প্রদাহ নিয়ে স্থির শান্ত ভাব বজায় রেখেছেন।

সে জানে—কারণ, বহুদিন আড়াল থেকে বুকফাটা নিঃশব্দ কান্না কাঁদতে দেখেছে সে গুরুদাসবাবুকে। লক্ষ্য করেছে—এর পরই কীভাবে একটু একটু করে শীর্ণ হয়ে বেঁকে পড়েছেন তিনি। দু-তিন বছর পরেই ওঁদের ব্যবসা তুলে বেচে-কিনে ঘরে এসে বসেছেন। যে আশা করে তার ছেলে বেঁচে আছে এবং একদিন ফিরে আসবে সে কখনও চারপুরুষের ব্যবসা এমনভাবে গুটিয়ে ফেলে না।

আরও জানে মাধবী, আরও দেখেছে। ইদানীং নিজের দেরাজের চাবি সদাসর্বদা বয়ে বেড়াতেন গুরুদাসবাবু, এটা তাঁর পক্ষে একটু অস্বাভাবিক আচরণ। তাইতেই সন্দেহ হয়েছিল ওর। এক দিনের এক অতর্কিত বিস্মৃতির সুযোগে গোপনে চাবি খুলে দেখেছিল সে—দেরাজের প্রথম টানাতেই কতকগুলো কাগজপত্রের নীচে একটা পোখরাজের আংটি, অজিতের আংটি। আংটিটার সঙ্গে একমুঠো শুকনো চামেলি ফুল—অজিতের প্রিয় ফুল।

দেখে আবার নিঃশব্দে দেরাজ বন্ধ ক'রে চাবিটা পূর্ববৎ বাথরুমের কলে ঝুলিয়ে রেখে এসেছে। তারপর সোজাসুজি ডাকহাঁক করে শ্বশুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে চাবির দিকে।

বৈধব্যের এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার পর কিছুতেই যেন মাছ-মাংস গলা

দিয়ে নামতে চাইত না। একাদশীতে তো নয়ই। কিন্তু তবু মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পারে নি। পারে নি শ্বশুরের জন্যেই। তিনি যে কী সহ্য করছেন পুত্রবধূর মুখ চেয়ে তা সে জানে। তিনি যদি এতটা সইতে পারেন, সে পারবে না? অবশেষে দীক্ষা নিয়ে সে মাছ-মাংস ত্যাগ করার অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছেন গুরুদাসবাবুও—ওঁরা সকলে মিলেই নিরামিষ ধরেছেন।

কিন্তু আয়তির অন্য লক্ষণগুলোর কোনটাই ত্যাগ করতে পারে নি। আর সেজন্য লাঞ্ছনাও বড় কম সইতে হয় নি তাকে। বিশেষত অজিতের অন্তর্ধানের বারো বছর পূর্ণ হতে আত্মীয়-স্বজনদের রসনা খরতর হয়ে উঠেছে। বারো বছর স্বামী নিরুদ্দেশ থাকলে, তাকে মৃত বলে ধরে নিয়ে স্ত্রীকে বৈধব্য গ্রহণ করতে হয়—এই নাকি নিয়ম। গুরুদাসবাবু মানেন নি সে কথা, বলেছেন, 'আমি জানি খোকন আমার বেঁচে আছে, যদি কোন-দিন তার সুমতি হয়, ফিরে আসে—বৌমার শুধু-হাত আর সাদা সিঁথি দেখে শক্-এই মরে যাবে সে। না, ওসব আইন আমি মানি না। মা আমার যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।'

অবশ্যই সেসব নিন্দার অধিকাংশ এসে সোজাসুজি আঘাত করত মাধবীকেই, গুরুদাসবাবু বেশির ভাগ খবরই পেতেন না, তবে মাধবীও বিচলিত হয় নি। শ্বশুরের শীর্ণ-ক্লিষ্ট বজ্রাহত মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে সব সহ্য করেছে সে, নিজের উপেক্ষার ও তাচ্ছিল্যের বর্মে প্রতিহত করেছে সে সব বাক্যবাণ। সুবিধা এই—বর্মের নীচে দেহের কোমল ত্বকে কালসিটে পড়ল কিনা, অথবা ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে উঠল কিনা—কেউ চোখে দেখতে পায় না। নইলে এ লজ্জা রাখার স্থান পেত না মাধবী।

সুদীর্ঘ কাল চলে গেছে সে ঘটনার পর।

অজিতের স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে। এখন সবটাই একটা অনুষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। বৈধব্য গ্রহণ উচিত কি না তাও যেন আর বড় প্রশ্ন নেই মনের মধ্যে।

মোটামুটি একটানা বইছিল জীবনযাত্রা—তারই মধ্যে আবার এই এক প্রচণ্ড আঘাত।

গুরুদাসবাবু শুকিয়ে উঠেছিলেন ঠিকই—কিন্তু ভেঙে পড়েন নি, ঝলসে গিয়েছিলেন—ভস্মাবশেষে পরিণত হন নি। দৈনন্দিন কাজগুলো নিয়মিত করে যাচ্ছিলেন। ব্যতিক্রমের মধ্যে—তিনিও ইদানীং গঙ্গাস্নান ধরে ছিলেন। গৃহিনী একা ছাড়তেন না অবশ্য, কাপড়-চোপড় তেলের শিশি ইত্যাদি নিয়ে পুরনো চাকর ঈশ্বর সঙ্গে যেত। সেই তাঁকে তেল মাখাত। সঙ্গে সঙ্গে জলেও নামত।

এইভাবেই চলছে গত চার-পাঁচ বছর। ঈশ্বর বুড়ো হয়ে দেশে চলে যেতে যদুকে এই ভার দিয়েছিল মাধবী। সেও দেড় বছর ধরে প্রত্যহ সঙ্গে যাচ্ছে, যদু সাঁতারও ভাল জানে বলে ওরা আরও নিশ্চিন্ত ছিল।

গত অমাবস্যার দিন হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। আসলে সেদিনটা যে অমাবস্যা তা কেউ জানত না, পরের দিন ভোরবেলা অবধি তিথি আছে বলে উপবাসটা পড়েছে পরের দিন। তাছাড়া—সবটা জড়িয়ে নিয়তিই মানতে হয়, নইলে যদুরই বা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে অমন পেটটা মুচড়ে উঠবে কেন? আর গুরুদাসবাবু মাত্র পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করার পর অসহিষ্ণু হয়ে জলে নামবেন কেন। ঘাটে যে সে সময় অন্য স্নানার্থী নেই তা লক্ষ্য করেও তো সাবধান হতে পারতেন। বেলা বেশী হয়েছে বলেই বোধহয় জনবিরলতা অত লক্ষ্য করেন নি।

অবশ্য জলে যে তিনি নেমেছেন তা কেউ প্রত্যক্ষ দেখে নি। ঘাট-পাণ্ডাও না, সে তখন পয়সা গুণছিল, তার সারা সকালের উপার্জন। একটু পরেই যদু এসে দেখে যখন প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে, 'বাবু? ঠাকুর, আমাদের বাবু কোথায় গেলেন?' তখন তার চমক ভেঙেছে। ছুটে জলের ধারে এসেছে সেও। কিন্তু তার বেশী কিছু করা যায় নি। তখনই জলের ধার থেকে আবার ছুটে ওপরে চলে যেতে হয়েছে, যদুকেও টানতে টানতে নিয়ে গেছে। কারণ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতপ্রমাণ জল এসে পড়েছে। বানের জল।

তারপর অবশ্য জলে নেমেছে তারা। আরও অনেকে নেমেছে। যেসব মাঝি-মাল্লা নৌকা সুরক্ষিত রেখে বাড়ি চলে গিয়েছিল, তারাও অনেকে এসেছ খবর পেয়ে, যথাসাধ্যই করেছে তারা, কিন্তু সেই উত্তাল বিক্ষুব্ধ প্রচণ্ড জলরাশির গর্ভাবর্ত থেকে পারে নি কেউ একটা দুর্বল শীর্ণ জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত

দেহকে খুঁজে বার করতে।…

সে আজ তিন দিনের ঘটনা।

আজ থানা থেকে খবর এসেছে যে, মাইল-দুই দূরে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে, খুব সম্ভব জোয়ারে ভেসে এসে চড়ায় আটকে পড়েছে। ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো কিসে খেয়ে গেছে, দেহে বস্ত্র নেই, তবে বৃদ্ধের মড়া, অনেকটা বড়বাবুর বর্ণনার সঙ্গে মেলে, ডান হাতের অনামিকায় একটা আংটিও আছে, কেউ কি যাবেন এ-বাড়ি থেকে সনাক্ত করতে?

অসহায় বিহ্বল আরক্ত দুটি চোখ মেলে শাশুড়ী তাকিয়েছেন মাধবীর দিকে। মাধবী বলেছে, 'চলুন আমি যাচ্ছি।'

'উনি—?' থানার লোক শাশুড়ির দিকে দেখিয়েছে আঙুল দিয়ে।

'না উনি যেতে পারবেন না। ওঁর শরীর ভাল নেই, শোকে-তাপে জর্জরিত, আর আমি যখন যাচ্ছি—ওঁর দরকার কি?'

সে লোকটি আর কিছু বলে নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে আর একবার শাশুড়ীর মূর্তিটা চোখে পড়েছে মাধবীর। সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর বেশে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাঁকে। ঝল্‌মল্ করছে দেবী-প্রতিমার মতো চেহারা। দেখলেই মা বলতে ইচ্ছে করে, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো রূপ তাঁর।

শ্বশুরের বড় প্রিয় ছিল এই চওড়া লালপাড় শাড়িটা।

কতবার বলেছেন, মাধবী নিজে কানে শুনেছে, 'তোমার পাকা চুলের সঙ্গে আর ঐ পাকা রঙের সঙ্গে এই চওড়া লাল পাড়টা যা খোলে গিন্নী, এমন বোধ হয় বেনারসী শাড়িতেও খুলত না।'

সব কথাগুলো একসঙ্গে মনে পড়ে চোখ ঝাপ্‌সা করে দিয়েছে ক্ষণকালের জন্য, তবু দৃঢ় পদক্ষেপে আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে গেছে সে গাড়ির দিকে। থানায় পৌঁছেও দ্বিধা করে নি। অকম্পিত পায়ে এগিয়ে গেছে লাশ-ঘরের দিকে, ভাল করে তাকিয়ে দেখছে। তারপর স্থির স্বরে বলেছে, 'না, এ আমার শ্বশুরের শব নয়।'

'নয়?' তারা অবাক হয়ে বলেছে, কিছুটা বিপন্নও, 'ভাল ক'রে দেখেছেন আপনি? আংটিটা?'

'দেখেছি। হ্যাঁ তিনিও গোমেদের আংটি পরতেন বটে, তবে এ সে

আংটি নয়।'

'তাহলে, তাহলে কিন্তু এ-লাশ আমাদের মুর্দাফরাসের হাতে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকল না।'

'সে আপনাদের যা করবার করবেন বৈকি।'

মাধবী শান্ত পদক্ষেপেই ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠেছে, কোন দিকে না তাকিয়ে।

জীবন-মূল্য

অবিনাশের কেন টি. বি. হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ বলে পুষ্টির অভাব, কেউ বলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কেউ বলে অতিরিক্ত পরিশ্রম, আবার কেউ বা বলে, তীব্র আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্যে অন্তঃক্ষয়ই এই রোগের মূল। 'রিপ্রেশ্যন' এই শব্দটির মধ্যে দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ইঙ্গিত করেন তাঁরা। এই মতভেদের কোন মীমাংসা করতে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ এর সব ক'টি অবস্থাই সত্য।

হয়তো সব মিলেই হয়েছে, কে জানে!

ছোটবেলাতেই বাবা মারা গিয়েছিলেন অবিনাশের। তখন ওর মাত্র আট বছর বয়স। ননীগোপালবাবু কলকাতায় মেসে থাকতেন। সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যেতেন। টাকীর ওধারে বাড়ি, নিত্য যাওয়া-আসা করার বড় অসুবিধা। মাঝারি ধরণের চাকরি ছিল, তাতে এমন নিঃস্ব হওয়ার কথা নয়। বোধহয় একটু উড়নচণ্ডে স্বভাব ছিল। খেতে টেতেও ভালোবাসতেন। শনিবার গভীর রাত্রে বাড়ি আসতেন এক পুঁটুলি বাজার করে নিয়ে, সন্দেশ রসগোল্লা মাছ মাংস কোনটাই বাদ থাকত না। তাছাড়া একটু আধটু রেসও খেলতেন বোধহয়। যাই হোক, হঠাৎ একদিন গাড়ি চাপা পড়ে যখন মারা গেলেন তখন দেখা গেল, বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। আপিসে যা পাওনা হবার কথা তা আপিসের দেনা শুধতেই প্রায় সবটা চলে গেল। এত দেনা যে কেন করেছিলেন তাও কেউ জানে না, না দিয়েছেন মেয়ের বিয়ে, না করেছেন বাড়ি।

একটা ইনসিওরেন্স পলিসিও করেননি ভদ্রলোক। দেশে দু'কামরার পুরনো বাড়ি, আর বিঘে-দুয়েক মতো জমি, এই এদের ভরসা। তাও অবিনাশের এক কাকা ছিলেন, বহুদিন থেকেই নিরুদ্দেশ, তবে শোনা গেছে যে তিনি বেঁচে আছেন। সংসারও পেতেছেন, সুতরাং যে কোন সময়ে ফিরে এসে এইটুকু বিষয়েরও অর্ধেক ভাগ চাইতে পারেন।

অবিনাশের মা অপর্ণারও বাপের বাড়ির দিকে কেউ ছিল না বিশেষ। বাবা-মা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে না থাকার মধ্যে। বাবা ইস্কুলমাস্টারী করতেন, অবিরাম নানা রোগে ভুগে ভুগে অকালেই চাকরি ছেড়ে ঘরে বসতে হয়েছে। বাইরে ঘুরে ঘুরে টিউশ্যনি করবেন সে সামর্থ্যও নেই। ফলে দু'জনেই এখন এক ভাগ্নের গলগ্রহ। বাবা ভাগ্নের ছেলেদের পড়ান আর মা ভাগ্নে-বৌয়ের সংসারে পেট-ভাতায় রান্না করেন। বস্তুত এই তাঁদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ কোন দিকেই কোন আশ্রয় বা অবলম্বন নেই।

তবুও সে দুর্দিনে অপর্ণা ভেঙে পড়েন নি।

অশৌচের মধ্যেই মন স্থির করে ফেলেছিলেন। এখানে থেকে ভিক্ষে করতে পারবেন না, আর দেবেই বা কে? ঝি-গিরি চাকরিরও মাইনে দেবার লোক নেই এখানে। যদি দুটোর একটা ধরতেই হয় তো শহর ভালো, সেখানে কেউ চেনে না, মান খোয়াবার ভয় নেই।

মন ঠিক ক'রে শ্রাদ্ধ শান্তির পরই দেশের ঘরে চাবি দিয়ে পেতল-কাঁসার বাসনগুলো আর মনখানেক চাল সম্বল ক'রে কলকাতায় চলে এলেন। সঙ্গে দুটি ছেলে—কালু আর ভুলু, অবিনাশ আর অরিন্দম।

কলকাতার কিছুই চিনতেন না, তবে স্বামী যে-মেসে থাকতেন সে মেসের ঠিকানাটা মনে ছিল, শ্যামবাজারে নেমে একখানা গাড়ি করে সোজা সেই-খানে গিয়ে উঠলেন। ননীবাবুর দু'চার জন অফিসের বন্ধুও ঐ মেসে থাকতেন। তাঁরা প্রথমটা রীতিমত বিব্রতই হয়ে পড়লেন ওকে ঐ ভাবে আসতে দেখে। অপর্ণা তা বুঝেই তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিলেন, ভয় নেই, আমি আপনাদের বেশী জ্বালাতন করব না। আজকের রাতটা এই বারান্দাতেই পড়ে থাকতে দিন, আর কাল সকালে দয়া করে কোন বস্তীটস্তীতে একটা কম ভাড়ার ঘর দেখে দিন। তারপর যা পারি নিজেই ক'রে নেব।

সেই রকমই ব্যবস্থা হল। অবশ্য একদিনে হল না, তিন চারদিন সময়

লাগল ঘর খুঁজে বার করতে। সে ক'টা দিন মেসেই একটা ছোট ঘর ছেড়ে দিলেন তাঁরা। সত্যবাবু বলে একটি ভদ্রলোক অনেক খুঁজে বেলেঘাটায় একটা বস্তিতে ঘর ঠিক করে দিলেন। টিনের দেওয়াল টিনের চাল, সিমেন্টের মেঝে, সতেরো টাকা ভাড়া। টানা ব্যারাক মতো বাড়িটায় দশঘর ভাড়াটে থাকে, দুটো সাধারণের কল আর দুটো পায়খানা ভরসা। তবু, একটা সুবিধে এই যে এটা ঝি-চাকরদের বস্তি নয়, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। দরিদ্র নিঃস্ব সন্দেহ নেই কিন্তু সকলেই ভদ্রবংশের লোক, উচ্চবর্ণের।

সত্যবাবু ঘর ঠিক করে দু'মাসের টাকা জমা দিয়ে মালপত্র সুদ্ধ সেখানে তুলে দিয়ে এলেন একেবারে। অপর্ণা যখন আঁচল থেকে তার যথাসর্বস্ব অবশিষ্ট টাকা ক'টি বার করে ভাড়া-জমার টাকাটা দিতে গেলেন, তখন তার পরিমাণ দেখে সত্যবাবু নিলেন না। সব জড়িয়ে বোধহয় চল্লিশটি টাকা আছে, তা থেকে চৌত্রিশ টাকা গেলে খাবে কি? হাত জোড় করে অপর্ণার উদ্যত হাত ফিরিয়ে দিয়ে বললেন সত্যবাবু, 'ওটা থাক বৌমা। সামর্থ্য থাকলে ভাড়াটা মাসে মাসে আমিই চুকিয়ে দিতুম, ননী আমার ছোট ভাইয়ের মতো ছিল, তবে কি করব আমিও বড় হ্যান্‌জারী হয়ে পড়েছি, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, সামান্য আয় আর এই বাজার।—তবে যদি কখনও খুব ঠেকায় পড় বৌমা, দু'চার টাকা দিলে কোন বিপদে উদ্ধার পাও তো, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে চলে এস, যেমন করেই হোক দেব।...'

তা অবশ্য যেতে হয়নি অপর্ণাকে। মাসখানেকের মতো চাল ছিল সঙ্গে। বাসন-কোসন যা এনেছিলেন তা একেবারেই বাসনের দোকানে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দিয়েছিলেন, চুরির ভয় থেকে বাঁচল। তাছাড়া নগদ টাকারও দরকার। নিজেদের ব্যবহারের জন্যে দু'একটা যা দরকার, এনামেল আর অ্যালুমিনিয়ম কিনে নিলেন।

তবু, সে টাকা কিছু অফুরন্ত নয়। সেটা অর্পণাও জানতেন। তিনি তাই আর ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা না করে তখন থেকেই কাজের চেষ্টা দেখলেন। প্রতিবেশীদেরই হাতে পায়ে ধরে সকলের কাছে কান্নাকাটি করাতে, একটা ব্যবস্থা হয়েও গেল। কালুকে একটা ওষুধের অ্যাম্পুল তৈরির কারখানায় ঢুকিয়ে দিলেন একজন, আর একজন এক দপ্তরীখানায় ভুলুর ব্যবস্থা করে দিলেন। মাস দুয়েক কাজ শেখার পরই ভুলু মাসে দশ-বারো-

টাকা করে আনতে লাগল, ভুলুর প্রথম মাস থেকেই দশ টাকা করে জলপানির ব্যবস্থা হল।

তখন কালুর বয়স নয়, ভুলুর আট।

তারপর বহুকাল কেটে গেছে। কালুর বয়স এখন চব্বিশ, ভুলুর তেইশ। কালু এখন মাস গেলে একশো সওয়াশো টাকার মতো ঘরে আনে; ভুলু দপ্তরীখানায় কাজ করতে করতেই এক ছাপাখানায় কাজ যোগাড় করে নিয়েছিল, সেও ওপর-টাইম নিয়ে সত্তর আশি টাকার মতো পায়।

অর্পণা অন্য কোন দিকে খরচা বাড়াননি, বাড়াবার উপায়ই বা কি, যা বাজার—ঐ টাকাতে শাক-ভাত ছাড়া কিছু খাওয়া চলে না, কেবল একটি বিলাসিতা করেছেন, বস্তির ঘর ছেড়ে একটা পাকাবাড়িতে ত্রিশ টাকা ভাড়ার একখানা ঘরে উঠে এসেছেন।

কিন্তু এখনকার দিনে ত্রিশ টাকায় বাসযোগ্য ঘর পাওয়া শক্ত। অপর্ণাও পান নি। উঠে আসার পরই ভুল ভেঙেছিল অবশ্য, তবে তখন আর কোন চারা ছিল না। কী করে এই বস্তী থেকে মুক্তি পাব—আগে এই কথাই শুধু ভেবেছিলেন, এখানে এসে দেখলেন এর থেকে বস্তীর ঘর ঢের ভালো ছিল। সেখানে রোদ ছিল, হাওয়াও পাওয়া যেত একটু-আধটু। গরমে তাত অসহ্য বোধ হত ঠিকই—তবে অস্বাস্থ্যকর ছিল না। এখানে সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে উত্তর-খোলা একতলার ঘর, অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসে। অন্য কোন দিকে জানলা নেই ঘরটায়, ফলে বুক-চাপা মতো—গরমে দুঃসহ গরম, শীতে অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা।

অনুতপ্ত হয়েছেন, তবু মান খুইয়ে আবার বস্তিঘরে ফিরে যেতে পারেন নি।

এ-পাড়ায় এসে আশপাশের অন্য বাড়ির লোকদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে কারও কারও সঙ্গে। অর্পনার স্বভাব মধুর, কথাবার্তা চালচলনও সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের মতোই। তাই গরিব হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কেউ অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করত না, সমান ভাবেই মিশত।

এইভাবেই এই গলির শেষ বাড়ির নমিতার মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে-

ছিল। নমিতার মা কালু ভুলুকে খুব স্নেহ করতেন, প্রায়ই ডেকে এটা ওটা খাওয়াতেন। ভুলু একটু লাজুক ধরণের চিরদিন, সে লোকের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারত না। সে যেত ওঁরা ডেকে পাঠালে তবেই। কালু বিনা আহ্বানেই যেতে শুরু করল, শেষ পর্যন্ত দু'বেলা। কাজে যাওয়া আর ঘুমের সময় ছাড়া সবটাই ওখানে কাটাতে লাগল। ক্রমে ঘুমের থেকেও খানিকটা বার করে নিল। নমিতার বাবা ব্যবসাদার মানুষ, কাজকর্ম সেরে তাঁর বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায় প্রত্যহই, তারও পর কিছু সময় কাটিয়ে বাড়ি ফেরে অবিনাশ। কোন কোন দিন ওখানেই খেয়ে আসে। ভুলু ঘুমিয়ে পড়ে, অর্পণা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত খাবার নিয়ে বসে থাকেন, এক এক দিন অকারণেই, শোনেন ছেলে খেয়ে এসেছে।···

তবুও অপর্ণা বুঝতে পারেন নি। তাঁর বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা অনেকের থেকেই বেশি, কিন্তু অপত্য-স্নেহ না কি অন্য সমস্ত বৃত্তিকে আবরিত করে দেয়, তাই তিনি কোন সন্দেহই করেননি। অপর কোন ঐ বয়সের ছেলে একটি যৌবনপ্রাপ্তা মেয়ের বাড়িতে ঐ ভাবে পড়ে থাকলে প্রথমেই যে সন্দেহটা দেখা দিত, সেটা নিজের ছেলের সম্বন্ধে দেখা দেয় নি কখনই।

তাঁর একবারও মনে পড়ে নি যে পয়সা না এলেও বয়স হলে যৌবন আসবেই, সে অবস্থা বা সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে না। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলের বয়স চব্বিশ, যৌবন এবং যৌবনের নিজস্ব ক্ষুধা তার পরিপূর্ণ চেহারা নিয়ে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনেকদিন আগেই। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে ঐ বয়সে তাঁর পাড়ার ছেলেরা অধিকাংশ সময়ই মেয়েদের কথা আলোচনা করে, তারা নিয়মিত সিনেমা দেখে, নিজেদের নায়কের স্থানে কল্পনা করে, আর নিজেদের প্রণয়-অভিজ্ঞতা—কিছু বা সত্য কিছু বা কল্পিত, নিত্য বন্ধুদের কাছে বিবৃত করে, তাঁরই ঘরের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

সর্বোপরি, তাঁর খেয়াল ছিল না যে নমিতার বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে এবং সে খুব খারাপ দেখতে নয়।

নমিতা পাড়ার মেয়ে-ইস্কুলে ক্লাস টেন্-এ পড়ত—যখন ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর ক্লাস ইলেভন্-এ উঠেছে, তারপর বার-দুই হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফেল করে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়িতে বসেছে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পাড়ার ইস্কুল, এ-সব জায়গায় লেখাপড়া যত না

হোক জীবন-অভিজ্ঞতার পাঠটা মেলে অনায়াসে। স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত কোন সত্য বা তথ্যই জানতে বাকি থাকে না তাদের।

নমিতারও ছিল না। কাঁচা বয়স—কাজকর্ম নেই, পড়াশুনো নেই, প্রেম করার সাধ জেগেছে অনেক দিনই। আর হাতের কাছেই পেয়েছে একটি তরুণ ছেলে, সে দেখতেও মোটামুটি সুশ্রী, রোগা হলেও হাড় চওড়া বলে খুব খারাপ দেখাত না অবিনাশকে, সুতরাং ব্যাপারটা মন্দ লাগে নি নমিতারও। অবিনাশ যে তার প্রেমে 'গোড়ালি থেকে টিকি পর্যন্ত' ডুবে গেছে, নমিতা তা জানত এবং উপভোগ করত। একটু আধটু ফষ্টি-নষ্টি, ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্লার্টেশ্যন—এর বেশি অবশ্য এগোয় নি ব্যাপারটা। তার কারণ এদের ইচ্ছার অভাব নয়, স্থানাভাব। দোতলায় দু'খানি ঘর নিয়ে থাকত নমিতারা, নিচের তলাটা ভাড়া দেওয়া ; নমিতার ভাই বোনও অনেকগুলি, নির্জন অবসর একেবারেই মেলেনি বলতে গেলে।

তা ছাড়া, অবিনাশের বোধহয় অত সাহসও ছিল না। তারা যে গরিব, লেখাপড়া শেখে নি, সামান্য কারখানার সামান্য কাজ করে, তারা যে কোন দিকেই নমিতাদের সমান নয়, এটা ভালো করেই জানত। তাই আশা সে করেনি, আকাঙ্ক্ষাই করেছে শুধু। আর সেই আশাহীন, প্রকাশের উপায়হীন আকাঙ্ক্ষার জ্বালায় নিরন্তর দগ্ধ হয়েছে। মনে মনে দয়িতাকে বক্ষলগ্ন অবস্থায় কল্পনা করেছে অহোরাত্র, তার ফলে স্বাস্থ্যটাই গেছে শুধু, লাভ কিছু হয়নি।

আর তারই ফলে কি না কে জানে, হঠাৎ একদিন জ্বর শুরু হয়েছে অবিনাশের, ঘুষ-ঘুষে জ্বর, তার সঙ্গে কাশি। প্রথমে হোমিওপ্যাথী চলেছে, তারপর অনেকদিন হয়ে যেতে ডাক্তার ডেকেছেন অর্পণা। ডাক্তার এসে সেই নিদারুণ সত্যটি শুনিয়ে গেছেন—টি. বি. হয়েছে। বিস্তৃত বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনিও করতে পারেন। তবে অত খরচা কি করতে পারবেন ওঁরা ?··· যাই হোক, এখনই রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে বাঁচানো শক্ত হবে। এই কথাটা বলে বিদায় নিয়েছেন তিনি।

বাঁচবার কথা নয়, নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই বেঁচে গেল অবিনাশ।

অপর্ণা জনে জনে কেঁদে পড়লেন পাড়ার লোকের কাছে। তাঁদের এবং

মনিবদের যৌথ চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত কলকাতার বাইরে একটা হাসপাতালে ব্যবস্থা হয়ে গেল, বিনা খরচেই থাকতে পাবে সেখানে, চিকিৎসাও বিনামূল্যে। ওর মনিব ওর মাকেও সামান্য কিছু সাহায্য করতে রাজী হলেন। অবিনাশ ভালো কর্মী, নিরীহ ও ভদ্র বলে ওর প্রতি তাঁদের কিছু মমতাও ছিল।

এই সময়ই রোগ উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন সকলে। বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন বিভিন্ন লোক, শেষ কথাটাও বলেছেন কেউ কেউ, সেক্স-রিপ্রেশ্যান। কথাটা অত বুঝতে পারেন নি অপর্ণা, ভুলুই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সে অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষ্য করেছে জিনিসটা, মুখচোরা স্বভাবের জন্যে মুখ ফুটে দাদাকে কিছু বলতে পারে নি। মাকে ইঙ্গিত দিয়েছে, দাদার দেরি করে আসার জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, তবু খুলে বলতে পারে নি ব্যাপারটা। এখন বলল। মা রোগের সব দায়িত্বটা পুষ্টিকর আহার্যের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর ঘরের ওপর চাপাচ্ছেন দেখে প্রতিবাদ করে উঠল। আর মুখচোরা লোকেরা যখন মুখ খোলে তখন স্বাভাবিকের থেকে বেশি রকমের তিক্ত ভাষণ করে, ভুলুও কিছু রেখে ঢেকে বলল না।

যাই হোক, কোনমতে ক'টা মাস কাটিয়েছে ওরা, যাকে বলে কাদায় গুণ টেনে। অভাবের শেষ নেই, ধার-দেনা বেড়ে গেছে চতুর্দিকে। ভুলুর একশোটি টাকাই ভরসা, মনিবরা দেন মাত্র ত্রিশটি টাকা, মায়ের হাতখরচের মতো। সুতরাং আবারও একটা বস্তির ঘরে উঠে যেতে হয়েছে, আলো-হাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে। তাও আগের মতো ভাড়ায় পায়নি, টিনের ঘরেরই কুড়ি টাকা ভাড়া। নতুন পাড়ায় গিয়ে অপর্ণাকে—যা এত দুঃখেও কখনও করেননি, রান্নার কাজ ধরতে হয়েছে।

প্রায় ন'মাস পরে ফিরেছে অবিনাশ নীরোগ হয়ে। তখনই কাজে যাওয়া সম্ভব নয়, ডাক্তারের নিষেধ ছিল। আড্ডা দেবার অবসর প্রচুর। কিন্তু এবার, ফিরে এসে একটা নতুন ব্যাপার দেখল, আড্ডার পথটা তার বন্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মতো। যে-সব বাড়িতে তার অবারিত দ্বার ছিল, ও গেলে যে-বাড়ির লোক খুশি হত, সে সব বাড়ির দ্বার ওর কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ বা শুধু কঠিন ও নিস্পৃহ থেকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ও অবাঞ্ছিত আগন্তুক, কেউ বা মুখেই বলে দিয়েছেন সোজাসুজি, আমাদের বাবা ছেলে-পুলের ঘর, তোমার রোগটা সম্পূর্ণ গেছে কি না তার কোন ঠিক নেই, তুমি

আর এস না এখানে।

নমিতাদের বাড়ি অবশ্য প্রথম প্রথম যাওয়ার চেষ্টাই করে নি অবিনাশ। সঙ্কোচ বোধ করেছে। এই অসুখের জন্যে, অবস্থার জন্যেও। আবার বস্তিঘরে যাওয়ার লজ্জা। সে এসে নিতান্ত অবুঝের, অবিবেচকের মতো মায়ের সঙ্গে রাগারাগিও করেছে এ নিয়ে। সে উষ্মার মূলেও নমিতাদের চিন্তাই ছিল, ওঁরা কী ভাবছেন না জানি, নমিতা ওকে কত হতদরিদ্র, কত সামান্য ভাবছে।

তারপর অবশ্য, কিছুদিন বিবেচনার সঙ্গে লড়াই করার পর গেছেও একদিন। নমিতা দেখা করেনি, কোথাও লুকিয়ে বসে ছিল হয়তো। নমিতার মা দেখা করেছেন, কথাও বলেছেন। আগের মতো আবদার করে অবিনাশ বলতে গেছে, কি মাসিমা চা-টা দিন। তার উত্তরে তিনি বিরস মুখে বলেছেন, কিসে চা দিই—সেই তো মুশকিল। এ সব কাপে দিলে উনি রাগ করবেন। চা-টা বাবা তুমি বাইরেই কোথাও খেও।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছেন, 'আর ছাখ বাবা, একটা কথা বলছি কিছু মনে ক'রো না। আমার মেয়ে বড় হয়েছে, পাঁচ জায়গায় বে-র সম্বন্ধ হচ্ছে। তুমি সোমত্থ ছেলে, যদি দিনরাত এখানে পড়ে থাক কি নিত্যি এস, একটা কথা উঠবে। এই তাই তোমার অসুখ নিয়ে কত কাণাঘুষো হয়েছে। তাছাড়া তোমার শরীর খারাপ, এখন একটু সাবধানে থাকা দরকার। এই বয়স—এখনও তো সারা জীবনটাই পড়ে আছে। নিয়মিত খাওয়া ঘুম দরকার। এমন ক'রে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো তোমার আর উচিত নয়। খাও দাও—ত্থ'পয়সা রোজগারের চেষ্টা কর। আর এমন হল্ল হল্ল করে ঘুরে বেড়িও না।'

খুবই শক্ত আঘাত।

ও যখন বাড়ি ফিরেছে ওর মুখের দিকে চেয়ে অপর্ণা আবারও ভয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। কিন্তু, বোধ করি অবিনাশের মনে এই ধরণের একটা আঘাতের কিছুটা প্রস্তুতি ছিল বলেই, শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছে। এমন রূঢ় কথা শুনতে হবে তা না ভাবলেও—ক'দিনের অভিজ্ঞতায়, শীতল অভ্যর্থনায় একটা আশঙ্কা ওর ছিলই।

সে সত্যিই উপার্জনের দিকে মন দিল এবার। বাইরে থেকে যেন নিজেকে

গুটিয়ে নিল খানিকটা। শুধু দু'চারজন পুরুষ বন্ধু ওকে ত্যাগ করে নি, তাদের সঙ্গেই অনেকটা মেলামেশা রইল। তবে সে যতটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হয়। বাড়িতে আর কারও যেত না অবিনাশ।

উপার্জনের চেষ্টা না দেখে উপায়ও ছিল না। বিপুল ঋণ মাথার উপর— ও আসতে কিছু ব্যয়ই বরং বেড়েছে। মনিবরা যে সাহায্যটা করতেন, ও ফিরে আসার পরও একমাস দিয়ে হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'আমাদের কাজ-কারবারের অবস্থা ভালো নয়, আর পেরে উঠছি না। তোমার জায়গায় লোক নিতে হয়েছে, তার টাকা তো পুরোই গুণতে হচ্ছে। তোমাকে এখানে আর নিতেও পারব না। তোমার এ শরীরে হাপরের সামনে বসে কাজ করাও উচিত হবে না। ডাক্তারেও বারণ করবে। তুমি অন্য কোন হালকা কাজ খুঁজে নাও।

অনেক ঘোরাঘুরি করে এক বন্ধুর সাহায্যেই খুঁজে একটা পেলও। আগের চেয়ে রোজগার কম, তবে বাঁধা মাইনের চাকরি। এক মনোহারী দোকানে কাজ। কাউণ্টারে মাল সরবরাহ করা, ক্রমাগত আলমারির পাল্লা ঠেলা আর অবিরাম ছুটোছুটি। মাইনে মাসে সত্তর টাকা। কাজটা খুব হালকা হল না, দশটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত খাটুনি, সন্ধ্যের সময় তো অমানুষিক পরিশ্রম হয়, কিন্তু উপায় কি? তবু এখানে এক-আধটু বিশ্রাম পায়, দুপুরের দিকে তেমন খদ্দের থাকে না, একটু ঝিমিয়েও নেয় এক আধ দিন। আর সবচেয়ে বড় সুবিধে যেটা আগুনের সামনে কাজ করতে হয় না। এর চেয়ে ভালো চাকরি তার পাবার কথাও নয়, এক কারখানার কাজ করলে পেতে পারত, কিন্তু সবাই নিষেধ করলেন।

একদিন, মাস-কাবারের মুখ সেটা, সারাদিন একটু নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পায়নি বলতে গেলে, রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, তখনও মুখ-হাত ধোওয়া হয়নি, অকস্মাৎ নমিতার বাবা বিশ্বনাথবাবু খুঁজে খুঁজে এসে হাজির। বাইরে থেকে, 'কালু, কালু ঘরে আছ?' ডাক শুনেই অবিনাশ লাফিয়ে উঠে বসল। বিশ্বাস হয় না যেন নিজের কানকেও। কিন্তু আবারও কানে এল বিশুবাবুর গলা, 'আচ্ছা, অবিনাশ দত্ত বলে এক ছোকরা এখানে থাকে কি না বলতে পারেন?'

আর অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। অবিনাশ প্রায় ছুটেই বাইরে এল।

'এ কি, মেসোমশাই আপনি হঠাৎ? এত রাত্রে? আরে, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? কারুর—কারুর অসুখ বিসুখ করে নি তো?'

শেষের প্রশ্নটা করার সময় গলা কেঁপে গেল অবিনাশের। আশঙ্কাটা যে কার অসুখের, লজ্জায় সে বলতে পারল না।

অবশ্য আশঙ্কার কিছু কারণও ছিল।

সত্যিই, বিশ্বনাথবাবুর যা চেহারা হয়েছে, উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টি, আলু-থালু বেশভূষা এবং রক্তবর্ণ চোখ, তাতে কোন বড় রকমের বিপদ ঘটেছে বলে ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। আর অসুখের চেয়ে বড় বিপদ অবিনাশ অন্তত কল্পনা করতে পারে না।

বিশুবাবু বললেন, 'অসুখ-বিসুখ করলে তো বাঁচতুম, যমের মুখে গেলে নিশ্চিন্তি, এত ভাবতে হত না। এমন লাঞ্ছনা অপমান মুখ পোড়বার ভয় থাকত না। আজ বাদে কাল বিয়ে, পাকা দেখা পর্যন্ত হয়ে গেছে, সামনের দশ তারিখে দিন স্থির, মেয়ে আমার দুপুর থেকে গা-ঢাকা দিয়েছেন। এক কাগজে লিখে রেখে গেছেন, আমাকে খুঁজো না, পাবে না। ও বিয়ে আমি করব না, আমার মন অন্যত্র বাঁধা।'

আড়ষ্ট বিবর্ণ হয়ে যায় যেন অবিনাশ। একই সঙ্গে আশঙ্কা আর আশায় বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। চেষ্টা করেও কোন কথা বলতে পারে না। আশা, যে-অন্যত্র তার মন বাঁধা পড়েছে সেখানে অবিনাশ কাছে কি না। খুবই সুদূর আশা, তবু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় কই?

বেশ কিছুটা পরে স্খলিত কণ্ঠে বলে, 'কে, নমিতা? নমিতার কথা বলছেন?'

'আবার কার কথা বলব আমি, রামী ঝিয়ের কথা!' বিরক্ত হয়ে ওঠেন বিশুবাবু ওর নির্বুদ্ধিতায়, 'আমার আর বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ক'টা আছে?'

বিপদের সময় এ ধরণের অনাবশ্যক নির্বোধ প্রশ্ন কারুরই ভালো লাগবার কথা নয়।

অবিনাশ বলল, 'নমিতার বিয়ে? কৈ, আমি শুনিনি তো!'

'তোমাকে আগে শোনাতে হবে—এমন তুমি কে আমার মাসীর মা'র কুটুম ?' এই কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন বিশুবাবু, বললেন, 'তোমার এখনই শোনবার তো কথা নয়। মানে এখন। বিয়ের সময় কি আর নেমন্তন্ন করতুম না, ঠিকই করতুম। বিয়ে-থার ব্যাপার—বাগড়া একটা পড়লেই হল। আগে থেকে কে আর চাউর করে বলো। কোন্ দিক থেকে ভাঙচি পড়ে তার ঠিক কি !'

'তা, মানে অন্য কোথায় মন বাঁধা না কি লিখেছে—সেটা কোথায়—মানে অন্য কাউকে ভালো-টালো বাসত কি না—জানেন কিছু ?'

প্রশ্নটা করতে গিয়ে শব্দগুলো গলায় যেন জড়িয়ে যায়। আবারও বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করতে থাকে।

বিশুবাবু আর একবার খিঁচিয়ে ওঠেন, 'যমের সঙ্গে বাঁধা আছে ! বাঁধনটা গলায় দিয়ে ঝুলত তো বাঁচতুম। কে কি বিত্তেন্ত, কোন্ প্রাণের ইয়ার আছে তা আমি কি করে জানব বল, আমাকে বলে কয়ে জানিয়ে কি আর পিরীত করবে !···বাপ বেটা কে, জোগাবার যন্তর বই তো কিছু নয়।'

তারপর খানিক থেমে ওরই মধ্যে একটু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি তো এর বিন্দুবিসগ্‌গ জানি না। সন্ধ্যেবেলা আমাকে খবর পাঠালে তোমার মাসিমা, সেই থেকেই তো এই পাগলের মতো ছুটোছুটি, করছি। পুলিশে কি মিসিং স্কোয়াডে খবর দিতে পারছি না—তা হলে আর লোক-জানাজানি ঢিঢিক্কারের কিছু বাকী থাকবে না। তখন কি ও মেয়ের আর বে হবে ?··· যা পারব নিজেদেরই করতে হবে। তোমার মাসিমাও তো তেমনি, কোন খবরই রাখে না। আমার যে হয়েছে এক ন্যাকা মেয়েমানুষকে নিয়ে ঘর করা ! নাকের সামনে মেয়ে একজনের সঙ্গে পীরিত করছে, উনি চোখে দেখেও বোঝেন নি কিছু ! অনেক কাণ্ড করে অনেক দোর ঘুরে যা খবর পেলুম, ঐ যে টগর ছোঁড়াটা আছে—তার সঙ্গেই না কি এদান্তে ওর খুব মাখামাখি হয়েছিল। তোমার মাসীমার গা ধোওয়া, রান্না করার সময় প্রত্যহ এসে বসে থাকত। বিকেল থেকে সেও না-কি উধাও হয়েছে। তার বাড়িতেও গেছলুম, তার এসব কোন খবরই রাখে না, তারা জানে তাদের দুধের ছেলে—তারা ভেবেই অস্থির গাড়ি চাপা পড়ল কি না !···'

আর একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, 'এখন সেই জন্যেই তোমার কাছে

ছুটে এসেছি। তোমাদের আগের বাড়ির সামনেই তো থাকে, তোমার সঙ্গে না কি খুব বন্ধুত্বও ছিল—তোমার মাসিমা বললেন। ছাখ দিকি সে কোথায় যেতে পারে, কোথায় উঠতে পারে—কোথায় কোথায় তার ঘাঁটি, কিছু হদিশ দিতে পারো কি না।'

আশার অতীত আশা, মনের মধ্যে যে অস্পষ্ট আব্ছা তুরাশা সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল কোথাও নেই, তবু একটা ছোট্ট আঘাত লাগে বৈ কি।

তবে তাকে আমল দেয় না অবিনাশ। তখনই ঘরে ঢুকে জামাটা টেনে গায়ে দিতে দিতে বেরিয়ে আসে আবার, 'চলুন তো দেখি, কতকগুলো আড্ডা আমার অবিশ্যি জানা আছে, দেখি কোন পাত্তা পাওয়া যায় কি না।'

বিশুবাবু ঘাড় নাড়লেন! 'তু'জনে এক জায়গায় গিয়ে লাভ নেই, তুমি তোমার মতো সন্ধান কর, খোঁজ পেলে জানিও। আমি একবার বোঁ করে স্যালদাটা ঘুরে আসি। রাত পৌনে এগারোটায় একটা গাড়ি ছেড়ে ভাগল-পুর যায়। শুনলুম ভাগলপুরে কে ওর এক বন্ধু থাকে, নতুন বে হয়েছে, সেখানেও গিয়ে উঠতে পারে।'

অবিনাশের যে অবস্থা ভালো নয়, ছুটোছুটি করতে গেলে যে কিছু খরচ পড়ে সে কথাটা এই তুঃসময়ে মনে পড়ার কথা নয় বিশুবাবুর, পড়লও না। ফলে ক্লান্ত অভুক্ত অবিনাশ যখন রাত তিনটের সময় ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি ফিরল তখন তার সত্ত-মাইনে-পাওয়া সত্তর টাকার মধ্যে বাইশটি টাকা খতম হয়ে গেছে। তখন আর ক্ষিদে কি খাওয়ার ইচ্ছে থাকার কথা নয়। মা বকাবকি করতে করতে উঠে কাগজ জ্বেলে একটু চা করে দিলেন, একখানা বিস্কুট দিয়ে তাই খেয়েই শুয়ে পড়ল অবিনাশ।

পরের দিন সকালেও কিছু খাবার সময় হল না। খবর পাওয়া গেছে ক'দিন থেকে বহরমপুরের কে এক বন্ধুর সঙ্গে টগরের খুব চিঠি চালাচালি হচ্ছে, সেখানেই নিশ্চয় গেছে ওরা। সকাল সাতটায় বাস ছাড়ে এসপ্ল্যানেড থেকে, এখনই না বেরোলে সে বাস ধরা সম্ভব নয়। মা খুব জেদ করাতে কোন মতে একখানা বাসি রুটি চা দিয়ে গিলে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ভুলো একটু রাগারাগি করতে গিয়েছিল তাকে ধমক দিয়ে উঠল, 'কী বলছিস! স্কাউণ্ড্রেলটাকে শিক্ষা দিতে হবে না। ভদ্রলোকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে—। তা ছাড়া মানুষের এই বিপদ দেখেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব! তবে আর

মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন!'

'তোমার নিজের বিপদ কে দেখে তার ঠিক নেই, তুমি যাচ্ছ অপরের বিপদ দেখতে!···তোমার এই শরীর, তার ওপর নতুন চাকরি, তারাই বা কি মনে করবে, রাগ করবে হয়তো—এই অনিয়ম করে যদি আবার পড়, কে দেখবে তাই শুনি, না কি চাকরিই থাকবে।'

'দ্যাখ ভুলো, এমনি ভাবে অত হিসেব ক'রে যদি শরীর রাখতে হয়, সে শরীর না থাকাই ভালো। অমন ভাবে একলষেঁড়ের মতো বাঁচতে আমি চাই না। আর চাকরি? যায় আর একটা খুঁজে নিতে পারব। এ চাকরি কে খুঁজে দিছল? এও তো আমিই যোগাড় করেছি।'

তবু ভুলো বলতে গেল, 'তারা কি তোমার ওপরই ভরসা করে বসে আছে! তুমি যা খবর রাখ তার থেকে ঢের বেশী খবর ওরা বার করতে পারবে। ওরাই খুঁজে বার করবে। কৈ আর তো কোন খবরও নিল না রাত্রে, হয়ত খোঁজ পেয়েই গেছে দ্যাখগে।'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় ছিল না অবিনাশের। ভুলোর কথা শেষ হবার অনেক আগেই সে বেরিয়ে গেছে।

তারপর বহরমপুর, সেখান থেকে কোন্ সূত্র ধরে মালদা, পূর্ণিয়া ঘুরে—হতাশ ও কপর্দকশূন্য হয়ে—অধিকন্তু এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু কর্জ করে অবিনাশ যখন ফিরল তখন নমিতা বাড়ি ফিরে পুরনো হয়ে গেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ের বাজার করে বেড়াচ্ছেন বিশুবাবু, নেমন্তন্ন চিঠিও ছাড়া হয়ে গেছে. এবং বলা বাহুল্য যে অবিনাশের নামে কোন চিঠি আসেনি।

তিক্তমধুর কণ্ঠে সংবাদগুলি দিয়ে ভুলো বলল, 'পরশুর পরের দিন বিয়ে। ম্যারাপ বাঁধা হয়ে গেছে। শুনছি খুব ঘটা হবে। মাইক-টাইক নয়—ভালো রসুনচৌকী বসবে। অবিশ্যি এ সব তো তুমি জানই। তুমি এত আপনার লোক তাদের।' আবারও একটা বিদ্রূপের হাসি হাসল ভুলো।

ক'দিনের অনিয়মে অনাহারে আর পরিশ্রমে এমনিতেই মুখ কালি হয়ে গিয়েছিল অবিনাশের, এখন তার ওপরে কে যেন খানিকটা আলকাতরা লেপে দিল। অনেকক্ষণ একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোল না তার। তারপর কোন-মতে যেন বাইরে কোথাও থেকে কণ্ঠস্বর খুঁজে কুড়িয়ে এনে প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে পাওয়া গেল কিছু জানিস?'

'জানি বৈকি। এই কলকাতাতেই—যাদবপুরের কোন্ এক কলোনিতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। ইচ্ছা ছিল ওখান থেকে কিছু টাকা যোগাড় করে বোম্বেতে পালাবে। কিন্তু টগরের তো ট্যাঁক ঢুঁ ঢুঁ—নমিতারই গয়না বেচে টাকা যোগাড় করবে এই মতলব ছিল। কিন্তু গয়না চাইতেই নমিতার মাথা গরম হয়ে গেল—সেই রাত্তিরে ঝগড়া, ব্যস পরের দিন টগর হাওয়া। বিশুবাবু পুলিশে খবর দিয়েছেন শুনে আরও ঠাণ্ডা মেরে গেছে তখন—টগরই টেলিফোন করে ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছিল বোধ হয়—মোদ্দা টেলিফোনে খবর পেয়েই বিশুবাবু গিয়ে নিয়ে এসেছেন, তার পরের দিনই। মানে তুমি তখনও বহরমপুর পৌঁছও নি—মেয়ে এসে বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

আরও একবার মিষ্টি করে হাসল ভুলো।···

আর কিছু করবার ছিল না।

তবে শোনার আরও কিছু বাকী ছিল।

যে দোকানে অবিনাশ কাজ করত, তাঁরা ক'দিন ওর খোঁজ করতে এসে ফিরে গেছেন। গতকালও একজন এসেছিল। সে বলে গেছে যে আর কষ্ট করে ওর যাবার দরকার নেই, তারা অন্য লোক রেখে দিয়েছে।···

তারপর ?

তারপরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। এবার ঘরের দিকে একটু নজর পড়ল অবিনাশের। না পড়ে উপায়ও ছিল না। গত সপ্তাহে রেশন তোলা যায়নি। ঘরে একদানা চাল নেই, বাজার থেকে ব্ল্যাকে একসের আটা এনে চলছে। মা একবেলা ছাতু খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। পাওনাদার খুবলে খাচ্ছে তাকে আর ভুলোকে।

অগত্যা পরের দিনই অবসন্ন দেহকে প্রায় চাবুক মেরে তুলে বেরোতে হ'ল কাজের খোঁজে।

আবারও সেই টো-টো করে ঘোরা। দিন পনেরো পরে একদিন ফিরল জ্বর নিয়ে। ঘুষঘুষে জ্বর। তার সঙ্গে কাশি। ডাক্তার দেখানোর সামর্থ্য ছিল না, সাত দিন এমনিই পড়ে রইল। তার পরই রক্ত বেরোতে শুরু হল মুখ দিয়ে—তাজা রক্ত।

এবার ভুলোকেই উদ্যোগ করে রিকশা ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে

হল। তিন চার দিন ঘোরাঘুরি করার পর খবর পাওয়া গেল—যক্ষ্মাই, একটা লাংএ অনেকখানি ক্যাভিটি। ফুসফুসের যে দিকটায় ঘা হয়েছে তার পাশেই একটা মেন আর্টারী—সেই জন্যেই এত রক্ত পড়ছে। অবস্থা একেবারে খারাপ নয়—তবে এখনই হাসপাতালে পাঠানো দরকার। ঘরে রেখে কি চিকিৎসা করাতে পারবেন? আমরা এখান থেকে যা ওষুধ দেব, তা যথেষ্ট নয়। ইঞ্জেকশ্যন দেওয়া দরকার অবিলম্বে।

ডাক্তার বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই কথাগুলো বললেন।

আবার অপর্ণা জনে জনে কেঁদে পড়লেন পাড়ার লোকের কাছে। পুরনো মনিবের কাছেও গেলেন। বিশুবাবুকেও গিয়ে বললেন। পুরনো মনিবরা দশ টাকা আর বিশুবাবু পাঁচটি টাকা দিলেন। এর থেকে বেশী কিছু করা তাঁদের সাধ্যাতীত। বিশুবাবু সন্থ মেয়ের বিয়ের দোহাই দিলেন।

কিন্তু হাসপাতালে পাঠাবার কোন ব্যবস্থাই করা গেল না এবার।

এখনও করা যায়নি। তেমনই পড়ে আছে বিছানায়। এখনও আউট-ডোরে নিয়ে যাওয়া চলছে, দু'দিন পর হয়তো তাও চলবে না। রোগী উঠতেই পারবে না বিছানা থেকে।

সঞ্জীবনী

ফুলশয্যার পরের দিন সকালবেলাই মলয় তার মাকে ডেকে বলেছিল, 'মা—এ কী করলে মা! শুধু রূপ দেখে ভুললে? এ যে একেবারে মুখ্খু। একে নিয়ে আমি কি করব! আমার যে অনেক আশা মা।'

মা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তাতে কি হয়েছে বাবা, তুই শিখিয়ে পড়িয়ে নে না। তোর তো অভাব নেই, একটা মেম মাস্টারনী রেখে দে না হয়।'

অনেক আশা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, মলয়ের আশা তা নয়। মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা ওর। বাবা খান-চারেক ভাড়াটে বাড়ি রেখে গেছেন, তাতে ছোট একখানা গাড়ি এবং কিছু চাকরবাকর রেখেও চলে যায়। সুতরাং ভাল চাকরি করবে—এরকম কোন প্রয়োজন বা মতলব মলয়ের ছিল না।

ওর আশা—ও সাহেবীয়ানা করবে। ইংরেজদের ক্লাবের সভ্য হবে, লাট সাহেবের সঙ্গে খানা খাবে—কলকাতায় যে একটি বিশিষ্ট জাত-দেশহীন সমাজ আছে—তারই মধ্যে সবার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। এমন সময় এ কি কাণ্ড!

ফোটো দেখেছিল মলয়। সম্বন্ধ এনেছিলেন ধনী মামা—এক মাত্র এঁকেই ভয় করে সে—সুতরাং বেশী খোঁজ-খবর করবার অবসর পায় নি। শুধু আশা করেছিল যে মেয়েটি কিছু অন্তত লেখাপড়া জানবে। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে আলাপ করতে গিয়ে একেবারে দমে গেল। এ যে কিছুই জানে না। এতই হতাশ হ'ল মলয় যে বাকী রাতটুকু আর একটাও বাক্যালাপ করল না বৌয়ের সঙ্গে এবং তপতীও ব্যাপারটা কী হ'ল তা বুঝতে না পেরে সহস্র কল্পিত আশঙ্কায় কণ্টকিত হ'য়ে বিনিদ্র কাটিয়ে দিল।...

মলয় মার পরামর্শই গ্রহণ করেছিল।

পরের দিনই সে ইংরেজী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেম গভর্নেস ঠিক করলে। বিলিতি নাচের ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে এবং বিলিতি খানা কি করে খেতে হয়—নিজেই টেবিলে বসে খাবার সময় সে পাঠ দিতে লাগল প্রত্যহ।

অবশ্য ক্ষেত্র অনুর্বরা হ'লে ঠিক কী হ'ত তা বলা কঠিন—কিন্তু তপতীর ক্ষেত্রে সেদিকে সুবিধা ছিল খুব। শীঘ্রই দেখা গেল—তপতীর মেধা অসাধারণ। সে যে ছেলেবেলায় লেখাপড়া শেখেনি, চাড় ক'রে কেউ শেখায় নি ব'লেই। কয়েক মাসের ভেতরেই সে একেবারে পাকা বিলিতি সুরে 'ও মাই—!' 'ইউ নটি, নটি বয়!' ইত্যাদি বলতে শিখল, বিলিতি গান ও নাচেও পোক্ত হয়ে উঠল—এবং রাশি রাশি ইংরেজী থ্রিলার পড়তে শুরু ক'রে দিল।

কিন্তু তপতী এখানেও থামল না। সে নিজে চাড় ক'রে ওস্তাদ রেখে দিশী গান শিখতে শুরু করলে। উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় নাচও কিছু কিছু আয়ত্ত করলে। মলয়কে বুঝিয়ে দিলে দেশী প্রথার নাচগানকে বিলিতি মজলিশে বার করাই হ'ল হাল ফ্যাসানের কালচারের প্রধান লক্ষণ। মলয়ের সাধ মিটল। ইতিমধ্যে ওর মাও একদিন মারা গেলেন। যেটুকু বাধা ছিল তাও গেল। মনের আশা মিটিয়ে আধুনিকতা করতে লাগল সে।

মার জন্য একটা শখ মলয় মেটাতে পারে নি এতকাল—সেটা হচ্ছে মদ্য

পান। মলয় বাইরে বাইরে বহুদিনই শুরু করেছিল কিন্তু ঘরে সেটা চলে নি। এইবার একদিন সে সকালে নিজে গিয়ে ভাল বিলিতি মদ কিনে নিয়ে এল। এবং যথারীতি লাঞ্চ্-এর টেবিলে পরিবেশন করবার হুকুম দিল।

তপতী প্রথমটা প্রবল আপত্তি করেছিল, 'ছি ছি! এ কী কাণ্ড তোমার! নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বসে মদ খাবে?'

মলয় রসিকতা ক'রে বলেছিল, 'তবে কী পরস্ত্রীর সঙ্গে মদ খাবো! তুমি সইতে পারবে?'

'না না—ঠাট্টা নয়। ভদ্রলোকের মেয়ে শেষে মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াবো?'

'মদ খেলেই মাতাল হয় এমন কথা কে বলেছে? আমি তো আজ তিন বছর খাচ্ছি। কৈ, মাতাল ত হইনি!'

'তোমার কথা আলাদা। আমার রক্তে য়্যালকোহল আছে। আমার ঠাকুর্দা তিন লাখ্ টাকা আয়ের জমিদারী উড়িয়ে দিয়েছিলেন মদ খেয়ে। আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন লিভারে ঘা হয়ে। সেও মদ খাওয়ারই ফল। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমাকে মদ ধরিও না।'

'ও-সব বাজে কুসংস্কার রাখ দিকি। ছোট্ট এক পেগ ক'রে খেও শুধু—আমাকে একটু সঙ্গ দেবার মতো!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তপতী বলেছিল, 'দাও। কিন্তু কাজটা ভাল করলে না।'

সে মাত্র সাত বছরের কথা। কিন্তু এর ভেতরই তপতীর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। এই সাতটা বছর ধরে তপতী শুধু এক-একটা ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে নেমেই এসেছে—কোথাও কোন মতে উঠতে পারে নি।

অবশ্য একেবারে উঠতে পারে নি বললে মিছে কথা বলা হবে হয়ত। উন্নতি হয়েছিল একটা দিকে।

মলয়ের বন্ধুবান্ধবরা—ওর ভাষায় ওর সমাজের লোকেরা—ঠিক করলে কোন একটা বন্যা বা ঐরকম একটা কিছু দুর্ঘটনা উপলক্ষ ক'রে একটা অভিনয় করবে। আপাতত নাটকটা রিহার্স্যাল দিয়ে রাখা যাক—দুর্ঘটনার অভাব হবে না। নাটকও ঠিক হ'ল। এইবার অনুরোধ এল মলয় আর তপতীকে অভিনয়ে নামতে হবে।

তপতী প্রথমটা রাজী হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মলয়ের আগ্রহে যখন রাজী হ'ল তখন দেখা গেল তারই চাড় বেশি। আসলে উচ্চ মধ্যবিত্তের এই

কর্মহীন জীবনে তার তখন অরুচি ধরে গেছে। তবু রিহার্স্যালেও ততটা বোঝা যায়নি—যথাসময়ে অভিনয়ে গিয়ে দেখা গেল যে নাচে গানে অভিনয়ে তপতী অসাধারণ। সকলের মুখেই তার প্রশংসা। মেয়েদের চোখে ঈর্ষা ও পুরুষের চোখে স্তুতি—তপতীকে সাফল্যের নেশা লাগিয়ে দিল। সে সেই রাত্রেই পরের অভিনয়ের তারিখ ঠিক ক'রে ফেলল।

এইবার তার জীবন নতুন গতিপথ খুঁজে পেলে। এক বড় ফিল্ম কোম্পানীর মালিক এসে চেক আর কনট্রাক্ট ফর্ম ফেলে দিলেন। তাঁদের আগামী আকর্ষণে নায়িকার ভূমিকায় নামতে হবে। তাঁরা এর আগের অভিনয়ে ফ্ল্যাশ ফোটো নিয়েছিলেন, সে ফোটো খুব ভাল উঠেছে। ছবি ভালই হবে তাঁরা আশা করেন। চেক্-এ অঙ্ক বসানো নেই—তপতী যে-কোন টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারে।

তপতীর চোখ জ্বলে উঠল—সেই সঙ্গে মলয়েরও। তপতী শর্ত করল মলয়কেও কোন ভূমিকা দিতে হবে। প্রযোজক যিনি—তিনি আরও একটু বেশী ক'রে সুবিধা দিলেন, বললেন,—'বেশ তো অভিনয় উনি করুন। আর সেই সঙ্গে আমাদের ডিরেক্টারকেও য্যাসিস্ট্ করুন না। ও কাজটা শিখে গেলে আর ভাবনা কি ?'

মলয় সাগ্রহে রাজী হ'ল। শুধু-সাহেবীয়ানাতে ওরও একটু একটু অরুচি ধরে আসছিল বোধহয়।

তপতীর প্রথম ছবিই—ছবিও'লাদের ভাষায়—হিট্ করলে। সাফল্যের নেশায় তপতী মেতে উঠল।

এক সঙ্গে একদিনে তিনটে কোম্পানির সঙ্গে কনট্রাক্ট করল। তার ভেতর একটিতে মাত্র মলয় রইল—বাকি দুটোতে শুধুই তপতী।

মলয় মৃদু আপত্তি তুলেছিল বৈ কি!

'ইউ আর গোয়িং টু ফাস্ট, মাই ডিয়ার!'

ঈষৎ সুরারক্ত দুটি চোখ স্বামীর মুখের ওপর মেলে, একটু বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে তপতী প্রশ্ন করেছিল, 'আর ইউ গেটিং জেলাস—ডার্লিং ?'

'অফ্ কোর্স নট!' জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল মলয়, 'আই য়্যাম্ ওনলি থিঙ্কিং অফ্ ইউ!'

'ডোণ্ট ট্রাবল ইওর ব্রেন আননেসেশারিলি, আই ক্যান ওয়েল্ টেক্

কেয়ার অফ্ মাইসেল্ফ !' আর একটু হেসেছিল তপতী।

মলয়ের মুখ আগুনের মতোই রাঙা হয়ে উঠেছিল কিন্তু প্রতিবাদের কোন ভাষা খুঁজে পায় নি।

এরপর একটু একটু ক'রে কিন্তু সত্যিই তপতী দূরে সরে যেতে লাগল।

প্রতিদিনই শুটিং থাকে ওর—সারাদিন কাজ করে কিন্তু তারপরও সে বাড়ি আসে না। ওখান থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলের কোন ক্যাবারেতে গিয়ে মদ খায় আর জুয়া খেলে। বাড়ি ফেরে রাত তিনটে চারটেয়—কোন কোন দিন একেবারেই ঘুমোয় না। মলয়ের সঙ্গে দেখাই হয় না। মলয় যখন ওঠে তখন তপতীর ঘুমের শুরু। দশটা নাগাদ উঠেই সে স্টুডিও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। ড্রেসিং টেবিলের ধারে গিয়ে প্রসাধনরত স্ত্রীর নাগাল ধরতে হয় মলয়ের। তাও তপতীর মেজাজ থাকে তখন খারাপ। আর একটু মদ পেটে না পড়লে মাথা-ধরা ছাড়ে না।

মলয় মিনতি করে, 'কী করছ বুলবুল, এসব ছাড়ো। শরীর যে গেল ?'

'শরীর রেখে কি লাভ বলতে পারো ?' চোখের পাতা আঁকতে আঁকতে বলে তপতী, 'যতদিন আছে ততদিন ব্যবহার ক'রে নেওয়াই ভাল।'

'কিন্তু এ যে অপব্যবহার।'

'কি জানি। এর চেয়ে ভাল ব্যবহার তো কখনও শিখিনি। তুমি তো শেখাওনি ! লিভ্ ফাস্ট—এই কি তোমার শিক্ষা ছিল না ?'

'কখনও না। একটু আধটু—এটা ওটা। সে হ'ল শখ-মেটানো ! কিন্তু তাই ব'লে আমি কি ক্যাবারেতে গিয়ে মদ খেতে আর জুয়া খেলতে বলেছি ?'

'গাছ যখন পোঁতা হয় ঠাকুর মশাই, তা সামান্যই থাকে। ঐ একটু আধটু—কিন্তু তা ক্রমে বাড়ে। মহীরুহে পরিণত হয়। বিষবৃক্ষের বেলাতেও তাই খাটে। তুমি যে সাহিত্য পড় নি, কাকে বোঝাবো। বঙ্কিমের বই পড়লে বুঝতে !...হাউ এভার, এর ফাণ্ডামেণ্টাল কথাটা বোঝবার মতো সহজ জ্ঞান আশা করি তোমারও আছে। সেটা কি ভেবে গ্যাখোনি ?'

'বুলবুল—চলো কোন দূরদেশে কোথাও যাই।'

'ছ-টা কনট্রাক্ট ডিয়ারী, তাছাড়া নিউ এম্পায়ারে তিনটে দিন নিয়েছি—কিছু টাকা তুলতে হবে। গত সপ্তাহে খুব হেভিলি হেরেছি। দেনা হয়ে গিয়েছে। টাকা চাই। রেডিওতে ছুটো প্লে আছে। সময় কোথা ?'

'আমি কি আজই যেতে বলছি! বেশ, এই কটা সেরে নাও। আর নতুন কনট্রাক্ট নিও না।'

'পাগল! এইবেলা সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে। ভাঁটা পড়বার আগে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট নিয়ে নিতে হবে। আউট অফ সাইট ইজ আউট অফ মাইণ্ড!'

রাগে ঠোঁট কামড়ায় মলয়। হাত মুঠো করে। কিন্তু জোর করতে পারে না। জোরের বাইরে চলে গেছে তপতী। আজ আর মলয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় না তাকে। তাছাড়া সেভাবে প্রথম থেকে চলেও নি মলয়। আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

তপতী সবই যে নিজে খরচ করে তা নয়। বাইশহাজার টাকা দিয়ে একখানা হাল মডেলের গাড়ি উপহার দিয়েছে সে স্বামীকে—জন্মদিনের উপহার হিসেবে। আর এক জন্মদিনে দিয়েছে দশহাজার টাকা দিয়ে পুরীর সমুদ্রতীরে এক বাড়ি। সংসারেও মধ্যে মধ্যে পাঁচ-সাতশ টাকা দেয়। কিন্তু তা আয়ের তুলনায় কমই। ব্যাঙ্কে একটা হিসেব আছে—তবে সেখানে জমে না এক পয়সাও; সেটা মলয় ভাল ক'রেই জানে।

মলয়ের ভাল লাগে না কিছু। নিজের বাড়ি মনে হয় হোটেলের চেয়েও নির্বান্ধব স্থান। চাকর-বাকররা যেটুকু করে—তাই। পুরোনো চাকর আর নেই। নতুন চাকরদের মায়া কম—দুহাতে চুরি করে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তিনচার দিন অন্তর। অবশেষে একদিন প্রকাশ্যেই রাগারাগি হয়ে গেল। তপতী ওর নিজস্ব মালপত্র নিয়ে সাহেব-পাড়ার একটা হোটেলে চলে গেল। মলয় তাকে ধরে রাখবার বা ফেরাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে না। বরং তার ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল সে বেঁচে গেল। সেও মালপত্র কিছু বেচে, কিছু একটা ঘরে গুদাম ক'রে রেখে, মোটা টাকায় বাড়িটা ভাড়া দিলে এবং নিজে গিয়ে উঠল ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। ফুলের মালা, শঙ্খ, উলুধ্বনি এবং সানাইয়ের বাঁশীতে যার সূচনা হয়েছিল সেই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল মুটে ও লরির কলরবে। বিদায়ের দিন কেউ কারুর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না।

জোয়ার বেশী দিন থাকে না। এই সাত বছরেই ভাঁটা পড়ে যায়। তবে সেটা কালের দোষ নয়—সে দোষ তপতীরই। আজকাল দিনরাতই সে মদে

চুর্ হয়ে থাকে। প্রযোজকরা 'সেট' সাজিয়ে বসে থাকেন, নায়িকার দেখা মেলে না। দেখা মিললেও এমন অবস্থায় মেলে যে তাকে দিয়ে কাজ হয় না। হাজার হাজার টাকা লোকসান হয়। শুধু স্টুডিও কি সেট-এর ভাড়া নয়—অপরাপর অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও খেসারত দিতে হয়। ছবির কাজ পেছিয়ে পেছিয়ে যায়, অনির্দিষ্ট কালের ধাক্কায় গিয়ে পড়ে। ভাল অভিনেতারা তারিখ দিতে চান না আর। ওর নাম থাকলে ডিস্ট্রিবিউটাররা টাকা দাদন দিতে চান না। যে নাম ছিল একদা চিত্রজগতের আকর্ষণ—তা হয়ে উঠল দায়।

কিন্তু চাঁদ অস্ত গেলেই বুঝি সূর্য ওঠে—প্রকৃতির নিয়ম। তপতীর ভাগ্যে যখন ভাঁটা পড়ছে মলয়ের ভাগ্যে তখনই জাগছে জোয়ার। মলয় এর আগে ছবি তুলেছিল—নাম হয়নি। ওদিকে ওর ঝোঁকও ছিল না। মোটকথা কিছুই করেনি এতকাল ; শুধু টুকিটাকি বাজে কাজ ছাড়া। তপতীর সঙ্গে বিচ্ছেদ (আর সেই বিচ্ছেদের আড়ালে যে অপমান ছিল হয়ত বা—তাও) ওর মনে অদ্ভুত একটা কর্মপ্রেরণা এনে দিলে। কাজের মধ্যেই ভুলতে চাইল নিজের কৃতকর্মের ফল। কাজ করতে চায় সে। কিন্তু কি করবে ? কোন কাজই জানা নেই। এমনি সময় হঠাৎ এল এক ফিল্ম কোম্পানী, ছবি পরিচালনার ভার দিতে চাইল ওকে—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে।

রাজী হ'ল মলয়।

এই রাজী হওয়াটা ওর নিজের কাছেই লাগল বিচিত্র।

তিক্ততা ছিল মনে, স্টুডিওর সমস্ত জগৎটা সম্বন্ধেই ছিল ঘৃণা। হয়ত ছিল—তবু, কাজ যে তখন ওর চাই-ই। যা হয় একটা কিছু করতে হবে ওকে। নিষ্ক্রিয়তা যে আরও অসম্ভব। শুধু সেই কারণেই হয়ত সে রাজী হ'ল এবং সমস্ত মন দিয়ে খাটতে লাগল দিনরাত।

চিত্রনাট্য যা হাতে এসেছিল তা বারবার পড়ে এবং অনেক ভেবে—আগাগোড়া ঢেলে সাজাল। সহজ ক'রে বলতে হবে এবং মানুষের উপভোগ করার মত ক'রে বলতে হবে—এটা মলয় বুঝেছিল। তারপর সে আর এক অসমসাহসিক কাজ ক'রে বসল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের ডেকে মোটামুটি একটা রিহার্স্যাল দিয়ে নিলে। এটা কোন চিত্রপ্রতিষ্ঠানই আজকাল আর করেন না—রিহার্স্যাল হয় একেবারে ক্যামেরার সামনে। মহাজন এই বাড়তি-

খরচের জন্য একটু আপত্তি করেছিলেন কিন্তু মলয় তাকে বুঝিয়েছিল যে এতে শেষ পর্যন্ত খরচ কমই হবে। সেট-এ পৌঁছে অনেক কম সময় লাগবে। মলয় যা ভূতের মত পরিশ্রম করেছিল তা দেখে একটু নরম হয়েছিলেন প্রযোজক। তিনি আর আপত্তি করলেন না।

দ্রুত ছবি উঠল। মলয় যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল কাজে। আহার-নিদ্রা জ্ঞান ছিল না ওর। দিনরাত খাটতে পারলেই সে বাঁচে। ফলে ছবি ভালই দাঁড়াল। কাগজওয়ালারা সাধারণত ভাল ছবি হ'লেও অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে চান না—তাঁরা কিছু কিছু ত্রুটি দেখালেন কিন্তু দর্শকদের প্রশংসা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে ছবি 'হিট' করল, প্রযোজক আশাতিরিক্ত টাকা পেলেন। এই ছবি খোলবার পনেরোদিনের মধ্যে মলয় মোটা টাকা পারিশ্রমিকের অঙ্গীকারে এবং বেশ মোটা রকমের কিছু অগ্রিম নিয়ে দুটি নতুন ছবির চুক্তিপত্রে সই করলে।

এরপর শুরু হল ওর জয়যাত্রা। একটার পর একটা ছবি ক'রে চলল মলয়; সবগুলিই অবশ্য 'হিট' করল না কিন্তু লোকসান হ'ল না কোনটাতেই। ফলে প্রযোজক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ওকে নিয়ে। বোম্বে মাদ্রাজেও ডাক পড়ল।

কিন্তু একটানা কাজেও মনের শূন্যতা ভরে না। ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ ক'রে যখন জনহীন ফ্ল্যাটে ফিরে আসে তখন একটা অজানা অবসাদে মন যেন ভেঙে পড়ে। দেহ চায় কার কোমল হাতের সেবা, কান চায় কিছু চটুল হাসির শব্দ শুনতে, কিছু অর্থহীন মিষ্ট প্রলাপ। টেবিলের উপর গরম টিফিনক্যারিয়ারে খাবার থাকে—অর্ধেক দিন তা খাওয়াই হয় না। চাকররা ঘুমে অচেতন—তাদের কি গরজ মনিবকে জোর ক'রে খাওয়াবার?

অথচ আশ্চর্য! এ শূন্যতাবোধ ত এতকাল ছিল না। যখন সেবা অযাচিত ভাবে আসত, তখন এই ভৃত্যরাজক-তন্ত্রই যেন ছিল কাম্য। মনে হ'ত এই জীবনই আসল জীবন। এই হ'ল ঠিক বেঁচে থাকা। গৃহগত-প্রাণ লোকগুলোর জীবন সঙ্কুচিত, ব্যাহত। ওরা জীবন্মৃত। ওদের করুণার চোখে দেখত মলয় এতদিন।

আজ কিন্তু এসব জীবন যেন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন মনে হয়!

আলমারিতে মদের বোতল সাজানো থাকে। মলয় আর স্পর্শ করে না। লাঞ্চের সময় তার বহুদিন আগেকার খাওয়া ঘি-মাখা ভাতের সঙ্গে মোচার ঘণ্টর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মার হাতের এটা-ওটা, প্রায়-ভুলে-যাওয়া ব্যঞ্জনের কথা।

দীর্ঘশ্বাস চেপে খেতে খেতেই উঠে পড়ে মলয়। অর্ধেক কোর্স তখনও বাকী থাকে। চাকররা প্রশ্নও করে না। মলয় আবার দ্বিগুণ জোরে কাজে হাত দেয়। কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে।

এই যখন মনের অবস্থা হঠাৎ একদিন বোম্বে থেকে ট্রেনে ফিরতে হ'ল ওকে। এয়ার-রিজার্ভেশান পাওয়া গেল না। তাছাড়া নির্জনে একটু ভাবাও দরকার হয়ে পড়েছিল মলয়ের। সে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা না ক'রে ট্রেনেই রওনা হয়ে পড়ল। একটা ফার্স্ট ক্লাস 'কুপে'তে সে একা। ভালই হ'ল—ভাবতে ভাবতে যেতে পারবে মনে ক'রে সে খুশী হ'ল।

ভাবতে চেয়েছিল যে আগামী ছবির কাহিনীটা, কিন্তু মন চলে গেল ওর নিজের কাহিনীতে। সারা পথই নিজের জীবনের ব্যর্থতা ওকে পীড়া দিতে লাগল। এই খ্যাতি, যশ,—অযাচিত এবং নিষ্প্রয়োজন অর্থ—এর কি মূল্য পুরুষের জীবনে? জীবন মহত্তর, স্ত্রী-পুত্র গৃহসুখ—এর দাম ঢের বেশী। ভাবতে ভাবতে একটা কথা মনে প'ড়ে আশ্চর্য হয়ে গেল মলয়। আজ ওর জীবনে কোন আত্মীয় নেই কোথাও। অথচ ছিল সবাই। মাসী ছিল, কাকা ছিল, পিসী ছিল। মার মৃত্যুর পর যখন মুসলমান বাবুর্চি এল এবং দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে বসে স্ত্রীর সঙ্গে মদ খেতে লাগল তখন তাঁরা পালাতে পথ পেলেন না। এই সম্পর্কের যারা ভাইবোন ছিল, তারা ওর পয়সার দিকে চেয়ে আছে এই কথা কল্পনা ক'রেই মলয় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আছে সবাই—কাছাকাছি আছে, অথচ একান্ত নির্বান্ধব কাটছে তার জীবন।

ভাবতে ভাবতে সেদিনও ওর সারারাত ঘুম হ'ল না। ভোরের দিকে খড়্গপুরে ট্রেন থামতে ওর সহসা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো মনে পড়ে গেল ওর বড় পিসীমা থাকেন মেদিনীপুরে; খুবই বুড়ো হয়েছেন নিশ্চয়ই, কারণ তিনি ওর বাবার চেয়েও কুড়ি বছরের বড়—একবার তাঁকে দেখে যাওয়া উচিত।

হয়ত আর কোনদিন এ পথে যাওয়ার সুযোগই মিলবে না।

সে তাড়াতাড়ি, প্রায় শেষ মুহূর্তে মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল খড়গপুরে।

বড় পিসীমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিনতে পারলেন না ওকে। তারপর কেঁদে-কেটে একেবারে পাগলের মতো কাণ্ড করতে লাগলেন। মলয়ের বড় পিসতুতো ভাই ওর বাবার বয়সী—তিনি এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়ার কোন ক্রটি হল না। মলয়ের মনে হ'ল যে পুরো এক জন্ম ডিঙ্গিয়ে সে যেন আবার পূর্বজন্মে ফিরে এসেছে। এ যেন ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া গত জন্মের একটি স্মৃতি। এ শুধু স্বপ্ন।

কিন্তু এইখানেই আর একটি ঘটনা ঘটল।

বাড়ি ঢোকবার মুখে ওর নজরে পড়ল একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণী মেয়ে ঐ বাড়িরই পুকুর থেকে স্নান ক'রে উঠে যাচ্ছে। রূপ খুব বেশী না থাকলেও অদ্ভুত একটা লাবণ্য ছিল মেয়েটির—চোখের পলকে মলয় মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই মেয়েটিকে বাড়ির মধ্যেও দেখলে। পিসীমার ভাগ্নীর মেয়ে—পরিচয় পাওয়া গেল—সুষমা নাম। সুষমা ওর পরিচর্যাও করলে কিছু কিছু, জল-খাবার দিয়ে যাওয়া, পরিবেশন করা, চা দিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চলচ্চিত্র পরিচালকের চোখ—ওর প্রত্যেকটি ভঙ্গীর মধ্যে অপূর্ব এক সুষমার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

একবেলা থাকবার কথা—একটা পুরো দিনরাতই কেটে গেল ওখানে।

পরের দিন ফেরবার সময় পিসীমা কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সবই তো শুনেছি বাবা, এমন ক'রে আর কতকাল কাটাবি? আর একটা বিয়ে-থা কর্। বলিস তো আমার নাৎনী সুষুর সঙ্গেই কথাটা পাকা ক'রে ফেলি। বাপ-মা-মরা মেয়ে, পিছুটান নেই। ঝিয়ের মতো খাটবে খাবে। তুই এত রোজগার করছিস—ঘরে যদি সুখ আরাম না থাকে ত সবই বৃথা যে! সুষু মেয়ে ভাল—তুই অমত করিসনি বাবা। তোদের পাল্‌টি ঘর—সম্পর্কেও বাধবে না।'

একেবারে 'না' বলতে পারল না মলয়—বললে, 'ভেবে দেখি একটু, পরে জানাবো পিসীমা।'

কলকাতায় ফিরে ভেবে দেখলে। দুই দিন রাত ধরে ভাবলে। বরং বলা চলে যে এতগুলো দিন ভাবা ছাড়া আর কিছুই করলে না।

তারপর চিঠি লিখে দিলে, 'আমি রাজী আছি পিসীমা, তোমরা ব্যবস্থা করো !...'

মনটা স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ অসম্ভব রকমের হাল্‌কা হয়ে উঠল। ওর মন যেন তার কল্পনার পাখা মেলে সুষমার স্বপ্নচিন্তায় সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতে লাগল। পিসীমার উত্তর না আসা পর্যন্ত কিছুই করতে পারলে না সে। গুন্‌-গুন্‌ ক'রে গান গেয়ে শুধু সে বাড়ীতে পায়চারী করে এবং বিকেল হ'লে একা গাড়ি নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে আসে। ফিল্ম ডিরেক্টারদের সঙ্গে আঠার মত যে একদল সহকারী এবং স্তাবক লেগে থাকে—এই ক-টা দিন তাদের নানা কৌশলে এড়িয়ে চলল।

পিসীমা একেবারে দিন স্থির ক'রে চিঠি দিলেন, 'তোকে কিছুই করতে হবে না বাবা, শুধু চলে আয়, এইখানেই একেবারে ফুলশয্যা সেরে কলকাতায় ফিরে যাবি !'

সেই আদেশই শিরোধার্য করলে মলয়। খানকতক দামী গহনা এবং শাড়ী কিনে, এখানে সাঙ্গোপাঙ্গদের জবরদস্ত রকমের গোটা-কতক মিছে কথা ব'লে —একটি মাত্র চাকর সঙ্গে ক'রে সে মেদিনীপুর রওনা হয়ে গেল।

বিবাহের আয়োজন এখানে সবই তখন প্রস্তুত। বাকী যেটা—সেটা মলয় সঙ্গে ক'রে এনেছিল। অর্থাৎ কাপড় ও গহনা। ওর পিসীমা ওর সামনেই সুষমাকে ডেকে এনে দেখালেন মূল্যবান বেনারসী ; মাদ্রাজী, শান্তি-পুরী, ধনেখালি, মুর্শিদাবাদীর বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল সমারোহ। মেলে ধরলেন নতুন চুড়ী হার আর জড়োয়া নেকলেশের বাক্স। মলয় সব গহনাই জড়োয়া আনতে পারত কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই আনে নি। এবার সে তার ঘরের বধূকে নিয়ে যাচ্ছে—মেমসাহেবকে নয়।

এই আশাতীত সৌভাগ্যের সামনে দাঁড়িয়ে সুখে ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সুষমা ; তার ফলে তাকে আরও সুশ্রী, আরও লোভনীয় দেখাল। মলয় মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক চোখে চেয়ে কল্পনা করতে লাগল তার সেই লজ্জা-স্তিমিত চোখ দুটিতে আসন্ন আত্ম-নিবেদনের আবেশ-বিহ্বলতা। ওর মনে হ'ল মধ্যের এই দুটো তিনটি দিনের প্রতীক্ষাকে অধীর দুই হাতে সরিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যেত সে।

রাত্রে পল্লীগ্রামের এই অদ্ভুত পরিবেশে, অনভ্যস্ত গৃহে ও শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল যে, সে ফুলশয্যায় সহস্র পুষ্পস্তবকের মধ্যে বসে সুষমার দেবতাবাঞ্ছিত সুদুর্লভ তন্বুলতাটিকে বাহু বন্ধনে বেঁধে তার লজ্জা-নিমীলিত অক্ষিপল্লবে অজস্র চুম্বন এঁকে দিচ্ছে। আর সেই স্বপ্নেই মনে হল, তার ব্যর্থ ও অশান্ত জীবন এতদিনে খুঁজে পেয়েছে সার্থকতা এবং শান্তি!

পরের দিন সকালে বাগানের ভেতর চেয়ার পেতে বসে চা খেতে খেতে মন যখন পূর্বরাত্রির স্বপ্নচিন্তারই রোমন্থন করছে তখন অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী পিসতুতো ভাইটিও চায়ের কাপ হাতে ক'রে পাশে এসে বসল। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ ব'লে বসল, 'তোমার সেই তাঁকেও যে দেখলুম পরশু!'

বুকের মধ্যেটা ধ্বক্ ক'রে উঠল কি মলয়ের?

সে কথা কইলে না। নিস্পৃহতা দেখানোই হয়ত উচিত ছিল কিন্তু দৃষ্টি যেন নিজের অনিচ্ছাতেই জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল।

'ছি ছি! যে অবস্থায় দেখলুম—মনে হ'ল যে ধরিত্রী দ্বিধা হও, আমি তাতে প্রবেশ করি। এতবড় বংশের বউ তুই—তোর কিনা এই কাণ্ড?

'কো—কোথায় দেখলে?'

'কোথায় আবার। চৌরঙ্গীতে। জামাটা ছেঁড়া, শাড়ীটাও তথৈবচ। তার আঁচলটা মাটিতে লুটোতে লুটোতে যাচ্ছে। চোখ দুটি জবাফুল একেবারে। চারদিকে দশহাত অব্‌দি মদের গন্ধে ভরপুর, দেখি এক ব্যাটা সাহেবকে দিব্যি চৌ-চাপটে চেপে ধরেছে—এক পেগ মদের দামের জন্যে। ওর ঐ অবস্থা, অথচ ফট ফট ক'রে ইংরেজী বলছে মেমেদের মতো—সব দেখে শুনে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাহেবটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই বার করলে একটা টাকা। টাকা নিয়ে সোজা চলল লিণ্ডসে স্ট্রীটের মদের দোকানটার দিকে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল—তাও কোন লজ্জা নেই। ছোঃ!'

যেটা এতক্ষণ ফাগুনের লঘু দক্ষিণাবাতাস ব'লে মনে হচ্ছিল, তাই যেন অকস্মাৎ দম্‌কা ঝাপ্‌টার মত একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস রচনা ক'রে দিয়ে গেল! মলয়ের মনে হ'ল আজ আর কোথাও বাতাস নেই, ছোট্ট পৃথিবীটা তার চারিদিকে কারাগার রচনা ক'রে আড়াল করেছে তার নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসটুকুও।

সে যেন অস্থির হয়ে উঠল।

আরও কত কি ব'লে চলেছে ওর পিসতুতো ভাই গিরীন। কিন্তু সেদিকে তখন কান নেই মলয়ের। এ কী হ'ল তার? কেন—কেন এমন বিশ্রী লাগছে? অমৃতের স্বাদ মুখের মধ্যে এমন তিক্ত হয়ে গেল কি ক'রে?

কিছু কিছু কি শোনে নি এর আগে? শুনেছে বৈকি। হয়ত এতটা শোনে নি। তাছাড়া তখন একটা বিতৃষ্ণাই অনুভব করেছে সে। আজ, আজ যেন নিজেকে অপরাধী বোধ করতে লাগল। আজ, কেন তা সে জানে না, আজ যেন প্রথম মনে হ'ল—তার এই সর্বনাশের জন্য মলয়ই দায়ী। মূলত এবং প্রধানত।

বেলা বেড়ে চলল। আগামী কাল বিবাহ। আনন্দের নানা আয়োজন চারিদিকে। ঠাট্টা তামাসা করছেন আত্মীয়ারা, বিশেষত বৌদি-সম্পর্কের যাঁরা। নগদ টাকাও মলয় কিছু ধরে দিয়েছিল আগের দিন পিসীমার হাতে। দস্তুর-মতো সমারোহের সঙ্গেই আয়োজন চলেছে। কেবল বড়দা রশুনচৌকী আনাতে চেয়েছিলেন, মলয় বারণ করেছে। এক স্ত্রী বর্তমানে আর একটা বিবাহ। তাতে আবার সানাই! ছি!

এই সব আয়োজন আজ প্রভাত পর্যন্ত কি এক নেশার মতো আমেজ এনে দিয়েছিল মলয়ের মনে। সে নেশা চলে গেল একেবারে। উদভ্রান্তের মতো বাগান থেকে বেরিয়ে এসে রৌদ্রের মধ্যেই মাঠের পথ ধরল মলয়।

সত্যিই তপতীর এই অবস্থা হয়েছে? তার স্ত্রীর? তাদের কুলবধূর?

একেবারে প্রথম দিক্‌কার বিবাহিত জীবনের কথা মনে পড়ল। আজ সুষমার মধ্যে যে সম্পদের আভাস পেয়ে সে লোলুপ লালায়িত হয়ে উঠেছে, সে সমস্ত সম্ভাবনাই কি একদিন তপতীর মধ্যে ছিল না? তপতীও কি তার অন্তরের প্রথম অর্ঘ্য, বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভার সাজিয়ে দেয় নি ওর সামনে? সেদিনকার তার বিকৃত রুচি তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল বলেই সে অমৃতে তার তৃপ্তি হয় নি। সে চেয়েছে তপতীর রূপের ওপর মুখোশ, সে চেয়েছে নারীর সহজাত সলজ্জ মানসিক গঠনকে নির্লজ্জ গণিকার মনোভাবে রূপান্তরিত করতে। এ তো তারই ফল। স্ব-খাত সলিল।

পিসীমার কাছ থেকে স্নানাহারের তাগিদ এল। মলয় কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই স্নানাহার করলে। ভোজ্যের বিপুল ও বিচিত্রায়োজনে বিস্ময় প্রকাশ করতেও সে ভুলে গেল; তাতে বরং বৌদির দল একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। কিন্তু

তার মন তখন স্মৃতির রোমন্থনে ব্যস্ত। প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্য আজ আশ্চর্য স্পষ্টতার সঙ্গে মনের পর্দায় ফুটে উঠছে—ছায়াছবির দৃশ্যের মতই, একটার পর একটা।

তাহ'লে কি সে সত্যিই তপতীকে ভাল বেসেছিল একদিন ?

না—এটা শুধু অনুশোচনা ?

ভাল ক'রে খাওয়া হয় না মলয়ের, অর্ধপথেই উঠে পড়ে। মহিলারা একযোগে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন। তাতে বরং আজ বিরক্তিই বোধ হয় ওর।

বিশ্রামের আয়োজন ছিল। কিন্তু মলয় শুয়ে থাকতে পারল না। একটু পরেই উঠে এসে বাগানে বসল। বাগান থেকে রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনেই পেয়ে গেল একটা বাস। বাস খড়্গাপুর যাচ্ছিল। খড়্গাপুর স্টেশনে পৌঁছেই দেখল একটা ট্রেন ছাড়ছে। কোনমতে একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে উঠে পড়ল। কলকাতায় পৌঁছে পিসীমার নামে এক দীর্ঘ জরুরী তার পাঠালে—'বিয়ে করা হ'ল না। মন শেষ অবধি সায় দিলে না। কাপড় গহনা এবং টাকা, যা রেখে এসেছি সবই যেন সুষমাকে দেওয়া হয়। ভাল পাত্রে তার বিবাহ দিও। আরও খরচ লাগে আমি দেব। আমার সুটকেসটা কেউ যদি কলকাতায় আসে, তাকে দিয়ে পাঠিও।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল মলয়। গত কয়েক ঘণ্টা তার যে যন্ত্রণায় কেটেছে তা অবর্ণনীয়। একটা দিক থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত। একটা ভুলের মূল্য দিতে আর একটা বৃহত্তর ভুল করতে যাচ্ছিল হয়ত—একটা অপরাধ ভোলবার জন্য আর একটা কঠিনতর অপরাধ ক'রে বসছিল। সে দায় থেকে ত অব্যাহতি পেলে!

সে স্নান ক'রে খানিকটা কড়া কফি খেয়ে নিলে! অবসন্ন দেহ আবার সতেজ হয়ে উঠতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। নিজের গাড়ী বার করার হাঙ্গামা ঢের, সে একটা ট্যাক্সী নিলে—এবং বিশেষ কিছু ভেবে দেখবার আগেই হুকুম দিলে—ধর্মতলা!

ধর্মতলার মোড়ে নেমে কিছু শঙ্কা কিছু উদ্বেগ নিয়ে হেঁটে হেঁটেই এগিয়ে চলল মলয়।

কেন সে এখানে এল? মোড়ে নেমে একটু বিহ্বলভাবেই নিজেকে প্রশ্ন করে মলয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রশ্নর নির্বুদ্ধিতাটা নিজের মনেই স্পষ্ট

হয়ে ওঠে। যদি গিরীনের কথা মিথ্যে হয় তো যেন সে বাঁচে। অন্তত আজ না দেখা হয়। তবু চোখ যেন ওর কিছু উৎসুক হয়েই চারিদিকের ভীড়ে কী যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। বেশীক্ষণ খুঁজতেও হ'ল না। খানিকটা এগিয়েই ওর চোখে পড়ল একটা ছোটখাটো ভীড়। যেন কোন পাগলকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলো বেকার লোক কৌতুক উপভোগ করছে।

কাছে এসে দেখলে পাগল নয়, মাতাল।

আর সে মাতাল—ওরই স্ত্রী।

এক নিমেষের ভেতর মানুষ যে এমন ঘেমে উঠতে পারে—তা এর আগে কোনদিন টের পায়নি মলয়। দুই কান ওর অপমানে যেন জ্বালা করতে লাগল, জামাটা যেন মনে হ'ল গলায় চেপে বসেছে, নিঃশ্বাস টানতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যেই মনে হ'ল যে সে পালিয়ে যায় কোথায়ও। এখান থেকে অনেকদূরে কোথাও। যেখানে এ অপমানের বার্তা পর্যন্ত পৌঁছবে না। সে ঘুরেও দাঁড়াল একবার।

কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার মনকে শক্ত করলে।

না—পালালে চলবে না। প্রায়শ্চিত্ত করতেই তো সে এসেছে।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল সে। কাছে গিয়ে ওর কাঁধটা ধরে বলল, 'তপতী, বাড়ি চলো।'

'কে? ও—মলয়? গুডলাক্। গ্ল্যাড টু মিট ইউ। কাণ্ট ইউ লেণ্ড মি সাম্ মানি? সে, টেন চিপ্‌স্? অর ফাইভ? অর এনিথিং। মাইরি মলয় —কতকাল যে ভাল বিলিতি মাল পেটে পড়েনি। দাও না দশটা টাকা— শুনেছি তো তোমার অবস্থা এখন ভাল যাচ্ছে। রোলিং ইন্ মানি!'

'ছিঃ তপতী। এরা হাসাহাসি করছে। বাড়ি চলো!'

'বাড়ি? হোম—সুইট্ হোম? ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল! দেয়ার্স নো হোম—য়্যাট লিস্ট ফর মি! তিনমাস হোটেলওয়ালাকে এক পয়সাও দিইনি। সেখানে আর নাক-গলানো চলবে না। আমি পথেই বেশ আছি। ওন্লি দেয়ার্স নো মানি, ছাটস্ দ্য ডিফিকাল্টী! আই ম্যাস্ট হ্যাভ সাম্থিং ফর এ ড্রিঙ্ক! ওণ্ট ইউ স্ট্যাণ্ড মি এ ড্রিঙ্ক; মাই ডার্লিং?'

'বুলবুল—' বলতে গিয়েও যেন কথা বেধে যায় মলয়ের। দুই চোখে

জল ভরে আসে অকস্মাৎ। কত আদরের ডাক ওর। প্রথম প্রণয়ের চিহ্ন ওদের! কতকাল এ নামে ডাকবার অবসর মেলে নি!

হাত ধরে টেনে আনে রাস্তার দিকে।

'চলো আমার সঙ্গে লক্ষ্মীটি!'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মলয়?'

'চলো না।'

একরকম জোর করেই তোলে একটা ট্যাক্সিতে। রাস্তায় যারা ভীড় ক'রে মজা দেখছিল তারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়। তার ভেতরই কে একজন আর একজনকে বলে, ওদের শ্রুতিগোচরের ভেতরই, 'আরে ঐ তো মলয় ঘোষ, ফিল্ম ডিরেক্টার!'

গাড়িতে উঠে তপতী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। নেশার ঘোরেই হয়ত ঝিমিয়েছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'ও মলয়, ইউ নটি বয়, কোথায় নিয়ে চলেছ! প্লিজ—টু দ্য নিয়ারেস্ট বার, প্লিজ!'

'বাড়ি চলো বুলবুল।'

'বাড়ি? কোন্ বাড়ি?'

একদা-সুন্দর চোখ-দুটি বিস্ফারিত ক'রে চায় তপতী।

'আমাদের বাড়ি।'

'মানে? তোমার বাড়ি? ও নো নো—প্লিজ নো। লেট্ মি গেট ডাউন হিয়ার!'

চলন্ত গাড়ি থেকেই নামতে যায় তপতী।

'ছি তপতী। ছেলেমানুষী ক'রো না। জানো তো বাড়িতেও ওসব আছে। সেখানে গিয়ে যা খুশী খেও। এখন চলো!'

'রিয়ালি?...কিন্তু বাড়িতে গিয়ে যদি আমি থাক্‌তে চাই? আর না বেরুই?'

'থাকবে বলেই তো নিয়ে যাচ্ছি, আর তোমাকে বেরোতে দেব না!'

খানিকটা গুম্ খেয়ে বসে থাকে তপতী, যেন ভাবতে চেষ্টা করে। বিস্মৃতির বহু দূর-পার থেকে কতকগুলো কি প্রাক্তন সংস্কার ভেসে আসে মনের মধ্যে। আত্মমর্যাদা, সম্ভ্রম এমনি কত কি! একসময় সে হঠাৎ বলে ওঠে—'কিন্তু চাকর-বাকর? না না—ছি! তারা কি মনে করবে? আমাকে এইখানেই নামিয়ে দাও। যদি পারো তো দশটা টাকা দাও, তা'হলেই

আমি কৃতজ্ঞ থাকব।...আমার, আমার অনেক টাকা এখনও বাজারে পাওনা আছে, 'জানো? আমি আদায় করতে পারি না তাই—!'

মলয় ওর দুটো হাত চেপে ধরে, 'এই তো আমরা বাড়িতে এসে গেছি, লক্ষ্মীটি। তুমি আর আপত্তি করো না বুলবুল!'

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ে তপতী, 'না। এটুকু মনুষ্যত্ব আমার এখনও আছে মলয়। এই অবস্থায় বাড়িতে আমি যাবো না—কিছুতেই। তার চেয়ে আমার পথই ভাল। অনেক ভাল। আমাকে এইখানেই নামিয়ে দাও।'

মলয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপে। বলে, 'বেশ চলো, তোমার হোটেলেই ফিরে যাই।'

'ওরে বাবা! সে চেষ্টা ক'রো না—প্লিজ। সেখানে ভয়াবহ রকমের দেনা হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা সে আমি বুঝব—চলো ত।'

হোটেলে পৌঁছে চেক্ লিখে দেয় মলয়—পাওনা সব টাকা তো বটেই, অনেকখানি অগ্রিমও। বলে দেয়—ওর সেবা বা স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি না হয়! ম্যানেজারের মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থাই ক'রে দেয়।

মলয়ও বাড়ি ফেরে না, ঐখানেই আর একটা শয্যার ব্যবস্থা ক'রে দিতে বলে। বাড়িতে খবর পাঠায়—কদিন সে এখানেই থাকবে।

তপতীর শরীর যে এত খারাপ হয়ে এসেছিল, তা সে নিজেও বুঝতে পারে নি এতকাল। একেবারে ভেঙে পড়ার আগে পর্যন্ত সে যেন কোন রকম আভাস পায় নি। দীর্ঘদিনের উপবাস ও অবিরত মদ্যপানে লিভারটা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, অকস্মাৎ তা শুয়ে পড়ল। প্রাণশক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না আর তার।

মলয় কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওর চিকিৎসা আর শুশ্রূষা করতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হ'ল রোগিনীকে নিয়েই। ডাক্তার ওষুধের-মাপে একটুখানি ক'রে মদ খেতে বলেছেন, নইলে এতদিনের অভ্যাসে রোগিনী থাকতে পারবে না। কিন্তু তপতী সে ওষুধের মাপে খুশী নয়। ফাঁক পেলেই সে বেশী খায়। মলয় আলমারীতে রেখে চাবি দিতে সে একদিন এক ছোকরা

চাকরকে দিয়ে বকশিসের লোভ দেখিয়ে আনিয়ে নিলে। রাত্রে ব্যথা উঠতে যন্ত্রণার ভয়াবহতা দেখে মলয় ব্যাপারটা অনুমান করলে। তখন জেরা করতেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। মলয় ম্যানেজারের কাছে নালিশ করতে সে ছোকরার চাকরী গেল। বাকী সব চাকরদের ডেকে ভয় দেখিয়ে দিলে মলয়—দৃষ্টান্ত চোখের সামনেই রয়েছে—সুতরাং এবার কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল মনে করলে সে। কিন্তু দু-চার দিন বেশ সুস্থ আছে দেখে মলয় যেমন বেরিয়েছে নিজের কাজে, তপতীও এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মদ খেয়ে এল। আবার ব্যথা, আবার সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি। ডাক্তারের সেই গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়া।

মলয় তিরস্কার করে না তপতীকে, নিজেও হাল ছাড়ে না।

শুধু বলে, 'তুমি আমাকে আরও বেশী খরচার দায়ে ফেলছ তপু, আমাকে দেখছি এবার দিনরাত নার্স রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কেন, কেন আমার জন্যে এত কাণ্ড করছ মলয়! কী আর হবে আমার বেঁচে বলতে পারো? আমার মধ্যে যে নারী ছিল সে তো বহুকাল আগে মরে গিয়েছে। ঘর সংসার পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন নিয়ে যে বহু-বিস্তৃত সংসারের আশায় আমরা নিজেদের সাবধানে রাখি সে আশা ঘুচেছে কতদিন আগে—তা মনেও পড়েনা। ছিল এক শিল্পী—তাকে আমি হত্যা করেছি স্বহস্তে। আর কেন বাঁচব, কিসের জন্যে বাঁচব বলতে পারো? তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, তুমি অন্তত বাঁচো। এখনও তোমার নতুন ক'রে সংসার পাতবার সময় আছে মলয়!'

সে কথা কি মলয়ও ভাবে না?

মাঝে মাঝে কি একটা হতাশা এসে ওর এই সমস্ত প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির মূলে নাড়া দেয় না? সুষমার দেহ-লাবণ্য স্মৃতিপথে ভেসে উঠে কি নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়ে যায় না? কার জন্য সে নিজের ভবিষ্যতের একটি সুন্দর সম্ভাবনাকে এমন ভাবে খোয়াবে? এই অর্ধমৃত একটি নারী আর সম্পূর্ণমৃত একটি শিল্পীর জন্য? আজও হয়ত মনে হ'ল যে তপতীর কথাই ঠিক। ঐ যুক্তি গ্রহণ করাই তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চকিতের মধ্যে মনের পর্দা দিয়ে সরে গেল ক-দিন দিনরাত-স্বপ্ন-দেখা সুন্দর নিভৃত একটি ঘরকন্নার ছবি, যেখানে এক তরুণী মেয়ে তার সেবা ক'রেই নিজেকে

কৃতার্থ, ধন্য মনে করছে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বহুদিন আগেকার আর একটা ছবিও চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর একটি তরুণী মেয়ে সেখানে হাতজোড় ক'রে বলছে, 'আমার ঠাকুরদা তিনলাখ টাকা আয়ের জমিদারী উড়িয়ে দিয়েছিলেন মদ খেয়ে। আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন লিভারে ঘা হয়ে। সে তো মদ খাওয়ারই ফল। তোমার হুটি পায়ে পড়ি—আমাকে মদ ধরিও না।'

এ ত খুব বেশী দিনের কথাও নয়। ক-টা বছরই বা।

সে মনকে কঠিন করে। সস্নেহ-হাতে ওর চোখহুটো চেপে ধরে বলে, 'কে বলেছে শিল্পী নিহত হয়েছে তপু। আমি মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র জানি, আমি আবার বাঁচিয়ে তুলব!'

ওষ্ঠ-প্রান্তে করুণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে তপতীর, 'সে আর সম্ভব নয়! মিছিমিছি আমাকে স্তোক দিওনা—আমি ঠিক অত শিশু নই।'

মহাজনরা ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে ওঠেন! তাগাদার ওপর তাগাদা আসে।

'কি হ'ল, নতুন ছবি কবে শুরু করবেন?'

তপতীও তাগাদা দেয়, 'তুমি কাজে যাও—আর কতদিন মড়া-আগলে বসে থাকবে এমন ক'রে?'

'তুমি তাহ'লে বাড়ী চলো এবার।'

'তাতেই কি তুমি নিশ্চিত হ'তে পারবে? বেশ, তাহ'লে চলো। কিন্তু আমি যদি তাড়াতাড়ি না মরি, শেষে বাড়ী থেকে তাড়াতেও পারবে না। তার চেয়ে তোমার জীবনের বাইরে ছিলুম—এই তো ভাল। সব রকমের স্বাধীনতাই ছিল তোমার।'

'স্বাধীনতা হয়ত সবাই চায় না বুলবুল।...তাছাড়া—তোমার মরবার কথা হচ্ছে না। বাঁচবার কথাই হচ্ছে। নায়িকার অভাবেই যে আমি ছবিতে হাত দিতে পারছি না।'

'কেন আমার সঙ্গে এমন মর্মান্তিক ঠাট্টা করছ বলো ত!'

'কে বললে ঠাট্টা করছি? সত্যিই বলছি।'

'পাগল? তুমি কি ভাবো আর কোনদিন আমি অভিনয় করতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। নইলে আমিও আর ছবি তুলব না।'

অনেকদিন পরে আবার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে তপতীর—শান্ত মেয়ের মত নিজেকে যেন সঁপে দেয় মলয়ের হাতে, 'বেশ তবে নিয়ে চলো বাড়ীতে। যা খুশী করো আমাকে নিয়ে। আমি আর কিছু বলবনা।'

মলয় তপতীকে বাড়ীতে এনে আবার টেলিফোনের চোঙ্গা তুলে নেয় হাতে। ডাক দেয় সহকারীদের।

তিনটি প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তি করা ছিল ওর। তার ভেতর একজন দশহাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এঁর সঙ্গেই তার সবচেয়ে বড় চুক্তি হয়েছিল—একলাখ টাকা পারিশ্রমিকে। সুতরাং তাঁরই তাগাদা সবচেয়ে বেশী।

মলয় তাঁকে জানালে যে এবার সে প্রস্তুত।

'আপনি কাস্টিং কিছু ঠিক করেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

মলয় ফর্দ বার ক'রে দিলে।

ফর্দ দেখে মহাজনের চক্ষু স্থির।

'তপতী দেবী? তপতী দেবীকে নামাবেন নায়িকার ভূমিকায়?'

'হ্যাঁ। তাই ঠিক করেছি।'

'না মশায়। এ চলবে না। তাঁর চেহারা আমি দেখেছি মাস-দুয়েক আগে। আপনি অন্য কাউকে ঠিক করুন।'

'আমি এই ঠিক করেছি। করলে আমি এই কাস্ট-এই করব। ছবি যখন আমি পরিচালনা করব তখন সে দায়িত্ব আমার।'

'না মশাই, মাপ করবেন। টাকাটা আমার—সে কথাটাও আমাকে ভাবতে হবে। তিনচার লাখ টাকার ছবি আমি জেনে-শুনে ডোবাতে পারব না।'

'তাহ'লে আমি ছবি তুলব না।'

'সে আপনার ইচ্ছা।'

মলয় পোর্টফোলিও থেকে চেক্-বই বার ক'রে দশহাজার টাকার চেক্ লিখে দিলে। বললে, 'চুক্তির কড়ার মত এ টাকা আপনার ফেরৎ পাবার কথা নয়—কিন্তু আমিও বিনা পরিশ্রমে আপনার টাকা নিতে চাই না। এই নিন!'

তবু তিনি বললেন, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখুন মলয়বাবু। এতগুলো টাকা। এতটাকা চট্ ক'রে কেউ দেবেনা আপনাকে। বোম্বেতেও পাবেন না সহজে!'

'তা আমি জানি। কিন্তু ছবির নিন্দা-প্রশংসার সব দায়িত্ব যখন আমার, তখন ছবির পরিচালনার মধ্যেও আমি আর কারুর কথা শুনতে রাজী নই।'...

একে একে সব প্রযোজকের সঙ্গেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। মলয়ের এক কথা, তপতী নায়িকা না হ'লে সে ছবি তুলবে না। প্রযোজকরাও অত টাকা ঐ নায়িকার ওপর ভরসা ক'রে খরচ করতে রাজী হন না। নানা রকম ঠাট্টাতামাশা করতে লাগল লোকে। মলয় নতুন করে তপতীর প্রেমে পড়েছে। মলয়ের এই বয়সেই বুঝি বাহাত্তুরে ধরেছে ইত্যাদি। একটি ফিল্ম্ মাসিকে এমন কথাও বেরিয়ে গেল যে তপতী কোন মাদুলি পরে বশ করেছে মলয়কে।

অবশেষে বাইরের সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে মলয় নিজের ছবি নিজেই তুলবে ঠিক করলে। বহু চিন্তার পর কাহিনী বেছে নিলে। এমন কাহিনী—যাতে তপতীকে নায়িকা সাজালেও বেমানান হয় না। বহু যত্ন ক'রে চিত্র-নাট্য রচনা করলে, ভেবেচিন্তে নির্বাচন করলে অপর নট-নটী!

যেদিন তপতীকে খবর দিলে, অমুক তারিখে নতুন ছবির মহরৎ—সেদিন সে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল বহুক্ষণ, মলয়ের মুখের দিকে। কথাটা তার বিশ্বাসই হ'ল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত—তারপর ব্যাকুল হয়ে বললে, 'ছিঃ ছিঃ, তুমি কি পাগল হয়েছ মলয়, এসব পাগলামি ছাড়। এতগুলো টাকা অনর্থক ডুবিও না। আমাকে হিরোইন্ করলে ছবি তোমার একসপ্তাহও চলবে না!'

মলয় দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'সে আমি বুঝব। তুমি ত জানো আমার প্রতিজ্ঞা—তোমাকে ছাড়া ছবি তুলব না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপতী বললে, 'চলো তবে। কিন্তু মড়াকে কি বাঁচাতে পারবে?'

সত্যিই অসাধ্য সাধন করল মলয়। তপতীও প্রাণপাত পরিশ্রম করল। প্রথম যখন নায়িকার অল্পবয়স তখন ক্যামেরাকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখলে মলয়—তারপর বেশী বয়সের বেলায় ক্লোজ-আপ নিলে। মেক্আপেরও ত্রুটি ছিল না। তবু যেটুকু খুঁৎ থাকতে পারত—তপতীর অসাধারণ অভিনয়ে সেটাও ঢেকে গেল। ছবি শেষ করেই মলয় নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ছবি দেখানো শুরু হ'তে বোঝা গেল সিদ্ধি ওর আশাকেও ছাপিয়ে গেছে। তেইশটি চিত্রগৃহের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ অসংখ্য দর্শকের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। এমন কি কাগজগুলিও প্রশংসা না ক'রে পারল না।

মলয় একদিন সন্ধ্যার পর তপতীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ছবি ভাঙবার মুখে গাড়ি অন্ধকার ক'রে বসে থাকে—ওকে শোনায় ওর বিজয়-ধ্বনি! তপতীর মুখে ফুটে ওঠে হাসি। মলয়ের হাত ধরে বলে, 'মলয়, ইউ আর ওআণ্ডারফুল।'

এরই ভেতর বোম্বে থেকে উড়ে আসেন এক কোটিপতি মহাজন।

ওদের দুজনকে চাই, মলয়কে দিয়ে তিনি ছবি তোলাবেন। যতটাকা লাগে!

মলয় সময় নিলে ভেবে দেখবার। রাত্রে দক্ষিণের বারান্দায় বহুকাল পরে স্ত্রীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে, 'তুমি কি বলো, বুলবুল?'

'আমি? আমি কি বলব। আমি তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিয়েছি—আমার কোন পৃথক ইচ্ছা নেই!'

মলয় ওর কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'শিল্পীকে তো বাঁচালুম—নারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না এবার?'

শিউরে ওঠে তপতী—ওর হাতটা সজোরে চেপে ধরে বলে, 'পারবে, পারবে—হ্যাঁ গো?'

'পারবো। চলো তপু, আমরা কোথাও কিছুদিন অজ্ঞাতবাস ক'রে আসি। কোন সুদূর নিভৃত জায়গায়।'

'চলো—আজই চলো। চাকর বাকর কেউ যাবে না। আমি সেখানে তোমাকে রেঁধে খাওয়াবো, তোমার সেবা করব—'

'আর আমি তোমাকে বাজার ক'রে এনে দেবো, রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকব তোমার পাশা-পাশি! কেমন তো?'

তপতীর দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, সে বলে, 'কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাবো যে এর জন্যেই এতকাল আমার অন্তর হাহাকার করছে! শিল্পী মিথ্যা, শিল্পী তুচ্ছ। নারী অনেক বড়! সংসার বৃহত্তর।'

শেষ হাসি

ব্যাপারটা নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হাসাহাসির অন্ত ছিল না। একটা নিত্য এবং অফুরন্ত কৌতুকের উৎস হয়ে উঠেছিল প্রসঙ্গটা। এমন কি এ প্রসঙ্গ না উঠতেও, মাঝে মাঝে আপনিই হেসে উঠত হর্ষনাথ—আপন মনেই। কথাটা মনে পড়লেই হাসি পেত ওর। আর সে হাসির বীজাণু মুহূর্তে বেলারাণীর মনে বা মুখে সংক্রমিত হতেও দেরি হ'ত না। এই অকারণ কৌতুক-হাস্যের একটিই মাত্র কারণ আছে তা সে জানে তাই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় সেও হেসে উঠত সঙ্গে সঙ্গে।

হাসতে হাসতে হাসির বেগ বেড়েও যেত মধ্যে মধ্যে। হেসে লুটোপুটি খেত ওরা। অনেকক্ষণ পরে, হয়ত হাসির ধমকটা একটু থামলে হর্ষনাথ বলত, 'আচ্ছা ওদের এত মাথা ব্যথা কিসের, সেইটে আমি কিছুতে বুঝতে পারি না। যার বিয়ে তার মনে নেই—পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—এও হয়েছে যেন তাই।'

বেলা বলত, 'তাই না তাই! মা বলে না—এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে ভিন গাঁয়ে মাথা ব্যথা—তা তোমাদের এ পাড়াটির মাথা ব্যথা দেখলে কথাটা সত্যি বলেই মনে হয়।

'পাড়ার দোষ দিচ্ছ কেন। আত্মীয়রাই তো বেশী। তোমার আমার দু' দল আত্মীয়ই তো উঠে পড়ে লেগেছেন আমাকে লজ্জা থেকে আর তোমাকে কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে।'

'হুঁ! তেমনি অপমানও হয়েছেন, হচ্ছেনও রোজ। কিন্তু তাতেই কি লজ্জা আছে!"

হাসির কথাই, হাসছেও ওরা তবু ঈষৎ যেন একটু তিক্ততাও ফুটে ওঠে বেলারাণীর কণ্ঠে।

অস্বস্তির বা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে পুরুষরা যত সহজে কৌতুকের দিকটা বেছে নিয়ে বাকীটা ঝেড়ে ফেলতে পারে—মেয়েরা তত সহজে পারে না। আঘাত যত সামান্যই হোক, তাদের গায়ে বেঁধে।...বেলাও এ-অপমান

বা আঘাতে মুখের এমন হাসি রাখতে পারত না যদি না সে আঘাতের মধ্যে পরোক্ষে ওর কাছে একটা দীনতা ও ন্যূনতা স্বীকারের প্রশ্ন থাকত, ওর রূপ না হোক, ওর সঙ্গ বা সাহচর্যের একটা বিশেষ মূল্য না স্বীকৃত হয়ে যেত সেই ধিক্কারে।...

কথাটা বেলাকে নিয়েই।

হর্ষও যেমন একটা সাংঘাতিক রকমের মানুষ নয়—তেমনি বেলাও বলবার মতো বা বিশেষ উল্লেখ করার মতো মেয়ে নয়।

ম্যাট্রিক্‌পাশ ছেলে হর্ষ—জীবনের ঘাটে ঘাটে ঠেক খেতে খেতে এসে এই বর্তমান মারোয়াড়ী ফার্মে পৌঁচেছে, মাইনে ও ভাতাটাতা নিয়ে শ' দুই টাকা পায় মাসে, হয়ত তার ওপর সাত-আট দশটাকা বেশী হ'তে পারে। এ অবস্থায় বর্তমান দিনকালে বিয়ে করা উচিত নয়, একান্নবর্তী সংসারে থাকলেও নয়। হর্ষও করত না—যদি না বন্ধু ব্রজেনের মারফৎ বেলারাণীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যেত। ব্রজেনেরই মামাতো বোন বেলা, পিতৃহীন অনাথ মেয়ে, কাকার ঘরে মানুষ। মানুষ অর্থে খেয়ে পরে সংসারের কাজ করে বড় হওয়া—লেখা-পড়া শেখানোর সঙ্গতিও ছিল না যে কাকার, হয়ত সে কথাটা সেকেলে মানুষ তাঁর মাথাতেও যায় নি। বেলারাণীরও সেদিকে তেমন কোন ঝোঁক ছিল না। দু চারটে বাংলা বই পড়ার মতো পুঁজি ছিল, তাইতেই চেয়ে চিন্তে নানা নাটক নভেল পড়া চলে যেত।

দেখতে ভাল ছিল না বেলারাণী। মাজা রং, বরং তার মধ্যেও যতটা ঔজ্জ্বল্য থাকা সম্ভব সেটুকুও ছিল না। ময়লা বলাই উচিত হয়ত। গড়ন-পেটন মুখশ্রী কোনটাতেই কোন অসাধারণত্ব ছিল না। গান-বাজনার চর্চা থাকা তো সম্ভবই নয়—সেলাই ও বোনা কিছু কিছু জানত—তাও নামে মাত্র। লোককে দেখানোর মতো কিছু নয়।

না, বেলারাণীর আকর্ষণে প্রথমটা যাতায়াত করেনি হর্ষ, করেছিল তার মার আকর্ষণেই। বড় চমৎকার কথা বলেন ভদ্রমহিলা, আর বড় যত্ন করেন। পরের সংসার, সামান্য চা ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারতেন না কিন্তু তাতেই যা আন্তরিকতা প্রকাশ পেত, যে আকুলতা তাতে হর্ষনাথ মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। সেই মোহেরই ফলশ্রুতিস্বরূপ তাকে একদিন কথা দিতে হয়েছিল যে হর্ষ তাঁকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করবে।

হর্ষদের সাংসারিক অবস্থা ভাল না। বাবা সামান্য চাকরি করতেন—এখন রিটায়ার করে ঘরে বসে আছেন। চাকরি ছাড়ার সময় সামান্য যা কিছু পেয়েছিলেন যকের ধনের মতো আগলে রেখেছেন বটে তবে সেও এমন একটা কিছু নয়। অসুখ প্রভৃতি বিপর্যয়ের মুখে কিছু কিছু বার করতেও হয়েছে। ভরসার মধ্যে হর্ষর পরের ভাই সম্প্রতি কোথায় একটা চাকরিতে ঢুকেছে, ছোটটি এখনও স্কুলে পড়ে। এ অবস্থাতে তার বিয়ে করা উচিত নয়—এমন কি মাও সেই কথাই বললেন। হর্ষ তাঁদের স্বার্থপরতায় ভারী চটে গেল। সে উদয়াস্ত খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাঁদের সংসার চালাচ্ছে—আর ওঁরা তার একটু শান্তি, একটু স্বাচ্ছন্দ্যের কথাটা একবারও ভাবছেন না। শুধু নিজেদের স্বার্থের কথাটাই ওঁদের কাছে সব! তাই যদি হয়, হর্ষই বা নিজের স্বার্থের কথাটা ভাববে না কেন?···সে পরিষ্কার বাড়িতে এক দিন নোটিশ দিলে যে—এ বিয়ে সে করবেই, ওঁদের সহযোগিতা না পায়, আলাদা বাসা ভাড়া করে বৌকে নিয়ে গিয়ে তুলবে—দরকার হয় রেজেস্ট্রী বিয়ে করবে। সে অজাত কুজাত কিছু বিয়ে করেছে না, অসবর্ণও নয়, বাড়ি থেকেই স্বচ্ছন্দে হতে পারে, তা বাড়ির লোকে যদি সেটা না বোঝে তো তাকে অগত্যা সেই ধরণেরই বিয়ে করতে হবে—উপায় কি?

অগত্য বাড়ির লোককে বুঝতে হ'ল। বাড়িতে থেকেই বিয়ে হ'ল। আর তার ফলে হর্ষর বাবা কেদার বাবুর গোপন সঞ্চয় থেকেও একখাবলা টাকা বেরিয়ে গেল। কারণ বেলারাণীরা কিছুই দেয় নি। হর্ষর হাতে যা জমেছিল তাতে সবটা হ'ল না। ওর শখ যত ছিল, তত সামর্থ্য ছিল না। এতটা খরচ হ'তে পারে সে জ্ঞানও না। তাহলে হয়ত শেষ পর্যন্ত সে সাধারণ বিয়ের জন্য জিদ না করে অসবর্ণ বিয়ের মতো শুধু লেখাপড়ার বিয়েতেই রাজী হয়ে যেত।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও হর্ষর বাবা মা ছেলে-বৌকে ধরে রাখতে পারলেন না। রোজই খিটিমিটি বাধতে শুরু করল। বেলারাণী এখানে এসে আবিষ্কার করল যে প্রধানত স্বামীর উপার্জনেই এখানকার সংসার চলে, সে সেই মাপেই সংসারের কর্তৃত্ব বা কর্ত্রীত্ব দাবী করে বসল। তাও সে দাবীর মধ্যে কোন শক্তি-সামর্থ্যের প্রশ্ন নেই—অর্থাৎ শাশুড়ীর মতো খাটতে সে পারবে না, শুধু হুকুম চালাবে। তার প্রাধান্যটা মেনে নেবে সবাই।

এতটা কোন শাশুড়ীই বরদাস্ত করেন না। এমন কি কোন অবীরা বিধবা শাশুড়ীও না। বেলারাণীর শাশুড়ীও করলেন না। ফলে একদা শুভ দিন দেখে এখানে ওদের পৈত্রিক বাসাবাড়ি থেকে এই মাত্র দশমিনিটের পথে একটি ঘর ভাড়া করে উঠে এল ওরা। ইতিমধ্যে বেলার একটি ছেলেও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও বেলা কিছু মাত্র দ্বিধা করল না। 'কে দেখবে' এই প্রশ্নের উত্তরে সে অকুতোভয়ে উত্তর দিল, 'ভগবান দেখবেন। যার কেউ নেই তারই তো ভগবান।'

অবশ্য এখানে পৃথক সংসার পেতে বসার পর আর মনোমালিন্য বা খিটিমিটি থাকার কোন কারণ নেই, ওদেরও ছিল না। সহজভাবেই আসা যাওয়া শুরু হয়েছিল। সিনেমা বা বাপের বাড়ি কি অন্য কোথাও যাবার দরকার হলে বেলা ছেলেটাকে শাশুড়ীর কাছে ফেলে দিয়ে যেত—আর নাতি কি তাঁর ছেলের অসুখ হয়েছে শুনলে তিনি নিজেই আসতেন। প্রীতির অভাব ছিল না, অভাব ছিল টাকার। হর্ষনাথের এই পৃথক সংসার টেনে বাবা মাকে কোন রকম সাহায্য করার অবস্থা থাকত না। অথচ ওঁদেরও—একটি মাত্র নতুন চাকরে ছেলের (সাধারণ চাকরি খুবই, হর্ষর ভাই প্রফুল্লও গ্র্যাজুয়েট নয়) আয়ে সংসার চলবার কথা নয়। চলতও না—কোন মতে দাঁতে-দাঁত চেপে চালাতেন কেদারবাবু। তার ভাণ্ডারেরও তলা চুঁয়ে এসেছিল—তিনি বলতেন, 'এখন যা আছে শ্মশান খরচা আর ছেলের দশপিণ্ডি দিয়ে খেউরি হয়ে ওঠার খরচা চলবে। শ্রাদ্ধশান্তি ক'রে লোক খাওয়ানোও চলবে না।…অবশ্য সে আশাও আমি করি না, সে ইচ্ছাও নেই।…জ্যান্ত দিলে না মুখে তুলে, মলে দেবে বেনার মূলে—ও পিণ্ডি খেয়ে আমার লাভ নেই।'

হর্ষনাথ যখন পৃথক্ হয়ে আসে তখনও পর্যন্ত বাবা মাকে অন্তত হাত খরচের মতো কিছু কিছু দেবার সাধু সঙ্কল্প একটা ওর ছিল। কিন্তু সংসারের যে এত রকমারি খরচা আছে তো এতকাল সংসারের মধ্যে থেকেও বুঝতে পারেনি। এখন বুঝল—বেশ হাড়ে হাড়েই বুঝল। হিসেবের ডান ও বাঁ, দুই প্রান্তে মেলাতে শেষ পর্যন্ত একটা পার্টটাইম কাজ ধরল—সেও এক মারোয়াড়ীর দোকানে—অফিসেরই চেনাজানা সূত্রে, ছটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ সেটা—মাইনেও খুব কম নয়, চল্লিশ টাকা কিন্তু তবু তা থেকেও

বাবা মাকে দেওয়া গেল না কিছু। কারণ ইতিমধ্যে আর একটি দায় বেড়ে গিয়েছিল। একখানা ঘরে থাকা, শাশুড়ীকে এর মধ্যে এনে রাখা সম্ভব নয়। তিনি যে প্রত্যহ আসা যাওয়া করবেন ওদের ছেলেটাকে একটু দেখবেন বা কোন কাজে আসবেন—সে রকম কাছাকাছিও থাকেন না। অথচ তাকে কিছু কিছু সাহায্য করা অপরিহার্য হয়ে উঠল। নইলে নাকি বেলার কাকার বাড়িতে আত্মসম্মান বজায় রেখে টিকে থাকা সম্ভব নয়, আর আত্মসম্মানই যদি না রইল তো জীবনে রইল কী?

এতকাল তাহ'লে ও বাড়িতে তিনি কী করে কাটালেন এই অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রশ্নটাও করতে পারল না হর্ষনাথ। হয়ত অশান্তির ভয়েই করতে পারল না—অথবা অনাবশ্যক বোধেই। তার চেয়ে মাঝে মাঝে দশ পনরো টাকা দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। সেই ভাবেই সে সংসারের বাজেটটাও ঠিক করে ফেলল। সে বাজেটে মাসে দুবার সিনেমা যাওয়ার খরচটাও ধরা হল—কেবল কেদারবাবুদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা গেল না কিছুতেই।

নতুন পার্টটাইম চাকরি নেওয়ার ফলে অর্থের অভাবটাও ভাল করে মিটল না, উপরন্তু আর একটা অভাব বেড়ে গেল—সেটা হচ্ছে সময়ের। সাড়ে আটটা পৌনে নটায় বেরিয়ে যায় হর্ষনাথ নইলে তিনবার বাস বদল করে দশটায় অফিস করা সম্ভব হয় না—আর ফেরে রাত সাড়ে নটা পৌনে দশটায়। এই দীর্ঘ সময়টা একা বেলার কাটে কী করে! বাড়ির অন্য যারা ভাড়াটে তাদেরও সন্ধ্যেবেলায় কাউকে পাওয়া যায় না। এক জনের অনেক ছেলে মেয়ে—রান্না ঘর থেকে বেরোতেই তার দশটা বেজে যায়। তা ছাড়া কাজ-কর্মের মধ্যে কেউ গিয়ে পড়া তিনি পছন্দও করেন না—বেলা বুঝে নিয়েছে। আর একটি দম্পতি আছেন, তাঁরা দুজনেই মাস্টারী করেন—সন্ধ্যাবেলা দুজনেরই টিউশনী থাকে। দুটি মেয়ে তাদের—এক ঝি দেখে। সে-ই আবার রান্নাও করে, তার কোন দিকে চাইবার কি গল্প করার সময় নেই। সে মানুষটাও তত সুবিধের নয়—বড় লাগানে স্বভাব। একটা কথা কইলে দশটা মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়ায়।

সুতরাং স্রেফ একা—এই একটি বাচ্চা নিয়ে সে থাকে কী করে? এই নিয়ে রোজই অশান্তি বাধে হর্ষের সঙ্গে। বেলা বলে একটা দিন-রাতের ঝি

রাখো। হর্ষ শিউরে ওঠে। খাওয়া পরা কুড়িটি টাকা অন্তত—মাস গেলে খুব কম করেও পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ। বেলা কি পাগল? মাসে দশটা টাকা সে বুড়ো বাবা মাকে দিতে পারে না, ষাট টাকা খরচ করে ঝি রাখবে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করার জন্যে?

বেলা রাগ করে বলে, 'তোমার যখন এই অবস্থা তখন বাবু বিয়ে করা উচিত হয়নি। বিয়ে না করলে বাবা মাকেও টাকা দিতে পারতে—আলাদা সংসার করার কথাও উঠত না।'

হর্ষও রেগে যায়। বলে, 'বিয়ে আমি সেধে পায়ে ধরে করতে যাইনি। তোমার মা-ই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। জিগ্যেসা করো গে যাও তাঁদের।'

ফলে ধুন্দুমার ঝগড়া বেধে ওঠে। আর সেটা প্রায় প্রত্যহই।

নিত্য এই অশান্তি কচ্‌কচিতে যখন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে হর্ষ বিশেষ করে বারো তেরো ঘণ্টা ধরে বাইরে আসার পর যদি প্রত্যহই এই তিক্ত অভ্যর্থনা অদৃষ্টে জোটে তো জীবন সম্বন্ধেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বার কথা—একেবারে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের ঘাড়েই সব ফেলে দিয়ে নিজে মেসে গিয়ে উঠবে কিনা যখন ভাবতে শুরু করেছে, তখন সকল সমস্যা সমাধানের এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতের কাছে এসে গেল আপনা থেকেই। সুবিধার রাজপথটা প্রসারিত হয়ে গেল জীবনের সামনে।···

বিয়ের পর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগসূত্রটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা শনিবারে, পার্ট-টাইম চাকরিও কী কারণে সেদিন ছিল না, সকাল করে বাড়ি ফেরবার পথে সুব্রতর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনেকদিনের বন্ধু—তেমনি মধ্যে অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। সুব্রত একটা বড় বিদেশী ব্যাঙ্কে কাজ করে, মাইনে ভাল কিন্তু মাথার উপর চার পাঁচটি অনূঢ়া বোন থাকায় বিয়ে করতে পারেনি, শিগ্‌গিরই যে বিয়ে হবে সম্ভাবনাও কম। এক কথায় চরম বেকার। অফিসের পর সিনেমা সিগারেট ছাড়া কোন অবলম্বন নেই। যোগাযোগটা দৈবেরই ঘটিয়ে দেওয়া বুঝতে হবে, নইলে সেদিন কোন সিনেমায় না গিয়ে একা চুপ করে পথের ধারেই বা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন সুব্রত এবং হর্ষই বা ওকে দেখে অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে কেন নিজের বাসায়?

সুব্রত প্রথমটা একটু অনিচ্ছায় এসেছিল। বিবাহিতা বন্ধুপত্নীর সংসারে

গিয়ে বসে গল্প করার 'মধ্যে' এমন চার্ম নেই—বরং যেন কেমন অস্বস্তিকরই ব্যাপারটা এই ওর ধারণা ছিল। কিন্তু বেলারাণীর সহজ অন্তরঙ্গতার সে ভুল ভাঙতে ওর দেরি হ'ল না। ভালই লাগত ওর—এই প্রায় অশিক্ষিত মেয়েটির সাহচর্যে, সন্ধ্যাটা ভালই কাটল বলে মনে হ'ল।

আসার সময় বেলা বলল, 'আসবেন কিন্তু দয়া করে মধ্যে মধ্যে। একা থাকি, সন্ধ্যা যেন কাটতে চায় না।'

ঈষৎ সংকোচের সঙ্গে হর্ষর দিকে মুখ তুলে সুব্রত বলে, 'কিন্তু তুই তো মানে তুই তো আসিস রাত দশটায়?

'ওরে ইস্টুপিড—সেই জন্যেই তো তোকে সন্ধ্যায় আসতে বলছে। আমি এলে আর তোঁর দরকার কি! না না, ঠাট্টা নয়, আসিস ভাই, প্লীজ। আমি শেষের দিকে এসে পড়ব'খন কিন্তু আমি নেই বলে কোন সঙ্কোচ করিস নি।'

সেই সূত্রপাত।

বেলারাণীর নিতান্ত সাধারণ চেহারা এবং ততোধিক সাধারণ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে যে কোন আকর্ষণ থাকতে পারে—সে সম্বন্ধে ওদেরও কোন ধারণা বা সচেতনতা ছিল না। ওর এ শক্তিকে যেন নূতন ক'রে আবিষ্কার করল হর্ষ। বেলারাণীকে কেন্দ্র করে বাড়িতে যে কোনদিন কোন 'মধুচক্র' গড়ে উঠবে—আর তা নিয়ে যে এত আলোচনা এত বাদানুবাদ এত ঈর্ষার সৃষ্টি হবে তা কে ভেবেছিল?

অথচ তাই তো হ'ল।

প্রথম সুব্রত। প্রথম এল সাত দিন পরে-শনিবার। তারপর এল তিন দিন পরে। তারপর দুদিন, পরে সে আসাটা প্রত্যহিক হয়ে উঠল।

সুব্রত এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কেষ্ট। কেষ্ট সুব্রতর মতো অবস্থাপন্ন নয় তবু মোটামুটি ভাল কাজই করে। তারও ঘরে বিবাহের বাধা প্রচুর। সুতরাং জীবন অনির্দ্দেশ্য, লক্ষ্যহীন, আশ্রয়হীন। সেই মরুময় জীবনে এমন একটি স্নিগ্ধ ওয়েশিস আশ্রয় আছে বা থাকতে পারে তা সে জানত না। সে যেন বেঁচে গেল এখানে আসতে পেয়ে, জীবনের যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেল।

কেষ্টকে নিয়ে এল হর্ষই একটু কৌশল করে। একা একটা অবিবাহিত 'সোমত্থ' ছেলে এসে তার তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা দেবে এ ব্যাপারটা যে খুব শোভন হবে না তা সেও বুঝেছিল। কিন্তু একাতে যে দোষ তা দুজন এলে ততটা থাকে না। সেই জন্যেই কেষ্টকে আনার প্রয়োজন তার। কেষ্টার আসা-যাওয়া শুরু হওয়াতে প্রথমটা সুব্রতর তত ভাল লাগেনি, কিন্তু পরে অবস্থাটা মেনেই নিয়েছে। চানক্য শ্লোক তার পড়া ছিল, প্রয়োজনমতো অর্ধেক ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সে বুঝত।

প্রথম যখন এই আড্ডার প্রতিষ্ঠা করে হর্ষনাথ তখন দৈনিক অশান্তি থেকে অব্যাহিত পাওয়াটাই বড় কথা ছিল তার কাছে। কিন্তু পরে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলোও উন্মিলিত হ'তে লাগল তার দৃষ্টির সামনে। সিনেমার খরচা আর এখন তার লাগে না কোনদিনই, ছোটখাটো বেড়াতে-যাওয়া-গুলোরও না। এ ছাড়া কারণে অকারণে উপহার আসে বেশীর ভাগই শাড়ি। ভাল শাড়ির জন্য আর আদৌ মাথা ঘামাতে হয় না। বেলার জন্মদিনে, ওদের বিবাহ বার্ষিকীতে এমন কি বেলার ছেলের জন্মদিনেও, তার জন্য স্যুটের সঙ্গে বিচিত্র কারণে বেলার জন্যও শাড়ি আসতে শুরু হ'ল। আরও কিছুদিন পরে দেখা গেল সুব্রতর জন্মদিনেও উপহারের ধারা বিপরীত দিকে বইছে– অর্থাৎ সে উপলক্ষেও সুব্রতই সিল্কের জামার 'পীস' ও শাড়ি আনছে, বেলা শুধু একটু মিষ্টি খাইয়ে কর্তব্য শেষ করছে।

এর প্রত্যক্ষ ফল যেটা—সেটা হ'ল এই যে, গোপনে বাবা মার হাতে মাঝে মাঝে পাঁচ দশটাকা দিতে পারছিল হর্ষ। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ ফলও একটা ছিল সে সঙ্গে—সেটাই কিছু তিক্ত। পাড়ার লোক—এ বাড়ির ও পাশের বাড়ির বিভিন্ন বাসিন্দারা অনেক দিনই ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষা শুরু করে-ছিলেন—স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে কেন্দ্র ক'রে 'মধুচক্র' বৈঠক, এমন মুখরোচক প্রসঙ্গটা ছেড়ে দেবেই বা কেন লোকে—কিন্তু এবার মা বাবাও বড় গোলমাল শুরু করলেন। এ বন্দোবস্তে যে তাঁদেরই কিছু সুবিধা হচ্ছে—চক্ষুলজ্জায় সে কথাটা কিছুতেই খুলে বলতে পারল না হর্ষ, কিন্তু সেটা তাঁদেরই বোঝা উচিত ধরে নিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল। এই সব আড় বুঝো মানুষদের কষ্ট পাওয়াই উচিত মনে ক'রে বার বার আপন মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগল যে, এবার থেকে আর এক পয়সাও দেবে না আর সে বাড়িতে। যেমন কে

তেমনি।

বাবা-মা কিন্তু ছেলের কাছে অনুযোগ করেই বিরত থাকলেন না। কেদারবাবু ক-দিন বিকেলের দিকে বেড়াতে এসে পুত্রবধূর কাছে প্রধানত শালীনতার উপর উপদেশমূলক বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। কিন্তু হর্ষর মা ওসব গৌণ পদ্ধতি বা পরোক্ষ উপদেশের ধার ধারেন না। তিনি সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তার পর কদিনই নাতিকে দেখতে আসার নাম করে সন্ধ্যাটা এদের ঘরে কাটাতে লাগলেন। তার ফলে সুব্রত ও কেষ্ট, বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে উঠল। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয় তাদের, কথাবার্তাও হর্ষর মার সঙ্গেই বলতে হয় বেশির ভাগ। সে কথা ফুরিয়ে যায় শিগ্‌গিরই। বার কতক হাই তুলে এক-আধ কাপ চা খেয়েই উঠে পড়ে তারা।

এ ভাবে চলবে না কিছুতেই, তা হর্ষও বোঝে। কিন্তু সে মুখ ফুটে মাকে কিছু বলতে পারে না। অগত্যা বেলাকেই বলতে হয়, সে একদিন শাশুড়ীকে স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'আমি বরং মা বিকেলে আপনার নাতিকে দিয়ে আসব, ও আসবার সময় আবার নিয়ে আসবে—আপনি আর সন্ধ্যার সময় এখানে থাকবেন না। ও সময় ওর বন্ধু-বান্ধবরা আসে, তারা ঠিক আপনার সামনে সহজভাবে গল্পগুজব করতে পারে না—অসুবিধা হয়!'

ওর শাশুড়ী ভুরু কুঁচকে জবাব দেয়, 'কেন বৌমা, বন্ধুর বোয়ের সঙ্গে এমন কি গল্প করবে ওরা যা গুরুজনের সামনে করা যায় না? তা হ'লে ওরা খারাপ গল্প অসভ্য কথা বলে বলো! কিন্তু সেরকম ক্ষেত্রে তো ওদের মতো বন্ধুকে তোমার ঘরেই ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় বাছা! এটা ভদ্দরলোকের বাড়ি, ভদ্দরলোকের ঘর, তুমি একজনের বিয়ে-করা বৌ—সেখানে এসে দুটো হুদ্দমুদ্দো বেটা ছেলে বসে রাত দশটা পর্যন্ত গল্প করে—যার বৌ সে যখন থাকে না তখন—এই তো যথেষ্ট নিন্দের কথা। তার ওপর গুরুজনের সামনে বলা যায় না এমন কথা যদি বলে এখানে এসে তো, তাদের তো সেইদিনই কুলোর বাতাস দিয়ে দূর করা উচিত। ..এসব কি বলছ বৌমা! দুটো পর লোকের অসুবিধে হবে বলে যার ঘরদোর সংসার তার মাকে আসতে বারণ করছ—তোমার আস্পর্দ্ধাও তো কম নয়। তাহ'লে পাড়ায় যা রটেছে তাতে কিছু সত্যি আছে বলো!'

বেলা মুখ গোঁজ করে বলে, 'ছেলের যদি মার ওপরেই এত ভরসা থাকবে তাহ'লে আলাদা হয়ে থাকবে কেন বলুন! সেইটেই তো আপনার বোঝা

উচিত ছিল। নিজের মান নিজের কাছে। আর পাড়ায় কি রটেছে না রটেছে তা আমাদের শোনবার দরকার নেই। যার বৌ সে যদি তার নিজের বন্ধুদের এনে বসিয়ে রাখে ঘরে তো আপনার কী বলবার আছে এতে তাও তো বুঝি না। যাক গে-যা বলবার আপনার ছেলেকেই বলবেন, আমাকে যা বলতে বলেছিল আমি বলে দিলুম। আমার দায়িত্ব শেষ।'

'তোমাকে এই কথা বলতে বলেছে খোকা? আমাকে থাকতে বারণ করে দিয়েছে? তা সে কথাটা সে তো সোজাসুজি বললেই পারত? বৌকে দিয়ে অপমান না করালে বুঝি মনোবাসনাটা পূর্ণ হ'ত না?···সে নিজের ঘরে বাজার বসাতে চায় এ-কথাটা আমিই জানলে সরে থাকতাম বাছা, এখানের ছায়া মাড়াতুম না।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। কিন্তু হাল ছাড়লেন না, ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে কণ্ঠস্বর বেশ উচ্চগ্রামে চড়িয়ে পাড়ার লোকের শ্রুতিগোচর-ভাবেই বহু কথা শোনালেন। পাড়ায় পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে এই নিয়ে, হর্ষ নিতান্ত অন্ধ এবং আহাম্মক বলেই কিছু দেখতে কি শুনতে পায় না। এর পর সে রাস্তায় বেরোলে ছেলেরা পেছনে পেছনে পাগল তাড়িয়ে বেড়াবে—এই তিনি বলে রাখছেন, না হয় তো সবই যেন তাঁর নামে কুকুর পোষে।

হর্ষ মুখ গোঁজ করে উত্তর দিল, 'তুমি তো ছুদিন যাচ্ছ, তাও এই মজার গন্ধ পেয়ে তাই—তোমার তো ছেলে বোয়ের জন্যে মাথাব্যথা নয়—কী হচ্ছে মজা দেখতে যাওয়া—তাও ছুদিন পরে কোমর কি পায়ে ব্যথা বাড়লে তো তামাশা দেখতেও যেতে পারবে না। আমি আসি রাত দশটায়—একা ছেলে মানুষ বাড়িতে থাকে, ওরাই তো নিত্য পাহারা দেয় এসে—তোমার ভরসায় আমি ওদের তাড়াতে পারি না তো।'

'অ। তাহ'লে বৌ সত্যি কথাই বলেছে। আমি যে যাই সেটা তোমারও অপছন্দ। কিন্তু আমি গেলে ওদের তাড়াতে হবে—ওরা আসতে পারবে না—এই বা কেমন কথা? সেইটেই বুঝতে পারছি না যে! ওরা কী এমন করে ওখানে বসে, কী এমন বলে যে—আমি থাকলে অসুবিধা হয়?'

'কী আবার বলবে! তুমি বুড়ো হয়েছ কোথায় ভাল কথা ভাববে, তা নয় তোমারই মনে যত কুচক্কর। আঁশটে গন্ধ ছাড়া খুঁজে পাও না কিছু।

অল্পবয়সী ছেলে ওরা—বন্ধুর বৌয়ের কাছে গল্প করে, সবসময় কি আর হিসেব ক'রে কথা বলতে পারে। ফষ্টিনষ্টি তো করবেই। সেটা গুরুজনের সামনে করা যায় কি ক'রে?'

এর পরও বহু কথা শুনতে হ'ল হর্ষকে। বহু কথা শোনালও সে। কিছুদিনের মতো মায়ে-বেটায় মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ হয়ে গেল। ছোট ভায়েরা মাঝে মাঝে আসত, মা তাদেরও বারণ করে দিলেন এখানে আসতে। কিন্তু মানুষ আসা বন্ধ হলেও কথা পৌঁছনো বন্ধ হ'ল না। তাঁরা যা বলেন যা বলেছেন—অন্য আত্মীয়স্বজনরা এসে তা শুনিয়ে যেতে লাগলেন। সব সময়ে সে কথাগুলো যে তাঁদের কথা তাও না, তাঁদের জবানীতে এঁদের কথাই। উপদেশ তিরস্কার ভীতিপ্রদর্শন অনেক রকমই বর্ষিত হ'ত। কেউ কেউ বা চিনির কোটিং দিয়ে কিছু রেখে-ঢেকে বলতেন—কেউ বা তিক্ত বক্তব্য সোজা-সুজি রূঢ় ভাষাতেই প্রকাশ করতেন।

বেলারাণীর মা এঁদের দলে যোগ দিতে সাহস করেন নি, অন্তত প্রকাশ্যে সোজাসুজি নয়, কারণ তাঁকে প্রতি মাসেই হাত পেতে টাকা নিতে হয় এই মেয়ের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি ছাড়া—ও পক্ষের আত্মীয়স্বজনদের কানেও কথাটা উঠতে তাঁরা মুখরোচক আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। তাঁদের তরফ থেকেও আক্রমণ চলতে শুরু হ'ল। এরা যত উড়িয়ে দেয় তাঁদেরও রোখ তত চড়ে যায়—ক্রমশ বাড়ি বয়ে এসে গালাগালি দিয়ে যাওয়াও চলতে লাগল।

আত্মীয়স্বজনও যত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন—হর্ষ যেন ততই মজা পায়। বেলাকে সে চেনে, বেলা সম্বন্ধে তার কোন সংশয় নেই। যেটুকু ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, একসঙ্গে দুজনকে গেঁথে সে সম্ভাবনাও নষ্ট করেছে সে। তা ছাড়া বেলা তো তার কাছে কিছু গোপন করে না। দুই বন্ধুর কী রকম প্রতিযোগিতা চলে বেলার মনোরঞ্জনের জন্যে, কোন উপহার দেবার সময় কার কী রকম মুখভঙ্গী হয়, কে কত আশা নিয়ে কোন্ উপহার বয়ে আনে এবং দুজনেই কেমন করে চেষ্টা করে একটু আগে অর্থাৎ অপরের অনুপস্থিতিতে এসে পৌঁছবার, বেলার একটু হাতের স্পর্শ পাবার জন্যে কী কাণ্ডটাই না করে বেচারীরা—এ সব তো বেলাই রাত্রে শুয়ে শুয়ে গল্প করে তার কাছে, বলতে

বলতে মুখে আঁচল দিয়ে কুলকুল করে হাসে। হাসে হর্ষর এই সব বন্ধুদের, তথা সাধারণভাবে সমস্ত পুরুষজাতির নির্বুদ্ধিতায়। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে হর্ষকে, 'আচ্ছা তুমিও তো এই তাহ'লে? নিশ্চয় এমনি ক'রে বেড়িয়েছ বিয়ের আগে?...এখনও কোথায় কি করছ কে জানে! আমি তো ভাবছি আমার জন্যে পয়সা রোজগার করতেই তোমার এত দেরি হয়—সে জায়গায় কোথাও চাট্টি গেলে আসছ কি না কে জানে!'

সন্দেহ প্রকাশ করার ভঙ্গী করে—কিন্তু হেসে ওঠে সে নিজেই—বলতে বলতে।

না, ওদের স্বামী-স্ত্রীর কারও পরস্পর সম্বন্ধে কোন সংশয় বা আস্থার অভাব নেই। এ যা করছে জেনেশুনেই করছে ওরা, এটা ওদের বাঁদর নাচাবার আনন্দ। তামাশা দেখা। তবে তামাশার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা এসে যায়, যৎসামান্য কিছু উপার্জনও হয় বলে এটাকে ওরা জিইয়ে রাখতে চায়।

মজা এখানে দুদিকে, এদের নাচিয়ে তো বটেই, পাড়াপড়শী—আত্মীয়-স্বজন—হিতাকাঙ্ক্ষীর দলকেও সেই সঙ্গে নাচিয়ে মজা দেখে ওরা। ওদের দুজনের বোঝাবুঝি, ওদের অফিসের দারোয়ান রায় নিহাল সিং যাকে বলে 'সমঝোতা' (শব্দটা আজকাল বাংলা খবরের কাগজেও চলছে খুব) সেটা যদি ঠিক থাকে তাহলে এ সব কোন নিন্দাকেই গ্রাহ্য করে না ওরা। বরং এদের এই বৃথা আক্রোশ, এই অকারণ মাথাব্যথা ও জ্বলেপুড়ে মরাতে একটা বাড়তি মজা উপভোগ করে ওরা, হাসির বাড়তি খোরাক খুঁজে পায় এদের নিষ্ফল উষ্মা দেখে। এরা চলে গেলে যে হাসে শুধু তাই নয়—চলে যাবার অনেক পরেও—এদের কথা মনে পড়ে হাসি পায় ওদের।

কী নির্বোধ এই লোকগুলো! আসল কথা—অত্যন্ত সহজ কথাটাও বুঝতে পারে না। নিজেরা নির্বোধ—অথচ তাদের নির্বোধ ভাবে। সেইটেই বোধ হয় ওদের সব চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা।

হেসে উড়িয়ে দেয় ঠিকই, তবু অবিরাম একই কথা শুনতে শুনতে, পথে-ঘাটে বাজারে লোকের চোখে চোখে এই বিদ্রূপের আভাস দেখতে দেখতে ক্রমশ একটা অস্বস্তিও অনুভব করে হর্ষ। বিদ্রূপটা সব সময়ে আড়ালে

ইঙ্গিতেই আবদ্ধ থাকে না—ওষ্ঠে ঘুরে শাণিত হয়ে এসে মর্মে বেঁধে। ঠিক যে তাকেই বলে তা নয়, সাধারণভাবেই মন্তব্য করে—পাড়ার ছেলেরা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে, অথবা অপেক্ষাকৃত বয়স্করা রকে বসে আড্ডা দিতে দিতে—হঠাৎ সে কাছাকাছি এলে গলাটা চড়িয়ে দেয় এক পর্দা। সে-মন্তব্য ঠিক কার প্রসঙ্গে করে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত হয়ত, হর্ষর প্রতি কটাক্ষ বলে কোনমতেই আদালতে প্রমাণ করা যাবে না—তবু সে মন্তব্যর মর্মগত অর্থ বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না, শ্রোতাদেরও নয়, বক্তাদেরও নয়—হর্ষনাথেরও নয়। চাপা হাসির হর্‌রাটা যেন পিছু পিছু তাড়া করে তাকে। কাক্‌লড্‌ শব্দটার অর্থ এতদিন জানত না—এদের পাল্লায় পড়ে সেটাও শিখতে হ'ল।

অস্বস্তিটা অবশ্য মনেই চেপে রাখে সে। বেলাকেও বলে না। মিছি-মিছি অশান্তি। তারও মেজাজটা আজকাল ঠিক থাকছে না—এটা হর্ষ লক্ষ্য করেছে। তাকে না জানিয়েই কিছু একটা করতে হবে।

অনেক ভেবে, প্রশ্নটাকে বহুদিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে সংখ্যা হিসেবে দুই অঙ্কটা বড়ই সামান্য। তার আদৌ তেমন ভার নেই। এক্ষেত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি করাই প্রয়োজন। সেটাই নিরাপদ। সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'তৃতীয়'টির অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

স্ত্রীর ব্যক্তিগত আকর্ষণ বা 'চার্ম' সম্বন্ধে তার নিজের কোন অনুভূতি না থাকলেও বন্ধুদের ভাবগতিক দেখে সে বস্তুটি সম্বন্ধে তার খুব উচ্চ ধারণা হয়েছিল। সে জিনিসটি আছে তো বটেই—আর তার শক্তিও খুব সামান্য নয়।...এই বিশ্বাস ও ধারণার ফলেই তার আত্ম-প্রত্যয়ও খুব বেড়ে গিয়ে-ছিল। এবার সে হাত বাড়াল অনেক ঊর্ধ্বে—'উদ্বাহুরিব বামন' যেমন চাঁদ ধরতে যায়—কতকটা সেই রকমই। সে তার ফার্মের ছোটসাহেবের ছেলে, মালিক শ্রেণীরই একটি তরুণকে বেশ কয়েকদিন ধরে জপিয়ে, বহু সাধ্যসাধনা করে একদিন বাসাতে নিয়ে এল।

নিজের দুঃসাহসে হর্ষ নিজেই চমকে গিয়েছিল কতকটা, বেলারাণী তো নির্বাক হয়ে গেল একেবারে। হর্ষ যে এমন আহাম্মকি করতে যাবে, এমন ভাবে নিজেদের দৈন্য ও সামান্য অবস্থা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবে নিজেই

—তা সে কল্পনাও করে নি। এই একখানা ঘরে থাকা, এই অতি সাধারণ মলিন শয্যা, ছুটো ভাঙাচোরা বেতের চেয়ার এবং দরিদ্র গৃহস্থালীর নানা রকম ডেয়োঢাক্‌না—এর মধ্যে নিয়ে এল সে মালিকের ছেলেকে। প্রকাণ্ড গাড়িখানা এসে যখন দাঁড়াল—তখন লজ্জায় মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছিল বেলার। হর্ষ তাকে একটি কথাও বলে নি, তাই—নইলে এ কাণ্ড কিছুতেই তাকে করতে দিত না বেলারাণী।

হর্ষর মাননীয় অতিথি লক্ষ্মীনারায়ণবাবুও প্রথমটা খুব অনিচ্ছাতেই এসেছিলেন। ছু'মিনিটের বেশী কোনমতেই তিনি থাকবেন না—মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর। অধস্তন কর্মচারীর একখানা ঘরের বাসায় বসে বসে চা খাওয়া তাঁদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বিশেষ এত সামান্য অবস্থায় ওরা থাকে তা আগে বুঝতে পারেন নি—তাঁর প্রথমটা যেন হাঁপ ধরেই উঠেছিল। যে ছুটি ছোকরা বসে ছিল তাদেরও আশা করেন নি তিনি—হয়ত ওরা কোথায় গিয়ে কি গল্প করবে, কথাটা কর্তাদের কানে উঠলেই মুশকিল।......কেনই বা তিনি এ আহম্মকীর মধ্যে এলেন—এই ভেবে নিজের উপর যথেষ্ট রাগ ধরেছিল। সন্তর্পণে—আল্‌তোভাবে বেতের চেয়ারটায় বসেই ঘড়ি দেখ-ছিলেন তিনি ওঠবার ভূমিকা হিসেবে।

কিন্তু তবু উঠতে পারেন নি সেই ছু'মিনিটের মধ্যে। ওঠা হয়ে ওঠে নি। বেলার এই সমস্ত ব্যাপারটায় যতই আপত্তি থাক, উনি যখন এসে একবার তার ঘরে বসেছেন তখন ধরে রাখাটা তার মর্যাদার প্রশ্ন। সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেই আটকাবার চেষ্টা করল, সে চেষ্টা সফলও হ'ল। আটকে গেলেনও লক্ষ্মীনারায়ণবাবু। দেখা গেল স্ত্রীর 'চার্ম' সম্বন্ধে হর্ষর হিসাবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। মূল্যমান নির্ণয়টা অতিরিক্ত হয় নি—বরং কমই হয়েছে।

তবু লক্ষ্মীনারায়ণবাবু সেদিন আধঘণ্টার মধ্যে বিদায় নিলেন। কিন্তু এর পরে যেদিন হর্ষ আবার অনুরোধ করল সেদিন আর বেশী পীড়াপীড়ির প্রয়োজন হ'ল না। সেদিন থাকলেনও প্রায় এক ঘণ্টা। তার পর থেকে আর নিয়ে আসবার প্রয়োজন হ'ল না—নিজেই আসতে লাগলেন। হর্ষনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল, বেলার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহার্ঘ উপহার লাভের আশায়। আর প্রত্যহ অত বড় গাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখে পাড়ার লোক এবং আত্মীয়সমাজও একটু হকচকিয়ে গেল।

হাসবার পালাটা এতদিন ঠিকই ছিল। বরং হাসির উৎসটা যেন আরও বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল ইদানীং। অকস্মাৎ সে হাসিটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। একদা অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে হর্ষনাথের চাকরিতে নোটিশ পড়ল। তাকে আর কোম্পানীর প্রয়োজন নেই।

প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস হ'ল না। তারপর মনে হ'ল তামাশা। পরে বুঝল কোথাও একটা বড় রকমের ভুল হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারল তামাশাটা ভাগ্যের। চিঠির নাম-ঠিকানায় কিছুমাত্র ভুল হয় নি।

লক্ষ্মীনারায়ণবাবু তখন অফিসে ছিলেন না। রাত্রে তাঁকে পাংশু বিবর্ণ মুখে সংবাদটা জানাল হর্ষ। তিনিও বিস্মিত হলেন। পরের দিন খবর নেবেন বললেন। আশ্বাস দিলেন, যে এর প্রতিকার একটা হবেই—এমন কখনও হ'তে পারে না।

কিন্তু পরের দিনও লক্ষ্মীবাবুকে অফিসে পাওয়া গেল না। সেদিন ওদের বাড়িতেও এলেন না। পরের দিন গিয়ে শুনল যে বিশেষ কাজে লক্ষ্মীবাবু পাটনা চলে গেছেন। অফিসেরই কাজে।

সাত-আটদিন পরে লক্ষ্মীবাবু আবার ওদের বাড়িতে এলেন। খুবই দুঃখের কথা—কিন্তু কেন যে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অমন চটেছেন হর্ষর ওপর, কিছুতেই কিছু করা গেল না। তিনি আর ওকে রাখতে রাজী নন, কোন অনুরোধ-উপরোধেই।

হর্ষ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি নালিশ করব। কেস করব ফার্মের নামে। আজকাল চাকরি যাওয়া আর সহজ নয় —'

লক্ষ্মীবাবু বললেন, 'সেটা মন্দ কথা নয় কিন্তু। তাহ'লে একটা কিছু সুরাহা হ'তে পারে। সত্যিই তো—যা খুশি তাই করবেন ওঁরা এ কী অন্যায়। ইউনিয়ন নেই যে আপনাদের অফিসে, তাহ'লে আপনার খরচ কম লাগত, তবু আমি বলি কি লাগিয়েই দিন। ভাল দেখে উকীল দেবেন কিন্তু—। ভয় নেই, আমি পিছনে আছি।'

হর্ষ উৎসাহিত হয়ে কেস করল। কিন্তু তাতে বেশ খানিকটা পয়সাই খরচ হয়ে গেল শুধু। গোড়াতেই গলদ ছিল একটা। ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট

লেটারে ছিল তখনকার মতো ছ মাসের জন্য নেওয়া হচ্ছে ওকে। তারপর সহজেই চাকরি করে গেছে, মাইনেও বেড়েছে কিছু কিছু—কন্‌ফার্মেশ্যান চিঠিটা চেয়ে নেবার কথা হর্ষর মনে পড়ে নি। তাছাড়া—কোম্পানী ওর নামে যে সব অভিযোগ আনলেন—কাজে গাফিলতি ও ইচ্ছাপূর্বক কোম্পানীর অনিষ্ট করবার—তা প্রমাণ হয়ে গেল অফিসেরই কটি বাঙ্গালী কর্মচারীর সাক্ষ্যের জোরে। ফলে হর্ষ হেরে তো গেলই—খরচটাও পেল না। আদালত দয়া করেই—মালিকের পক্ষে খরচের ডিগ্রিটা দিলেন।

এর পর একেবারেই চোখে অন্ধকার দেখল।

যে আয়ে তাকে চালাতে হয়েছে তাতে টাকা জমানো সম্ভব নয়, হর্ষরও জমে নি। অফিস থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল তার বেশীর ভাগই মামলায় চলে গেছে। লক্ষ্মীবাবু বলেছিলেন আপীল করতে—কিন্তু ততক্ষণে হর্ষনাথের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়েছে, সে আর সে-পথে পা বাড়াল না।

চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল হর্ষ বোঁ বোঁ ক'রে। কিন্তু এই অফিসের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়েই যা কিছু অফিস-পাড়ার সঙ্গে পরিচয় তার। দেখেশুনে মামলা-করা কেরানীকে কেউ অফিসে ঢোকাতে রাজী নয়। লক্ষ্মীবাবুও মুখটা ভার ক'রে বললেন, 'তাই তো, তখন তো অতটা ভেবে দেখা যায় নি, কাজই একটু খারাপই হয়ে গেছে। মামলাটা না করলেই হ'ত। যা দিনকাল, ঝগড়াটে লোক জেনে গেলে আর কেউ ঘরে ঢোকাতে চাইবে না। তাই তো—'

পার্ট-টাইম কাজটা অবশ্য ছিল—কিন্তু তার আয় তো ঘর-ভাড়াটা দেবার পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। টিউশনীর বাজারে তার দাম নেই কিছুই, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পনেরো-কুড়ি টাকার বেশি পাওয়া গেল না। ইস্কুল-মাস্টার নয়, গ্র্যাজুয়েটের ডিগ্রি নেই—তাকে কে উঁচু ক্লাসের ছেলে পড়াতে দেবে?—আয় প্রায় কিছুই নেই, অথচ প্রত্যহের প্রয়োজন ঠিকই আছে। সেটাকে অনেক মেজেঘষে, অনেক কষ্ট করে কমিয়ে যা দাঁড় করানো গেছে তাও ভয়াবহ।

এবার সত্যিই বন্ধুদের কাছে হাত পাততে হ'ল হর্ষকে।

তারা দিলেও অবশ্য কিছু কিছু। দিতে শুরু করেছিল চাকরি যাওয়া থেকেই। কিন্তু স্বেচ্ছায় দু'একটা উপহার দ্রব্য কি শাড়ি এনে দেওয়া এক

জিনিস আর নিয়মিতভাবে সংসার টেনে যাওয়া আর এক। তাদের সে সাধ্যও ছিল না। তারা উশখুশ করতে লাগল। পালাবার রাস্তা খুঁজতে শুরু করল।

এরই মধ্যে হর্ষকে একদিন শুনতে হ'ল যে—সকাল করে তার বাড়ি ফেরাটা বাঞ্ছনীয় নয় এখন, (মূল চাকরি চলে যাওয়াতে পার্ট-টাইমটা কিছু সকাল করে সারছিল হর্ষনাথ) সে যেন একটু দেরি করেই আসে সে এসে ঘর জুড়ে বসে থাকলে তার বন্ধুদের আর ধরে রাখা যাবে না।

একদিন মাকেও এই কথা শুনতে হয়েছিল, না? কে জানে, তা আর হর্ষর মনে নেই। সে কিন্তু এবার আর হাসতে পারল না, বরং যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যা নয় তাই বলে গালাগালও দিল বেলাকে, বন্ধুদেরও।

বেলা বলল, 'বেশ তো—তা ওদের বারণই ক'রে দিও না বাবু আসতে। কী দরকার বা। আর কদিনই বা আসবে? বাড়ীও'লা শুনিয়ে গেছে এখনকার আইনে সবটাই ভাড়াটের সুবিধে বটে—যদি ভাড়াটা ঠিকমত দিয়ে যায়। তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়লে আর কোন পথ নেই, বাড়ীও'লা যে কোন দিন উঠিয়ে দিতে পারে।···আমাদের নাকি বেশ ক'মাস বাকী পড়েছে?'

খুব সরল প্রশ্ন। কোন প্রকার আবেগ বা উষ্মা বা জ্বালা নেই কণ্ঠস্বরে। কিন্তু তাতেই যেন হর্ষ গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

সেদিন চাকরি সেরে বহুক্ষণ পথে পথে ঘুরে যখন রাত দশটায় বাড়ি ফিরল হর্ষ—তখনও তার ঘরে হাসির হুল্লোড় চলেছে। অনেকদিন পরে লক্ষ্মীবাবুর গাড়িটা দেখতে পেল। বাড়ি ভাড়ার টাকাটা কি চাইবে সে তাঁর কাছে? পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে, দুশ' টাকা প্রায়। বাড়িও'লা নালিশ করেই দিয়েছেন হয়ত—নয়ত দু-একদিনের মধ্যেই করবেন।···

মন স্থির করতে পারল না হর্ষ। বাইরে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ চুপ করে। লক্ষ্মীবাবু বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে চলে গেলেন। সুব্রতরা বোধ হয় আগেই চলে গিয়েছিল।

খাওয়াদাওয়ার পর সুসংবাদটা দিল বেলা, দুখানা একশ টাকার নোট হর্ষর সামনে মেলে ধরে বলল, 'আজ ওরা কেউ ছিল না, আমি মুখ ফুটে চেয়েই নিয়েছি। ভাড়াটা তো দিয়ে দাও। খাই না-খাই মাথার ওপর আচ্ছাদনটা থাক। মনে আছে আমার রমেশবাবুরা একবার এক ভাড়াটেকে

আদালতের পেয়াদা লাগিয়ে পথে বার করে দিয়েছিলেন, হাঁড়িকুঁড়ি বাক্স বিছানা নিয়ে শুকনো মুখে রাস্তায় বসে ছিল বৌটা—সেই থেকে ওটা আমার বড্ড ভয়।'

যন্ত্রচালিতের মতোই টাকাগুলো স্ত্রীর হাত থেকে নিল হর্ষ। কে জানে কেন মনে হচ্ছিল ওর—সংবাদের এই শেষ নয়, আরও আছে।

বেলা সত্যিই বলল আবার, 'আরও একটা ভাল খবর আছে। লক্ষ্মীবাবু এখান থেকে পাটনা চলে যাচ্ছেন—ওখানকার অফিসের সর্বেসর্বা হয়ে। বলেছেন ওখানে গিয়ে বসলে তোমাকে ঐ অফিসে ঢুকিয়ে নেবেন। ওখানে নাকি আর ওঁর ওপর বোল্‌নেও'লা থাকবে না কেউ। এই মাসের শেষেই উনি চলে যাচ্ছেন।'

সু-খবর সন্দেহ নেই। তবু হর্ষর আড়ষ্টতা ঘোচে না কেন কে জানে!

বেলা ওদিকের বিছানাটা টেনে ঘুমন্ত ছেলেকে নেড়ে শোওয়াতে শোওয়াতে বলল, 'এই শনিবারটা বাপু তোমাকে সকাল সকাল করে এসে ছেলে সামলাতে হবে। আমি সেদিন থাকব না······লক্ষ্মীবাবু অনেক করে বলে গেছেন, কে এক ওদের দেশের নাচিয়ে এসেছে, ওঁর বাগানবাড়িতে নাচগান হবে—সেই সিঁথির কাছে কোথায় ওদের বাগানবাড় আছে—সে নাচ আমাকে না দেখালে নাকি চলছে না লক্ষ্মীবাবুর!·····বলছেন ও জিনিস টিকিট কিনে নিউ এম্পায়ারে দেখতে পাবে না কোন দিন।···সন্ধ্যাবেলা গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন—রাত দশটার মধ্যে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। বলছেন তো দোষের কিছু নেই, জেদ করছেন—আমি আর না বলতে পারলুম না। তুমি একটু বাড়িতে থেকে খোকাকে দেখো আর—' একটু থেমে মুচকি হেসে বলল, 'তোমার বন্ধুদেরও সামলিও।'

সে আবারও হাসল একটু এবার বেশ শব্দ করে।

কিন্তু কে জানে কেন—সে হাসি আর হর্ষর মনে বা মুখে আজ কোন প্রতিধ্বনি জাগাল না। সে চুপ ক'রে বসেই রইল নোট দুখানা হাতে নিয়ে।

ভীমরতি

প্রাণশরণ পালের গল্প আমি এর আগেও লিখেছি। ঠিক নাম করে লিখি নি—গল্প হিসাবেই লিখেছি। তবে ষোল আনাই সত্য। আমাদের গ্রামের মিডল্ ইংলিশ ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। বিয়াল্লিশ বছর একটানা চাকরি করে যখন 'রিটায়ার' করেন তখনও তাঁর মাইনে পঁয়ত্রিশের উপর ওঠে নি। ইস্কুলে পেন্‌সন্ নেই, তবু তাঁর এই দীর্ঘদিনের 'সার্ভিস'-এর কথা চিন্তা ক'রে কমিটি বিশেষ রেজল্যুশনে মাসিক সাত টাকা পেন্‌সনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তবে এসব জাগতিক ব্যাপার নিয়ে প্রাণশরণবাবু মাথা ঘামাতেন বলে কেউ শোনে নি। তার থেকে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় তাঁর কাছে নেসফীল্ডের ইংরেজী ব্যাকরণের সূত্র। গৃহে কি হচ্ছে তা গৃহিণীই জানেন। একটি মাত্র মেয়ে, সে কতকটা পরের সাহায্যেই লেখাপড়া শিখেছিল। পাঁচজনের আনুকূল্যেই পার হয়েও গেছে। উনি নিশ্চিন্ত। অবশ্য পার না হলেও উনি যে খুব বিচলিত হতেন তা নয়। ওঁর উদ্বেগ অশান্তি অন্য ব্যাপারে। ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে কোন ভুল থাকল কিনা, অথবা কোন শিক্ষক পড়ানোয় ফাঁকি দিচ্ছেন কিনা—এই হচ্ছে তাঁর দুশ্চিন্তার প্রধান ও প্রবল কারণ। কোন ছাত্র—অবশ্য ভাল ছাত্র, মোটামুটি যারা শতকরা পঞ্চাশের উপর নম্বর পায়—যদি 'হাফইয়ারলি'তে কোন বিষয়ে সত্তর পেয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় তাতেই চৌষট্টি পেল, তাহলে আহার নিদ্রা ভুল হয়ে যেত প্রাণশরণবাবুর। কেন সে এই ছ নম্বর কম পেল তা যতক্ষণ না বার করতে পারতেন ততক্ষণ স্বস্তি থাকত না।

মনে পড়ছে এই মাস্টার মশায়টির কথা?

সেই যে, এর আগেও লিখেছিলুম—একবার বিখ্যাত ইংরেজীনবিশ জে. এম. ব্যানার্জির নামে প্রকাশিত এক প্রাইমারি বইতে 'ইন দি সান'-এর জায়গায় 'আণ্ডার দি সান' ছাপা হয়েছিল বলে ওঁর নিজের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল এবং আশেপাশের বাকী সকলের জীবন উনি দুর্বিষহ করে

তুলেছিলেন। জে. এম. ব্যানার্জি ভুল লিখেছেন একথা বলার সাহস নেই। অথচ এতকাল ধরে যা শিখে এসেছেন সেই নেস্‌ফীল্ডের গ্রামার ভুল, তাই বা মেনে নেন কী করে? শেষে অনেক খুঁজে খুঁজে ক'লকাতায় গিয়ে দেখা করতে ব্যানার্জি সাহেব জিভ্‌ কেটে যখন বললেন যে, এটা অমার্জনীয় ভুল, তখন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। তেমনি আবার যখন শুনলেন যে এসব বই ব্যানার্জি সাহেবের লেখা নয়, অপরে লিখে দেয়, তিনি নামটা ভাড়া খাটান মাত্র, তাতেই এমন ভুল সম্ভব হয়েছে, তখন পাল মশায় কেঁদে ফেললেন ওঁর সামনেই। জে. এম. ব্যানার্জির মতো লোক তাঁর নাম ভাড়া খাটান, আর তাঁর নামে এইসব ভুল চলে যায়,—এ যে কতখানি মর্মান্তিক দুঃখের ব্যাপার তা মাস্টারমশায় ব্যানার্জি সাহেবকে বোঝাবেন কী ক'রে।

এবার মনে পড়ছে প্রাণশরণ পালের কথা?

কিন্তু এ তো আগেই বলেছি। শুধু সেই লোকের কথাই লিখতে বসেছি—এইটে বোঝাবার জন্যেই এ কাহিনীর পুনরুক্তি।

আজ অন্য গল্প শোনাব ওঁর।

ছাত্রদের—বিশেষ ভাল ছাত্রদের—ভালবাসতেন তিনি, তা আগেই বলেছি। কিন্তু অনেক সময় সেটা পাগলামির স্তরে পৌঁছত সেই কথাটা বলা হয় নি।

কেমন শুনবেন?

সেবার তাঁর একটি প্রাক্তন ছাত্র, হাইস্কুল-কলেজের সব পরীক্ষায় পাস করে অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে গেল। উনি দীর্ঘকাল তার কোন খবর রাখতেন না, রাখা সম্ভব নয়। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত ওঁর স্কুলের দৌড়। তার পর চার বছর আরও স্কুল, চার বছর কলেজ—এই আট বছরই দেখা-সাক্ষাৎ নেই বলতে গেলে। দৈবাৎ সেদিন ছেলেটির বাবার সঙ্গে বেলেঘাটা স্টেশনে দেখা হয়ে গেল, তাঁর মুখেই শুনলেন খবরটা।

ওঃ, তার পর সে কি দুশ্চিন্তা প্রাণশরণ পাল মশায়ের।

'সৌরেনের সব ভাল—কিন্তু টির মাথা কাটতে আর ছোটহাতের আইয়ে ফুটকি দিতে কিছুতে মনে থাকে না যে ওর। কী হবে! ওতেই তো নম্বর কমে যাবে।' প্রথম প্রথম ওঁর উদ্বেগে কেউ কান দেয় নি। তামাশা মনে করেই নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল ওঁর প্রশ্নটা তামাশা নয়,

নিজের জীবন-মরণের প্রশ্নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি সত্যিই ওঁর আহার নিদ্রা লোপ পেল যেন। একে বলেন, ওকে বলেন, পাড়ায় ওঁর এক অধ্যাপক ছাত্র ছিলেন বিভূতিবাবু বলে, তাঁর কাছে ছুটে যান। সেই এক কথা—'কী হবে? হয়তো খুবই ভাল লিখবে, ছেলে তো ভাল, কিন্তু ওতেই তো সব নম্বর কাটা যাবে।'

শেষ পর্যন্ত ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুলস্‌-এর কাছে গেলেন—ওঁদের কাছে ইনিই বিধাতা ছিলেন সেকালে, কিন্তু তিনিও হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা। বললেন—'আপনার দেখছি মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। কত বয়স হ'ল আপনার? ভীমরতি তো শুনেছি, সাতাত্তর বছরের সাত মাসে পৌঁছলে তবে হয়। সে বয়স তো হয় নি এখনও। যদি ওতেই সব নম্বর কাটা যায় তো এতকাল ফার্স্ট হ'ল কি করে? তা ছাড়া আপনি যখনকার কথা জানতেন তার থেকে এতদিনে অনেক ইমপ্রুভ করেছে নিশ্চয়। যান যান, আপনি বাড়ি যান। এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আর তাই যদি হয়, এত অমনোযোগীই যদি হয়, তার পরীক্ষায় ফেল করাই উচিত। আপনি আর কি করতে পারেন! আপনাকে তো আর পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেবে না। ভেবেই বা লাভ কি।'

বলা বাহুল্য, এ কথাতে কোন সান্ত্বনা পেলেন না প্রাণশরণ পাল। দু-তিন দিন ক্রমাগত ছট্‌ফট করে শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে সৌরেনের বাবার সঙ্গে দেখা করলেন এবং দিল্লীতে সৌরেন কোথায় উঠেছে খবর নিয়ে সেই ঠিকানায় একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলেন, "মাইণ্ড ইয়োর টিজ অ্যাণ্ড আইজ।"

এই সৌরেনকেই আমি একদিন দেখেছি—প্রাণশরণবাবু তাঁর হতদরিদ্রের সামান্য বাজার নিয়ে ঠুক ঠুক করে বাড়ি ফিরছেন—ঘ্যাঁচ করে একটা প্রকাণ্ড মার্কিন গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে এসে প্রাণশরণবাবুর ছেঁড়া কাদামাখা কেডস্‌ জুতোপরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। সেদিন আনন্দে গর্বে প্রাণশরণবাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। এর চেয়ে বেশী কোন পুরস্কার তিনি জীবনে চান নি, পেলেন কিনা তা নিয়েও কখনো ভাবতে বসেন নি।

প্রাণশরণবাবু রিটায়ার করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখেই। তখন জীবনযাত্রার ব্যয় একরকম ছিল। ক্রমশঃই তার অঙ্ক লাফিয়ে বেড়ে গিয়ে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। নতুন একশ্রেণীর উচ্চ

মধ্যবিত্ত দেখা দিল—যা-কিছু সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য, আয়েসের ও বিলাসের উপকরণ তাদের ঘরে গিয়েই উঠল। প্রাণশরণ এদের কোনো দলেই পড়েন না। তাঁর সাত টাকা পেন্‌সন্‌ আর দু-তিনটি প্রাইভেট টিউশনি ভরসা—মোট আয় চল্লিশ টাকার বেশী নয়। তাতে সেদিনে কোনমতে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলত যদিবা, আর কোন বাড়তি খরচ করা সম্ভব হ'ত না। যে মাটির ঘরে থাকতেন তার চালের গোলপাতা পচে গলে গিয়ে বড় বড় গবাক্ষের সৃষ্টি করল, দেওয়ালের গোড়ার মাটি ধুয়ে বেরিয়ে সব ঘরটাই হেলে পড়ল একদিকে, কিন্তু তার কোন সংস্কার করা সম্ভব হয়ে উঠল না।

এর ভিতর তাঁর একটি ছাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরাধে জেলে আটকা পড়েছিল। খবরটা আগেই শোনা ছিল। হঠাৎ একদিন যেন কার মুখে শুনলেন যে বন্দী ছেলেটি জেল থেকেই পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়েছে এবং সেইভাবেই তৈরী হচ্ছে। ভাল খবর সন্দেহ নেই, তবে এতে আর আমাদের কি? কিন্তু মাস্টারমশায় ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠলেন, 'এই ছ্যাখো, এতদিন ও পাট নেই, রজত কি পারবে নিজে নিজে পড়াশুনো করে পরীক্ষা দিতে? তা ছাড়া খুব স্মার্ট ছেলে তো ও কোনদিনই নয়, বরাবরই ওর উপর নজর রাখতে হ'ত। তবে হ্যাঁ পড়ায় মন আছে, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে, ওর সঙ্গে লেগে থাকলেই ভাল রেজাল্ট করবে। কিন্তু ওখানে কে ওকে সাহায্য করবে। ওরা কি প্রাইভেট টিউটর রাখতে দেবে?'

ইদানীং ওঁর এই পাগলামিতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গিছল, কেউ আর কান দিত না, এমন কি ওঁকে বুঝিয়ে যুক্তি দিয়ে নিরস্ত করারও চেষ্টা করত না। মাস্টার মশায়ও তা জানতেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি অন্য কাউকে কিছু না বলে সটান পাঁচ মাইল হেঁটে আলিপুর জেলে ধাওয়া করলেন এবং দিন দুই এমনি ঘোরাঘুরির পর একদিন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের দেখাও পেলেন।

ওঁর বক্তব্য শুনে সাহেব তো হতভম্ব। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল তাঁর কথাটা বুঝতেই। প্রাণশরণবাবুর বিশ্বাস, তিনি বেশ গুছিয়ে অকাট্য যুক্তি দিয়েই কথাটা পেড়েছেন, কোথাও কোন ভুল বোঝার অবকাশ থাকে নি, কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাটা ধরতে পারলেন না। তার কারণ, এ ধরনের আর্জি কারও থাকতে পারে, কেউ এমন প্রস্তাব করতে

পারে এইটেই তো তাঁর ধারণার অতীত।

অবশেষে যখন বুঝলেন যে লোকটা তামাশা করছে না, তখন তিনি রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। মনে মনে প্রাণপণে শুধু এ লোকটার কি কি বদ মতলব থাকতে পারে—স্পাই কিনা, কিম্বা এদের দলেরই লোক কোন ছুতোয় ভিতরে এসে এদের সাহায্য করতে চায়—তাই বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অনেক জেরা করে অনেক রূঢ় কথা বলেও এই আজব লোকটার ফন্দির তল পেলেন না যখন, তখন ওপরওলাদের জিজ্ঞাসা করে জানাবেন—এই অজুহাতে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন।

তবে এইটুকু বাধাতেই নিরস্ত হবেন—প্রাণশরণ মাস্টার মশায়ও তেমন লোক নন। তিনি আবার নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে হাজির হলেন। সেদিন সাহেব দেখা করলেন না, সুতরাং ফের তার পরের দিন। এবার লোকটা নাছোড়বান্দা জেনেই সাহেব ওর সম্বন্ধে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলেন যে তাঁর নিজের বড় সম্বন্ধী, দেড় হাজার টাকা মাইনের অফিসার, এই আধ-পাগলা লোকটার ছাত্র এবং তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। তিনি বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ওঁকে যেখানে খুশী থাকতে দিতে পার চারু, লেখাপড়ার বাইরে যে অন্য কোনও জগৎ আছে তার কোন খবরই রাখেন না উনি। ওঁর কোন পলিটিক্যাল মোটিভ্ আছে একথা শুনলে ওর ছাত্র মাত্রেই হাসবে।'

অতঃপর উনি সপ্তাহে নিয়মিত তিন দিন যেতে লাগলেন। সব বিষয়ে পড়ানোর যোগ্যতা ছিল না, তবে ইংরেজী ও অঙ্কটা ভালই জানতেন। ফলে শুধু ঐ একটি ছাত্রই নয়, আরও অনেক কটি জুটে গেল। জেলখানায় সময়মত যেতে হয়, গাড়িভাড়ার পয়সা নেই, অতটা পথ হেঁটে বাড়ি ফেরা (যাওয়া তো বটেই), ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে যেত। অন্ধকার পথ-ঘাট। তবে এসব সামান্য অসুবিধেয় উনি কর্তব্যকর্ম থেকে বিচলিত হবেন—মানে, উনি যা কর্তব্য বলে জানেন—এমন দুর্বলতা ওঁর কোনকালেই ছিল না, হঠাৎ দেখা দেবে তা সম্ভব নয়। শরীর খারাপ হয়েছে সাবধান হওয়া উচিত, এ প্রসঙ্গ কেউ তুললে উত্তর দিতেন, 'শরীরের আর অপরাধ কি বলো। অনেক দিন তো হ'ল! এখন যেটুকু খাটতে পারে তাইতেই খুশী থাকা

উচিত।' যেন সেইটেই প্রশ্নকারীর আসল দুশ্চিন্তা—আশানুরূপ কাজ হচ্ছে না বলে। শরীর খারাপের জন্যে বিশ্রাম করা, কি কম পরিশ্রম করা দরকার —সেই কথাই এরা বোঝাতে চায়, এমন আজগুবী ধারণা ওঁর মাথাতেই যেত না। এই কাজটা যে স্রেফ ভূতের বেগার দেওয়া, অপটু শরীর নিয়ে সে বেগার দেওয়ার কোন যুক্তিই নেই—কে তাঁকে বোঝাবে ?

তবু একদিন বুঝতেই হ'ল যে, দুটোয় নিবিড় যোগাযোগ আছে। শরীর ভাল থাকলে তবেই পড়ানো-রূপ-বেগার দেওয়ার বিলাস সম্ভব।

হঠাৎই একদিন ছানি পড়তে শুরু করল, দু'চোখেই একসঙ্গে। আর অনশন-অর্ধাশন-জীর্ণ শরীর বলেই কিনা কে জানে, সে ছানি দ্রুত বাড়তে লাগল, মাস তিনেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে গেল দৃষ্টি। আব্ছা আব্ছা মানুষগুলোর আদল এবং দিন কিংবা রাত্রি—আলোর আভাসে এইটুকু বোঝা ভিন্ন আর কিছুই দেখার অবস্থা রইল না।

পয়সা নেওয়া টিউশনি অনেকদিনই বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ আজকাল যাঁরা ভাল পয়সা দেন তাঁরা ইস্কুল-মাস্টার খোঁজেন। তা ছাড়া, ঐ ভাঙা মাটির দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসে ছাত্ররাও পড়তে নারাজ। ইদানীং যারা আসত, নিঃসম্বলের দল, নীচের ক্লাসের ছাত্রই বেশি। তাদের মাসে চার টাকা ক'রে দেবার কথা,—কোচিং ক্লাসের মতো করেছিলেন কতকটা—কেউই প্রায় দিত না। উনিও পয়সার তাগাদা করতেন না, পাছে এরা আসা বন্ধ করে।

এই বেগারের ছাত্রদের জন্যই কিন্তু মাস্টার মশায় বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। দু'চার জন প্রাক্তন ছাত্র মাসিক চাঁদা করে ওঁর সংসার চালাত, মাসে ষাট-সত্তর টাকার মতো তুলে দিত। ওঁর পত্নী একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন বলে, মেয়ে একটা ঠিকে-ঝিয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। সুতরাং বেশী সাধ্য ছিল না মেয়েরও। মাস্টার মশায় এইসব প্রাক্তন ছাত্রদেরই ধরলেন, হাসপাতালে ব্যবস্থা ক'রে অন্তত একটা চোখ কাটিয়ে দিতে। নিয়েও গেলেন তাঁরা, কিন্তু এইখানে ভগবানের চরম মার অপেক্ষা করছিল ওঁর জন্যে। ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, শরীরের যা অবস্থা অপারেশন করা নিরর্থক। করলেও চোখের দৃষ্টি আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আপনারা ভাবছেন, এতেই ভেঙে পড়লেন প্রাণশরণবাবু, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন করলেন ?

তা যদি ভেবে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে কিছুই চেনেন নি ওঁকে আপনারা।

পড়ানো তো বন্ধ ছিলই না, মুখে মুখেই যতটা সম্ভব পড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তবু কদিন চুপচাপ বসে থাকার পর এক প্রাক্তন ছাত্র, এক জিলা স্কুলের হেড-মাস্টার, প্রণব কুণ্ডুকে গিয়ে বললেন, 'বাবা বেচু, একটা কথা বলছি। আচ্ছা, ব্লাইণ্ড স্কুলে ভর্তি না হয়ে কি ব্রেল্‌টা শেখা যায় না ? ওখানকার কোন মাস্টার মশায়কে বলে একটু ব্যবস্থা করে দিতে পারিস না ?'

'সে কি ! এ বয়সে ব্রেল শিখে আপনি কি করবেন ?' প্রণববাবু তো অবাক ! 'আপনি তো চাকরি করতে যাবেন না।'

'না, তা নয়। তবু পড়াশুনোটা তো থাকে।···চাই কি পড়তে পারলে পড়াতেও পারব।'

'ক্ষেপেছেন আপনি ! এখন এই ছিয়াত্তর-সাতাত্তর বছর বয়সে ব্রেলে বই পড়ে কী পড়াবেন ? আপনি যা পড়াবেন তাতে ওসব কি কাজে লাগবে ? সেসব বইও আলাদা, ব্রেল শিখলেও সাধারণ বই হাত বুলিয়ে পড়তে পারবেন না। যারা পাস করবে, নিজেরা লেখাপড়া শিখবে তাদের জন্যেই ও বই।··আর অনেক তো পড়ালেন মাস্টারমশায়, দু-চারটে দিন এবার বিশ্রাম করুন না।'

প্রাণশরণবাবুর চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন, 'কারও যদি কোন কাজেই না এলুম তো বেঁচে লাভ কি বল্‌।···চোখ যাওয়ার থেকে প্রাণটা গেলেই ভাল হ'ত।'

প্রাণশরণবাবু সাম্প্রতিক বিনাপয়সার এক ছাত্রের কাঁধে হাত দিয়ে চলে এলে, প্রণববাবু বড় ছেলেকে বললেন, 'এবারে স্যারের সত্যিই ভীমরতি হয়েছে।···আর সে বয়সও তো হ'ল। পড়ানো পড়ানো করে ক্ষেপে গেলেন একেবারে। আমরা তো গাধাঠ্যাঙানো থেকে অব্যাহতি পেলে বাঁচি।'···

এইটুকু অনাশ্বাসেই প্রাণশরণবাবু হাল ছাড়তেন কিনা সন্দেহ, নিশ্চয়ই আরও দু'চার জনকে গিয়ে ধরতেন, হয়তো শেষ পর্যন্ত অন্ধ-বিদ্যালয়েই চলে যেতেন। কিন্তু ভগবানের বোধ হয় এবার ওঁর কথাটা মনে পড়ল, তিনি

এই উৎকট নেশার হাত থেকে ওঁকে রক্ষা করলেন।

ওঁর স্ত্রী হিসেব ক'রে বলেছিলেন পরে, ঠিক ভীমরতির দিনটাতে অর্থাৎ সাতাত্তর বছর সাত মাস সাত দিনের দিন একেবারেই বিশ্রাম নিলেন। 'বুকটায় কেমন ব্যথা করছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো'—এর বেশি আর কিছু বলতে পারেন নি ; স্ত্রী উঠে হাত বুলিয়ে দেবার জন্যে অপেক্ষা করতেও না। মৃত্যু পাঁচ-ছ মিনিটের বেশি সময় দেয় নি। এই শ্রেণীর আধপাগল হতদরিদ্র অকিঞ্চিৎকর লোকের জন্যে এর বেশি সময় দেবার মতো অবসর এমন কি বোধ করি মৃত্যুদেবতারও নেই।

আশাতীত সৌভাগ্য

লোকে শুনলে বলবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল। বললও অনেকে, যারা জানে ভেতরের কথা। কিন্তু কার প্রায়শ্চিত্ত কে করল—সে প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল না। হয়ত আরও বহুকাল পরে পাওয়া যাবে—হয়ত অন্য ঘটনায়। ওদের জীবনের অন্য পরিণতিতে। আসল প্রায়শ্চিত্ত তোলাই রইল, সম্ভবতঃ সেটা অপর কাউকে করতে হবে।

অথবা, এমনিই হয় জীবনে, একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপরকেই করতে হয়। ময়নাও তাই করল। তার বাপের পাপ, তার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্তই করল সে।

আবার ভাবি, প্রায়শ্চিত্ত—না এটা তার মুক্তি !···কে জানে, কোন দিন তার দেখা পাওয়া যাবে কিনা আর—সে বেঁচে আছে কিনা। যদি থাকে আর যদি দেখা পাওয়া যায়—তবেই বোঝা যাবে সে কি পেল, কি করল।

অত কিছু ভেবে যায়ও নি সে। সহ্য করতে পারে নি, আর সহ্য করা সম্ভব ছিল না বলেই সে চলে গেছে সেদিন। একবস্ত্রে, হয়ত বা কপর্দকশূন্য অবস্থাতেই। কোথায় গেছে, বেঁচে আছে না আত্মহত্যা করেছে, তা অবশ্য কেউ জানে না।

খোঁজ-খবরের অবশ্যই কোন ত্রুটি হয় নি। তার স্বামী ভবেশ, নিমু, ছেলে পরিমল—সবাই খুঁজেছে। খুঁজেছে বন্ধু-বান্ধবের দল। আত্মীয়-

স্বজন সকলেই। এমন কি, যারা দীর্ঘকাল ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি, ওদের এই অনাচারকে পাপ মনে ক'রে দূরে পরিহার করেছে ওদের সঙ্গ—তারাও এই সংবাদে ছুটে এসেছে। খোঁজ-খবর করার চেষ্টা করেছে। থানা হাসপাতাল—নিকট-দূর সকল আত্মীয়-বাড়ি, কোনটাই বাদ পড়ে নি। ক্ষীণতম সূত্রও যেখানে আছে, সম্ভাব্য আত্মীয় বলে এমনিতে যাদের কথা ভাবাই যায় না—নিরাশার আশা হিসেবে সে-সব স্থানেও খোঁজ করা হয়েছে। থানায় ডায়েরী করার রসিদ নিয়ে রেডিওতে প্রচার করানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়েছে নিমু—কিন্তু কোথাও থেকে কোন খবর পাওয়া যায় নি। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল একেবারে, কর্পূরের মতো উবে গেল।

অবশেষে একদিন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন সকলে যে, সে ডুবেই মরেছে। এ অন্তর্ধান আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়।

যেদিন গেছে সেদিন গঙ্গায় বড় রকমের বান আসবার কথা। দুপুরের একটু পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে, গঙ্গায় পৌঁছতে যতটা সময় লাগতে পারে হিসেব করলে দেখা যাবে—সময়টা বান আসবার বিজ্ঞাপিত সময়ের সঙ্গেই মিলে যায়। সেই বানের মধ্যেই জলে নেমেছে নিশ্চয়। তারপর ভেতরের চোরা বানে তলিয়ে গেছে। যথাসময়ে ভাঁটার প্রবল টানে দেহটাকে বহুদূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ফেলেছে—হয়ত হাঙ্গরেই খেয়েছে আর তা না খেলেও অনেক দূরে কোথাও গিয়ে কোন্ জঙ্গলের ধারে আটকেছে—কলকাতার কাছাকাছি তার সন্ধান মেলে নি সেই কারণেই।...

কিন্তু কে জানে কেন আমি এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারি নি। আমি যতদূর জানি ময়নাকে—দীর্ঘ আটাশ-উনত্রিশ বছর ধরে তাকে যা দেখেছি—তাতে ঠিক এ পরিণাম ভাবা যায় না। মূর্তিমতী সহনশীলতা বলে যদি কিছু থাকে পৃথিবীতে—ময়নাই সেই বস্তু। ছোটবেলা থেকে ভগবানের মার খেতে খেতে সে পাথর হয়ে গেছে, তার এই মুখ বুজে সহ্য করাটাই যেন ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, অভিযোগ করায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই যদি তারও সহ্যের সীমা কোন কারণে অতিক্রান্ত হয়ে থাকে, সে আত্মহত্যা করবে না। এ জীবনের শেষ না দেখে—ভগবানের আরও কত মার থাকতে পারে তা না দেখে যাবে না।

হয়ত কোনও তীর্থে, দেবমন্দিরে গিয়ে সেবার কাজ নিয়েছে। নয়ত কোন দূর প্রবাসে গিয়ে কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে দাসীর কাজ করছে। শান্তভাবে প্রতীক্ষা করছে তার সৃষ্টিকর্তা কখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তাকে আঘাত দিতে দিতে—সে সেই অবসরে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবে—'কেন, কি এমন করেছিলুম আমি যে, আমার ওপরই তোমার এত আক্রোশ!' আর জানতে চাইবে ইহলোকের এই অবিশ্বাস্য দুঃখেই তার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল কিনা।

ভগবানের মার বৈকি! এত দিয়েও এমনভাবে বঞ্চিত করতে এক সেই বিধাতাই পারেন। মানুষ এতটা কঠোর, এতটা নির্মম হ'তে পারে না বোধহয়।

অথচ—দুর্গতি পাবার কথা নয়। ঈশ্বর ওকে যে অকল্পিত রকমের বিপুল সম্পদ দিয়ে পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে, তাতে তার সুখী হবারই কথা। সংসারে সম্রাজ্ঞীরূপেই অধিষ্ঠিত হবার কথা। ওর প্রতি বিধাতার সেইটেই সবচেয়ে নিষ্করুণ পরিহাস।......

গরিবের ঘরে রূপটাও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ হলেও হতদরিদ্র ঘরের মেয়ে ময়না। বাবা এককড়ি ঘোষাল ডাকসাইটে নেশাখোর ছিল ও অঞ্চলের। সব রকম নেশাতে সমান আসক্তি ও দক্ষতা তার। এত নেশা যে করে তার পক্ষে কোন কাজকর্ম করা সম্ভব নয়—করেও নি কখনও। ফলে যা কিছু পৈতৃক জমি-জমা ছিল তা ময়নার জন্মের আগেই শেষ হয়ে গেছে। তিন চারটি ভাই-বোন ওরা—পরের অনুগ্রহে, বলতে গেলে ভিক্ষান্নেই মানুষ হয়েছে চিরদিন।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে মেয়ের জন্যে সুপাত্র খোঁজা সম্ভব নয়। ময়নার মা-ও সে-চেষ্টা করেন নি। পাড়ার এক বৃদ্ধ মাস্টারমশাই ময়নাকে খুব স্নেহ করতেন, নাতনীর বন্ধু হিসেবে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত ছিল ময়নার, নাতনীর সঙ্গে ওকেও তিনি পড়িয়েছেন নিয়মিত। আর একটা বছর সময় পেলে প্রাইভেটে পাসও করিয়ে দিতে পারতেন—কিন্তু সে সম্ভাবনা তিনিই নষ্ট করলেন। ওর এই বিয়ের সম্বন্ধ আনলেন। দৈবক্রমে বিয়ে হয়েও গেল এক কথাতে।

ভবেশ মাস্টারমশাইয়েরই শালীর ছেলে। পাত্র হিসেবে শুনতে অন্তত—

খুব খারাপ ছিল না ভবেশ। ম্যাট্রিক পাস, রেলে চাকরি করে, নিজস্ব বাড়ি আছে। মা নেই—তা সেটা তো বৌদের পক্ষে একরকম আশীর্বাদই বলতে গেলে—বাবা আছেন, তিনিও ঐ রেল-অফিসেই কাজ করেন। নিবিরোধ শান্ত মানুষ। একমাত্র ভবেশের যা ন্যূনতা—ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস-কোয়ালিফিকেশ্যন্—তা হ'ল ওর চেহারাটা। চেহারাটা ওর আদৌ বলবার মতো কিছু নয়। কালো, বেঁটে—মুখখানা থ্যাবড়া মতো—ছোটবেলায় সাঁতার কাটতে গিয়ে আমাদের কন্টির হাঁটু লেগে সামনের একটা দাঁত ভেঙে গিয়েছিল—তার ওপর বাঁ রগের কাছে ছিল একটা ভয়াবহ রকমের বড় জড়ুল, তাতে একগাছা করে লম্বা চুল হয়ে থাকত সর্বদাই, কাটলেও চারদিন পরেই আবার দেখা দিত। তাতেই আরও যেন গা কিরকির করত সেদিকে চাইলে।

কিন্তু ময়নার মা-বাবার অত বাছবিচার করার অবস্থা ছিল না। বাবা তো ততদিনে বিবেচনার বাইরেই চলে গিয়েছিল। বিচিত্র সব নেশা করার ফলে কতকটা জন্তুর মতো অবস্থা হয়েছিল, সদা-সর্বদা গুম হয়ে বসে থাকত আর মধ্যে মধ্যে বিড়বিড় ক'রে বকত। ময়নার দাদাও তখন বেকার, তার বয়সও এমন কিছু বেশি নয়। সুতরাং যা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল মাকেই।

মাস্টারমশাই অবশ্য পাত্রের চেহারার কথা আগেই জানিয়েছিলেন, কমিয়েও বলেন নি কিছু—পুরোপুরিই বর্ণনা দিয়েছিলেন ভাল-মন্দ দুইই। শুনে মা-র মুখটা শুকিয়েও উঠেছিল। তবে সে কয়েক মুহূর্ত—তার পরই সে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মনকে তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন। বেশ স্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাঁরা যদি রাজী থাকেন, আপনি আর দু-মত করবেন না কাকাবাবু—ঐখানেই ঠিক ক'রে ফেলুন। ভিক্ষের চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া—ভিখিরীর আবার বাছবিচার কি, আমার কি আর ছেলের রূপের কথা ভাববার মতো অবস্থা! দু'মুঠো খেতে পায়—মাতাল দাঁতাল নেশাখোর না হয়—এই আমার ঢের। তাই যে দিতে পারব, তাও তো আশা রাখি নি কোন দিন।'

রাজী না থাকার কোন প্রশ্নই ছিল না। পাত্রপক্ষ অর্থাৎ ভবেশের বাবা এ প্রস্তাব লুফে নিয়েছিলেন। একমাত্র ছেলে তাঁর—ফুটফুটে বৌয়ের আশা থাকবে এ তো স্বাভাবিকই—তাই বলে সত্যি সত্যিই যে এমন পরমাসুন্দরী

মেয়ে পাবেন তাঁর কিম্ভূতকিমাকার ছেলের জন্যে, তা একবারও আশা করেন নি। এমন কি তাঁর শেষ পর্যন্তও আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত ভাংচি পড়বে, কন্যাপক্ষরা পাত্রর চেহারা দেখলে এ বিয়ে ভেঙে দেবে। তাই বিয়ে দিতে এসে অস্থির হয়ে ঘড়ি দেখেছেন আর বার বার পুরোহিতকে শুধিয়েছেন—লগ্নের একটু আগেই বিয়েতে বসে গেলে এমন কি দোষ হয়।

এক পয়সাও নেন নি ভবেশের বাবা। এদেরও দেওয়ার সাধ্য ছিল না। সাধারণ একখানা সস্তা তাঁতের শাড়ি পরে বিয়ে হয়েছে ময়নার, গহনার মধ্যে দু'গাছি ক'রে ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত মোড়া চুড়ি। প্রসাধনের মতো পাউডারও জোটে নি কনের। যতীশবাবু গা-সাজানো গহনা নিয়ে গিয়েছিলেন অবশ্য, মৃতা স্ত্রীর গহনা ভেঙে হার চুড়ি কঙ্কন দুল সবই গড়িয়েছিলেন, বেনারসী শাড়িও কিনে নিয়েছিলেন—বিয়ের পর বৌ সাজানোর কোন অসুবিধা হয় নি।

তাও—ময়নার মায়ের—ঘর-খরচা, দানের বাসন, জামাইয়ের একটা সামান্য আংটি, কাপড়—এবং ফুলশয্যার জন্য নিয়মরক্ষা যৎসামান্য মিষ্টি ফুল কাপড়েই তিনশো টাকার মতো খরচা হয়েছিল। সে সব টাকাটাই পাড়ায় চাঁদা ক'রে তুলেছিলেন ভবেশের মেশো সেই মাস্টারমশাই।

এই যাদের অবস্থা—তাদের কাছে ভবেশও আশাতীত সুপাত্র বৈকি।

ভবেশ শুনেছিল যে তার বৌ সুন্দরী, কিন্তু ঠিক এতখানি সুন্দরী তা কল্পনাও করে নি। এমন কি দেখার পরও প্রথমটা যেন বিশ্বাস হ'তে চায় নি তার যে সত্যিই এই মেয়ে তার বৌ হয়ে ঘরে আসছে। তারপর, বিশ্বাস যখন হয়েছে, একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছে এই আশাতীত সৌভাগ্যে।

সে বিহ্বলতা অবশ্য ঘরে-বাইরে সকলেই অনুভব করেছে প্রথমটায়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তো বটেই—যারা শুধু মাত্র প্রতিবেশী তারাও। অকল্পিত অবিশ্বাস্য ভাগ্যে ঈর্ষিত হয়েছে—তবু দূরেও থাকতে পারে নি, যেন একটা চৌম্বক আকর্ষণে কাছে এসেছে। ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে নানা ছুতোয়। পাড়ার যারা বন্ধুস্থানীয় তারা এতকাল ভবেশকে একটু করুণার চোখেই দেখত, অন্তত অন্তরঙ্গ হিসেবে কেউই কোনদিন ভাবতে পারে নি, বরং সাধ্যমতো এড়িয়েই চলেছে—এখন সকলেই অন্তরঙ্গতার প্রতিযোগিতা দিতে

শুরু করল। ভবেশের জন্য উৎকণ্ঠার সীমা রইল না। তাদের—দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে অযাচিত উপদেশ দিয়ে উপকৃত করতে সকলেই ব্যস্ত ও তৎপর হয়ে উঠল।

ভবেশের বাইরের ঘর এতকাল অকেজো হয়ে পড়ে ছিল—এখন সেখানে নিত্য আড্ডা জমতে লাগল। যতীশবাবুর অবস্থা খারাপ ছিল না, পার্শেল আপিসের বড়বাবু ছিলেন—তিনি প্রসন্ন মনেই চা-জলখাবার যোগাতে লাগলেন আর এর মধ্যে নিজেরই একটা বিজয়গর্ব অনুভব করতে লাগলেন।

যারা এ আড্ডায় জমতে পারল না—অর্থাৎ যাদের কিনা ভবেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সামান্যতম দাবিও নেই—তারা সেই পুরনো রসিকতা ক'রে মনের ঝাল মেটাতে লাগল—দ্য বিউটি য়্যাণ্ড দ্য বীসট্‌!—এবং আশা করতে লাগল—যে, এ বৌ বেশিদিন ভবেশের ঘর করবে না, শিগ্‌গিরই কারও সঙ্গে পালাবে।···

আজ বলতে লজ্জা নেই সেদিন যারা পতঙ্গের মতো ময়নার আকর্ষণে ছুটে যেত ভবেশদের বাড়ি—একান্ত নির্লজ্জভাবেই তার মধ্যে আমিও একজন ছিলুম। না গিয়ে যেন থাকা যেত না, একবার চোখে দেখার জন্য সারাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতুম—ময়নার আশ্চর্য রূপের এমনই মোহিনী জাদু ছিল। তবে আমি কখনও শোভনতার সীমা অতিক্রম করি নি। অন্য বন্ধুরা উগ্র লোলুপতা প্রকাশ ক'রে নিজেদের কতখানি ছোট ক'রে ফেলছে দেখেই আমি নিজেকে সংযত করেছি।

লোভ যতই থাক—আশা কিছু ছিল না। ময়না শান্ত ভদ্র মেয়ে, স্বামীর ইচ্ছা মতো সে বন্ধুচক্রে এসে বসত, চা খাবার দিত, ওদের স্থূল রসিকতায় মুখ টিপে হাসত, দু-একটা কথাও কইত—কিন্তু রঙ্গিনী বা বিলাসিনী ধরনের মেয়ে সে আদৌ ছিল না। ইংরিজিতে যাকে 'ককেট্‌' বলে—বাংলা করতে গেলে যে ক্ষেত্রে 'ছিনাল' বলা ছাড়া উপায় নেই—সে রকমের কোন প্রবণতাই তার মধ্যে দেখি নি কোনদিন। বরং তার সেই শান্ত বিনত ভদ্রতার বর্মে—সকল উচ্ছলতা ও অসভ্যতাই প্রতিহত হয়ে ফিরে যেত, যে অশোভন লোলুপতা প্রকাশ করতে যেত সে-ই লজ্জা পেত শেষ পর্যন্ত।

সেই জন্যেই নিজেকে সামলে চলেছি বরাবর, এইসব দুর্গতি দেখেই। আশা যেখানে নেই—সেখানে অকারণে ছোট হয়ে লাভ কি? তাছাড়া,

সেদিনের সমাজ ছিল আলাদা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিক সেটা—তখনও এত জনবৃদ্ধি হয় নি গ্রামে, পাড়ার 'হোমোজেনিয়াস' প্রকৃতিটা নষ্ট হয়ে যায় নি। যে এই পাড়ায় জন্মেছে, এই পাড়ায় বড় হয়েছে, এইখানেই যার শিক্ষা দীক্ষা অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ সব কিছু ঘটেছে—যার তিন পুরুষের বাস এইখানে এই এক পাড়ায়—তার সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব না থাকলেও তার অনিষ্ট চেষ্টা, অন্তত এ ধরনের, করা সম্ভব ছিল না যারা বাড়াবাড়ি করতে গেছে, তারা নিজেদের লালসা ঢাকতে পারে নি এই পর্যন্ত—তার চেয়ে বেশি দূর এগোবার কথা খুব সম্ভব তারাও ভাবে নি।

যাই হোক—আমি খুব একটা বেচাল দেখাই নি বলেই—কিংবা অন্য কি কারণে জানি না—স্বামীর অগণিত বন্ধুর (বিয়ের পর বন্ধু-সংখ্যা ভবেশের অগণিতই দাঁড়িয়েছিল) মধ্যে ময়না আমাকেই একটু অন্তরঙ্গ হিসেবে নিয়েছিল। স্বভাব-চাপা মেয়ে সে—একটু-আধটু যা মুখ খুলত দৈবাৎ কখনও, সে আমার কাছেই। আর হয়ত একই কারণে ভবেশও আমার কাছে তার মনের গোপন পেটিকাটি খুলে ধরত। গল গল ক'রে বেরিয়ে আসত তার মনের কথা—নির্জন অবসর পেলেই।

স্বভাব-চাপা হলেও ময়না কুটিল বা কুচুটে ছিল না। ভেতরবুঁদ যাকে বলে তাও না। কোন প্রশ্ন করলে সরল সত্য উত্তর দিত, কোন কিছু গোপন করত না। জন্মকাল থেকে দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়েছে তাকে, তাই চুপ ক'রে থাকতেই শিখেছে সে। সে-চুপ করাটা সহ্য করারই চিহ্ন, মানসিক জটিলতার পরিচায়ক নয়। এটা বুঝেছিলুম বলেই মেয়েটিকে আমি একটু শ্রদ্ধাও করতুম মনে মনে—শ্রদ্ধা ও সমীহ, এবং স্নেহও। তাতেই আরও সে অনায়াসে তার গোপন বেদনার ডালি উজাড় ক'রে দিতে পারত—সঙ্কোচে বাধত না।

আর এই জন্যেই—বোধহয় আমিই একমাত্র লোক যে ওদের সর্বনাশের ইতিহাস সম্পূর্ণ না হোক—বেশির ভাগ জানতে পেরেছিলুম। যেটুকু বলে নি ওরা, সেটুকুও অনায়াসে কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নিতে পেরেছি, হয়ত তা একেবারে অলীকও না, সে কল্পনা সত্য ঘেঁষেই গেছে।

তামাশার ছলেই কথাটা তুলেছিলুম একদিন।

বিয়ের পর বছর দেড়েক কেটে গেছে ততদিনে—সেই প্রসঙ্গেই ভবেশকে বললুম, 'কি রে, এখনও ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন?'

আপিস থেকে ফেরার সময় সেটা, দু'জনে এক ট্রেনেই ফিরেছি। স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে যেতে যেতে কথা হচ্ছিল। প্রশ্নটা শুনে কিন্তু ভবেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল, আমার মুখের দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে বলল, 'সাহস হচ্ছে না ব্রাদার!'

'সে আবার কি! এতে আবার ভয়ের কি আছে? ছেলে হলে খাওয়াতে পারবি না তুই? তোর যা পৈতৃক পয়সা আছে—দু-তিনটে ছেলেমেয়ে অনায়াসে মানুষ করতে পারবি। তুই নিজেও তো বেকার নোস।'

'না না, তা নয়।' কেমন যেন অসহায় হয়ে উঠল ওর দৃষ্টিটা। বলল, 'কথাটা তোকে আমিই ক'দিন বলব বলব ভাবছিলুম—। কী জানিস, আমার ভয় করে—ছেলেমেয়ে যা হবে যদি আমার মতো কুচ্ছিত হয়?'

আমি একেবারে নির্বাক হয়ে গেলুম। খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললুম, 'স্টুপিড! সেই ভয়ে তুই কখনই ছেলেমেয়ে করবি না! কী বলছিস পাগলের মতো?...কুচ্ছিত হয় তো হবে। এই তো তুই কুচ্ছিত হয়ে জন্মেছিস, তাতে কি তোর বাপ-মা ভালবাসেন নি, না তোর বৌ জোটে নি?'

'না, তা নয়—' কী যেন বলতে গিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত বিপন্নভাবে চুপ ক'রে যায়।

'তা নয় তো কি সেইটেই বল না!...কিছু মনে করিস নি, তুই তো তোর মা-র মতো দেখতে হয়েছিস। তোর মা-রও তো পাত্র জুটেছিল। তোর বাবা তো রীতিমতো সুপুরুষ—তিনি অনাদরও করেন নি, ফেলেও দেননি, বৌকে ভালও বেসেছেন যেমন বাসতে হয়। নইলে যে বয়সে তোর মা মারা গিয়েছিলেন—অনায়াসে আর একটা বিয়ে করতে পারতেন।...তোকেও তো ভালবাসেন।...যার যেমন চেহারাই হোক, তার জন্যে উল্‌টোটাও ভগবান যুগিয়ে রাখেন ঠিক, তাকে পছন্দ করার বা ভালবাসবার মতো।...মানে ছেলের ক্ষেত্রে বৌ, মেয়ের ক্ষেত্রে বর।...এই যে তুই এমন, তোর অত সুন্দরী বৌ—ভালবাসে না তোকে?'

'ভালবাসে? ঠিক বলছিস?' কেমন এক ধরনের অধীর আগ্রহে আমার হাতটা চেপে ধরে ভবেশ, 'আমায় ঘেন্না করে না? আমার যেন বিশ্বাস হ'তে

চায় না ভাই। কেবলই মনে হয়—এও কি সম্ভব? নিশ্চয়ই মনে মনে ঘেন্না করে, শুধু হিন্দুর মেয়ে, ভদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে—জানে আর কোন উপায় নেই তাই—কোনমতে সহ্য করে।'

আমি এবার একটু ভীতই হয়ে উঠি ওর ভবিষ্যৎ ভেবে। একটু দাবড়ানি দিয়েই বলে উঠি, 'এই ছ্যাখো রাসকেল কোথাকার! তুই এইসব ছাইভস্ম ভাবিস নাকি বসে বসে? তুই কি অন্ধ, চোখে দেখতে পাস না তোকে ভালবাসে কি না? তা যদি না বাসত—যে-কোন লোকের সঙ্গেই তো বেরিয়ে যেতে পারত—অন্তত ইয়ে, মানে ঘনিষ্ঠতা তো করতেই পারত। এখানে যে পেত সে-ই লুফে নিত।·· কোন দিন ওর কোন সে-রকম মতিগতি দেখেছিস? তুই-ই তাকে আমাদের মধ্যে টেনে এনে বসিয়ে রাখিস, সে কি নিজে থেকে আসতে চায়?'

'তা বটে। তেমন কোন মতিগতি ওর দেখি নি—সত্যিই। ঠিকই বলেছিস। ও দেবী। আমার ওপর ভগবানের আশীর্বাদ। পাড়ায় আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনেকেই বলে শুনেছি, বিউটি য়্যাণ্ড দ্য বীস্ট্—আমার এক এক সময় মনে হয় বুঝি সেই গল্পই সত্যি হবে আমার জীবনে—ওর ভালবাসায় আমার এই কুচ্ছিত খোলশটা খসে গিয়ে সুন্দর হয়ে উঠব। হতে কি পারে না? ঈশ্বরের দয়া হ'লে কি না হয়!'

আর দাঁড়ায় না সে। বোধহয় বৌয়ের কথা মনে ক'রে তাকে দেখবার জন্যে ছটফট ক'রে উঠে হন হন ক'রে এগিয়ে যায়—আমি যে পাশে ছিলুম, তার সঙ্গে কথা কইছিলুম—তা মনেও পড়ে না।

এর দিন তিন-চার পরে। ওদের বাড়ির আড্ডা ভেঙে সবে বাড়িতে এসে জামা ছাড়ছি—ভবেশ এসে হাজির।

বেশ একটু ভয় পেয়েই গেলুম। এখনই এমন ভাবে ছুটে এল কেন? হয় কোন বিপদ-আপদ অথবা কারও অসুখ-বিসুখ—এ ছাড়া এ সময় এভাবে আসবার কোন কারণই খুঁজে পেলুম না। আর স্বভাবতই ময়নার কথাই মনে হ'ল প্রথমে। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'কী রে কি ব্যাপার—কী হ'ল কি? হঠাৎ—? কারও অসুখ-বিসুখ—'

'না, সে সব কিছু নয়। এমনিই—। একটা কথা ছিল। তোর অসুবিধে

হবে একটু বসলে ? তোর বোধহয় খাওয়াও হয় নি এখনও ?······কাকীমা বসে আছেন নাকি ? তাহলে বরং খাওয়া সেরে আয়।'

'না না। আমার খাবার এখানেই ঢাকা থাকে। গুণধর ছেলে যে মাঝ-রাত্তিরের আগে ফিরবে না—এতদিনে সেটা তিনি বুঝে গিয়েছেন। তাই আর বসিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা করেন না। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বোস। মোদ্দা কথাটা কি—যা ওর সামনে বলা গেল না ?'

'বলছি। ওর সম্বন্ধেই কথা।'

এই বলে আমার বিছানার ওপরই বসে ধীরে-সুস্থে একটা বিড়ি ধরাল ভবেশ। তারপরও কিছুক্ষণ এক রকমের দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'একটা কথা বড্ড ভাবছি ক'দিন ধরে—বুঝলি ?···তুই শুনে হয়ত হাসবি, পাগল ভাববি, কিন্তু পাগলের কথা নয়। প্লীজ, তুই আমার মন দিয়ে কথাটা ভেবে ছাখ !'

আসল কথাটা কিছুতেই যেন বলতে পারছে না। আবারও ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

আমি এবার অসহিষ্ণু হয়েই বললুম, 'কিন্তু আসল কথাটা কি ? কেবলই তো হেঁয়ালি ক'রে যাচ্ছিস। এত রাত্তিরে—কাজের কথাটা চট ক'রে সেরে ফেললে হ'ত না ?'

'বলছি, বলছি। বলব বলেই তো এসেছি। ব্যাপারটা কি জানিস ?—কি বলব, কোন দিক থেকে কথাটা পাড়ব তাই বুঝতে পারছি না। সেদিন থেকে তোর কথাটা খুব ভাবছি—বুঝলি? সত্যিই ভেবে দেখলুম—ও আমাকে সত্যিই ভালবাসে। অন্তত হাবভাব কথাবার্তা আচার-আচরণে যা বোঝা যায় !·· কিন্তু আমার তরফ থেকে কি একটু অবিচার করা হচ্ছে না ?'

'সে আবার কি ! তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নেশা-ফেশা করেছিস নাকি ? ঠিক ক'রে খুলে বল দিকি—কি বলতে চাস !'

'আঃ—তুই যেন দিন দিন বুদ্ধু বনে যাচ্ছিস ? বলছি সে আমার জন্যে এতটা করছে—তার দিকটাও তো আমাকে দেখতে হবে। আমার মতো একটা হতকুচ্ছিত নিয়েই চিরজীবন কাটাবে সে ? ওরও একটা সাধ আহ্লাদ তো আছে। ওর মতো সুন্দরী মেয়ে—তারও তো ইচ্ছে যায় একটা সুপুরুষ কেউ তাকে ভালবাসুক। তার জীবনটা এমনভাবে নষ্ট ক'রে দেওয়া কি উচিত ?'

স্ত্রী সুন্দরী হওয়ার জন্মে মানুষের অনেক রকম অনিষ্ট হতে দেখেছি—সবচেয়ে সন্দেহ-বাতিকটাই বেশি দেখা দেয়, তাতে দুটো জীবনেরই শান্তি চলে যায়—কিন্তু এ যে একেবারে অভাবনীয়। ভবেশের যা হয়েছে এমন কখনও শুনিও নি, ভাবিও নি।···আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললুম, 'সত্যিই ও বৌ পাওয়া তোর উচিত হয় নি। তুই কুচ্ছিত সেটা তো বড় কথা নয়—তুই যে এমন বদ্ধ পাগল সেটাই যে জানা ছিল না ···আসলে তোর মাথাটারই চিকিৎসা করানো দরকার। তুই কালই লুম্বিনী পার্কে যা —গিরীন্দ্রশেখর বোসের কাছে—মাথাটা দেখিয়ে আয়।'

আবারও সেই রকম চোখ পিট পিট করতে করতে বলল, 'কেন, আমার মাথা খারাপের কী এমন লক্ষণ দেখলি ? আসলে তোরা স্বাধীনভাবে কোন কথা ভাবতে পারিস না। কতকগুলো সংস্কারের দাস হয়ে গেছিস—তাই যে ভাবতে পারে তাকে পাগল ভাবিস।'

'ওরে স্টুপিড, সব পাগলই নিজেকে অরিজিন্যাল থিঙ্কার ভাবে।·· একটা কথা তোর মাথায় যাচ্ছে না যে—সে যদি তোকে সত্যিই ভালবেসে থাকে—তার কাছে তুই-ই কন্দর্পকান্তি। ভালবাসার চোখে কেউ কুচ্ছিত থাকে না··· ওসব ভাবনা তুই একেবারে ছেড়ে দে, যে সৌভাগ্য হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে তাকে ভোগ ক'রে নে নিশ্চিন্তি হয়ে।···এসব বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকতে দিস নি—দুটো জীবনই নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে !'

'হুঁ। তা ঠিক।' কেমন এক রকম নিরুৎসাহ কণ্ঠে উত্তর দিয়ে উঠে পড়ল ভবেশ। বুঝলুম যে আমার কথাগুলোর একটাও তার পছন্দ হয় নি। আসলে মাথার মধ্যে এই চিন্তাটা কম্প্লেক্স বা ফিক্সেশ্যনের মতো চেপে বসেছে—এ থেকে ওর সহজে মুক্তি মিলবে না।

তাই বলে সে এমন একটা কাণ্ড করবে তা আমরা কেউই ভাবি নি। ভাবা সম্ভবও নয়। যত রকম মানুষ বুঝি তত রকমই মতি—এর হিসেব ভগবান ছাড়া আর কারও রাখা সম্ভব নয়।

নিমু আমাদের পাড়ারই ছেলে, হরিহর ডাক্তারের বড়ছেলে সে, দূর-সম্পর্কে ভবেশের ভাইপো হয়। ছেলেটি তখন সবে থার্ড ইয়ারে পড়ছে, বয়স খুবই কম—আঠারো-উনিশের বেশি হবে না। বয়স কম, মুখও কচি—

কিন্তু এদিকে লম্বা-চওড়া ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটা। রঙ উজ্জ্বল গৌর না হলেও ফরসার দিকেই। মোট কথা, সব জড়িয়ে এমন একটা সুকান্তি যে ওর দিকে চোখ পড়লে সহজে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কি ভাবে ভবেশ কি করল জানি না, আমার সঙ্গে ঐ কথাবার্তার মাস কতক পরে হঠাৎ দেখি নিমু নিয়মিত এ বাড়িতে আসতে শুরু করেছে। সে আসা সাধারণ আসা নয়, বিকেল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এ বাড়িতেই থাকে সে। শুনলুম ওদের বাড়িতে পড়াশুনোর বড় অসুবিধে—পাশেই গয়লাদের খাটাল—সেখানে নাকি সন্ধ্যে থেকে বড় হৈ-হল্লা হয়, ভবেশের বাড়ির দোতলায় নির্জনে পড়তে আসে সে।

সেই সঙ্গে আরও কিছু পরিবর্তন ঘটল এ বাড়িতে।

বাইরের ঘরে আমাদের আড্ডায় ময়নার আসা বন্ধ হয়ে গেল। সে আর নিচে নামে না। চা-জলখাবার অবশ্য বন্ধ হয় নি, কিন্তু সেগুলো আসে ঝিয়ের মারফৎ। যার হাতের স্পর্শে ও মুখের হাসিতে এ সব খাদ্য লোভনীয় হয়ে উঠত—সে আর খাবারের ট্রে নিয়ে একদিনও ঘরে ঢোকে না। ফলে মাস দুইয়ের মধ্যেই ভবেশের নিচের ঘরের আড্ডা ভেঙে গেল—এবং নানা রকমের চাপা কানাঘুষোয় পাড়ার আকাশ-বাতাস উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এর পর—আরও মাসখানেকের মধ্যে দ্রুত কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। নিমু বি. এ. ফেল করল এবং ময়নার কোলে একটি ছেলে এল। পুত্রসন্তান। ছেলেটির সঙ্গে আর যা-ই হোক ভবেশের কোন সাদৃশ্য দেখা গেল না, বরং কোন কোন নিন্দুক নিমুর মুখের সঙ্গেই সাদৃশ্য আবিষ্কার করে ফেলল।

সে আবিষ্কারের কথা ভবেশের কানেও যে না পৌঁছত তা নয়—কিন্তু তাতে সে খুশিই হ'ত, বলত, 'আরে এ তো সায়ান্সের কথা। পোয়াতী অবস্থায় যার মুখ সামনে বেশি দেখে তার মতোই ছেলেমেয়ের মুখ হয়। আমি তো সেই জন্যেই পারতপক্ষে ওর সামনে থাকতুম না ক'মাস।'

এমনই ভাগ্য—এ অবাঞ্ছিত ঘনিষ্ঠতায় যে দুজনের সবচেয়ে বিচলিত হবার বা বাধা দেবার কথা—সে দুজনেরই কিছু করার শক্তি রইল না। হরিহর ডাক্তারের ক্যান্সার হ'ল—এবং যতীশবাবুর স্ট্রোক। তিনি বাক্যরহিত হয়ে বিছানায় পড়ে থেকে মাসকতক পরে মারা গেলেন, হরিহরের অত দিনও

কাটল না—তার আগেই এ সব ঝামেলা ছেড়ে অন্য লোকে যাত্রা করলেন। নিমু ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি ভাগ ক'রে নিয়ে সেটা ভাড়া দিয়ে পাকাপাকি ভাবে এদের বাড়িতে এসে বাসা বাঁধল। ভবেশ বলত ভাড়াটে, নিমু নিজের পরিচয় দিত 'পেয়িং গেস্ট'। যতীশবাবু মারা যাবার পর ওপরের দুটো ঘরই খালি ছিল, একটাতে ছেলে নিয়ে ময়না থাকত, আর একটা নিমুকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ভবেশ মহা আনন্দে নীচের ঘরে বাস করতে লাগল। ওকে দেখে মনে হ'ত এত দিনে ও শান্তি পেয়েছে। তার সে খুশি পাড়ার কোন লোকের কটূক্তি কি বিদ্রূপেই ম্লান হ'ত না। সে বাজার-হাট, গোয়াল-বাড়ি, ডাক্তারখানা ও চাকরি এই নিয়ে বিষম ব্যস্ত হয়ে রইল। অবসর সময় ছেলেমেয়ে দেখা তো আছেই '

নিমু যা ভাড়া পেত এবং পৈতৃক টাকার সুদ—তা থেকে মাকে কিছু খরচ দেওয়ার পরেও যা থাকত, একার পক্ষে ঢের। তবুও বসে না থেকে কিছু কিছু খুচরো অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করতে লাগল। তখন বাতাসে পয়সা ওড়ার যুগ—তাতেও বেশ আয় হ'ত। ক্রমে বেশ অবস্থাপন্নই হয়ে উঠল, নতুন গাড়ি কিনল একখানা—কিন্তু বিয়ে করার কি আলাদা বাসা করার কোন উৎসাহই তার দেখা গেল না। আত্মীয়-স্বজনদের ও ত্যাগই করেছিল এক রকম, তবুও তারা কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে এলে জবাব দিত, 'মাপ করো রাজা. এ বেশ আছি। ও যা যত্ন করে—কোন মেয়ে তার সিকিও পারবে না।'

প্রথম প্রথম কাকীমাই বলত ময়নাকে। পরে শুধুই কাকী। আরও কিছুদিন পর থেকে শুধু 'ও'। ময়না ওর থেকে মাত্র বছর দুইয়ের বড় হবে —তাকে গুরুজন পদবীতে ডাকতে সঙ্কোচ বোধ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এ সব হয়ে গেল বহু দিনের কথা।

ছেলে পরিমল বড় হয়েছে, বি. এ. পাস করেছে। বড় মেয়ে হেনা কলেজে পড়ছে, দীপু ইস্কুলে।

এখন আর ওদের সম্পর্ক নিয়ে কেউ আলোচনা করে না বিশেষ, দীর্ঘকালে অবস্থাটা মেনেই নিয়েছে এক রকম। শুধু আত্মীয়রা—বিশেষ ভবেশদের —কেউ আর যোগাযোগ রাখে না তেমন। ক্রিয়াকর্মে যদি বা নিমন্ত্রণ করে, শুভকর্মের সময় ডাকে না। বিয়ে-থা হ'লে শুধু বৌ-ভাতে নিমন্ত্রণ করে।

মেয়ের বিয়ে হলে পরিষ্কার বলে যায় 'রাত্রে খেয়ো'। অর্থাৎ শুভকর্মে এয়োর কাজ ময়নার উপস্থিতি যে বাঞ্ছনীয় নয়—তা পরোক্ষে হ'লেও স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেয়।

ময়না অবশ্য কোথাও কোন নিমন্ত্রণেই যায় না। বাড়ি থেকেই বেরোয় কদাচিৎ। যাওয়ার মধ্যে পাড়ার শিবমন্দিরে, কালীবাড়িতে, রামকৃষ্ণ মন্দিরে—কি কালীঘাটে। দু-একদিন নিমু ও ভবেশের পীড়াপীড়িতে সিনেমাতেও যায় হয়ত—তবে সহজে স্বেচ্ছায় যায় না। বাইরে থেকে দেখলে হঠাৎ কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। এমনিই তো দেখা হয় ন'মাসে ছ'মাসে একদিন—তবু পথে-ঘাটে যা দু-একদিন দেখেছি, যেটুকু নজরে পড়েছে—দেখেছি যে প্রতিমার বাইরে কোন পরিবর্তন হয় নি বটে, তবে সে প্রতিমাই থেকে গেছে, নিতান্তই পাথর বা মৃত্তিকা—তার মধ্যে প্রাণ নেই। শুধু দেহটা চলছে এই পর্যন্ত, মানুষটা যে, যন্ত্র হয়ে গেছে।

বেশ আছে শুধু ভবেশই। তেমনিই বাজার-হাট করছে, সংসার দেখছে, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকত্বও চালাচ্ছে, নিমুর ফাইফরমাশ খাটছে মাইনে-করা কর্মচারীর মতো এবং সেই নীচের ঘরে পৃথক হয়ে বাস করছে।

তার মধ্যেই এই কাণ্ড।

পরিমলকে তার নিমুদাদা ব্যবসা করতে বলেছিল, সেটা তার পছন্দ হয় নি। গোটাকতক চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ওদিকের কর্তব্য শেষ ক'রে আরামে আড্ডা দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। বহুদিন পরে ওদের বাইরের ঘরে আবার আড্ডা জমতে শুরু হয়েছিল—দ্বিতীয় পুরুষের। তাতে বরং কতকটা নিশ্চিন্তই ছিল ময়না, চোখের ওপরই আছে বলে।

কিন্তু সেভাবে বেশি দিন গেল না।

নন্দিনী আর তার বিধবা মা—এই পাড়াতেই দীর্ঘকাল আছেন। নন্দিনীর বাবার অবস্থা ভাল ছিল। ওদের তাই কারও অনুগ্রহপ্রার্থী হ'তে হয় নি। ইতিমধ্যে নন্দিনী বড় হয়ে উঠল, গানে-বাজনাতেও একটু নাম হ'ল তার। একটু একটু করে মধুর বার্তা ছড়িয়ে পড়তে পাড়ার ছোকরা-মধুকরের দল এসে জুটতে শুরু হ'ল। দেখা গেল তাতে নন্দিনীর মা-রও বিশেষ আপত্তি নেই।

এই সূত্রে পরিমলও গিয়ে পড়ল। প্রথমটা মনে হয়েছিল আর পাঁচ-

জনের মতো নন্দিনীই তার প্রধান আকর্ষণ। ছিলও তা গোড়ার দিকেই—কিন্তু ক্রমে দেখা গেল কন্যার থেকে কন্যার মায়ের সাহচর্যই তার বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে। পরিমল নিমুর মতোই সুপুরুষ, তার প্রতি মেয়েমাত্রেরই আকর্ষণ স্বাভাবিক—কিন্তু বয়সে অনেক বড় নন্দিনীর মা—পাড়ার ছেলেদের সর্বজন অভিহিত মাসীমা সম্বন্ধে দুর্বলতাটা দুর্বোধ্য। প্রথমে তাই কেউ অত মাথাও ঘামায় নি, ক্রমে সকলেরই কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে উঠল। নিমু ও ময়নারও টনক নড়ল।

কিন্তু ততদিন শিকড় বহু দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, কিছুতে কোন চেষ্টাতেই সে বিষবৃক্ষ ওপড়ানো গেল না। কান্নাকাটি ভয় দেখানো, তিরস্কার—মায় হাতখরচা বন্ধ ক'রে দিয়েও কোন ফল হ'ল না। নিমু টাকা বন্ধ করলেও ভবেশ গোপনে যোগাত—সে পারে না অত কঠিন হ'তে। তার হাতেও টাকা কিছু কম নেই। তাছাড়া নন্দিনীর মা-রও অবস্থা ভাল, তিনি পরিমলের জন্য যথাসর্বস্ব খরচ করতেও রাজী।

অবশেষে একদিন ময়না ছেলের সামনে ঢিব ঢিব ক'রে মাথা খুঁড়তে—পরিমলের মুখ থেকে কঠোর সত্যটাই নির্মম আঘাতের রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল, 'এ নিয়ে এত কাণ্ড করার কি আছে মা, আমার পক্ষে তো এইটেই স্বাভাবিক।···আমি তো তোমাদেরই ছেলে। যে যাই বলুক, আমার শরীরে যে নিমুদাদার রক্ত আছে তা আমিও জানি, তুমিও জানো! তবে আর এখন এত ক্যাকড্ হচ্ছ কেন?'

এর পর আর একটি কথাও বলে নি ময়না। প্রতিবাদ করে নি, কলহ করে নি—এমন কি তার মুখ দেখেও নাকি বোঝা যায় নি যে কতটা আঘাত পেয়েছে সে। আরও যে দু'দিন ছিল, সহজ ভাবেই কাজ-কর্ম ক'রে গেছে, কথাবার্তা বলেছে। তাই কেউই অত মনে করে নি যে কোন সতর্কতার প্রয়োজন আছে। সেই জন্যেই অতি সহজে বেরিয়ে যেতে পেরেছে সে—ছেলের মুখে ঐ কথা শোনার তিন দিন পরে।

কেউ সতর্ক হয় নি ব'লেই খোঁজাখুঁজ শুরু হ'তে কিছুটা সময় লেগেছে। আর সম্ভবত সেই সুযোগেই অনেকটা দূরে চলে যেতে পেরেছে সে—কিংবা সত্যিই গঙ্গায় ডুবতে পেরেছে, কে জানে।

এতদিনে খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়েছে সবাই, কেবল

একেবারে আশা ছেড়ে দিতে পারে নি ভবেশ। সে এই ক'মাসেই যেন খুব বুড়ো হয়ে গেছে।···তবু এখনও সে প্রত্যহ বিকেলে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়। কী আশায় যায়—কী ভাবে স্ত্রীকে খুঁজে পাবার কথা ভাবে—তা সে-ই জানে। শুনেছি সে একবার কেদারবদ্রীর পথে যাবে তীর্থযাত্রায়—বড় মেয়ের বিয়েটা হ'লেই রওনা দেবে।

রূপকথা

এখানে এসে অসীমের খুশির সীমা নেই। এ তার স্বপ্নেরও অতীত, এ বিলাসের কল্পনা পর্যন্ত করতে সে কখনও সাহস করে নি। সে অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে, বিস্ময়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ওঠে নির্জনেই। প্রতিটি রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, এখানে কি সত্যিই একটা দিন একটা রাত তার কেটেছে ?

'আর খাওয়া ?

বড়লোকেরা স্বতন্ত্র জীব, তারা খুব ভাল খায়, এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে ছিল মাত্র—কিন্তু সাধারণ মানুষ, বিশেষ ক'রে তার মতো মানুষ যে এমন খেতে পায় বা খায়, তা কে জানত ? কারণ তার সামান্য জীবনে যাদের সঙ্গে জানাশোনা, তারা প্রায় সকলে তারই মতো অবস্থার লোক।

ধরো, সকালে উঠেই সত্যিকারের মাখন দেওয়া একখানা টোস্ট্ কিম্বা দুখানা ভাল বিলিতি বিস্কুট ; তার সঙ্গে চা—এক পয়সা প্যাকেটের গুঁড়ো চা নয়—দামী দার্জিলিং চা, তাতে ঘরের গরু বা মোষের দুধ এবং চিনি ইচ্ছামতো। সেইটেই ওর কাছে সব চেয়ে লোভনীয় বলে মনে হয়। ভয়ে ভয়ে সইয়ে সইয়ে দেখত প্রথমে যে, কতটা পর্যন্ত দুধ তারা বিনা আপত্তিতে দেবে—এখন সে নির্ভয়ে চায়. আধ কাপ দুধ দিতেও তাদের কোন বিরক্তি দেখা যায় না। তারপর দশটায় ভাত—ধপ্‌ধপে আতপ চালের ভাত, দুখানা খুব নরম রুটি, প্রতি দু'হাতা ভাতের সঙ্গে এক হাতা করে ঘি (ভেজিটেবল ঘি অবশ্য—কিন্তু তাও তো তার কাছে দুরাশা। চপ্‌চপে ক'রে ঘি মেখে ভাত, সে জানত কেবল রাজারা খায়), তার সঙ্গে ডাল, তিনটে-চারটে তরকারী, পাঁপর, দু-তিন

রকমের আচার, দই ও দহি-বড়া। দই-র সঙ্গে চিনি ইচ্ছামতো। এরা জৈন, মাছ মাংস খায় না, তাতে কিন্তু অসীমেরও খুব কষ্ট নেই, কারণ মাছ যে কী রকম খেতে তা সেও তো ভুলে গেছে বহুদিন। এরপর আবার ছুটোর সময় শুধু এক কাপ চা, ভাত খেয়ে অফিসে এসে বসলে এক গ্লাস বরফ জল তো আছেই। চারটেয় পুরি, চাট্‌নি, লাড্ডু ও চা। রাত্রে রুটি বা পুরি (ইচ্ছামতো), ডাল, তরকারী, চাট্‌নি, দহি-বড়া—এ ছাড়া, কথাটা ভাবলেই অসীম কেমন হয়ে পড়ে, পায়স বা ক্ষীর কিংবা বড় একবাটি দুধ প্রত্যহ। এরপর আরও দু ঘণ্টা অফিসের কাজ সেরে সে যখন শুতে যায়, তখন নেয়ারের খাটিয়ায় পুরু জাজিম-পাতা বিছানা এবং একটি পাখা—বিশেষ ক'রে তারই মাথার ওপর, সম্পূর্ণ তারই জন্য একটা গোটা পাখা—অপেক্ষা ক'রে থাকে। ছেঁড়া মশারি টাঙাতে হয় না, অর্ধেক রাত্রে উঠে মশা বা ছারপোকা মারার হাঙ্গামা নেই। গরমে ছট্‌ফট করার কথা তো ভুলতেই বসেছে।

এ যদি স্বর্গ-সুখ না হয় তো স্বর্গ সুখ যে খুব বেশী লোভনীয় তা অসীম মনে করে না।

এর সঙ্গে ওর বাড়ির অবস্থাটা? এতদিন বাদে মাইনে বেড়ে বেড়ে মাগ্‌গী-ভাতা সুদ্ধ দাঁড়িয়েছে পঁয়ষট্টি টাকা। তার মধ্যে ছাপ্পান্ন টাকা তো দু'মণ চাল কিনতে বেরিয়ে যায়। লোকসংখ্যা খুব কম নয়, মা, স্ত্রী, সে নিজে, একটি খোকা, ছোট ভাই এবং ছোট বোন। শহরতলীতে মাথা গোঁজবার মতো একটি বাড়ি আছে এই ভরসা। বাড়িটা অবশ্য জরাজীর্ণ, পড়ো-পড়ো কিন্তু তবু ভাড়া লাগে না, আর তার সঙ্গে সামান্য যা জমি এখনও আছে তাইতে দুটো গাছপালা দিয়ে ডুমুর সজনে ডাঁটা থোড় কচুশাক প্রভৃতির সংস্থান হয়। বাড়িতে তরকারী বলতে ঐ সবই চলছে দীর্ঘকাল ধরে—বাজার করবার মতো কিছুই আর হাতে থাকে না। তবু সেই জমি থেকেই দুবার, একবার ওর বিয়ের সময়, আর একবার ছোট ভাইয়ের টাইফয়েডের সময়—একটুক্‌রো ক'রে বেচতে হয়েছে। তখন কীই-বা দর পাওয়া গিয়েছিল, সেটুকু থাকলে আর কিছু ফসল পাওয়া যেত, এখন যা আছে তা থেকে আর একটুও হাতছাড়া করা যায় না। অথচ সংসার যে ক্রমেই অচল হয়ে আসছে এটাও ঠিক। রাগ হয় ওর মায়ের ওপর। এই অবস্থায় তিনি সাত-তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়ে বসলেন। ওর তো তখন এত বোঝবার বয়স

হয় নি—তাঁরই ভেবে দেখা উচিত ছিল। পঁয়ষট্টি থেকে ছাপ্পান্ন গেলে থাকে তো ন'টি টাকা, এতকাল আবার তা থেকে মান্থলি টিকিট কিনতে হ'ত। সত্যি সত্যিই তো জাদুমন্ত্রে সংসার চলে না, বাজার ছাড়াও হরেক রকমের খরচ আছে। ওর বৌ সামান্য যে আট-ন ভরি সোনা নিয়ে এসেছিল তা চলে গেছে। মার কাছে বিশেষ কিছু ছিল না, যা ছিল তার মধ্যে কানের মাকড়ী থেকে শুরু ক'রে কোমরের রূপোর গোট পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে। এখন আর সোনার গুঁড়ো বলতে বাড়িতে কিছু নেই। ওর শ্বশুরের কাছে পাওনা আংটি, ভাইয়ের পৈতের আংটি সব শেষ করেছে একে একে। এখন যদি ভারী কিছু অসুখ হয় কারুর (ঈশ্বর না করুন) তা হলে বাড়ী বাঁধা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আয় বাড়ানোর আর একটিমাত্র উপায় খোলা আছে, সেটি হচ্ছে ছোট ভাইকে ইস্কুল ছাড়িয়ে কোন কারখানায় দেওয়া। কিন্তু তাতেও মন সরে না অসীমের, ভাইটা লেখাপড়ায় বড্ড ভাল, আর সেই জন্যেই ইস্কুলে ফ্রী পড়ে, ইস্কুলেরই পুয়োর ফাণ্ড থেকে তাকে বই-খাতা দেয়। এ অবস্থায়, পাস করার আর মোটে একটা বছর থাকতে ছাড়িয়ে নেবে ? অথচ কীই বা করে ! শুধু তো ভাত নয়—কাপড় আছে, জামা আছে, টেক্স খাজনা আছে। ধার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে দু-তিন জায়গায়। আকাশ-ফুঁড়ে আর কিছু টাকা আমদানি না হলে কোনও আশা নেই !

এই অবস্থায় হঠাৎ, এই মনিবের লেকের ধারের প্রাসাদোপম বাড়িতে এসে থাকা এবং তাঁরই ওখানে খাওয়ার প্রস্তাবটা, হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরার মতো বৈকি ! শুধু যে কল্পনাতীত রকমের ভাল খাওয়া তাই তো নয়। একটা লোকের খাওয়ার খরচটা যদি বাড়িতে বেঁচে যায় তাও বা মন্দ কি ? তা ছাড়া, তার খোদ মনিব আকারে ইঙ্গিতে ভরসা দিয়েছেন যে, সে যদি মন দিয়ে কাজ ক'রে এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে দিতে পারে তো তিনি আগামী পূজোর সময় কিছু বোনাস দেবার চেষ্টা করবেন। মনিব ভালই বলতে হবে, এই সেদিন অর্থাৎ গত বৎসর ছেলের বিয়ের সময় পুরো এক মাসের মাইনে (মাগ্‌গী ভাতা বাদ) বোনাস দিয়েছেন, তাছাড়া দিয়েছেন নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি, মায় নতুন জুতো পর্যন্ত। এবারও তার অত্যন্ত মলিন এবং শতছিন্ন ধুতির চেহারা দেখে একজোড়া মিলের ধুতি তাকে আনিয়ে দিয়েছেন নিজেই উপ-যাচক হয়ে। হয়ত সেটা তাঁর বাড়ি এবং নিজস্ব অফিসের মর্যাদা রাখবার

জন্যেই—তবু অত কথা ভেবে দেখার দরকার কি অসীমের? পেয়েছি এ-ই কত। হয়ত এবারও এক মাসের মাইনে বোনাস দেবে। অবশ্য মন দিয়ে কাজ করার অর্থ হ'ল—সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত ভূতের মতো খাটা, শুধু দু-তিনবার স্নানাহারের অবসর বাদ; সেইজন্যেই বাড়িতে এনে রাখার ব্যবস্থা, কিন্তু তাতে অসীমের অন্তত কোন ক্ষোভ নেই, কী-ই বা করত সে কাজ না করলে? এখানেও যেমন তার বন্ধুবান্ধব নেই, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমনি নেই। বন্ধুবান্ধব থাকাটাও একটা বিলাস, তার মতো গরীবের সে বিলাস করার সামর্থ্য কৈ? সুতরাং শুধু শুধু চুপ ক'রে বসে না থেকে এদের কাজ একটু করলেই বা ক্ষতি কি? বিশেষত এরা যখন এত যত্ন ক'রে এখানে রেখেছে, এত ভাল ক'রে খাওয়াচ্ছে!

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, এখানে আরও অনেক কর্মচারী আছে আর তাদের সকলকার জন্যেই এই রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এবং সে শুনেছে যে, মনিবরা নিজেরা যা খান তাতে, তাঁদের প্রতি-একজনের খরচে এদের সাত-আটজনকে এই রকম আড়ম্বর ও প্রাচুর্যের সঙ্গে খাওয়ানো যায়। তবু সে খুবই চরিতার্থ বোধ করে নিজেকে, কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। আর কেউই অত খাটে না, বরং তাকে নানারকম বিদ্রূপ করে, আহাম্মক বলে হাসাহাসি করে—তবু অসীম মনে করে যে, তার যখন এমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না তখন একটু খাটতে দোষ কি? এমন বাড়িতে থাকতে পেলে এবং এমন খেতে পেলে সে কুড়ি ঘণ্টা খাটতে রাজী আছে।

তাছাড়া মনিবেরও যখন এত বিপদ!

বিপদ যে খুবই বেশী, তা সে-ই তো সব চেয়ে বেশী জানে। ওর মনিব-দের নানা রকমের ব্যবসা, সেটা যুদ্ধের দৌলতে এমনিই যথেষ্ট ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তার ওপর তাঁরা চোরাবাজারের পেছনের দোর দিয়ে এই তিন বছরে উপার্জন করেছেন বোধ হয় এক ক্রোর টাকারও বেশী। এ ব্যাপরটা এমন নিঃশব্দে এবং এমন মসৃণভাবে হয়ে গেছে যে সরকার বাহাদুর তার বিন্দু-বিসর্গও টের পান নি। ওদের বড় কারখানাটার মধ্যে যে দু-দুটো নতুন তেলের কল এই তিন বছর চলেছিল—তার ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার টাকা ঘুষ এবং কিছু তাদ্বিরের ফলে ছিল সরকারী কর্তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সব

খদ্দেরের সঙ্গেই বলা-কওয়া ছিল, দুটো চালান যেত একসঙ্গে, দুটোই তাঁরা সই ক'রে দিতেন। বড়টা অর্থাৎ আসলটার দামই আদায় করা হ'ত—ছোট চালানটার হিসাব থাকত খাতাপত্রে। সেই খাতাপত্র আয়কর অফিসে জমা দেওয়া হ'ত—ইন্সপেক্টররা এসে দেখতেন, অথচ সেটা ছিল আসল আয় এবং আসল কারবারের মাত্র এক-অষ্টমাংশের হিসাব।

আসল হিসাবটা জানত তিন-চারটি অত্যন্ত নিরীহ এবং বিশ্বাসী কর্মচারী—অসীম তাদেরই একজন। অসীম আবার তাদের মধ্যে ছিল সব চেয়ে কম মাইনে পাওয়ার এবং বেশী খাটবার লোক। কিন্তু ও সেজন্যে একটুও দুঃখিত নয়—লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখবার অবকাশ পায় নি সে, বাবা মরবার পরই ইস্কুল ছেড়ে চাকরির খোঁজে বেরোতে হয়েছিল। সেদিন কাজকর্ম এবং লেখাপড়া কোনটাই জানত না, ফলে কোথাও চাকরি মেলে নি। একেবারে মরীয়া হয়ে ও এই বড়বাবুরই একদিন পা জড়িয়ে ধরে এখানে কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছিল। এঁরাই হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন। সুতরাং অসীম জানে যে, সে যা পাচ্ছে তাই ঢের, আর কোথাও গেলে হয়ত এ মাইনেও পাবে না—যদি বা চাকরি পায়। তা বাদেও, কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে তো! ওরা লাখ পেলে কি ক্রোর পেলে তাতে অসীমের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? সে ওদের অদৃষ্ট এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি। তার যা পাওয়ার যোগ্যতা, তা তো সে পাচ্ছে—তবে আর তার অসন্তোষের কারণ কি?

হ্যাঁ—হিসাবের কথাটা যা উঠেছে। এদের কোম্পানীটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড, অর্থাৎ খুড়ো ভাইপো এবং ভাগ্নে—এই তিন ডিরেক্টর। তার মধ্যে এঁরা যদিও তিনজনেই চোরাকারবারের ইতিহাসটা জানতেন, বর্তমান মনিব অর্থাৎ খুড়ো এবং মামা (একই ব্যক্তি) নাকি আবার এরই মধ্যে বাকী দুজনকে ঠকিয়ে নিজে কয়েক লাখ টাকা বেশী কামিয়ে নিয়েছেন। সোজা পথে সেটার জন্যে নালিশ করার পথ নেই—কারণ তাহলে সবাই জড়াবে; সুতরাং বাঁকা পথেই তাঁরা নানা রকম মামলা-মোকদ্দমা ক'রে এঁকে বিব্রত ক'রে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে সরকারী মহলও আয়কর-প্রবঞ্চনা নিবারণের জন্যে যেমন উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে সমূহ বিপদ—কোন্ সময় যে কোন্ দিক থেকে বাজ পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। এক্ষেত্রে নকল হিসাব বা সরকারী হিসাবটা চোস্ত ক'রে রাখা প্রয়োজন যখন যা খাতা বা হিসাব দরকার

হয়, তা-ই সঙ্গে সঙ্গে নকল তৈরী ক'রে ফেলতে হবে, তাছাড়া আসল হিসাবটাও নিজের কাছে থাকা দরকার। সেইজন্যেই বিশেষ অফিসটিও, মানে অন্তরঙ্গ এই চারটি কর্মচারীকে ঘরে এনে পুরেছেন মনিব। কাজ তো দরকার বটেই—এরা শত্রুপক্ষে বা সরকারী পক্ষে সাক্ষী না দেয়, সেটাও দেখা দরকার। বড়োবাবু খুবই পুরনো লোক এবং বিশ্বাসী। তিনি মাইনে পান দেড়শ টাকা, কিন্তু তাঁর পৃথক কমিশনের ব্যবস্থা আছে। তাতে তাঁর বাড়ি-ঘর, মোটা টাকার ইন্স্যুরেন্স এবং একটি রক্ষিতা রাখার খরচ চলে যায়। বাকি তিনটি লোক তাঁরই সংগৃহীত—একেবারে অবস্থা খারাপ দেখে দেখে তিনি চাকরি দিয়েছেন, যাতে তারা একদিনের জন্যেও চাকরি ত্যাগ করতে সাহস না পায়। এইসব মোকদ্দমা শুরুর আগে তিনি বলে দিয়েছিলেন ওদের, 'দেখ, ওরা হয়ত এখন লোভ দেখাবে, ডাকবে, চাকরিও দেবে এর চেয়ে বেশী মাইনেতে কিন্তু কাজ চুকে গেলেই লাথি মারবে। তার চেয়ে পুরোনো মনিবকে ছেড়ো না। আর আমি যখন আছি তখন এখানে অন্তত চাকরি যাবার ভয় নেই।' সেই আশ্বাস আর আশঙ্কাতেই ওরা সামান্য মাইনেতে মনিবের এক ক্রোর টাকা বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে খাটছে ভূতের মতো। বড়-বাবুই মনিবকে বলে দিয়েছেন, 'এদের দারিদ্র্য ঘোচাতে নেই, তাহলেই যে যার নিজের স্বার্থ দেখবে। সার্কাসে বাঘকে নির্জীব ক'রে রাখে আধপেটা খাইয়ে—দেখেন নি? খেতে না পেলেই ঠিক থাকবে ব্যাটারা!'

মনিবও সেটা মানেন, তাই দয়া করবার ইচ্ছে থাকলেও চেপে যান।

সব মেঘেরই যেমন রূপোলী লাইন আছে, রূপোলী লাইনেও বুঝি তেমনি মসী-রেখার অভাব নেই।

এখানে অসীমের সব চেয়ে অস্বস্তির কারণ হ'ল মনিবের স্টেনোগ্রাফার এবং সেক্রেটারী মেমটি। অসীম জানত খাঁটি মেমই, পরে শুনেছিল, তারই মুখে, যে তার মা ছিল য়্যাংলো-বার্মিজ, বাপ ইউরোপীয়ান। যুদ্ধের সময় রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে এসে এখানেই আছে কিন্তু তাও এতকাল সাহেব-বাড়িতেই কাজ ক'রে এসেছে—কালা আদমির কাছে চাকরি এই প্রথম। মেম-স্টেনোর কোন প্রয়োজন নেই ওর মনিবের, শুধু ওটাও ঐশ্বর্যের একটা অঙ্গ বলে রাখা। অন্য কী একটা বিলিতি অফিসে গিয়ে ওকে দেখেন মনিব,

তারপর তিনগুণ মাইনে দিয়ে ডেকে আনেন। সে অবশ্য এখানে থাকে না, কারণ জৈনবাড়িতে তার আহারাদির ঘোর অসুবিধে। তবে তার প্রয়োজনও নেই—ওর ঘরভাড়া ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ই মনিব বহন করেন। মধ্যে মধ্যে প্লেনে চেপে যখন বিদেশে যান কিংবা দার্জিলিং ওয়াল্টেয়ার যান হাওয়া বদলাতে, তখন সেক্রেটারী তাঁর সঙ্গে তাঁরই সমান সম্মানে গিয়ে থাকে। অবশ্য এ নিয়ে মন্দ লোকে কম মন্দ কথা বলে না। কিন্তু অসীম জানে যে, বড়লোকের এসব ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। তারা পয়সা রোজগার করে তো এই সব শখ-শৌখিনতার জন্যেই।

এমন কি, ওদের বিলাস বা ঐশ্বর্যেও কোনদিন অসীম ঈর্ষাবোধ করে নি কিংবা ওর কোন নিঃশ্বাস পড়ে নি। পয়সা ওরা করেছে সে ওদের কৃতিত্ব এবং ঈশ্বরের দয়া। তাতে তার ক্ষুব্ধ হবার কি আছে? বরং মধ্যে মধ্যে চাকরদের অনুমতি নিয়ে, অন্তঃপুরিকারা বেড়াতে গেলে বাবুদের ঘরগুলো দেখে আসে। মসৃণ পরিচ্ছন্ন মার্বেল পাথরের মেঝে, সেখানে বার বার পা মুছেও যেন ঢুকতে সঙ্কোচ বোধ হয়, তার মধ্যে জুঁই ফুলের মতো নরম শুভ্র বিছানা। চেয়ার, ডেস্ক, আলমারি প্রভৃতির এক-একটার মূল্যে তাদের মতো সামান্য প্রাণীর এক বৎসর সংসার চলে যায়! ঘড়ির দিকেই হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতে হয়—ঘণ্টা বাজে অর্কেস্ট্রার সুরে। ছবিগুলোই বা কী! এসব ঘরে পাখা নেই, তার বদলে আছে প্রত্যেকটিতে আড়াই হাজার টাকা দামের কয়েকটি বাতাস-প্রেরক যন্ত্র। তার ওপর খসের পর্দা ফেলা আছে, সে পর্দার ওপরে আবার বৈদ্যুতিক ধারাযন্ত্রে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা—তাতে প্রতি সন্ধ্যায় এক শিশি ক'রে আতর ঢেলে দেওয়া হয়। সেই সুগন্ধি ভিজা খসের পর্দার মধ্যে দিয়ে যন্ত্রের হাওয়া যখন হু-হু ক'রে ঢুকতে শুরু করে তখন দেখতে দেখতে সুগন্ধি ঠাণ্ডা বাতাসে ঘর ভরে যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক নেত্রে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসীম এবং যতদূর সম্ভব নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে প্রাণপণে সে-সুবাস নেবার চেষ্টা করে।

বড়বাবুর যেটা নিজস্ব অফিসঘর, সেখানে প্রায়ই যেতে হয় অসীমকে। সেটাও এয়ার-কণ্ডিশনড্ করা, অর্থাৎওঘরের বাতাসের তাপ ইচ্ছামত তাতে বাড়ানো কমানো যায়। তাতে আছে আধুনিক ধরণের বিরাট সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিল, সেক্রেটারীর জন্য একটা রোলটপ্ ডেস্ক, চামড়া-মোড়া চেয়ার খান-

কতক, বড়বাবুর চেয়ারে আবার নরম লোমওয়ালা কী জন্তুর চামড়া বিছানো ; একটা চওড়া সোফা, একটা আরামকেদারা এবং নানা রকমের টেলিফোন যন্ত্র। এ ছাড়া, ছোট্ট রেডিও সেট, ইস্পাতের আলমারি, কম্বিনেশন তালা দেওয়া লোহার সিন্দুক এবং এক আলমারি বই। এমন পুরু কার্পেট পাতা আছে যে, পা দিলে গোছ-সুদ্ধ ডুবে যায়। এই অফিসঘরে তার মতো ময়লা কাপড়, ছেঁড়া জামা ও খোঁচা খোঁচা দাড়িসুদ্ধ তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়—এইটেই অসীম একটা মস্ত অনুগ্রহ ব'লে মনে করে।

কিন্তু অসুবিধা হয়ে পড়েছে ওর এই অফিস-রূপ-স্বর্গবাসিনী সেক্রেটারী-রূপ অপ্সরাটিকে নিয়েই।

এর আগে যে শ্যামাঙ্গী য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ছিল সে নাকি অন্য কোন কর্মচারীর সঙ্গে কথাই কইত না, হুকুম করার প্রয়োজন বাদে। অসীমের মনে হয় সে-ই ছিল ভাল। এ মেয়েটি, মেভিস ক্লেয়ার এর নাম, সম্পূর্ণ উল্‌টো। বড়বাবুর মতে ওর মাথায় ছিট আছে। সে অফিসসুদ্ধ বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করে যেচে, যারা ইংরেজী ভাল জানে না তাদের সঙ্গে ইঙ্গিতে কাজ সারে। ওদের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে তার যেন কৌতূহলের শেষ নেই। হুকুম সে করে অনুরোধ করবার মতো ক'রে, সৌজন্যবোধ আছে যথেষ্ট। ভারি হাসি-খুশি আমুদে মেয়েটি, বয়স কত তা অসীম আন্দাজ করতে পারে না, জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। অনবরতই কণ্ঠে তার গান আছে গুনগুনিয়ে। আর কারণে অকারণে ফাঁক ফেলেই তার সেই খাস অফিসরূপ স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওদের নীচের তলার বড় অফিসঘরে চলে আসবে এবং সকলের সঙ্গে পাল্লা ক'রে গল্প করবে। যতক্ষণ না লোক পাঠিয়ে মনিব ডাকবেন ততক্ষণ সে আর ওখানে ফিরবে না। মনিব সম্বন্ধে তার ভাবটা এতই তাচ্ছিল্য এবং বিদ্রূপের যে, মনে হয় এত টাকা আয়ের চাকরিটার ওপর ওর যেন একটুও মমতা নেই। ওর ভাবভঙ্গী দেখে অসীমেরই বুক কাঁপতে থাকে, ওর ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে।

এ বাড়িতে আসার তিন-চারদিন পর থেকেই যেন মেভিসের পক্ষপাতটা তার ওপর বেশী হয়ে পড়ল। প্রথম প্রথম ওর কথা বুঝতে বিষম বেগ পেতে হ'ত অসীমকে, অথচ সে যে ওর কথা বুঝতে পারছে না এটা জানতে

দেওয়া বড় লজ্জার কথা—ফলে মেভিস কাছে এসে দাঁড়ালেই অসীম ঘেমে উঠত, ওর গলা শুকিয়ে জিভ যেন ভেতরে ভেতরে জড়িয়ে যেত কথা বলবার সময়। কিন্তু মেভিস সত্যিই ভাল মেয়ে, সে অসীমের অসুবিধাটা বুঝতে পেরে বেশ আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কথা বলতে শুরু করলে! এখন অসীম ওর সব কথাই বুঝতে পারে, এমন কি উত্তর দিতেও খুব অসুবিধা হয় না। সে পরে বুঝেছে যে গ্রামারের দিকে তত মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই, মেভিস নিজেও খুব ব্যাকরণ-দুরস্ত কথা বলে না; ওর কাছে তো আশা করেই না। কোনমতে শব্দগুলো দিয়ে বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিলেই হ'ল। ক্রিয়াগুলো মেভিসই বসিয়ে নিতে পারবে।

তবু, ওর সেই দুধে-আল্‌তার মতো রং, সুন্দর দামী ছিটের পোশাক, ফাঁপানো মাজা চুল এবং নখ ও ওষ্ঠের কৃত্রিম লালিমা নিয়ে চারিদিকের বাতাসে একটা পাউডার ও এসেন্সের মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে যখন পাশে এসে বসত, তখন অসীম তার নিজের ময়লা কাপড়, ছেঁড়া জামা আর দাড়ি-চুলের দুরবস্থা স্মরণ ক'রে প্রত্যেক বারই সঙ্কুচিত ও বিব্রত বোধ করত নিজেকে। এ যেন সূর্যকিরণের রেখা দিয়ে ময়লা আবর্জনা দেখিয়ে দেওয়া। নিজের দারিদ্র্য এর আগে আর অসীমকে কখনও এমনভাবে লজ্জা দেয় নি। কারণ সেই অপরিসীম দৈন্যেই সে চিরকাল অভ্যস্ত। এখানে এসেও এমন কিছু লজ্জার কারণ ঘটে নি, কেননা ক্রোরপতি মনিব ও পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের ভৃত্যের জীবনযাত্রায় যে পার্থক্য থাকবে তা তো জানা কথাই। কিন্তু মেভিস সম্বন্ধে তার মনের সেই স্থৈর্য কেন যে বার বার এত বিচলিত হয়ে পড়ে তা সে নিজেই বোঝে না। মেভিস মাইনে পায় তার আটগুণ, আয় আরও ঢের বেশী। তার অবস্থাও মেভিসের জানতে বাকী নেই, বেশভূষা দেখেই সে পাশে এসে বসে যখন, তখন তার এ অহেতুক লজ্জার যে কোন কারণ নেই তাও সে জানে—তবু সমস্ত কার্য-কারণ ও যুক্তি-তর্কের অতীত মন যথাসময়ে সব ভুলে আবারও কুণ্ঠিত ক'রে তোলে তাকে।

মেভিস হয়ত তার এই সামান্য অবস্থার জন্যেই দয়া করে তাকে, হয়ত কেন—নিশ্চয়ই।

প্রথম দিনের পরিচয়টা ওদের বেশ মনে আছে অসীমের। এখানে আসবার বোধ হয় তিনদিন কি চারদিন পরেই হঠাৎ মেভিস এসে সেই

প্রশ্নই ক'রে বসল, 'বাবু, তুমি দিনরাত এমন বসে বসে খাতা লেখ কেন? তোমাকে ওরা যা লজ্জাকর মাইনে দেয় তাতে এক ঘণ্টার বেশী কাজ করা উচিতই নয়।'

বিব্রত অসীম কষ্টে উত্তর দিয়েছিল, 'কীই বা করব বলো, কাজ না ক'রে! চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে তো?'

'তা হোক। তাই বলে অকারণে মস্তিষ্ককে এমন ভারাক্রান্ত করবে? বিকেলে একটু একটু বেড়িয়ে এলেও তো পারো। স্বাস্থ্য থাকবে কেন ঘরের মধ্যে বসে বসে এত খাটলে! তোমাকে ওরা পেয়েছে যেমন বোকা!'

সেদিন এর পরও কী সব উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভাল ক'রে কিছুই গুছিয়ে বলতে পারে নি, তা মনে আছে অসীমের। এর পরের দিন দুপুরে এসে মেভিস জোর ক'রে ওর খাতা বন্ধ ক'রে দিয়ে বলেছিল, 'রাখো দেখি তোমার খাতা। একটু গল্প করো। তোমার ঘরের কথা বলো। তুমি বিয়ে করেছ?···হে ঈশ্বর! বলো কি—ছেলে আছে? মা, ভাই, বোন? আর এই তুচ্ছ আয়?'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলেছিল মেভিস, 'জোর ক'রে মাইনে বাড়িয়ে নিতে পারো না, এদের চাপ দিয়ে! এই তো সুযোগ।'

অসীম ভয়ে ও কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'কিন্তু তাই কি উচিত? বিপদের সুযোগ নিয়ে—বিশেষত খুব দুঃসময়ে ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল; আর এমন কিছু খারাপ ব্যবহারও তো করে নি!'

'খারাপ ব্যবহার করে নি—বলো কি? এত কম মাইনে দেওয়াটাই তো অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত! লজ্জা করে না ওদের? জানোয়ার সব।'

আরও এমনি ধরণের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা। অসীম বসে বসে ঘামে আর আড়চোখে চায়, কে এসব কথা শুনছে এবং কী-ই বা মনে করছে!

তাও তবু একরকম চলেছিল কিন্তু এর পরের দিন পাঁচটার সময়, মনিব কি একটা পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার অবসরে, যখন মেভিস হঠাৎ এসে প্রস্তাব করল, 'চল বাবু একটু বেড়িয়ে আসি!' তখন অসীমের মনে হল সীতার মতো তার পাতাল প্রবেশের সুযোগ থাকলে সে বেঁচে যেত। এই বেশভূষা নিয়ে মেমের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া? পাগল নাকি!

সে কী একটা ওজর দেবার চেষ্টা করল কিন্তু মেভিস তার কোন কথাই

শুনল না, হাত ধরে টেনে নিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। আরও চূড়ান্ত হ'ল, যখন লেকে খানিকটা বেড়াবার পর হঠাৎ একটা রিকশা নিয়ে ছোট লেকের মধ্যে ঢুকে পড়ে রিকশাওয়ালাকে বলল টালিগঞ্জের দিকে চালাতে! ইস্, এই ময়লা ও ঘামের গন্ধওয়ালা জামা নিয়ে সঙ্কীর্ণ রিক্শায় ওর সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি ক'রে বসা! আগে তবু এদিকটা ভিড় কম থাকত, এখন যুদ্ধোত্তর কলকাতাতে ভিড় কোথাও কম নেই। লোকগুলো হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখে এবং নানারকম জল্পনা-কল্পনা ও হাসাহাসি করে। অসীম বেচারী তো একবারও লজ্জায় মাথা তুলতেই পারল না। মেভিস কিন্তু নির্বিকার, সে বকেই চলল সারা পথ।

এর পর থেকে মেভিস হয়ে উঠল ওর জীবনে বিভীষিকা। সে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল পরের দিন সারা সকালটা, যেন তার সঙ্গে ওর আর চোখোচোখি না হয়, মেভিস যেন ব্যস্ত থাকে কিংবা ওদের য়্যাকাউণ্টাণ্ট যুগলকিশোরের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠে—কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। তিনটের সময় অফিসে ঢুকে অন্য দু-একজনের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেই সটান ওর পাশে এসে বসে একটা কাগজের প্যাকেট বার ক'রে বললে, 'বাবু, ভাল স্যাণ্ড্উইচ্ আছে দুখানা, খাও। আমার লাঞ্চ এনেছিলুম কিন্তু শরীরটা ভাল নেই বলে খাই নি।'

শুধু কি স্যাণ্ড্উইচ? ডিম, কেক্, আরও কত কি। এখানের নিরামিষ আহার ওর বরদাস্ত হ'ত না বলে বরাবরই বাড়ি থেকে লাঞ্চ নিয়ে আসত ও। কিন্তু সে-সব সুখাদ্য—যা অসীমের শুধু নামেই শোনা ছিল এতকাল—কিছুমাত্র স্বাদু লাগল না তার কাছে আজ। কারণ লজ্জা ও সঙ্কোচে সমস্তগুলো গলার কাছে ডেলা পাকাতে লাগল।

আর ওর যেটা আশঙ্কা ছিল তাই ঘটল! মেভিস চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে বিদ্রূপ বর্ষণ শুরু হ'ল। সব চেয়ে যাঁকে ওর ভয়, সেই বড়বাবুর কাছ থেকেই আক্রমণটা এল সব প্রথমে। ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি অনেকক্ষণ থেকেই ক্রূর হয়ে ছিল, তিনি এখন কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক রকমের মধু টেনে এনে বললেন, 'দেখো হে ছোকরা, হাত বাড়িয়ে সূর্য ধরতে গেলে শুধু হাত নয়, দেহটাই পুড়ে যাবে। ও হ'ল ঠাকুরের কলা, ওতে

কুকুরের মুখ দিতে নেই।'

যুগলকিশোর বললে, 'যাই বলুন ভূতনাথদা, ঐ রকম কাপড়জামা পরে থাকে তাই, আমাদের অসীমের চেহারাটা তো আর খারাপ নয়। দাড়িটাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে থাকলে ওকেই আপনারা সুপুরুষ বলতেন।'

অসীম প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'ও সব কী যা-তা বলছেন যুগলদা, আমার এই অবস্থা দেখেই ওর একটু দয়া হয়েছে—সত্যিই, ভিখিরীকে দয়া করছে বৈ তা নয়।'

মুকুন্দ ছেলেমানুষ, কলেজেও পড়েছিল বছর-খানেক, সে শুধু অসীমকে সমর্থন করলে, 'সত্যিই তো ভূত্‌দা, ওর কী দোষ, ও তো এড়াবারই চেষ্টা করে।'

বড়বাবু শুধু বললেন, 'হুঁ!'

পরের দিন কী একটা কাজে যেতে হ'ল ডালহাউসি স্কোয়ার। অফিসেরই কাজ। সেখানে ওদের রেজিস্টার্ড অফিস, কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে, অসীমকেই যেতে হয়েছিল। ফেরবার পথে একটা ছেঁড়া চটের থলিতে খাতাপত্রগুলো ঝুলিয়ে নিয়ে ট্রামের অপেক্ষা করছে, এবং—কেড্‌স্ জুতোর তলাটা ফুটো হয়ে গেছে—তার মধ্যে থেকে গরম পেভমেণ্টে পা ঠেকে পুড়ে যাচ্ছে বলে মধ্যে মধ্যে ডান পা-টা তুলে একটু আরাম পাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পেছন থেকে অতি পরিচিত কণ্ঠের ডাক, 'ওসীম, ওসীম!'

মেভিস এখানেও! একেবার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে ও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে?'

মেভিস হেসে বলল, 'আমার আজ ছুটি নেওয়া ছিল এবেলাটা। আমার এক বোন থাকে এখানে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে লাঞ্চ খেয়ে এই বেরোচ্ছি। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ট্রামের জন্যে? সিলি। এখনই ফিরে গিয়ে সেই ঘানিগাছে লাগতে হবে না। চলো একটু কোথাও যাই। সিনেমায় যাবে?'

কী সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি অসীম বলে ফেললে, 'সিনেমা আমার ভাল লাগে না।'

তিনটের শো হ'লেও ভাঙতে সেই ছটা—কী কৈফিয়ৎ দেবে অফিসে?

কিন্তু ততক্ষণে ওর বাহুমূলটা চেপে ধরে ওকে আকর্ষণ করছে মেভিস,

'মেট্রোতে খুব হাসির ছবি আছে একটা, দেখবে চলো। সঙ্গী খুঁজছিলুম কাউকে, ম্যাগিকে বললুম, তা ওর অফিসে আবার ডিরেক্টারের মিটিং।'

শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে আকর্ষণ করে', মেভিস তেমনিভাবে ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললো মেট্রোর দিকে। আজ অসীম বরং একটু দৃঢ়ভাবেই আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। ওর সব যুক্তিই মেভিস হেসে উড়িয়ে দিলে।

শেষে একেবারে পেছনের সীটে আধো-আলো-আধো-অন্ধকারে পাশাপাশি বসে অসীমের যেন খানিকটা ভরসা হয়, সে সব সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমার মতো এত গরীব, এত ময়লা কাপড়-জামাওলা লোককে পাশে বসিয়েছ, তোমার এতে কোন লজ্জা বোধ হচ্ছে না?'

'কেন?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে মেভিস, 'লজ্জা কিসের? তুমি আমার লাভারও নও, ফিয়াঁসেও নয়—লজ্জা করবে কেন? পৃথিবীর সকলকেই যে ধনী হতে হবে, এমন তো কোন মানে নেই। গরীব লোক কি কারুর বন্ধু থাকতে পারে না?'

'কিন্তু', তবুও সসঙ্কোচে বলে অসীম, 'কিন্তু তুমি যে আমাকে এত দয়া করো, এতে আমি বড় সঙ্কুচিত বোধ করি—আর বাকী সকলেই বা কি মনে করে বলো দেখি? হয়ত মনিবও এতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। আমার যা অবস্থা সেই মতো থাকাই কি উচিত নয়?'

'সিলি! সঙ্কোচের কি আছে? আর মনিব? তাঁর কাছে এখন তুমি আমার চেয়ে বেশী মূল্যবান। নাও, ছবি শুরু হ'ল, দেখ মন দিয়ে—'

সিনেমা থেকে বেরিয়ে মেভিস একটা ট্যাক্সি ডাকল। অফিসের ছুটির সময়—এখন বাসে ওঠা যাবে না, এই হ'ল তার যুক্তি। অসীমেরও প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না, একে তো দেরি হয়ে গেছে, তাতে বাসে ক'রে ফিরতে হয়ত আরও বিস্তর দেরি হয়ে যাবে। যদি কেউ রাগ করে? এমনিই তো যেন অফিস-সুদ্ধ সকলকেই ওর ভয়। সকলকে খুশি রাখবার জন্যই ব্যস্ত ও।

গাড়িতে বসে চলতে চলতে মেভিস আজ ওর বাড়ির সব খবর নিতে লাগল। ঠিক কে কে আছে, বাড়ি-ঘর আছে কিনা, কত আয়-ব্যয় ইত্যাদি! হু-হু বাতাসে মেভিসের শ্যাম্পু-করা নরম রুক্ষ চুল উড়ে এসে লাগে ওর গায়ে,

তার সঙ্গে এসেন্স ওডিকলোন পাউডারের একটা মিশ্রিত সৌরভ ওকে যেন উন্মনা ক'রে দেয়। তবু অসীম একে একে সব কথাই খুলে বলল। এত দারিদ্র্য চেপে যাওয়ারই কথা, এসব ক্ষেত্রে অনেকেই হয়ত খানিকটা গোপন করত, কিন্তু মেভিসের মধ্যে অসীম কোথায় একটা সত্যকার সহানুভূতির সুর পেয়েছে, পেয়েছে একটা প্রশ্রয়—সুতরাং সে কিছুই গোপন করল না। ওর সেই অবিশ্বাস্য রকমের দারিদ্র্যের ইতিহাস শুনতে শুনতে মেভিসের দৃষ্টি এক সময়ে ঝাপ্‌সা হয়ে এল—অসীমের ডান হাতটার ওপর নরম শুভ্র বাঁ হাতখানা রেখে গাঢ়স্বরে শুধু বার বার বলতে লাগল, 'ও ডিয়ার, ডিয়ার—মাই পুয়োর চাইল্ড্‌! সো সরি, রিয়ালি!'

এর পর যেন আর মেভিসের সঙ্গটা ততো অসহ্য লাগে না। সঙ্কোচ ও লজ্জাটা ক্রমেই কমে আসে—যদিচ তবু, আজকাল স্নান করবার সময় সপ্তাহে দু'দিনই কাপড়জামায় সাবান দেয় অসীম, সহকর্মীদের বিদ্রূপ সহ্য ক'রেও। মেভিসও, বোধ হয় ঠাণ্ডা মাথায় সবটা ভেবে দেখে, আজকাল আর অত ঘন ঘন নিচের অফিসে আসে না। তবে, লাঞ্চের ভাগটা প্রায়ই বেয়ারা কী চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ওর কাছে, খবরের কাগজে মুড়ে।

এইভাবে কয়েক দিন কাটবার পর হঠাৎ একদিন দেশের একটি লোক টেলিফোন ক'রে জানাল, অসীমের খোকার বড্ড অসুখ, বাঁচা কঠিন। অসীম যেন অবিলম্বে গোটা দুই ওষুধ এবং সম্ভব হলে এক শিশি হরলিক্‌স্‌ নিয়ে একবার বাড়ি যায়।

অসীমের মুখ শুকিয়ে গেল। পরনের কাপড় ছাড়া আর বিক্রি করবার মতো কিছুই নেই যে। তবু কিছু নিয়ে যেতে পারুক বা না পারুক—নিজের একবার যাওয়া দরকার। তখনই বড়বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল করুণ মুখে, দুটো-তিনটে দিনের ছুটি এবং গোটাদশেক টাকা আগাম মাইনে চাই, যদি প্রয়োজন বুঝে ভূতনাথবাবু দয়া করেন!

ভূতনাথ-দা প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ছুটি! ছুটি এখন কি ক'রে হবে? সব কাজ বন্ধ ক'রে তিনদিন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব নাকি! টাকা বরং স্লিপ দিচ্ছি নিয়ে যাও, মোদ্দা আজ রাতটা বাড়িতে থেকে কাল ভোরেই ফিরে এস।'

অন্য সময় হ'লে অসীম আর এর ওপর কথা কইতে সাহস করত না, হয়ত এটুকু বলাই অসম্ভব ছিল, কিন্তু এই কদিনে মেভিস বার বার ওর মাথায় একটা কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে অসীমের এই চাকরিটা যত প্রয়োজন তার চেয়ে এই চাকরিটার ঢের বেশী প্রয়োজন ওকে—সুতরাং সে বারকতক মাথা চুলকে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'আমার কাল ভোরেই আসা সম্ভব হবে না বড়বাবু, ছুটো দিন না দেখে আসতে পারব না! তাতে যা হয় হবে।'

ওর এই কণ্ঠস্বরেই যেন বড়বাবুর সুর পাল্‌টে গেল। বিস্মিত হয়ে তাকালেন বটে, কিন্তু আর প্রতিবাদও করলেন না। বললেন, 'যাও, মোদ্দা আর বেশী দেরি ক'রো না, দেখছ তো অবস্থা! আর হাতের কাজটা তুলে দিয়ে যাও।'

মেভিসের পরামর্শের আশ্চর্য ফল দেখে অসীম অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ওকে নমস্কার জানাতে জানাতে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। মেভিস সত্যিই দেবী, মেভিসের তুলনা নেই।

ভক্তের স্তুতি যেন দেবীর কাছে পৌঁছে গেল! সবে সীটে এসে বসে কলমটা তুলে নিয়েছে অসীম, গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে এক ঝলক দমকা বাতাসের মতো ঘরে ঢুকল মেভিস স্বয়ং। আজ একেবারেই ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'ওসীম চলো একটু, বেরুই। পাঁচটা তো বেজে গেছে।'

অসীম ভয়ে ভয়ে একবার বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি আজ আর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না মিস ক্লেয়ার, আজ এখনই বাড়ি যাবো, এই হাতের কাজটা সেরে।'

'বাড়ি যাবে? হঠাৎ?'

'ছেলের বড় অসুখ। বাঁচে কি না সন্দেহ।' বলতে বলতে অসীমের চোখে জল এসে গেল। সে সব খবরটাই, যা এইমাত্র পেয়েছে, খুলে বলল।

'মাই গড! আর তুমি এখনও খাতা নিয়ে বসে? এই মুহূর্তে ওঠো, না না, কোন কথা নয়। বড়বাবু কিছু মনে করবেন না। উনিও তো

ছেলের বাপ। মনিব অপেক্ষা করতে পারবেন—কাজও, কিন্তু অসুখ অপেক্ষা করবে না।'

সে জোর ক'রে ওর কলমটা কেড়ে নিয়ে খাতাটা বন্ধ ক'রে দিলে। বড়বাবু সব দেখেও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মনিবের ওপর সেক্রেটারীর প্রতিপত্তিটা তিনি অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন বহুদিনই। বরং নিজেই ক্যাশ থেকে দশটা টাকা বার ক'রে দিলেন অসীমের পূর্ব-প্রার্থনা-মতো।

মেভিস রাস্তায় বেরিয়ে বললে, 'দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি করি। আমারও বেড়ানো হবে, তোমাকে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

পথে বাথগেটে গাড়ী থামিয়ে নিজেই ওষুধ কিনলে, পথের ধারে একটা বড় দোকান থেকে বেশী দাম দিয়ে হরলিক্স্—তারপর নিউ মার্কেটে ঢুকে ফল খেলনা কিনে গাড়ির ভেতরটা প্রায় বোঝাই ক'রে ফেললে।

অসীম ব্যাকুলভাবে বললে, 'এ কত খরচ করছ, এ সব কি করছ তুমি? এত কি হবে, একটা তো ছেলে!'

'তা হোক, দরকারে লাগবে বৈকি! আমার নাম ক'রে দিও তোমার ছেলেকে, বিশেষ ক'রে এই ডল্‌টা। আর এই পাউডারটা নিয়ে যাও, বোনকে দিও!' নিজের হাত-ব্যাগ থেকে ছোট্ট সোনালি পাউডারের কৌটোটা বার ক'রে ওর প্রায়-অসাড় হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'অসুখ ভাল ক'রে সেরে না গেলে এখানে আসবার দরকার নেই, চাকরির জন্যে ভেবো না। চাকরি তোমার ঠিক থাকবে। তুমি ছাড়তে চাইলেও চাকরি তোমাকে ছাড়বে না।...আর ছাখো, তোমাকে আরও একটা সদুপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, এই সব ক্রোরপতিদের মত অকৃতজ্ঞ কেউ নেই—কাজ ফুরোলে আর মনে ক'রে রাখবে না। এই বেলা যত পারো আদায় ক'রে নাও। অন্তত মাইনে তো খানিকটা বাড়িয়ে নাও।...চারদিন দেশে বসে থাকলেই দেখবে ওঁর ঐ প্রকাণ্ড গাড়ী তোমার দেশের গলিতে ঢুকছে। আর তো এসব কথা বলতে পারব না, তাই সব আজ বলে নিচ্ছি। এ চাকরি কাল-পরশুর মধ্যেই ছেড়ে দেব।'

চমকে, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অসীম, 'সে কি? কেন?'

'ভাল লাগছে না। এ যেন আমার আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। ঐ ভুঁড়িদাস ক্রোরপতিটাকে আমি বুঝিয়ে দেব যে, টাকা দিয়ে পৃথিবীতে সব

কিছু কেনা যায় না। ভেরি ব্যাড্ মান!'

হঠাৎ যেন অসীমের মনে হ'ল সে বড় অবসন্ন হয়ে পড়ছে। যেন মস্ত বড় একটা অবলম্বন চলে যাচ্ছে তার, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে কি তবে এই ক-দিনেই মেভিসকে আশ্রয় বলে ধরে নিয়েছিল?

অনেক চেষ্টায় সে শুধু বললে, 'ফিরে এসে কি আর দেখতে পাবো না তোমাকে?'

'বোধ হয় না।'

'আর দেখাই হবে না?' কখনও না?'

'কে জানে! কোথায় চাকরি পাই আবার, ঠিক তো নেই। মনে করছি বোম্বাই চলে যাবো।'

ততক্ষণে গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে গেছে। মেভিস ওর জিনিসপত্র-গুলো কতক পকেটে, কতক থলিতে, বাকী সব হাতে গুছিয়ে তুলে দিয়ে অকস্মৎ ওর মুখখানা দুহাতে ধ'রে কাছে এনে, লঘু কৌতুকভরে যেন, ওর মুখে ঠোঁটের ওপর একটি চুমো খেয়ে বললে, 'গুড্ বাই, মাই ডিয়ার বয়! মাই সিলি, ইনোসেণ্ট, ডার্লিং বয়! গুড বাই!'

গাড়ির দরজা খুলে বিস্মিত হতভম্ব অসীমকে এককরম ঠেলেই নামিয়ে দিলে মেভিস।

. .

স্টেশন ছাড়িয়ে আধ-পাকা রাস্তা চলে গেছে দুধারের বাঁশঝাড় কচুবন ও পানা-পুকুরের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যায় ম্লান আলোকে ওর ঝাপ্সা দৃষ্টি পথ দেখতে পায় না, বার বার হোঁচট খায়। তবু ওর সেদিকে লক্ষ্য নেই। এক রকম বিহ্বল বিমূঢ়ভাবেই পথ চলেছে। এ ওর কী হ'ল? এতদিনের অপরিসীম দুঃখকে ও নিজের প্রাপ্য বলে সহজে মেনে নিয়েছিল, তাই ওর চিত্তের ভারসাম্য কখনও নষ্ট হয় নি। আজ কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। নিজের দৈন্য—বিদ্যা ও বিত্তের—আজ যেন ওকে বার বার ধিক্কার দিচ্ছে, নিজের অকিঞ্চিৎকরতা আজ যেন প্রথম ওকে অভিভূত ক'রে তুলেছে।

ও দরিদ্র, দয়া পাওয়া ওর অভ্যাস আছে। মেভিসের অবস্থা আর ওর অবস্থায় এতই তফাৎ যে ভিক্ষা মনে ক'রেই মেভিসের দয়াটা ও মেনে নিয়ে-

ছিল—সকলের বিদ্রূপ ওকে বিব্রত করেছে কিন্তু বিচলিত করতে পারে নি। আজ প্রথম ওর মনে একটা নিদারুণ সংশয় দেখা দিয়েছে—তবে কি মেভিসের আচরণ সবটা ঠিক দয়া নয়, অনুগ্রহের সঙ্গে কি তবে স্নেহও মেশানো আছে একটু? সে স্নেহ সাধারণ বন্ধু বা ভগ্নীর স্নেহ ছাড়াও একটু বেশী, আর একটুখানি গভীর? তবে কি—

চলতে চলতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো থমকে দাঁড়ায় ও।

একথা কেন মনে হচ্ছে ওর? কাপড়জামা আজও সেই রকমই নগণ্য, মলিন; তিনদিন দাড়ি কামানো হয় নি। দেহের গঠন ও গাত্রের বর্ণ, মুখের শ্রী ও সৌষ্ঠব বহুদিন দারিদ্র্যের চাপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেই ওর বিশ্বাস—বেশভূষার দৈন্যে অন্তত চাপা তো পড়েইছে। আর তা না হ'লেই বা কি, মেভিসের মত সুশ্রী মেয়েকে আকর্ষণের কি থাকতে পারে ওর মধ্যে?

না, এ দয়াই। দয়া থেকেই স্নেহ। নিছক নারীর অন্তরের জননী-মূর্তি।

আবার পথ চলতে শুরু করে সে।

কিন্তু ওর চোখ তবু বার বার ঝাপ্‌সা হয়ে আসে কেন? অনেকদিন আগে ও একটা বাঙলা বইতেই পড়েছিল যে সাধারণত বিলেতের মেয়েরা পুরুষকে ঠোঁটে চুমো খায় না—ওটা একটা বিশেষ সম্পর্কের প্রতীক। ছিঃ! …এ ওর কি সংশয়, বামন হয়ে চাঁদ শুধু নয়, বড়াবুর ভাষায় সূর্য ধরবার চেষ্টা। যা পড়েছে ও, তা হয়ত সত্য নয়—কিংবা রীতি-নীতি বদলে যাচ্ছে ক্রমাগতই। তা ছাড়া মেভিস তো আর ঠিক ইউরোপীয়ান নয়—ওদের সামাজিক প্রথা তার জানবার কথাও নয়।

মনকে এইসব অলস চিন্তার জন্যে ধমক দেয় অসীম।

গাছপালার ছায়ায় বেশ নিবিড় হয়ে সন্ধ্যা নামে। ঐ ট্রেনে আর যারা নেমেছিল, ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল, এগিয়ে গেছে বহুক্ষণ। অসীমও জোরে জোরে পা চালায়।

বর্ষার জলে চারিদিকের খানা-পগার একাকার হয়ে গেছে। আবর্জনা ও বনগাছ-পচার একটা ভ্যাপ্‌সা, তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকে। এরই মধ্যে ওর সেই জরাজীর্ণ পৈতৃক দুখানা ঘরের একখানাতে তার একমাত্র সন্তান স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে ছেঁড়া কাঁথার ওপর পড়ে রয়েছে। পাশে বসে ছেঁড়া-কাপড়-পরা

অনাহার-শীর্ণা তার স্ত্রী ও বুভুক্ষু ভাইবোন।

এই তো ওর জীবন। এই জীবনই ওর সত্য। আগেও ছিল, পরেও থাকবে। এ ইতিহাসের কোন পরিবর্তন নেই। এর ভেতর জন্মেছে সে, কোনমতে পরমায়ুর ক'টা বছর কাটিয়ে এইখান থেকেই একদিন বিদায় নিতে হবে। ততদিনে, শুধু পরিবর্তনের মধ্যে—ভাঙ্গা বাড়ীটার নোনা-ধরা দেওয়াল থেকে হয়ত আর খানিকটা বালি খসে পড়বে। ছাদের চিড়টা আর একটু চওড়া হয়ে যাবে।

এর মধ্যে মেভিস ?

সেদিনের বায়স্কোপ দেখার মতোই ছায়া-বাজী। স্বপ্ন। ক্ষণিকের দেখা স্বপ্ন, স্মৃতি থেকে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়াই ভাল।

জীবনে এ সব আসে না কোনদিনই, কল্পনাতে থাকে, ঈর্ষামাখানো কল্পনা ও দিবা-স্বপ্নে। এ হ'লে মানুষ সুখী হ'ত, তাই স্বপ্ন দেখে মধ্যে মধ্যে। শুধু রূপকথাতেই পড়া যায়, রাজপুত্র এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙায় কুঁচবরণ কন্যার, পরীরা উড়ে আসে স্বর্গ থেকে রাখাল-বেশী রাজকুমারকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজকন্যার দেশে। ওর মধ্যে কোথাও সত্য নেই।

তবু—তবু এক এক সময় যেন মনে হয় যে, ঐ অস্পষ্ট সংশয়টাই সত্য! মনের সমস্ত সত্তা সেই সংশয়টাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, সে কণ্টক-আলিঙ্গনে সমস্ত বুকটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়—তবুও। মনে হয়, হয়ত মেভিসই সেই পরী, ওকে জানাতে এসেছে যে এ দীন বেশ ওর ছদ্মবেশ মাত্র ওর ভেতরে শাশ্বত কালের রাজপুত্র আছে, তারই জন্য পরীর প্রতীক্ষা, তারই জন্য এ অভিসার!

এই স্বপ্ন ও আকুলতার পাশাপাশি ফুটে ওঠে বাস্তবের ছবিটা ; সামান্য সাধারণ স্ত্রী, দারিদ্র্যে শীর্ণ ও শ্রীহীন। অনাহার ও দৈন্য, আর এই অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দীর্ঘ-প্রসারিত নিজের একঘেয়ে ভবিষ্যৎ জীবন। ক্ষুধার কাছে এই আত্মাবমাননাকর ক্রীতদাসত্ব। নিজের মনের এই শোচনীয় কারাবাস, এই অসহায় আত্মসমর্পণ।

অকস্মাৎ ওর দুই রগ টন্ টন্ ক'রে আকুল উষ্ণ-অশ্রু নেমে আসে ওর দু-চোখ বেয়ে। সমস্ত পথ, আর তার সঙ্গে যেন সমস্ত জীবনটাও ঝাপ্‌সা, একাকার হয়ে যায়।

বানপ্রস্থ

আমার মামাশ্বশুর প্রচণ্ড ধনী—এ কথাটা বিয়ের আগে থাকতেই শুনে আসছি। আমার বিয়েতে তিনি আসেন নি—তিনি নাকি কোথাও আসেন না, এমনি একটা কথা অস্পষ্টভাবে শুনেছিলাম, তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। একটা কী সোনার গহনা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লোক দিয়ে—এই পর্যন্ত। আমাদের বাড়ি বৌভাতেও আসেন নি। মামীশাশুড়ি এবং তাঁর এক ছেলে এসে নিমন্ত্রণ রেখে গিয়েছিল।

মামাশ্বশুর রতন দত্ত বিলেত-ফেরৎ বড় ডাক্তার। বিলেতেই আগাগোড়া পড়ে, পরে ওখানেই রিসার্চ করে এম. ডি. ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছিলেন। এখানে এসে প্র্যাকটিস জমাতেও দেরি হয় নি। অবস্থা অবশ্য ওঁদের চিরদিনই ভাল —নইলে দশবছর বিলেতে থাকতে পারতেন না—কিন্তু তারও বহুগুণ ভাল ক'রে তুলেছিলেন তিনি নিজের উপার্জনে। প্রকাণ্ড বড় বড় বাড়ি, তিনচারখানা রাক্কুসে গাড়ি—ঐশ্বর্য-সমারোহের কোন ত্রুটি ছিল না কোথাও।

অকস্মাৎ একদিন শুনলুম রতন মামা এই মহামূল্যবান প্র্যাকটিস ছেড়ে এমন কি শহর ছেড়েও কোথায় কোন অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন। আর কোন দিনই এখানে ফিরবেন না, এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল সংবাদটি নিয়ে। আমার স্ত্রী তো তাঁর কোলের মেয়ের একশ'তিন জ্বর ফেলে চলে গেলেন তাঁর বাপের বাড়ি—খবরটা ভাল ক'রে জানতে। কলকাতার চিকিৎসক-মহল, ধনী-মহলে আলোচনার শেষ রইল না, নিন্দুকের রসনা মুখর হয়ে উঠল এই উত্তম রসায়ণ পেয়ে।

এক কথায় খবরের মতো খবর একটা জন্মগ্রহণ করল কলকাতায়, বহুদিন পরে।

স্ত্রী ফিরে এলে রসালো খবরটা পুরোপুরি পাওয়া গেল। বহুদিন ধরেই স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনাও নেই। দীর্ঘদিন বিলেতে থেকে রতন মামার মেজাজ হয়ে গেছে পুরোদস্তুর সাহেবী। অথচ বিলেত যাবার আগে ছেলেবেলায় বিয়ে করা স্বকু মামী একেবারে গেঁয়ো। কোথাও একটুকু মিল নেই দুজনের

স্বভাব ও রুচিতে। আর সেই জন্যই যথার্থ প্রণয়-বন্ধনে কোনদিন বাঁধা পড়ে নি দুজনের মন। তবুও এই দীর্ঘকাল চলেছিল একরকম জোড়াতালি দিয়ে কিন্তু ইদানীং ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠাতে অশান্তি চরমে পৌঁচেছে। তারা সবাই মায়ের দিকে। রতন মামার চরিত্রের ছোটখাটো খুঁতগুলোও এমন ভাবে তাদের মা তাদের কাছে চিত্রিত করেছেন যে তারা বাপকে একটা পিশাচ কি দানব মনে করে। আরও তাইতেই খুব আঘাত পেয়েছেন রতন মামা।

অনেকদিন ধরেই নাকি এ মতলব তাঁর মাথায় গিয়েছিল। গালুডি অঞ্চলে কোন্ এক নির্জন জায়গায় অনেক জমি নিয়ে বাড়ি করিয়েছেন একটি, সেখানে একটি তরুণী সাঁওতাল মেয়েও প্রতিষ্ঠা করেছেন—বাগান, কুয়া, মায় ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা পর্যন্ত সব ক'রে আসবাব পত্র নিয়ে গিয়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছেন—বিলাস ও আরামের কোন অভাব রাখেন নি। এ বাড়ির কথা তিনি অবশ্য বাড়িতে বলেন নি—কিন্তু গোপনও করেন নি। সবাই জানত যে বাড়ি হচ্ছে, তাদের বহু সম্পত্তিতে আর একটা সম্পত্তি যোগ হচ্ছে। শিগ্গিরই তারা সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে আনন্দ করবে ; এ আশাও তারা রাখত।

কিন্তু সব আশাতে ছাই পড়ে গেল যখন অকস্মাৎ একদিন রতন মামা অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই সুদূর অজ্ঞাত পল্লীতে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাত্রা করলেন। নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, গবর্ণমেণ্ট লোন, ক্যাশ সার্টিফিকেট এবং ভাড়াবাড়ির আয় সব তিনি ব্যাঙ্ককে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন—তা থেকে তারা ওঁর সংসারে দেবে মাসিক সাতশো টাকা এবং ওঁকে সেখানে পাঠাবে তিনশো। খাজনা, ট্যাক্স সব তারাই দেবে। বড় ছেলে য়্যাটর্ণী হয়েছে, মেজছেলে ডাক্তার। পারে তারা নিজেরা ক'রে খাবে। তাদের সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব আর আছে বলে তিনি মনে করেন না। স্ত্রী, একটি নাবালক ছেলে ও অবশিষ্ট একটি অনূঢ়া মেয়ের জন্যে সাতশ টাকাই যথেষ্ট। গাড়ী দুখানা তিনি বেচে দিয়েছেন, একখানা আছে। ছেলেরা রাখতে পারে রাখবে নইলে বেচে দেবে। মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হ'লে ব্যাঙ্ক থেকে বিশ হাজার টাকা এককালীন পাওয়া যাবে, সে ব্যবস্থাও তিনি ক'রে রেখেছেন। তিনি তো সম্পত্তি থেকে কাউকে বঞ্চিত করছেন না—মৃত্যুর পর তারাই পাবে—কিন্তু জীবিতকালে তিনি ওর কিছুই হাত-ছাড়া করতে রাজী নন। কতদিন বাঁচবেন,

কী দরকার হবে, তা কে জানে। ইত্যাদি—

স্ত্রী তাঁর কন্যার অসুখ ভুলে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে এই কাহিনী বিবৃত করলেন অনেকক্ষণ ধরে।

আমি সব শুনে বললুম, 'ভালই তো, বৃদ্ধ বয়সে বানপ্রস্থ নেওয়ার নির্দেশ তো শাস্ত্রেই আছে।'

'হ্যাঁ বানপ্রস্থই বটে। আর বৃদ্ধ কিসের। রতন মামা বৃদ্ধ! হ্যাঁ, ষাট বছর বয়স হয়েছে বটে, তবু শরীর একটু টস্‌কায় নি। না পেকেছে একটি চুল, না পড়েছে কোন দাঁত। সোজা হাঁটেন এখনও কী রকম দেখেছ তো। এখনও অন্ততঃ বিশ বছর প্র্যাকটিস করতে পারতেন তিনি। সবাই হায় হায় করছে—ফেলে-ছড়িয়ে মাসে বিশ হাজার টাকা আয় হ'ত। সেইটে নষ্ট ক'রে দিয়ে চলে গেলেন।'

'তা ছেলেরা যখন সকলে মিলে আদাজল খেয়ে লাগত বাপের সঙ্গে—তখন এটা বুঝি ভেবে দেখে নি যে তাদের নবাবীর উৎসটা কোথায়? দুধলো গরুর চাট সহ্য করতে হয়।'

'তা যা বলেছ! এমনটা যে হবে সে কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবে নি কেউ। মামীর মুখ শুকিয়ে গেছে। বড় দুই ছেলেরও। রোজগার তো এখনও কারুরই তেমন শুরু হয় নি। বাপ থাকলেও তবু মেজ ছেলেটা দাঁড়াতে পারত—এখন তো কেউই ডাকবে না!'

'তা সেখানে তিনি একাই থাকবেন? রেঁধে বেড়ে দেবে কে?'

'ছাই, একা থাকবেন না আরও কিছু। ওগো, সে ব্যবস্থা তিনি আগেই করেছেন—সেখানে নাকি আগে থাকতেই একটা ডব্‌কা সাঁওতাল ছুঁড়ি ঠিক ক'রে রেখেছেন। তার সঙ্গেই ঘর করছেন এখন স্বামী-স্ত্রীর মতো। ছি ছি, কী প্রবৃত্তি বাপু! হাজার হোক দুই একটা শিক্ষিত বিলেত-ফেরৎ লোক—আর ঐ নোংরা সাঁওতাল মেয়েটার সঙ্গে—!'

'তা উনি একটি মেম রাখলে অতটা দোষের হ'ত না—কী বল?'

'যাও! তাই কি আমি বলেছি। তবু ওরই মধ্যে রুচি বলে একটা কথা আছে তো!'

'মাতাল লোক—ওদের কি অত রুচির বালাই আছে?'

'মাতাল এমন কিছু নয়। তাহ'লে কি আর স্বাস্থ্য অমন থাকে? দুবেলাই

খান বটে—কিন্তু মাপা। তাতে মাতাল হয় না। অভ্যেসটা হয়ে গেছে বিলেত থেকে—ছাড়তে পারেন নি আর। ওটাকে নাকি সেখানে কেউ দোষের বলে মনেও করে না।'

রতন-পুরাবৃত্ত ঐখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল—অন্তত আমাদের জীবনে। একটা ঢিল পড়েছিল পুকুরের জলে, জলটা খানিকক্ষণ ধরে কেঁপেছিল—আবার সব মিলিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। নিজেদেরই জীবনে সমস্যার অন্ত নেই—পরের সমস্যা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? বিশেষ ক'রে ধনী কুটুম্ব—সর্বদা বর্জনীয়! আমরা এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করতুম—অর্থাৎ গায়ে পড়ে আত্মীয়তা দাবী করি নি। তাঁরা তো করবেনই না। বিয়ের পর আমাদের নবদম্পতিকে তাঁরা একবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেন নি।

কিন্তু সেই মামাশ্বশুররাই একদিন পুরোনো সম্পর্কের সূত্র ধরে টান দিলেন।

আমার মতো এক অভাজনকে তাঁদের দরকার হবে তা কে জানত!

তাঁরা তো জানতেনই না। কতখানি লজ্জা ও অপমান গলাধঃকরণ করতে হয়েছে তা তাঁদের মনের মধ্যে না সেঁধিয়েও অনুমান করতে পারি।

হঠাৎ আমার খাস শাশুড়ি ঠাকরুনই খবর পাঠালেন, আমার মামী-শাশুড়ি একবার আমার দর্শন-প্রার্থী। আমি যেন অতি অবশ্য যাই তাঁদের বাড়ি।

বলা বাহুল্য খবরটা পেয়ে আমার বিস্ময় ও কৌতূহলের শেষ রইল না। বিব্রতও বোধ করতে লাগলুম।

স্ত্রীকে বললুম, 'কী ব্যাপার বল দিকি? আমাকে আবার এসব কি ফ্যাঁসাদে ফেলবার মতলব তোমাদের?'

'কী জানি—আমিও তো বুঝতে পারছি না। মা তো কিছুই খুলে লেখেন নি—'

'তা হলে চেপে যাই, কী বল?'

'সেটা কি ভাল হবে? মা অত ক'রে লিখেছেন!...তুমি বরং এক কাজ কর না, আগে একবার মার সঙ্গেই দেখা কর না, কী ব্যাপার তাঁর কাছ থেকেই জান্‌তে পারবে।'

'হ্যাঁ, ও-ই করি আমি! আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। বলি আমাকে খানিকটা বিষয় লিখে দেবেন না এটা তো ঠিক। তাঁরই কোন উপকার করার জন্য ডেকেছেন। গরজ থাকে তিনিই আসবেন।'

বলি বটে কিন্তু যেতেও হয় শেষ পর্যন্ত।

শাশুড়ি ঠাকরুন খুব মিনতি ক'রে লিখে পাঠান আবার।

অগত্যা স্ত্রীর উপদেশ শিরধার্য ক'রে আগে নিজের শ্বশুর বাড়িতেই হাজির হই?

'কী ব্যাপার বলুন তো মা?'

'কী বলব বাবা—বৌদির কেলেঙ্কারী কত বলব! ওঁরা তো ওধারে খুব নবাবী বাড়িয়েছিলেন—এখন ঐ সাতশো টাকায় আর কখনও চলে ওঁদের? তবু গাড়িটাড়ি বেচে দিয়েছেন, সে টাকা গেছে—বৌদির অত গহনা, তার অর্ধেক চলে গেছে এই ক'মাসে। শেষে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বাড়ির নিচের তলাটা ভাড়া দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে আপত্তি তুলেছে। এ বাড়িও নাকি তাদের জিম্মেদারীতে দেওয়া আছে। একেবারে নিরুপায় দেখে উনি আর ওঁর ছোট মেয়ে মিলে গিয়েছিলেন সেইখানে—কী যেন জায়গাটা গালুডির কাছে—কী রেখা মাইন না কি—খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ভিক্ষে করতে গেছেন—সেই ভাবেই বলা উচিত ছিল, তা নয় —সেখানে গিয়ে সেই সাঁওতালনীকে দেখে নাকি ওঁদের এমন মাথাগরম হয়ে গেছে যে একেবারে যাচ্ছেতাই ঝগড়া করেছেন, মেয়ে নাকি বাইরে কোথায় একটা বেডপ্যান ছিল তাই ছুঁড়ে বাপকে মেরে তাঁর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে—এই সব ছোটলোকমি কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত দাদা নাকি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ওদের দূর ক'রে দিয়েছে। যে মুখে গিয়েছিল সেই মুখেই ফিরে এসেছে —এক কাপ চা পর্যন্ত জোটে নি কোথাও।'

শুনতে শুনতে অকারণেই কেমন যেন শঙ্কিত বোধ করি। এসব কথা আমাকে শোনানোর উদ্দেশ্য কি? এর মধ্যে আমাকে জড়াতে চান নাকি?

বলেও ফেলি কথাটা, 'তা এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক মা তা আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।'

'বলছি বাবা, রোস। এই তো ব্যাপার শুনলে, ওঁদের তো সংসার চলছে না। দাদার নাকি যা আয় আরও দুহাজার টাকা ওদের দিলেও তাঁর কিছু

ক্ষতি হবে না—এ নাকি শুধু ওদের জব্দ করার জন্যেই এই সাতশো টাকার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলেদের তো আয় নেই বললেই হয়—ঝি চাকর ঠাকুর রেখে চার পাঁচটা প্রাণীর চলে কি ক'রে ঐ টাকায়? তাই ওঁদের আর্জি তুমি যদি একবার তোমার মামা-শ্বশুরের সঙ্গে দেখা ক'রে একটু অনুরোধ কর।'

'আমি? কী সর্বনাশ! বলেন কি? আমাকে তিনি চেনেন না—কখনো চোখে দেখেনও নি—আমার কথা তিনি শুনবেন কেন?'

'আছে বাবা, এরও অর্থ আছে।' শাশুড়ি বেশ রহস্য-ঘন কণ্ঠে বলেন, 'তোমাকে চোখে দেখেন নি সত্য কথা—কিন্তু পরিচয় দিলেই চিনবেন, তোমার খবর তিনি সবই রাখেন। তিনি নাকি কথায় কথায় তোমার দৃষ্টান্ত দেন সবাইকে—যে, কি রকম সামান্য অবস্থা থেকে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। কারুর কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য চাও নি। এই সেদিনও নাকি কার কাছে চিঠিতে লিখেছেন নিজের ছেলেদের তুলনা দিয়ে যে,—ওদের পিছনে এত পয়সা খরচ করলুম—আজ পর্যন্ত একটি পয়সা রোজগারের হিম্মৎ হ'ল না—অথচ ছেলেবেলায় বাপ মরে গিয়েছিল আমার ভাগ্নীজামাই গনেশের, সে দ্যাখো নিজেই নিজের পথ ক'রে নিয়েছে, এখন মাস গেলে হাজার বারোশো টাকা রোজগার করে। তাই শুনে বৌদির মনে হয়েছে যে তুমি গিয়ে যদি দাঁড়াও আর একটু ওদের হয়ে বল তো দাদা নরম হবেন।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বিরস মুখে বললুম, 'দেখুন এই সামান্য ভরসায় আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না—কিছুই হবে না, লাভের মধ্যে আমার সম্বন্ধে যেটুকু ভাল ধারণা আছে—সেটুকু নষ্ট হবে। না মা—সে সম্ভব নয়।'

'আমি তো বললুম বাবা, বৌদি কোন কথাই শুনছেন না—বড্ড কান্নাকাটি করছেন। হাজার হোক অত মানী লোক, এককালে সকলের মাথার ওপর পা দিয়ে চলেছে—আজ তার ঐ দুরবস্থা, কষ্টও হয়। তা তুমি একবার চল বাবা, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনমতে এড়াতে পার!'

অগত্যা পালাবার আর পথ রইল না। স্বয়ং শাশুড়ি ঠাকরুনই সঙ্গে চললেন, পালাবো কি ক'রে?

রতনমামার বাড়ি টালায়। প্রকাণ্ড বাড়ি। যেমন বড় বড় ঘরদোর, তেমনি মূল্যবান ফার্ণিচার সব। ড্রয়িং রুমে ভাল ভাল ছবি, দামী আলোর ঝাড়, বড় বিলিতি আয়না—অভাব কিছুরই নেই। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই যেটা প্রথমে নজরে পড়ল—সেটা হ'ল অপরিসীম শ্রীহীনতা, যাকে বলে লক্ষ্মীছাড়ার দশা একেবারে!

সোফাসেটের ঢাকাগুলো ছেঁড়াখোড়া, ময়লা—মাথার কাছে বড় বড় তেলের দাগ ধরে গেছে তবু সেগুলো কাচবার কথা কারুর মনে পড়ে নি। ঝাড়ের অর্ধেক আলোর বাল্‌ব্‌ নেই, সম্ভবত অন্য সব ঘরে টাঙাবার দরকার পড়লেই এখান থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে লাগানো হয়, এখানে আবার সেগুলো ফিরে লাগাবার কথা কারুর মনে পড়ে না। দালানে বারান্দার স্থানে স্থানে এঁটো চায়ের কাপ, জলখাবারের ডিশ পড়ে আছে, চেহারা দেখলে মনে হয় সকাল থেকেই ঐ অবস্থায় আছে সেগুলো। সিঁড়ির ধারে মেহগনী কাঠের রেলিং-এ ছেঁড়া গামছা, চাকরদের কাপড় এবং সম্ভবত ঘরমোছা ন্যাতা ঝুলছে। কোন মেয়েছেলে কাপড় ছেড়েছে ওপরের দালানে—ভিজে কাপড় ও সায়া সেখানেই পড়ে আছে। একটা দামী টার্কিশ তোয়ালে পড়ে সিঁড়িতে। এক কথায় বাড়িতে ঢুকলেই মনে হয় গৃহস্বামীরা যেমন অগোছালো তেমনি নোংরা। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হ'তে থাকে ঐ অবস্থা দেখলে!

আমি যেতে মামীমা তাঁর ছেলে মেয়ে সবাই এসে ঘিরে বসল।

ছেলেমেয়েদের কথাবার্তাও আমার ভাল লাগল না। যেন বড় বেশী স্বার্থপর। শুধু তাই নয়—আমাদের সঙ্গেও এমনভাবে কথা কইতে লাগল যেন আমি তাদের হয়ে এ কাজটা করতে বাধ্য, ক'রে আমিই কৃতার্থ হব।

মনটা খুবই বিষিয়ে উঠল তাতে সন্দেহ নেই! কঠিন হয়েই ছিলাম—থাকতামও শেষ পর্যন্ত—যদি না মামীমা আমার দুটো হাত ধরে হাউহাউ ক'রে কাঁদতেন।

'আমাকে বাঁচাও বাবা, এভাবে কখনও থাকি নি—থাকতে পারব না। কিছু যদি না করতে পার তো গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর পথ থাকবে না।'

এক্ষেত্রে আর কঠিন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং সময়মতো শিগগিরই একদিন সেখানে যাব—সুবোধ বালকের মতো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হ'ল।

মামীমাকে বলে এসেছিলাম হাতে জরুরী কাজ আছে, সাত-আট দিনের আগে যাওয়া হবে না। কিন্তু মনের মধ্যে অপ্রীতিকর দায়িত্বটা এমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠল যে সব কাজ ফেলেই একদিন রাত্রের ট্রেনে চেপে বসতে হ'ল—তিন দিনের মধ্যেই।

ট্রেন পৌঁছল শেষরাত্রে। বাকি রাতটুকু স্টেশনেই কাটিয়ে একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে যখন রতনমামার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম তখন সবে পূর্বাকাশে দিনের আভাস জেগেছে—সে আলোয় যেন অপরূপ সুন্দরী প্রকৃতির ঘুম ভাঙ্গছে একটু একটু ক'রে—চোখের সামনে পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে শস্যক্ষেত্রে একটু একটু ক'রে জাগছে সে।

তবু—সিংভূমের এই স্বর্গীয় শোভাও মনে কিছুমাত্র আনন্দ জাগাতে পারল না। যাঁর কাছে যাচ্ছি তাঁকে চিনি না, কেমন মানুষ তাও জানি না, শুনেছি অত্যন্ত দাম্ভিক এবং রগচটা—নিজের ছেলেরাই বলেছে, বিষম রূঢ় ও কর্কশভাষী—কেমন অভ্যর্থনা করবেন কে জানে, আমাকেও কুকুর লেলিয়ে তাড়িয়ে দেবেন কিনা। সুতরাং মনটা বিরক্ত হয়েই রইল।

দেখলুম, রিক্সাওলাদের কাছে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছেন রতনমামা। একটু বলতেই তারা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—নতুন বাড়ির বাবু তো? ঐ ধাঙ্গি আছে যাঁর বাড়ি। খুব জানি, চলুন না। এই তো কিছুদিন আগে বাবুর পরিবার আর মেয়ে এসেছিল, আমার রিক্সাতেই নিয়ে গিছলুম কিনা—তা কী ঝগড়া কী বলব—আমরা লজ্জায় মরে যাই? বাবু বুঝি বাড়িতে রাগারাগি ক'রে এসে এখানে আছে?'

সংক্ষেপে 'হুঁ' বলে চুপ করিয়ে দিই! লজ্জায় অপমানে আমারই মাথা কান গরম হয়ে ওঠে। ছিঃ ছিঃ! এমনি সবাইয়ের কাছেই এ গল্প করেছে নিশ্চয়। আরও কত বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসেন—তাঁরা শুনে গিয়ে কল-কাতায় ছড়াবেন এই মজাদার কেচ্ছাটা।

সবটা কল্পনা ক'রে মনটা আরও অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু অনেকটা দূর পথ অতিক্রম ক'রে রতনমামার বাড়ির সামনে গিয়ে যখন রিক্সাটা থামল তখন সেদিকে চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত মন থেকে সব গ্লানি সব অপ্রসন্নতা চলে গেল। মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, 'বাঃ'!

তখন বেশ ফরসা হয়েছে, সামনের উঁচু ইউক্যালিপটাস-এর ওপরের ডালে লালের আভাসও লেগেছে খানিকটা, কাজেই দেখার কোন অসুবিধা নেই। উঁচু লোহার ফেন্সিং ঘেরা বিস্তৃত বাগান, তাতে বোধ হয় এমন কোন ফুল গাছের নাম করা যাবে না—যা নেই। বাগানটি চার ভাগে ভাগ করা, মধ্যে লাল মোরাম ফেলা রাস্তা। একদিকে খানিকটা চতুষ্কোণ ঘাসে মোড়া—'লন'। সব গাছগুলিই পুষ্পিত—ফুলে ফুলে ঢেকে আছে সব। তার সম্মিলিত সৌরভে যেন নিমেষের জন্য সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। এই বাগানের মধ্যে সদ্য চুনকাম করা ছোট একটি বাড়ি প্রভাতী আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। চতুর্দিকেই শ্রী আর রুচির পরিচয়।

একটি অল্প বয়সী 'হো' মেয়ে সেই সকালেই বাগানে কাজ করছিল—রিক্সা থামতে দেখেই উঠে এল।

'কোথা থেকে আসছেন? কাকে চাই?' বেশ শান্ত বিনত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল সে। তারপর বাবুর আত্মীয় শুনে ফটক খুলে দিয়ে বলল, 'আপনি একটু বসুন বারান্দায়, বাবু আসবেন এখনই।'

জিজ্ঞাস করলুম, 'বাবু উঠেছেন?'

'অনেকক্ষণ! বাবু খুব ভোরে ওঠেন যে! ওদিকে শুতেও যান যে রাত ন'টার মধ্যে।'

তবু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি, 'কুকুর খোলা নেই তো?'

'না না। সে ওদিকে বাঁধা আছে। এখনই ঘুরে এসেছে কি না। আর সে খুব শান্ত। বাবু ইশারা না করলে কাউকে কিছু বলে না—বিশেষ দিনের বেলা। রাত্রে কারুর আসবার উপায় নেই। বাইরেই ছাড়া থাকে কিনা।'

নিশ্চিন্ত হয়ে মোরামের রাস্তা ধরে দক্ষিণের বারান্দায় এসে উঠি। পেটেন্ট স্টোনের মেঝে—ঝক্‌ঝক্ করছে পরিষ্কার, একটু সিঁদুর পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া যায়। রং করা পরিষ্কার কটি বেতের চেয়ার—চেয়ারের কুশনগুলিতে সাদা ধপধপে ওয়াড় পরানো। সেখানেও সুরুচি ও পারি-পাট্যের ছাপ।

বারান্দার মেঝে এতই পরিষ্কার যে জুতো পায় দিয়ে উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। জুতো খুলে খালি পায়ে গিয়ে বসলাম একটা চেয়ারে।

একটু পরেই গুন্ গুন্ ক'রে কী একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে

এলেন গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ এক পুরুষ, বয়স হয়ত ষাট হবে—কিন্তু দুই রগের দু'পাশে কিছু পাকা চুল ছাড়া সে বয়সের ছাপ কোথাও নেই। দিব্য স্বাস্থ্যের লক্ষণ, মুখে অপরিসীম প্রসন্নতা।

অনুমানে বুঝলাম ইনিই রতন-মামা! উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলাম।

আমাকে দেখেই কিন্তু তাঁর মুখের সে প্রসন্নতা মিলিয়ে গিয়েছিল, ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'কে? আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

একটু বিব্রত বোধ করলাম বৈ কি।

বললাম, 'আপনি চিনবেন কিনা জানি না। আমার নাম গণেশ—আমি—'

'ও, তুমি তরুর জামাই? বোস বাবা, বোস! বড় খুশী হলুম তোমাকে দেখে। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে এখানে এসে কটা দিন কাটিয়ে যাবার জন্যে লিখব মনে করছিলাম। আমার এখন এমন ভদ্র-বাঙ্গালী-ফোবিয়া হয়ে গেছে যে—জামাকাপড়-পরা বাবু দেখলেই আতঙ্ক হয়। তাই তোমাকে দেখে ভুরু কুঁচকেছিলাম। ওরে ও ধাঙ্গি, বাথরুমে জল দে, বাবু মুখ হাত ধোবেন। আর চা জল-খাবার তৈরী কর।'

বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, কিন্তু গায়ে ড্রেসিং গাউনও নেই—পায়ে দামী স্লীপারও নেই। লুঙ্গির উপর গেঞ্জি, খালি পা। বুঝলুম যে সত্যি-সত্যি জামাকাপড়ের আতঙ্ক হয়েছে ওঁর।

বাথরুমে যাওয়া-আসার পথে বাড়ি-ঘরের অনেকটাই চোখে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তফাৎটাও।

এখানে প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে পরিপাটি ক'রে সাজানো, ঘরদোর তক্ তক্ করছে পরিষ্কার। কোথাও—না ঘরদোরে আর না বিছানা আসবাবে—এতটুকু ময়লা বা অপরিচ্ছন্নতা নেই। আর সবই সাদা। ধপধপ করছে সাদা। এমন অম্লান শুভ্রতার বর্ণসমারোহ আর কোথাও দেখি নি।

মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এসেই সেই কথাই বললাম রতন-মামাকে।

'সাদা রঙ্‌টা আপনার খুব পছন্দ বুঝি?'

'আমার চেয়েও ধাঙ্গির পছন্দ বেশী। পরিষ্কার-পরিষ্কার ওর একটা নেশা। সাদাটা হাতের মধ্যে পায়, পরিষ্কার হ'ল কি না বুঝতে পারে—তাই

ঐটেই ও ভালবাসে। প্রত্যহই এক বালতি ক'রে সাবান কাচবে—এমন বাই!' বলেই একটু সস্নেহ হাসি হাসলেন।

একটু পরে সেই হো মেয়েটিই চা জলখাবার দিয়ে গেল। সেখানেও সুন্দর পরিপাট্য। ছোট দুটি টিপয়ে খাবার জল চা সাজিয়ে এনে প্রত্যেকের সামনে বসিয়ে দিয়ে গেল। নিঃশব্দেই করছে সব, মুখে একটিও কথা নেই। আমার সঙ্গে আগে কথা না কইলে ভাবতুম হয়তো বোবা।

আর কোন দ্বিতীয় মানুষের অস্তিত্ব টের পাই নি এখনও পর্যন্ত। সুতরাং অনুমানে বুঝলুম এইটিই ধাঙ্গি। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম। মেয়েটি সত্যিই খুব পরিষ্কার। খাটো সাঁওতালী কাপড় পরনে কিন্তু তাও ধপধপ করছে। খালি গা—মাথায় এই সকালেই কটা সাদা ফুল গুঁজেছে—অপরাজিতা আর বেলফুল মিলিয়ে। কিন্তু মুখের রেখা প্রশান্ত, ভাবলেশহীন। অনেকটা যন্ত্রের মতো।

চা-পর্ব শেষ হ'লে বাবুর তামাক দিয়ে গেল ধাঙ্গি।

রতনমামা বললেন, 'শোন্—এ বাবু আমার জামাই হয়। ছাখ্‌ দিকি, মাছ-টাছ পাস কিনা—নইলে একটা মুর্গি কাট। আর শোন, একটা ইজিচেয়ার খুলে দিয়ে যা—তুমি বাবা বেশ আরাম ক'রে বোস। এখানে তো কোন কাজ নেই। সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস থাকলে খেতে পারো—আমার কাছে কোন লজ্জা নেই। থাকবে তো দু-চারদিন?'

'না না। আমি এই দুপুরের গাড়িতেই ফিরব বলে এসেছি। রিক্সাওলাকে বলেছি নিয়ে যাবে—'

'পাগল নাকি। আউট অফ কোশ্চেন। দুদিন না থেকে যাওয়াই হ'তে পারে না।'

'সে—দেখুন বরং আর একবার এসে থাকা যাবে। বলে-টলে আসি-নি। কাপড়-জামাও বিশেষ কিছু আনি নি—'

'কী দরকার এখানে? আমার কাচা লুঙ্গি আছে, ধুতি আছে, পায়জামা আছে, যা খুশী নিতে পার। বিছানা আছে। তারা ভাববে? সে আমি এখনই টেলিগ্রাম ক'রে দেবার ব্যবস্থা করছি।'

তিনি জোর ক'রেই উড়িয়ে দিলেন আমার সব যুক্তি।

আর সত্য কথা বলতে কি, আমারও এত ভাল লাগছিল জায়গাটা যে খুব

একটা যেতেও ইচ্ছা করছিল না। বিরূপ অভ্যর্থনা আশা ক'রেই একটি ছোট কাঁধঝোলায় একটা তোয়ালে ও ধুতি ছাড়া কিছুই আনি নি, সেজন্য আপ-সোসই হতে লাগল।

সব শেষে রতন মামা বললেন, 'আমি যদি নিষেধ করি রিক্সাওলাই কি নিয়ে যেতে সাহস করবে তোমায় মনে করো? আমাকে ওরা যমের মতো ভয় করে। একে বন্দুক রিভলভার দুই-ই আছে—তার উপর এই বাঘা কুকুর। আমাকে সকলে যথাসাধ্য এড়িয়েই চলে।'

বলে হা হা ক'রে হেসে নিলেন খানিকক্ষণ। প্রাণ-খোলা হাসি। মামীমা ও মামাতো শালা বর্ণিত 'রগচটা' 'দাম্ভিক' 'রূঢ়ভাষী' সে লোকটিকে তো এর মধ্যে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তবে কি এটা ওঁর ছদ্মবেশ?

একথা সেকথার পর মূল প্রশ্নের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করি।

'তা আপনি কি সত্যিই আর কলকাতায় ফিরবেন না?'

'পাগল! আবার! শুনছ যে জামাপরা মানুষ দেখলেই আমার আতঙ্ক হয়। এই ধাঙ্গীটা কলকাতার মেয়েদের দেখাদেখি জামা পরতে শুরু করেছিল—এক ধমকে সে বদভ্যাস বন্ধ করেছি। বলে দিয়েছি যে হয় জামা ছাড়তে হবে নয় আমাকে ছাড়তে হবে।'

'কিন্তু এই অকাল বানপ্রস্থ কি বেশী দিন ভাল লাগবে?'

'বানপ্রস্থ!' রতনমামা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসেন। এবারে তাঁর দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে, 'বানপ্রস্থ কাকে বলে বাবা? বনে গেলে বানপ্রস্থ হয়! সেইটেই যে ছিল আমার বনবাস। এই তো সবে জীবন শুরু করেছি বলতে গেলে। বাঁচবার মতো বাঁচছি এই একটা বছর। এ যে কি শান্তি তা তো চোখে দেখতেই পাচ্ছ! এই ফেলে আমি সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে যাব—মানুষ জন্তুর মাঝখানে! কেন যাব? টাকা? টাকার দরকার সম্ভোগ করতে। সম্ভোগই যদি না থাকে ভূতের মতো কেবল টাকা রোজগায় ক'রে লাভ কি? ভদ্র সভ্য মানুষে আমার দরকার নেই। আমার ধাঙ্গীই ভাল। একটা মেয়ে—কত আর বয়স হবে—কুড়ি বাইশ বড় জোর—কী খাটে তা তোমার ধারণা নেই। এই যে চমৎকার বাগান দেখছ, ওখানে হলে তিনটে মালী লাগত—ধাঙ্গী একাই করে। ও আমার একাধারে

মালী, ঝি, রাঁধুনী—সেবাদাসী। আমার কোন লজ্জা নেই বাবা, প্রয়োজন হ'লে শয্যাসঙ্গিনীর কাজও চালায়। এই সব চেয়ে ভাল, হুকুম করলে কাছে আসে, নইলে দূরে থাকে, অকারণে গায়ে পড়তে আসে না বা গৃহিণীর অধিকার দাবী করে না। চমৎকার পরিবেশ, স্বাস্থ্য ভাল থাকে—দৈহিক আরামের অভাব নেই। বেশ আছি! বেশ আছি!'

'কিন্তু এমন নিঃসঙ্গতা আর কদিন ভাল লাগে? বইটই অবশ্য আনান হয় তো—'

'কিছু না। কিছু না। কিছুর দরকার হয় না। সারাদিন ঐ পাহাড়ের দিকে চেয়ে, আর তামাক খেয়েই বেশ কেটে যায়। খবরের কাগজ একখানা আসে বটে কিন্তু অর্ধেক দিন তাও পড়া হয় না। পড়তে ইচ্ছেই করে না। আমার কিছু কষ্ট হয় না পড়াশুনো না ক'রে। লোকের সঙ্গে কথা কওয়াই তো বিষ। যাকে পছন্দ হয় না—তাদের সাহচর্যও অসহ্য। দু একজন বন্ধু আছেন তাঁদের আসতে বলি মধ্যে মধ্যে। আর আত্মীয়দের মধ্যে এক তুমি—তোমাকে দেখি নি কিন্তু তোমার সব কথা শুনে তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করত প্রায়ই। তাই ভাবছিলুম আসতে লিখব। কিন্তু তোমার বউ নয় কি শাশুড়ি নয়। আত্মীয় স্বজনদের মুখ দেখতে চাই না আর!'

এর ওপর ওকথা আর কওয়া যায় না। মনে মনে বেশ একটু হতাশ হয়ে পড়লুম।

ইতিমধ্যে ধাঙ্গী আর এক প্রস্থ চা দিয়ে গেল। কল্‌কে পালটে দিয়ে গেল গড়গড়ার।

চা খেয়ে দুচার টান তামাক টেনে আবার প্রসন্ন হলেন রতনমামা! কেমন একটু চোখ টিপে বললেন, 'তুমি কেন এসেছ তা আমি জানি। বলবার চেষ্টা করো না। ওদের প্রসঙ্গ শুনলেই আমার রাগ হয়। তবে তুমি নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে যাও—আমি মাসিক আরও পাঁচশ টাকা ক'রে বাড়িয়ে দিতে বলে দেব ব্যাঙ্ককে। দেব তাদের প্রতি দয়া ক'রে নয়—তোমাদের মতো বেচারী আত্মীয়দের বাঁচাতে! এমনি আরও কত লোকের জীবন দুর্বহ করবে তার ঠিক কি! কিন্তু বলে দিও this is final, আর এক কড়িও বাড়বার সম্ভাবনা নেই। এর পর যদি ও প্রস্তাব নিয়ে কেউ আসে—কুকুর লেলিয়ে দেব!'

বেঁচে গেলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো দিন তাঁর অপূর্ব বানপ্রস্থ উপভোগ

ক'রে যখন ফিরলাম, আমাকে বলে দিলেন, 'তুমি যদি একা কোনদিন আস্তে চাও, always welcome, আমি মানুষ চিনি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে—খাঁটি মানুষ বলেই সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু আর কোনও আত্মীয় কাউকে সঙ্গে এনো না। আমার বানপ্রস্থের পবিত্রতা নষ্ট করতে দেব না।'

আসার সময় কী মনে হ'ল, হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করলাম।

তিনি হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সুখী হও বাবা! এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর জানি না!'

নাটকের মতোই

সংবাদটা খুবই নাটকীয়। সব কাগজেই বেরিয়েছিল। কেউ প্রথম পাতায় ছেপেছিলেন ছোট টাইপের হেডলাইনে, কেউ ছেপেছিলেন ভেতরের পাতায় ডবল কলম হেডলাইন দিয়ে। এ নিয়ে পথে ঘাটে রেস্তোরাঁতে আলোচনাও হয়েছে কিছু কিছু। তবে বেশী হৈ হৈ করার অবকাশ মেলে নি। যেখানে নিত্য নূতন চমকপ্রদ খবর—হত্যা, রাহাজানি, লুট, ছিনতাই, ডাকাতি, বন্দুক কেড়ে নেওয়া, আগুন লাগানো, বোমাবাজি—অগণিত খবরের ফুলঝুরি, সেখানে কোন-খবর নিয়েই বেশী আলোচনার অবসর মেলে না। ব্যাঙ্ক লুঠ, ডাকাতি—সাড়ে তিন লাখ টাকা লুঠ হয়েছে খবর বেরোলেও—একবার একটু ভয়ার্ত মন্তব্য ক'রেই অন্য সংবাদে চলে যেতে হয় পাঠককে, তার বেশী মনোযোগ দেওয়া চলে না! কোন বিদেশী রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হলেন কিম্বা কোন বিদেশী রাজাকে মেরে ফেলা হল—এসব আমাদের নিয়ম অনুসারে বড় হরফে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বার হলেও তাদৃশ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না—এমনই 'জমানা' পড়েছে।

অবশ্য এ কাহিনী শুরুও এক সংবাদ দিয়েই।

বেলেঘাটার দিকে এক পুলিশের এস.-আইকে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী, কুড়ুল, দা এবং ছোরা দিয়ে কুপিয়ে ও খুঁচিয়ে মেরেছে।

এ ধরনের সংবাদ নতুন নয়, আজকালকার কাগজে তো নিত্যই বেরুচ্ছে। এ রকম ঘটনা ঘটছেও অবিরত।

তবু যে তপনের মা চেঁচিয়ে উঠলেন কাগজটা পড়তে পড়তে তার কারণ নিহত লোকটি তাঁর পরিচিত, এক রকম আত্মীয়ের মতোই।

'ইস। তোর নিখিল মামাকে-ই—!···আরে, ও তো লালবাজারে ছিল জানতুম। ছাখো, একে বলে নিয়তি! কি করতে এসেছিল কে জানে, ঐ জন্যেই তো আজ ছ মাস লালবাজারে পড়ে আছে একা—ঐ ভয়েই। কেন মরতে আবার বাড়িতে আসতে গেল!'

তপন বেলায় ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছিল। সে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কে নিখিল মামা?'

'এই যে। কাগজ দেখিস নি বুঝি। নিখিল চ্যাটার্জী, জোড়া-গৌরতলা লেনের—তাকে যে কাল, রাত আটটার সময়—'

'সে আবার আমার মামা হ'ল কি করে?' তপনের ভ্রূকুটি আরও ঘনীভূত হয়।

'তুই সব ভুলে যাস। কি যে করছিস আজকাল—। লেখা নেই পড়া নেই—ইস্কুল-কলেজ থাকে অর্ধেক দিন বন্ধ—কেবল টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ানো, কাজের মধ্যে তো এই! আমরা যখন নারকোল-ডাঙ্গায় থাকতুম—পাশের বাড়ির নিখিল মামা—মনে নেই? ওর সম্পর্কেই তো ওখানে যাওয়া, ও-ই তো বাড়ি ঠিক ক'রে দিয়েছিল। বাড়ি ক'রে আমরা এখানে উঠে আসার পর অনেকটা দূর হয়ে গেল তাই—এমনি কিছু দূর নয়, তবে একটা বাস কি ট্রামে তো পড়ে না—তুবার বদল করতে হয় বলেই। ওরাও বাড়ি করে বেলেঘাটা চলে গেল। এককালে খুবই দহরম মহরম ছিল। সম্পর্কও একটু আছে—আমার আপন পিসতুতো ভাইয়ের মানে তোর ষষ্ঠীমামার সতাতো ভাই। পিসেমশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে, বুঝলি এবার? তবে খুবই আসত আমার বাপের বাড়িতে—সেই এতটুকুটি যখন, তখন থেকে। আমার ঠাকুমা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন জামাই ষষ্ঠীতে নেমন্তন্ন করেছেন, পুজোয় কাপড় দিয়েছেন জামাইকে। বলতেন, 'ছেলেমানুষ, কী-ই বা বয়স, বে করবে না আবার! এখন থেকে সাধ আহ্লাদ সব ঘুচিয়ে বসে থাকবে নাকি! বেশ করেছে বে করেছে। তাতে আমার ভালবাসা কল্যেণ অকল্যেণ চলে যাবে কেন? সেই জন্যেই তো, উনি যখন হঠাৎ বদলি হয়ে এলেন—কোথায় বাড়ি কি বিত্তান্ত, আমারই মনে পড়ল নিখিলের কথা—

চিঠি দিতে বাড়ি ঠিক ক'রেও দিলে সাত দিনের মধ্যে!...ছাখো, গুঁড়ো গুঁড়ো মেয়ে কতকগুলো, একটা ছেলে নেই, বড় কেউ নেই মাথার ওপর—বৌটো কি যে করবে!'

মুখ ধুয়ে এসে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে তপন্ বললে, 'ওরা তো আজ কাল মোটা টাকা পায় এইভাবে মরলে। খুন হলে তো সুবিধে আছে ঢের।'

'তুই থাম!' মা ধমক দেন, 'দশহাজার না পাঁচ হাজার—এই তো দেয়। তাতেই সব দুঃখ ঘুচে গেল একেবারে?...একটা পরিবারের চলে যায়? চারটে না পাঁচটা মেয়ে—ছেলে হবে এই আশায় আশায় অপারেশনও করতে দেয়নি, নইলে বৌ তো বলেছিল। তার শরীর তো ভাল নয়। তা ঐ এক ছেলের শখ।...নতুন বাড়ি করেছে সরকার থেকে টাকা ধার নিয়ে, তাতেও কুলোয় নি, কী সব ইনসিওর-টিনসিওর বাঁধা রেখে বাড়ি শেষ করেছে। সে দেনা মাথার ওপর। যদি ধারের টাকা শোধ দিতে হয়—এক পয়সাও থাকবে না হাতে, তাতেই দেনা শোধ হবে কিনা কে জানে! খাবেই বা কি, লেখাপড়াই বা শেখাবে কি ক'রে মেয়েদের। বাড়িও এমন নয় যে ভাড়া দেবে—তিনটি তো ঘর মোটে খুপরি খুপরি। ওর কি ভাডা দেবে।'

'তুমি দেখে এসেছ নাকি?' তপন চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্ন করে।

'ওমা, তা দেখি নি! গৃহপ্রবেশে অত ক'রে বলে গেল। তুই তখন যেন কোথায়—কলেজ থেকে কোথায় নিয়ে গেছল, মুসৌরী না কোথায়।...এমন তো কিছু আয় নয়, ওদের তো পুলিশের চাকরি, ঘুষ নেবার কাজও ছিল না।... তবু বেঁচে থাকলে হয়তো কষ্টে-ছেষ্টে শোধ দিতে পারত—এখন এই নাবালক মেয়েগুলোর কী হাল হবে বল দিকি, এতটুকু এতটুকু সব—বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা! কী যে ওর ওপর এত আকোচ তাও জানি না। কী করেছিল কার! ভাগ্‌নাটাকে এনে রেখেছিল, এদের কেউ দেখবার নেই, বৌয়ের শরীর খারাপ যখন লালবাজারে যায়—তা তাকেও তো মারলে এই ক'মাস আগে, সুধীরকে—বেচারা ফুটবল খেলছিল মাঠে—সাতেও নেই পাঁচেও নেই, মামাকে দেখাশুনো করত এই পর্যন্ত। এখন এমন একজন রইল না—যে পয়সায় না হোক গতরে করে।'

'দেখছে তো চারদিকে এসব কাণ্ড হচ্ছে, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিলেই তো পারত!' তপন এক রকমের নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে বলে।

'তুমি তো বলে খালাস। তারপর, খেত কি? এতগুলো মুখে কি তুলত? আজকালকার দিনকাল—চাকরির বাজার তো এই, অর্ধেক কল-কারখানা বন্ধ—একটা যে-কোন চাকরির জন্যে ছেলেগুলো হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে—এতদিনের পাকা চাকরি ছেড়ে এই চল্লিশ বছর বয়সে কি করত—তাই শুনি? কেউ খেতে দিত—এই যারা মেরেছে?···সত্যিই কি দিনকাল যে পড়ল!···আর তুমিই যে কি ক'রে বেড়াচ্ছ তাও তো জানি না—কোথায় ঘোরো টো টো করে—কোনদিন কোথায় খুন হবে, নয়ত বাড়িতে পুলিশ আসবে—এ বেশ দেখতে পাচ্ছি!'

'সকলের যা হচ্ছে, তোমারও তাই হবে। সমাজে বাস ক'রে কি আর এসব এড়াতে পারবে?' তপন খুব উচ্চাঙ্গের দার্শনিক ভঙ্গীতে বলে।

তপনের মা পরের দিন ওদের খবর নিতে গেলেন। তপন বারণ করেছিল—শোনেন নি।

'তুই চুপ কর। এক সময় আমাদের অনেক করেছে। আর আত্মীয়ই তো। এত বড় বিপদে মানুষ খবর নিতে যাব না! হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? সে আমি পারব না। তা আমার অদৃষ্টে যা হয় হোক। তোদের এই সমাজে বাস করছি যখন—তখন এসব কি আর এড়াতে পারব—অপঘাত মৃত্যু আছে একদিন ভাগ্যে—বেশ বুঝতে পারছি!'

ছেলেকে মোক্ষম খোঁচা দিয়ে ছোট ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন—একটা ট্যাক্সী করে।

ফিরে এলেন অনেক রাত্রে। তপনের বাবা আপিস থেকে এসে ইস্তক ছটফট করছেন। স্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, বকাবকি করছিলেন অনুপস্থিত স্ত্রীর হয়ে উপস্থিত মেয়েটাকেই, 'চিরদিন তোর মার সমান গেল! একটা কিছু মাথায় গেল তো আর রক্ষে নেই। এই দিনকাল—ঐ পাড়ায় যায় মানুষ! তা আবার একটা বাচ্ছা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়িও তো চিনি না ছাই!'

তপন সেদিন কি কারণে একটু আগেই ফিরেছিল বাড়িতে। মা তখনও আসে নি শুনে তারও মুখ সাদা হয়ে গেল, কিন্তু যাওয়া কি খোঁজ করার কথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করল না। হয়ত বাবা পাছে সেই কথাই বলে বসেন, সেই ভেবেই অত বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল—কে জানে।

যাই হোক—দশটার সময় যখন তপনের বাবা নিজেই জামাটা গায়ে গলাচ্ছেন তখন ওঁরা ফিরে এলেন। ওঁরা মানে—তপনের মা, ভাই এবং সঙ্গে আর একটি কুড়ি একুশ বছরের সুশ্রী মেয়ে!

সেই মেয়েটির সঙ্গে চোখোচোখি হতে তপন যেন পাথর হয়ে গেল। সে মেয়েটিও কম অবাক হ'ল না। তবে তার বিস্ময় অতটা নয়—যতটা তপনের। আসলে মেয়েটি খুবই কেঁদেছে, হয়ত সম্প্রতি কান্নাকাটি করছিল একটু আগে পর্যন্ত। মুখ ফুলে থমথম করছে, চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। শোকের প্রাবল্যে অন্য কোন অনুভূতিই তেমন স্পর্শ করছে না। অবাক হলেও তা প্রকাশ করার মতো শক্তি কি উদ্যম নেই আর।

তপনই অবশেষে অর্ধ-প্রশ্ন করল একটা, 'শোভনা তুমি!'

'ওমা, তুই শোভনাকে চিনিস নাকি? তবে যে সকালে নিখিলমামাকে চিনতে পারছিলি না?'

'শোভনার সঙ্গে নিখিলমামার কোন সম্বন্ধ আছে জানব কি ক'রে। শোভনা আমার সঙ্গে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে—বাগবাজার থেকে আসে এই জানি!'

তপনের মা কেঁদে ফেললেন, 'বলিস নি ওদের দুর্গতির কথা। মেয়েটা কাল থেকে মুখে একটু জল পর্যন্ত দেয় নি—শুধু কেঁদে যাচ্ছে।...তাই তো জোর ক'রে ধরে আনলুম। বলে, ওদের ফেলে কোথায় যাব? তা অবশ্য বটে, তবে আপিস থেকে লোক এসেছে, আজ তো খুব পুলিশ পাহারা দেখলুম, বৌয়ের কে একজন পিসতুতো ভাইও এসে আছে, তাই ওকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে এলুম!'

বলতে বলতে তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে, তখনও তার বিস্ময়-বিহ্বলতা দূর হয় নি দেখে, মনে পড়ল ওর যে আসল কথাটা এখনও বলা হয়নি, অর্থাৎ পরিচয়টা দেওয়া হয় নি। বললেন, 'শোভনা তোর নিখিলমামার বড় মাসীর মেয়ে। দুবছর আগে ওর বাবা মা দুজনেই মারা যান এক মাসের আড়া-আড়িতে. মানে বাবাই মারা গেছলেন—শোকটা সামলাতে না পেরে মা আত্ম-হত্যে করে রেলে গলা দিয়ে। আর কেউ কোথাও নেই দেখে নিখিল এনে কাছে রেখেছিল তারপর বাগবাজারে এই টিউশ্যনিটা নিখিলই যোগাড় ক'রে দেয় কাকে যেন ধরে—তাদের মেয়ে দুটোকে পড়ায়—তার বদলে তারা খেতে

আর থাকতে দেয়। বাকী যাবতীয় খরচ নিখিলই যোগাচ্ছিল, বইখাতা, কাপড় জামা জুতো—সব!'

তারপরই কপালে চাপড় মেরে আবারও কেঁদে উঠলেন তপনের মা, 'সত্যি—কী যে দুগ্‌গতি, দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। গুয়ের গোবলা বাচ্ছা বাচ্ছা মেয়েগুলো—বড়টারই এগারো বছর বয়েস সবে। বৌটার তো এমনিই শরীর ভাল না, আমাশা জ্বর—ডাক্তার ডাকবে কি কাউকে খবর দেবে এমন অবস্থাও নেই শুনে কাল রাত্রে চুপি চুপি দেখতে এসেছিল ওদের—কি ক'রে কে খবর পেয়েছে জানি না, বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ঐ কাণ্ড! বৌটা আরও তাই কাঁদছে হাহাকার ক'রে—আমি আবাগীকে দেখতে না এলে তো আর এই কাণ্ড হত না! আমিই খেলুম মানুষটাকে। আমার জন্যে অমন একটা মহৎ প্রাণ নষ্ট হয়ে গেল। না হয় আমি মরতুমই—কারও কিছু ক্ষতি হত না তাতে। এ কি হল!…এই বলছে আর কপাল ঠুকছে। আজ নাকি লালবাজার থেকে প্রসেশান ক'রে নিয়ে গিয়েছে নিখিলকে—এদের ডাকতে এসেছিল, তা কে যাবে, বড় মেয়েটাকেই শেষ পর্যন্ত—সেই মুখ-অগ্নি করেছে। এই মাত্তর ফিরল, আরও তার জন্যেই দেরি, এই আসছে এই আসছে ক'রে—। সেই সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত মুখে জল পড়েনি মেয়েটার। একটু শরবৎ খাইয়েই বেরিয়ে পড়লুম। তোমরা আবার ভাবছ!'

তপনের মা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে—এবং তারপর এদের খেতে দিয়ে বহু বিলাপ করলেন আরও। অনেক কথা জানা গেল। ছ মাস আগেই নাকি চিঠি পেয়েছিল নিখিল, ওপর-ওলাদের বলতে তাঁরা লালবাজারের মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। দরকার হলে পোস্ট অপিস থেকে নিখিলের বৌ গিয়ে ফোন করত। শোভনাও এক আধ দিন এসে খবর নিয়ে যেত এদের—তেমন কিছু বলার থাকলে সে-ই লালবাজারে গিয়ে নিখিলকে জানিয়ে আসত। পুলিশের গাড়ি এসে মধ্যে মধ্যে র‍্যাশন নামিয়ে দিয়ে যেত, অন্য অন্য জিনিস কাপড় জামা—পাড়ায় লোককে ধরে আনাত নিখিলের বৌ। তবে অসুখ বিসুখ হলেই মুশকিল, পাড়ার ডাক্তারকে বলা কওয়া ছিল, তবে কে কখন খবর দেয় এই তো এক আতান্তর। আর হুট বলতে ডাক্তার ডাকাও চলে না, এই টাকার টান। নিখিল অনেক ওষুধ পত্তর জানত,

বাড়িতে থাকলে সে-ই দিত এটা ওটা—ডাক্তার ডাকারও দরকার হ'ত না।... তাছাড়া পরীক্ষা, বই খাতার ব্যাপার এসবও আছে। শোভনাই করত যা পারত।

'ছ্যাখো না', তপনের মা বললেন, 'এমন ভয় হয়েছে লোকের—এই ধরনের বিপদে পাড়ার লোকেই তো এসে পড়ে, বুক দিয়ে সাহায্য করে—এইতো দেখে আসছি চার কাল—তা এদের এই বিপদেও, জানালায় জানালায় দেখছি সব দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিল গিন্নিরা—কেউ একটু একবার এসে দাঁড়ালে না। পুরুষরা তো ত্রিসীমানায় আসছে না। যেন এদের সাহায্য করছে দেখলে তাদের সুদ্ধ মারবে।.. সবাইকে অমানুষ ক'রে দিয়েছে—এই এক হাওয়া এসে।...বরং দেখলুম ভদ্দরলোকের চাইতে ছোট-লোকরা ভাল। ওদের যে ঠিকে ঝি হেনা—সে আর তার মেয়ে এসে পড়ে আছে কাল সেই খবর পেয়ে এস্তক। ওদের পেছনে যে বস্তি—সেখানকারও দু তিনটে মেয়েছেলে এসে দেখলুম খুব করছে, তারাই তো মেয়েগুলোকে জোর ক'রে খাওয়ানো, বাড়ি ঘর ধোওয়ামোছা, সব করছে। একজন তো মায়ের মতো বৌটাকে কোলে ক'রে বসে আছে।...তোমাদের এই লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকদের মুখে আগুন।'

.

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারল না তপন।

এ একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার, এই পরিস্থিতিটা। শোভনা তাদের বাড়িতে, তারই ঘরে, মাত্র বোধহয় হাত-চারেক দূরে শুয়ে আছে। ঘরের অভাব বলেই, তার ছোট দুই ভাইকে ওঘরে বাবার বিছানায় পাঠিয়ে শোভনাকে নিয়ে তার মা শুয়েছেন ওদের তক্তপোশে। মা আছেন—না, অন্য কোন সম্পর্ক স্পষ্ট নয় ওদের মধ্যে—তবু, এক ঘরে এত কাছা-কাছি শোভনা আর সে—থ্রিল বোধ করারই তো কথা।

সেই থ্রিলটাই বোধ হচ্ছে না—কে জানে কেন। কীরকম অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

অনুতাপ? বিবেকের দংশন?

'গশ!' ওদের হেমন্তদার ভাষায়, 'গশ য়্যাণ্ড ননসেন্স!'

এসব সেই মধ্যযুগীয় মনোভাব।

রাজনীতিতে বিপ্লবে, এসব থাকতে নেই। এই ধরনের মনোভাবই আপিংয়ের মতো নেশা ধরিয়ে রেখে দেয়।···

না, সেসব কিছু না। এমনিই—

শোভনা কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। সকাল থেকে নাকি কিছুই খায় নি। এখন মা জোর ক'রে বসিয়েছিলেন—কিছুই খেতে পারল না। একটু যা কমলা নেবুর রস শেষ অবধি, মা একরকম জোর ক'রে খাইয়ে দিলেন, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ছেলেমানুষের মতো।

খুবই খারাপ লাগছে তপনের।

শোভনার জন্যেই খারাপ লাগছে। নইলে আর কিছু নয়।

এর মধ্যে শোভনার এতখানি আঘাতের ব্যাপার আছে, তা কে জানত!

অবশ্য জানলেও যে কোনো প্রতিকার করতে পারত, তা নয়। তবু খারাপ লাগছে এটাও ঠিক।

সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম করার ব্যাপারে এককালে তপনের মনোভাব খুব স্পষ্ট এবং 'সোচ্চার' ছিল, বর্তমান কালের সংবাদপত্রের ভাষায়।

কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত সে। প্রেম ব্যাপারটার ওপরই হাড়ে চটা ছিল। ছেলেমেয়েগুলোকে অমানুষ ক'রে দেয় এই নেশা, অথবা ঘুরিয়ে বললে অমানুষরাই ঐ নেশায় মশগুল হয়।

যাদের জীবন সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে দায়িত্ব বোধ আছে—যারা কাজ করতে চায়, মানে কাজের মতো কাজ—তাদের কাছে এ ব্যাপারটা সযত্নে পরিহার্য।

এই কথাই বারবার সরবে এবং বেশ ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই শুনিয়ে এসেছে সকলকে—মানে ওর সহপাঠী বন্ধুবান্ধবদের।

আসলে এর আগে তেমন কোনো সহপাঠিনীর দেখা পায় নি বলেই হয়ত অতটা গলার জোর ছিল। কো-এডুকেশনের মধ্যেই পড়েছে বারবার, আশপাশের অনেক ছেলেকেই দেখেছে কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যেতে, কেউ কেউ ওর মধ্যেই জোড় বদল ক'রে নিয়েছে—যেন প্রেম চালাবার জন্যে, প্রেমে পড়ার জন্যেই কলেজে ঢুকেছে ওরা। মেয়েগুলোও যেন ওৎ পেতে বসে ছিল—ছেলেদের ধরবে বলে। ছি!

তপনের ও ধরনের মনোভাব কখনও হয় নি, বরং সে এদেরই অমানুষ ভেবে এসেছে বরাবর—হীন চোখে দেখে এসেছে।

ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেও প্রথমটা অত লক্ষ্য করে নি শোভনাকে। আলাপ হয়েছে এই কিছুদিন—মাসকতক। হঠাৎই চোখে পড়েছে। শান্ত সংযত-বাক মেয়েটিকে—নম্রতার একটা কঠিন আবরণে সর্বদা নিজেকে আবৃত রাখে এমন ভাবে, সহজ আত্মমর্যাদার এমন একটি সহজাত বর্ম আছে যে—একদিন দুদিন লক্ষ্য ক'রে দেখেই তপনের আশ্চর্য লেগেছে, মুগ্ধ হয়েছে সে। আকৃষ্ট হয়েছে বলাই বাহুল্য। এ মেয়ে অসাধারণ—ঐ যে যারা চারিদিকে কেবল হি-হি ক'রে হেসে বেড়াচ্ছে, রেডিওর নাটক বা ফিল্মের নায়িকাদের অনুকরণে কথা বলছে, বেশে এবং ভূষায় আধুনিক হওয়াই যাদের মনে হয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—তাদের মতো নয়। একেবারে স্বতন্ত্র, স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

তবু—তখনই গায়ে পড়ে আলাপ করতে যায় নি। বুঝেছিল যে এ সে মেয়ে নয়, ওভাবে পরিচয় করতে গেলে হবে না। তারপর—একসময় আলাপ হয়েছে, একটু ঘনিষ্ঠতাও। যত কাছে থেকে দেখেছে ততই মুগ্ধ হয়েছে সে। ইদানীং ওকে ঘিরে একটু স্বপ্ন, একটু ভাবনাও শুরু হয়েছে।

না, জীবনসঙ্গিনী হিসেবে নয়—ওর যা জীবন, ডেডিকেটেড জীবন বলেই মনে করে সে, তাতে সঙ্গিনী মানে বাধা, বন্ধন, কর্মক্ষমতার বিনষ্টি—ও চায় কর্মসঙ্গিনী হিসেবে। এ মেয়ে সোবার, এর দায়িত্বজ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, পড়াশুনো আছে, এ মেয়ে যদি সত্যিকার কোনো কাজে নামে, ছেলেদের থেকে ঢের ঢের বেশি কাজ করতে পারবে। এই মেয়ে পাশে থাকলে, একসঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য ঘটলে, অনেক বেশি কাজ করতে পারবে।

ইদানীং একটু ফাঁক পেলেই গল্প হত ওদের। এর মধ্যে বিস্তর দিন ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে থাকতেই—সেসব অনেক দিন তপন হাঁটতে হাঁটতে গেছে বাগবাজার পর্যন্ত—মানে বড় রাস্তা পর্যন্ত। ওদের গলিতে ঢোকে নি, কারণ তাহলে শোভনার ভদ্রতার খাতিরে ওকে বাড়িতে ডাকতে হয়, জলখাবার খাওয়াতে হয়, কে জানে ওদের বাড়ির আবহাওয়া কেমন—শোভনা হয়ত পছন্দ করবে না, অথচ না বললেও অপ্রস্তুতে পড়বে। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই আরও বাড়ি পর্যন্ত সঙ্গে যায় নি। শোভনাও কোনদিন বলে নি, অবশ্য আভাস দিয়েছে যে তাদের গলি ভাল নয়, অপরিচিত এবং ভিন্নপাড়ার ছেলের না যাওয়াই ভাল।

সুতরাং, শোভনার পরিবারে কে আছে, ওর বাবা মা আছেন কিনা, পারিবারিক অবস্থা কি রকম—এসব কোনো প্রশ্নই করা হয়ে ওঠে নি। শোভনাও নিজে থেকে কিছু বলে নি। স্বভাব-চাপা মেয়ে সে, এমনিই খুব মিতভাষিণী। কেবল দু একদিন এমন ভাবে কথা বলেছে—যাতে তপন বুঝেছে যে, এখানে ওর বাবা মা কেউ নেই, পরের বাড়িতেই থাকে। সে বাবা মা যে মৃত—এটা স্পষ্ট বোঝে নি। একদিন মামার বাড়ির প্রসঙ্গে শুধু বলেছিল যে এক মামা হায়দ্রাবাদে থাকে আর এক মামা জোড়হাটে। আর তাদের কারুরই এমন চাকরি নয় যে যখন-তখন কলকাতা আসতে পারে, কিম্বা ভাগ্নীকে গাড়িভাড়া পাঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তবু এতটা যে—মানে, ঠিক এরকম অবস্থা—তা বুঝতে পারে নি তপন।

এতটা যে ভালও বেসেছে সে শোভনাকে—তাও বোঝে নি।

যে প্রেমকে সে এতদিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এসেছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে, সেই প্রেমই তাকে কখন এতখানি পেয়ে বসেছে, ভেতরে ভেতরে এত দুর্বল করে দিয়েছে তা বুঝতে পারে নি। প্রণয়ের দেবতা বোধ করি দ্বিগুণ শোধ তুলেছেন তাঁর অপমানের।

শোভনার এই শোকার্ত চেহারা, এই অসহায় অবস্থা—ওর ইতিহাস যেন কাঁটার মতো বুকে বিঁধছে তপনের, কিছুতেই তার খচখচানি থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। যতই বোঝাতে চেষ্টা করছে মনকে যে, এমন অবস্থায় বহু মেয়েকেই পড়তে হয়েছে—এই দুঃখ দারিদ্র্য এ দেশের ঘরে ঘরেই আছে, ছুরিতে না মরে অন্য কোনো রোগে, ক্যানসারে মরলেও ঠিক এই অবস্থাই হতো তার সংসারের এবং শোভনারও—এই সব চিন্তা ও যুক্তি ছাপিয়ে ক্রন্দনারক্ত সুন্দর দুটি চোখ, শোকাহত বিষণ্ণ একটি অতি প্রিয় মুখ এবং একান্ত অবসন্ন ভঙ্গীর একটা ছবি মনে ভেসে উঠে ওর ব্যথার স্থানে প্রচণ্ড মোচড় দেয়, অকারণেই যেন চোখে জল এসে যায়।

লজ্জিত বোধ করে বৈকি, নিজের দুর্বলতা এবং অমার্জনীয় আবেগের জন্যে। জোর ক'রে অন্য অনেক কথা ভাবতে চেষ্টা করে, অনেক বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা—সমাজের প্রতি (কোনো একটা দেশের কথা ভাবে না ওরা—সমগ্রভাবে মানবজাতির কথাই চিন্তা করে) যে দায়িত্ব ওদের, মানবসমাজের মুক্তির যে দায়িত্ব ওরা নিয়েছে সেইসব কথা, দর্শনের কথা, রাজনীতির কথা—

নেতাদের, চিন্তাবিদদের বড় বড় জটিল যুক্তি মনে আনতে চায়, কিন্তু কখন যে একটি সুকুমার মুখের শূন্য অসহায় বেদনার্ত দৃষ্টি ওর মনের সমস্তখানি জুড়ে বসে তা বুঝতেও পারে না।

ও তক্তপোশে সেই দৃষ্টি এবং মুখের অধিকারিণীও জেগে আছে, সম্ভবত কাঁদছেই এখনও—যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে কাঁদবার চেষ্টা করলেও একেবারে গোপন করতে পারছে না তার শব্দ—ছুটে গিয়ে ঐ দুটি চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দেবার দুর্নিবার ইচ্ছা হতে লাগল বারবার, কিন্তু শেষ অবধি পারল না। সাহস হলো না, মনের মধ্যে বাধাও অনুভব করলো। সেও এপাশ ওপাশ করে সারারাতই বিনিদ্র কাটিয়ে দিল। যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, আমি তোমার ব্যথা তোমার দুঃখ খানিকটা ভাগ ক'রে নিলাম।

শোভনা পরের দিন ভোরেই চলে যেতে চাইল। অনেক কষ্টে এইটুকু শুধু রাজী করালেন তপনের মা যে, চা খেয়ে, স্নান ক'রে যাবে এখান থেকে। এত ভোরে গাড়ি ঘোড়াও তো নেই, পথও জনহীন, একা যাওয়া ঠিক হবে না।

মা তপনকে বললেন, 'তোরা তো বন্ধু, তুই-ই তাহলে পৌছে দিয়ে আয় না।'

তপন কিছু বলার আগেই শোভনা বলে উঠল, 'না!'

কাল থেকে এসে পর্যন্ত—এই পরিষ্কার কথা একটা শোনা গেল ওর, কণ্ঠস্বর দৃঢ় এবং যেন একটু কঠিনও। অন্তত তপনের তাই মনে হ'ল।

তপনের বাবা অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'না না ঠিকই বলেছেন শোভনা মা, ও যা পাড়া—ভিন্নপাড়ার ঐ বয়িসী ছোকরা, না যাওয়াই ভালো। এমনি আর কিছু না হোক, পুলিশে ধরেও হ্যারাস করতে পারে! আমিই যাচ্ছি—'

'না পিসেমশাই, কিছু দরকার নেই। আমিই যাচ্ছি। একাই বেশ যেতে পারব। আমি তো একাই আসা-যাওয়া করি, আর কারও যেতে হবে না—বাসে ক'রে চলে যাব—'

তপনের এই প্রথম একটা খটকা লাগল।

কাল থেকে একবারও—সেই প্রথম চোখোচোখি হবার পর—ওর সঙ্গে কথা বলে নি শোভনা, বা চোখে চোখ রাখে নি। কারও দিকেই চায় নি অবশ্য,

মুখ নিচু ক'রেই থেকেছে বেশির ভাগ, এক আধবার কেবল, মার সঙ্গে কথা বলার সময়—মার মুখের দিকে মুখ তুলেছে। অপরের কথা আলাদা, কিন্তু যেখানে বন্ধুত্বর সম্পর্ক, ইদানীং বেশ একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে—দুজনেরই দুজনের সাহচর্য ভাল লাগে এটা যেখানে স্পষ্ট—সেখানে তার দিকেই তো আগে চাইবার কথা, তার কাছেই সান্ত্বনা এবং আশ্বাস খোঁজার কথা।

এটা কি ইচ্ছাকৃত ? এড়িয়ে যাওয়া ?……

নীরব ধিক্কার একটা ? নিঃশব্দ অভিযোগ ?…

এতদিন কথা-বার্তার মধ্যে তপনের সহানুভূতিটা কোন দিকে—ওর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে—তা বুঝতে নিশ্চয়ই বাকী নেই শোভনার। এই কঠিন 'না' এবং দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া কি তারই ফল ? এটা কি তিরস্কার ?

বুঝতে পারল না তপন। আরও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই সকালেও কপালের কোণে ঘাম জমে উঠল দেখতে দেখতে।

শুনল মা বলছেন, 'হ্যাঁগো—একটা কাজ-কর্ম দেখে দাও মা শোভনাকে। ও বলছিল। তোমার অফিসে না হোক, তোমাদের ওখানে তো অনেক অন্য আপিসের লোক আসা যাওয়া করে শুনেছি—কাউকে বলে কয়ে, এই অবস্থা বলে—একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও না।'

বাবা বলে, 'কেন—ও পড়বে না আর ? পরীক্ষা দেবে না ?'

'কি ক'রে দেবে বলো ? কে আর খরচ টানবে এখন ?'

'না মানে, ফি কত বাকী ?'

'বাকী কত সেই বা কে বলবে। তাই তো ও বলছিল, করে পরীক্ষা হবে, কবে রেজাপ্ট বেরোবে, এখনকার দিনে তো ঠিক নেই কিছু। তা ছাড়া ওর খরচেরও ঠিক প্রশ্ন নয়, সংসারটা দেখবে কে ? শোভনা বলছে, মানুষের মেয়ের মতোই কথা বলছে—আমার দুঃসময়ে মেসোমশায় আমার বাবার কাজ করেছেন, উনি তো আমাকে টিউশ্যানীও করতে দিতে চান নি, আমিই জোর ক'রে গিছলুম—এখন এই অবস্থায় যদি আমি তাঁর সন্তানের কাজ করতে না পারি তাহলে আমার জন্মেই ধিক। তাহ'লে মানুষ বলে পরিচয় দেওয়াই উচিত নয় আমার।'

তারপর একটু থেমে তপনের মা আবারও বললেন, 'সত্যিই ওদেরই বা কে দেখে—তেমন আত্মীয় স্বজন কেউ নেই যে এত বড় সংসারের দায়িত্ব

মাথায় নিতে পারে। বাড়ির এক গাদা দেনা এখনও মাথায়—সব জড়িয়ে যা পাবে এদিক ওদিক থেকে, হয়ত দেনাটা শোধ হয়ে যেতে পারে—কিন্তু তার পর? এতগুলো পেট—খাবে কি? খাওয়ার থেকেও বড কথা—লেখাপড়া শেখার খরচ কি কম আজ-কাল?'

বাবার উত্তর শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করল না তপন, জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এখানে শোভনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে না সে, যদি একাই আসে—পথে ধরবে। সে একটু জোরে হেঁটে বড় রাস্তায় বাস-স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল।

একাই এল শোভনা। আগের দিনের সে শোকার্ততা নেই, যদিও মুখে এবং চোখে এখনও তার চিহ্ন স্পষ্ট।

হয়ত ওকে দেখেই শোভনা একটু দূরে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি অন্য দিকে—মানে চোখ দুটো কিছুই নজরে পড়ছে না ঠিক—সেটা তার চেয়ে থাকার ভঙ্গী থেকেই বোঝা যায়।

বাসস্টপে বহু লোক। তবু তরুণ এবং তরুণীর নিভৃতআলাপ এতই সাধারণ ঘটনা যে কেউ আর কৌতূহল বা কৌতুক বোধ করে না এখন। তপন কাছে এগিয়ে গেল একটু; আস্তে ডাকল, 'শোভনা'।

শোভনা ওর দিকে মুখটা ফেরাল কিন্তু কথা কইল না। চোখ দুটোও ওর মুখ পর্যন্ত উঠল না—পায়ের দিকে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'আমি—আমি তোমার সঙ্গে যাব?'

'না।'

উত্তর সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হ'ল বহু কথার সমষ্টি ঐ একটি অক্ষর।

কেবল আগের দিনের সে কাঠিন্য নেই। হয়ত কালও ছিল না—কঠিনতা বা রূঢ়তা ওর অনুমান।

'আমি কি কিছুই করতে পারি না তোমার জন্যে? এনিথিং—?'

এবার চোখ তুলল শোভনা।

না—অনুযোগ নয়, তিরস্কারও নয়, তপনের মনে হ'ল গভীর একটা হতাশাই সে চোখে। বহু আশার প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে তার মনে প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পে, সেই ভগ্নস্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে যেন চেয়ে আছে সে।

অপরিসীম একটা বিষাদ শুধু সে দৃষ্টিতে।

কথা কইল না। এর চেয়ে কোন ভৎর্সনা করাও ভাল ছিল। কঠিন কথা শোনালে সে জবাব দিতে পারত, অন্তত মনে মনে এতটা অসহায় বোধ করত না, এতটা অপরাধী। এই সকরুণ বিষণ্ণতা কি তাদের সম্পর্ক-সমাপ্তিরই পূর্বাভাস?

আর কথা বলার অবসর পাওয়া গেল না। বাস এসে গেল। ঠেলা-ঠেলি ক'রেই উঠল শোভনা। একটু ইতস্তত ক'রে তপনও উঠে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

বাস বদলের সময় আবারও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পালা। আবারও দেখা হ'ল। অর্থাৎ দুজনেই দেখল দুজনকে। ভীড় ঠেলে কাছাকাছি এল তপন, একেবারে ঠিক পাশে এসে দাঁড়াতে সাহস করল না।

কিন্তু এবার শোভনাই কাছে এল। চোখে চোখও তুলল। সেই অসহায় ভাব, সেই বিষাদের মধ্যেও এবার একটি দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। দৃঢ়তা বলা হয়ত ভুল, রূঢ়তা তো নয়ই—তপনের মনে হ'ল অনমনীয়তা বললেই ঠিক বোঝানো যায়। অত্যধিক শান্ত এবং ভদ্র এই মেয়েটির চোখে রূঢ়তা ফোটা সম্ভব নয়।

কাছে এসে নিচু গলাতেই বলল, 'প্লীজ, প্লীজ লিভ মি য়্যালোন! তুমি—তোমরা অনেক করেছ, এর পর আর সাহায্য করতে এসো না। ডোণ্ট য়্যাড্ ইন্‌সাণ্ট টু ইনজুরী!'

ইতিমধ্যে বাস এসে পড়ল। শোভনা দ্রুত এগিয়ে গেল সে বাসের দিকে। তপন যেতে পারল না। পা দুটো যেন ক্ষণকালের জন্যে মাটিতে আটকে গেছে, অথবা অবশ হয়ে গেছে।

এই স্পষ্ট অভিযোগের জন্যে প্রস্তুত ছিল না তপন।

তার মতবাদ আকারে ইঙ্গিতে জানিয়েছে। শোভনার সহানুভূতি কোনদিকে বোঝার চেষ্টা করেছে। দলেও টানতে চেয়েছে—পরোক্ষে। স্পষ্টাস্পষ্টি কোনদিন এসব কথা ওঠে নি, এই ধরনের রাজনীতিতে যে তপনের কোন সক্রিয়তা আছে—তাও কোনদিন ঘুণাক্ষরে জানায় নি।

তবু জেনেছে শোভনা। অনুমান নয়—নিশ্চিত জেনেছে।

তিরস্কার কি অভিযোগ নয়, ওদের সম্পর্কে ওর ভবিষ্যতের আশায়

পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে গেল।

এ মেয়েকে এতদিনে এটুকু জেনেছে তখন। এ ক্ষণিকের উষ্মা কি অভিমান নয়—এ সমাপ্তির শেষ নেই, এর পর আর শুরু করা যাবে না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে একটা পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল।

নিজের মন এমন ভাবে তপনও বোঝে নি কোনদিন। ও যে শোভনাকে এই ভাবে, এমন একান্তভাবে ভাল বেসেছে—এত উন্মত্ত, প্রচণ্ডভাবে তা কখনও ভাবতেও পারে নি।

আজ তপনের মনেও এক বিপুল বিরাট শূন্যতা, অপরিসীম বিষাদ—একটা চরম অসহায়-বোধ।

বহুক্ষণ বসে রইল সেই ভাবে। রোদ উঠল, পার্কে ভীড় কমে এল। নাগরিক জীবনের জীবন-লক্ষণ এখন পথে। প্রতি বাস স্টপে দেড়শো দুশো লোক—যে যার কর্মস্থানে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত।

চা পর্যন্ত খাওয়া হয় নি সকাল থেকে। তা হোক, কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা খেতে ইচ্ছে হ'ল না তখন।

সে উঠে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল। কোন বাসে বা ট্রামে ওঠা সম্ভব নয় এখন। ট্যাক্সীতে চড়ার মতো অবস্থা নয় পকেটের।

হাঁটছে—কিন্তু কোথায় যাচ্ছে খেয়াল ছিল না। একেবারে যখন হুঁশ হ'ল তখন দেখল সে নিখিল মামাদের (চিনত না সত্যিই এতদিন—মানে ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে জানত না) বাড়ির কাছে এসে পড়েছে।

এ পাড়ায় এ বাড়ির কাছে আসা নিরাপদ নয় ওর পক্ষে, কিন্তু আসলে এখানে আসবে বলে আসে নি।

নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়া। দুধারে খোলা ড্রেন, দোকানের সামনে-গুলোয় কাঠ চাপা দেওয়া। দোকানও সামান্য ধরনের। তারই মধ্যে একতলা ছোট বাড়ি নিখিল মামাদের। এখনও বাইরে বালির কাজ হয়নি, ইট বার করা। দরজাটা খোলা, বাইরে থেকেই ভেতরের বারান্দা এবং উঠোনের খানিকটা দেখা যায়। রোগা রোগা কতকগুলো মেয়ে। ভীত, বিহ্বল, নির্বোধ দৃষ্টি। কিছুই বুঝছে না ঠিক। কেবল বোধ হয় এটুকু অনুমান করছে যে তাদের জীবনে একটা মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে—নিদারুণ বিপদে পড়েছে তারা।

পাণ্ডুর মুখ, চোখের কোণে কালি। সে বিবর্ণতা ভয় কি অস্বাস্থ্যের জন্যে তা বোঝা কঠিন। অত্যন্ত সস্তার ছিট দিয়ে তৈরী ফ্রক। বাড়ির যতটা চোখে পড়ে—ঠিক অর্থাভাব হয়ত নয়, অর্থ-কৃচ্ছ্র তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। শোভনা একটা মেয়েকে চান করাচ্ছে, তার কাছে আরও একটা ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বছর তুই বয়েস হবে। শোভনার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল চুষছে একটা। সামনেই রকের উপর বসে আছেন—সম্ভবত ঐটিই নিখিল মামার স্ত্রী—মাথায় হাত দিয়ে। অত্যন্ত কৃশ ও রুগ্ন, বহুদিন ধরে ভুগছেন বোধ হয় নানা রকম রোগে, হয়ত হজমও হয় না কিছু, সমস্ত দেহে, মুখের ভাবে নিদারুণ অপুষ্টির চিহ্ন। বসে থাকার ভঙ্গীটাই এত করুণ—মনে হয় জীবন থেকে সর্ব প্রকার সুখ বা আনন্দই শুধু নয়—উদ্দেশ্যও চলে গেছে, কোন অবলম্বন, আশা—বেঁচে থাকার কোন কারণও বুঝি খুঁজে পাচ্ছেন না। শুধুই একটা শূন্যতা, জীবনব্যাপী অন্ধকার সামনে। আর দাঁড়াতে পারল না তপন। ফিরে এসে বাস-এ চাপল। ফিরতি বাসে তত ভীড় নেই।

বাড়ি ফিরতে মা অনুযোগ করলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ। এক কাপ চা পর্যন্ত খেয়ে যাস নি? শোভনাদের বাড়ি অবধি গিছলি বুঝি—মানে নিখিলদের বাড়ি—শোভনার সঙ্গে?'

সংক্ষেপে একটা 'না' বলে বাথরুমে চলে গেল তপন।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল সে। ভাতও খেল যেমন খায়। সারা তুপুর জেগে বসে রইল তারপর—একা একটা বই হাতে করে। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয় নি—তবুও চোখের পাতায় তন্দ্রার আভাস নেই। সে কথা মনেও নেই বা কোন দৈহিক ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না।

ক্লান্তি শুধু মনে। এতদিনের ধারণা ও বিশ্বাসের মূলটা নড়ে গেছে। ভূমিকম্পের পরের অবস্থা ওর মাথায়।

বেলা তিনটে পর্যন্ত সেই একভাবে বসে রইল জানলার ধারে। তারপর হঠাৎ উঠে জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে, মা ঘুমোচ্ছেন, তা হোক—এখনই ঝি আসবে। দরজাটা ভেজিয়ে দিল শুধু।

পাড়ার বড় পোস্ট আপিসে টেলিফোনের ঘেরা বুথ আছে। সেইখান

থেকে প্রায় বিশ মিনিটের চেষ্টায় পুলিশ কমিশনারকে পেল সে, ততক্ষণে ঘামে নেয়ে উঠেছে প্রায়।

বলল, 'দেখুন আমি একটা অপরাধ স্বীকার ক'রে আত্মসমর্পণ করতে চাই। আমার নাম তপন রায়—কিন্তু আপনি কথা দিন, ওয়ার্ড অফ অনার যে, আমার সঙ্গীদের নামের জন্যে আমাকে কোনরকম নির্যাতন বা কষ্টদায়ক জেরা করবেন না। সে কথা পেলে আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আপনার কাছে চলে যেতে পারি।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ওপারে। তারপর উত্তর এল ; 'কিন্তু পরিচয়ের সূত্র ধরে যদি আমরা খোঁজ খবর করি—সে স্বাধীনতা থাকবে তো?'

'সে অবশ্যই থাকবে। কিন্তু একটা কথা, আমার মা বাবা ভাইদের ধরে টানাটানি করবেন না—তাঁরা কিছুই জানেন না। অনেষ্টলি। আমার কোন একস্ট্রিমিষ্ট মতবাদ আছে, তাও পর্যন্ত জানা নেই তাঁদের। এমনিই তাঁদের যথেষ্ট ক্ষতি হবে—আমিই বড় ছেলে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে চাই না।'

'এটা হোক্‌স্‌ নয়? আমরা কিন্তু টেলিফোন কল ট্রেস করতে পারব।'

'মিনিট কুড়ি দেখুনই না।'

'তা হঠাৎ এই সারেণ্ডার কথার অর্থ?'

তপন হাসল। বেশ শব্দ করেই হাসল। তারপর বলল, 'বাবু চেঞ্জেস হিজ মাইণ্ড।'

'তাহ'লে চলে আসুন—ওয়েলকাম।'

'কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতিটা—'

'দিলাম ওআর্ড অফ অনার। আপনার কাছে সঙ্গীদের নাম জানতে চাইব না। আপনার বাড়িতেও কোন হাঙ্গামা করব না।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

কুড়ি মিনিটেরও আগে তপন লালবাজারে পৌছে গেল। বোধহয় বলাই ছিল। একজন সার্জেন্ট সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল কমিশনারের ঘরে।

সহজ শান্তভাবে, হাসিহাসি মুখে তপন বলল, 'এস. আই. নিখিল চ্যাটার্জীকে যারা খুন করেছে আমি তাদের একজন। আমার নাম তপন রায়। বাবার নাম-ঠিকানা—আর যা জানতে চান বলছি। কেবল সঙ্গে যারা ছিল, কি ভাবে কেন খুন করেছি সে সব বলতে পারব না।'

পুলিশ কমিশনারের সামনের টেবিলে আর একজন বসে ছিলেন। কমিশনারের ইঙ্গিতে তিনি বললেন 'আমার সঙ্গে আসুন, আমি কনফেসন লিখে আপনাকে দেখিয়ে নিচ্ছি, আপনি সই ক'রে দেবেন— । কিন্তু বেল— ?

'না, বেল চাই না। বরং আপনাদের ফাঁসি কাঠই ভাল, বাইরে থেকে বুচর্ড হতে চাই না। আর তার চেয়েও বড় কথা, ফ্যামিলিকে বিপন্ন করতে চাই না।'

কমিশনার হাসলেন।

এই সংবাদ—প্রাচুর্যের মধ্যেও বড় হেড লাইন দিয়ে ছাপার মতো খবর বৈকি।

"এস. আই হত্যার আসামীর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ।"

"নাটকীয় স্বীকারোক্তি" ইত্যাদি—

এ সুযোগ কোন কাগজ ছাড়বে ?

— দ্বিতীয় স্তবক সমাপ্ত —